প্রথম প্রকাশ ঃ   পৌষ ১৩৬০

প্রকাশক ঃ শ্রীপ্রশান্ত তালুকদার

প্রচ্ছদ ঃ   সত্য চক্রবর্তী

লুম্বন

—গল্প সূচী—

লু সুন গল্পসংগ্রহ

লু সুন গল্পসংগ্রহ

লু সুন গল্পসংগ্রহ

লু সুন গল্পসংগ্রহ

একটি পাগলের দিনলিপি

তারা দুই ভাই। নাম না-ইবা বললাম। দু'জনেই আমার হাই স্কুলের বন্ধু। কিন্তু বহুদিনের অসাক্ষাতে পরস্পর আমরা ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। কিছু দিন আগে পরস্পর জানতে পারলাম, দুই ভাইয়ের একজন গুরুতর পীড়িত। তাই আমাদের গ্রামের বাড়িতে যাবার পথে একদিন ওদের ওখানে নামলাম, খোঁজ নেব এই উদ্দেশ্যে। কিন্তু একজনের সঙ্গে আমার দেখা হলো। তার কাছেই শুনলাম ছোটোটি অসুস্থ হয়েছিল।
—আমার খুব ভালো লাগছে, আমাদের দেখবার জন্য কষ্ট করে এতদূর এসেছ! বড় ভাই বলল—তবে ভাইটি কিছুদিন হলো সুস্থ হয়েছে। সরকারী কাজে অন্যত্র গেছে। তারপর হাসতে হাসতে ভাইয়ের লেখা ডায়েরির দুটো খাতা নিয়ে এল। বলল, এগুলো পড়লেই তার কী অসুখ করেছিল বুঝতে পারবে। তারপর এও বলল, পুরনো বন্ধুকে এগুলো দেখাতে কোনো আপত্তি নেই বলেই আমাকে দেখতে দিল। আমি দু'খানা খাতাই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। তন্ন তন্ন করে পড়ে বুঝতে পারলাম সে নিপীড়ন গূঢ়ৈষায় ভুগছিল। লেখাগুলো কেমন এলোমেলো অসংলগ্ন। অনেক উদ্‌ভ্রান্ত মন্তব্য করেছে, উপরন্তু কোনো তারিখ দেয়নি। কালির রঙ এবং লেখার পার্থক্য দেখেই বোঝা গেল একদিনে বা একই সময়ে লেখা হয়নি। কোনো কোনো অংশ অবশ্য একেবারে অসংযুক্ত ছিল না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার কাজে লাগতে পারে মনে করে কিছুটা অংশ টুকে রেখেছিলাম। ডায়েরির বক্তব্যের যুক্তিহীনতার কোনো অংশই আমি বদলাই নি। শুধু কতকগুলো নাম পরিবর্তন করেছি। যদিও যাদের নাম উল্লেখ করা ছিল, তাদের সবাই পল্লীগ্রামের বাসিন্দা, বাইরের দুনিয়ায় সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং অপ্রয়োজনীয়। ডায়েরির নামকরণ সুস্থ হয়ে লেখক নিজেই করেছিল। আমি সেটাও বদলাই নি।

॥ ১ ॥

আজ রাত্রের চাঁদটাকে কেমন ভীষণ উজ্জ্বল লাগছে।
তিরিশটি বছর আমি চাঁদ দেখিনি। আজ যখন দেখলাম, একটা অদ্ভুত উত্তেজনার অনুভূতি বোধ করলাম। উপলব্ধি করতে লাগলাম, গত তিরিশটা বছর আমি অন্ধকারে কাটিয়েছি, কিছুই জানতে পারিনি, কিন্তু এবার আমাকে খুব সতর্ক হতে হবে। তা যদি না হয়, তাহলে চাও-দের বাড়ির কুকুরটা অমন করে দু দু-বার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল কেন?
আমি যে ভয় পাচ্ছি, তার যথেষ্ট কারণ আছে।

॥ ২ ॥

আজ রাতে আকাশে চাঁদ নেই, এটা অমঙ্গলের চিহ্ন। আজ সকাল বেলা যখন খুব সতর্কভাবে বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছিলাম, তখন মিঃ চাও-এর চোখে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি লক্ষ্য করেছি। মনে হচ্ছিল, যেন তিনি আমাকে ভয় করছিলেন, আমাকে খুন করতে চাইছিলেন। আরও সাত আট জন লোক ছিল। তারাও ফিস্ ফিস্ করে কী যেন আমার কথা আলোচনা করছিল। তাদের দেখে ফেলেছি, আমি টের পেয়েছি বলে তারা ভয় পেয়েছিল। যাদের পাশ দিয়ে গেলাম, সবাইকে একরকম লাগল। সবচেয়ে হিংস্র লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটল। আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কম্পন শুরু হলো এই ভেবে, তাদের প্রস্তুতিপর্ব এইবার শেষ হয়েছে। ভীত হইনি অবশ্য, কিন্তু পথ চলতে চলতে দেখলাম, সামনে একদল ছোট ছেলে মেয়েও আমাকে নিয়ে আলোচনা করছে। তাদের চোখের দৃষ্টি ভয়ঙ্কর ফ্যাকাশে। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম কেন আমার প্রতি এদের এমনি ব্যবহার! আমি জিজ্ঞেস না করে পারলাম না—বলো কেন। কিন্তু তখন তারা সবাই ছুটে পালিয়ে গেল। আমি ভেবে পাই না মিঃ চাও-এরই বা আমার বিরুদ্ধে কোন্ অভিযোগ থাকতে পারে; ঐ রাস্তার লোকগুলিরও বা আমার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ! কুড়ি বছর আগে একদিন মিঃ কু চিউর বহুদিনের ইতিবৃত্তের বর্ণনার কথা না শুনে এড়িয়ে গিয়েছিলাম। তিনি আমার উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন—এছাড়া আর তো কিছু মনে পড়ে না! মিঃ চাও কু চিউকে না চিনলেও নিশ্চয় এসব কথা শুনে থাকবেন, তাই নিশ্চয় তার হয়ে প্রতিশোধ নিতে চাইছেন। বাজেই রাস্তার সব লোকদের সঙ্গে নিয়ে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলেন। কিন্তু ঐ ছোটো ছেলে-মেয়েরা? তারা তো তখনও জন্মায়নি। যদি তারা আমাকে ভয়ই করবে তাহলে আজকে আমার দিকে ওরকম অদ্ভুত ভাবে তাকাবে কেন, যেন আমাকে খুন করতে চাইছে! এইতেই আমি ভয় পাই! আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে, অস্থির করে।

আমি জানি। নিশ্চয় মা-বাপের কাছ থেকে ওরা শিখেছে।

॥ ৩ ॥

রাত্রে ঘুমুতে প্যারি না। কোনো কিছু বুঝতে হলে সবদিক বিশেষ করে বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন।

ঐসব লোকগুলোর কাউকে হয়তো কোনো ম্যাজিস্ট্রেট পিলোরিতে তুলে শাস্তি দিয়েছে। কেউ হয়তো গালে চড় খেয়ে শাস্তি পেয়েছে, কারও স্ত্রীকে হয়তো বেলিফ ধরে নিয়ে গেছে, কারও পিতা-মাতা হয়তো ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। ওদের কিন্তু সে-সময় এতটা ভীত, এতটা হিংস্র মনে হয়নি, যেমন কালকে দেখেছি।

সবচেয়ে অদ্ভুত মনে হয়েছিল রাস্তার উপর ঐ মেয়েছেলেটাকে। সে তার ছেলেকে বেদম পিটছিল আর চেঁচিয়ে যাচ্ছিল—কুটি্ শয়তান! তোর গা থেকে দু-চার কামড় মাংস তুলে নিলে হয় না! তবেই না মেটে গায়ের ঝাল অথচ মেয়েছেলেটি তখন কেবল আমার দিকেই তাকাচ্ছিল। আমি চমকে উঠেছিলাম, নিজেকে সামলাতে পারিনি। তখন ঐসকল সবুজ-মুখো, লম্বা-দেঁতো মানুষগুলো বিদ্রূপের হাসি হাসতে শুরু করল! বুড়ো চেন ছুটে এসে হিড় হিড় করে টেনে আমায় বাড়ি নিয়ে গেল।

সে আমাকে টেনে হিচড়ে বাড়ি নিয়ে গেল। বাড়ির সবাই যেন আমাকে চিনতেই পারল না এমনি ভান করল। তাদের চোখের দৃষ্টিও আর সবার মতো দেখলাম। আমি পড়ার ঘরে ঢুকতেই তারা বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। হাঁস মুরগীকে যেমন খাঁচায় বন্ধ করে। এই ঘটনাটা আমাকে আরো বিহ্বল করে তুলল।

দিন কয়েক আগে, 'ওলফ কাব' গ্রাম থেকে আমাদের একজন প্রজা এসেছিল, ফসল নষ্ট হওয়ার খবর দিতে। আমার বড় ভাইকে লোকটা বলল—তাদের গ্রামের একজন দাগি বদমায়েশকে নাকি পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। জনকয়েক লোক নাকি লোকটার কলিজা আর যকৃত বের করে বেশ করে তেলে ভেজে খেয়ে ফেলেছে। এতে নাকি তাদের সাহস বাড়বে। আমি যখন তাদের কথার মাঝখানে বাধা দিলাম, আমার বড় ভাই এবং প্রজাটি উভয়েই আমার দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকাল। কেবল আজকেই আমি বুঝতে পারছি, এ দুজনের চোখের দৃষ্টিও ঠিক বাইরের ঐ লোকগুলোর মতোই ছিল। কথাটা ভাবতেও আমার মাথার তালু থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ কেমন শিউরে ওঠে। এরা মানুষ খায়, তাহলে এরা আমাকেও খেয়ে ফেলতে পারে।

আমি বুঝতে পারছি, ঐ স্ত্রীলোকটির দু-চার কামড় মাংস তুলে নেওয়া, ঐ সবুজ-মুখো আর লম্বা-দেঁতো মানুষগুলির হাসি, আর আমাদের প্রজার মুখে শোনা ঐ দিনকার কাহিনী সবই একটা স্পষ্ট গোপন ইঙ্গিত। তাদের হাসিতে ছুরি আর কথায় বিষ আমি উপলব্ধি করতে পারি। তাদের দাঁত সাদা আর ঝকঝকে, এরা সবাই নরখাদক!

আমার মনে হয়, যদিও আমি খুব খারাপ মানুষ নই, তবু ঐ মিঃ কু-র ব্যাপার থেকেই এর শুরু! তাদের সবার একটা গুপ্ত অভিপ্রায় আছে আমার ধারণা। তবে ঠিক আন্দাজ করতে পারি না। আর তারা যখনি রেগে যায় তখনই যে কোনো লোককে তারা দুষ্ট লোক বলে ধরে নেয়। আমার মনে আছে যখন আমার বড় ভাই আমাকে রচনা লিখতে শেখাত, শত ভালো মানুষ হলেও যদি কোনো যুক্তি উত্থাপন করতাম, তার বিরুদ্ধে ঐ যুক্তিগুলিকে মেনে নিয়ে সে চিহ্নিত করে রাখত। যদি কোনো দুষ্কৃতকারীকে সমর্থন করতাম তখন সে বলত—খুব ভালো, তোমার মৌলিকতার পরিচয় আছে। আমি তাদের

গোপন চিন্তা ধারাকে কেমন করে আন্দাজ করতে পারব—যখন দেখছি তারা মানুষ খেতেও প্রস্তুত ?

কোনো কিছু বুঝতে হলে বিশেষ করে বিবেচনা করে দেখা দরকার। প্রাচীন কালে, আমার যতটুকু মনে পড়ে, অনেক সময় মানুষ মানুষের মাংস খেত, তবে এ বিষয়ে আমি ঠিক স্পষ্ট নই। আমি ব্যাপারটা আরো একটু খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু মুশকিল এই, আমার ইতিহাসের বিদ্যায় ক্রমানুবর্তিতা নেই, এর প্রতি পাতায় লেখা এই কয়টা কথা—পূণ্য আর নীতি। কিছুতেই যখন ঘুমুতে পারছিলাম না, অর্ধেক রাত আমি বই পড়ে কাটিয়ে দিলাম। প্রতি ছত্রের ফাঁকে ফাঁকে প্রতি অক্ষরে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে লাগল, দেখলাম সারাটা বইয়ের পাতায় পাতায় শুধু দুটি শব্দ লেখা—মানুষ খাও।

বইয়ের লেখা এই সব শব্দ, আমাদের প্রজার মুখে উচ্চারিত সবগুলো কথা, যেন তাকিয়ে থাকে আমার দিকে অদ্ভুত ভাবে, তাদের মুখে কেমন একটা রহস্যময় হাসি !

আমিও একজন মানুষ, আর তারা আমাকে খেতে চায় !

॥ ৪ ॥

সকাল বেলা আমি চুপচাপ বসেছিলাম কিছুক্ষণ। বুড়ো চেন দুপুর বেলায় খাবার নিয়ে এল। এক বাটি সবজি, এক বাটি সেদ্ধ মাছ। মাছের চোখগুলো কেমন সাদা এবং শক্ত দেখতে। মুখ হাঁ করা, ঠিক যারা মানুষ খেতে চায় তাদের মতো। কয়েক গ্রাস খাবার পর আমি ঠিক বলতে পারছিলাম না ঐ ভিজা ভিজা পিছলা গ্রাসগুলো মাছের না নরমাংসের। আমি সব গলাধঃকরণ করতে লাগলাম।

আমি বললাম—বুড়ো চেন, দাদাকে বলো আমার কেমন দম বন্ধ হয়ে আসছে। বাইরে বাগানে গিয়ে একটু ঘুরে আসব। বুড়ো চেন কিছু বলল না। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পর আবার ফিরে এসে গেট খুলে দিল।

আমি নড়িনি। আমার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করে দেখবার জন্য লক্ষ্য করতে লাগলাম। জেনেশুনেই সে আমাকে বাইরে বেরুতে দেবে না। দাদা ধীরে ধীরে এল, সঙ্গে একজন বৃদ্ধ। খুনির চোখের মতো তার চোখ জ্বলজ্বল করছিল। আমি দেখে ফেলব এই ভয়ে মাথা নুইয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে তেরছা দৃষ্টি ফেলছিল আমার দিকে।

—আজকে তোমাকে বেশ ভালো দেখাচ্ছে। আমার বড় ভাই বলল।

—হ্যাঁ। আমি বললাম।

—মিঃ হোকে আজকে ডাকিয়েছি, দাদা বলল, তোমাকে দেখবার জন্য।

—কেন। আমি বললাম।

আসলে আমি ঠিক জানতাম ঐ বুড়ো ছদ্মবেশী ঘাতক ছাড়া আর কিছু নয়।

আমার নাড়ী পরীক্ষা করা, কতটুকু চর্বি আছে, এইটুকু বুঝবার অজুহাত। কেননা এমনি করে আমার মাংসের কিছুটা ভাগ সেও পাবে। তবু আমি ভয় পাই নি। যদিও আমি নরমাংস খাই না, তবু তাদের চেয়েও আমার বেশি সাহস। আমি আমার দু'হাতের মুঠো সামনের দিকে ছুঁড়ে দিলাম। দেখি সে কী করে! বুড়ো বসে পড়ল, চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ আমতা আমতা করল, তারপর কিছুক্ষণ আবার চুপ করে রইল। তবে চতুর চোখ খুলে বলল—বেশি বেশি ভেব না। কিছুদিন চুপ করে বিশ্রাম নাও, দেখবে সেরে উঠেছ।

বেশি ভাববে না! কিছুদিন চুপচাপ বিশ্রাম নাও! বসে বসে যখন গায়ে বেশ চর্বি জমবে, তখন অনেকটা মাংস খেতে পারবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এতে আমার কী উপকার হবে, এতে আমি কী করে সেরে উঠব। এ লোকগুলো নরমাংস খেতে চাইবে, আবার লুকিয়ে লুকিয়ে সাধু সাজবে, তড়িঘড়ি কাজ করতে সাহস পাবে না, এদের দেখলে সত্যি আমি প্রায় হেসেই মরে যাই। হাসিতে ফেটে না পড়ে পারলাম না, এত মজা লাগছিল। আমি জানতাম এই হাসিতেই সাহস এবং সততা ছিল। বুড়ো ভদ্রলোক আর আমার ভাই, উভয়েই কেমন পানসে হয়ে গেল, আমার সাহস আর সততা দেখে। কিন্তু যেহেতু আমি বেশি সাহসী, আমাকেই খাবার জন্য তারা আগ্রহী বেশি, আমার সাহসিকতার অন্ততঃ কিছুটা ভাগ পাবার জন্য। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি গেটের বাইরে বেরিয়ে গেল, কিন্তু খুব বেশিদূর না গিয়ে খুব নিচু কণ্ঠে আমার দাদাকে বলল—এক্ষুণি খেতে হবে। আমার বড় ভাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। তাহলে তুমিও এর মধ্যে আছ! এই বিরাট আবিষ্কার, যদিও আমি বেশ একটু আঘাত পেলাম, যা আমি আশা করেছিলাম তার চেয়ে এমন কিছু বেশি নয়। আমাকে খেয়ে ফেলবার ষড়যন্ত্রে আমার নিজের বড় ভাইও আছে! নরমাংস খাদক আমার বড় ভাই!

নরমাংস খাদকের ছোট ভাই আমি!

আমাকে অন্য লোকেরা খাবে, তবুও আমি একজন নরমাংস খাদকের ছোট ভাই।

॥ ৫ ॥

এই ক'টা দিন আমাকে আবার ভাবনা পেয়েছে। ধরে নাও ঐ বুড়ো ভদ্রলোকটি একজন ছদ্মবেশী ঘাতক নয়, সত্যি সত্যি একজন ডাক্তার। তাহলেও সে নরমাংস ভোজী। তার পূর্বসূরি লি শিহ-চেন রচিত ঔষধের বইয়ে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে মানুষের মাংস সেদ্ধ করা যায় এবং খাওয়া চলে; তা সত্ত্বেও কি সে বলতে পারে যে সে মানুষ খায় না?

আমার বড় ভাইয়ের কথা বলতে গিয়ে বলতে হয় তাকে সন্দেহ করবারও আমার অনেক যুক্তি আছে। যখন সে আমাকে পড়াত, নিজের মুখে বলত,

মানুষ খাবার যোগাড় করতে নিজের সন্তানকেও বিক্রি করে। একবার এক-জন অসৎপ্রকৃতির লোকের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিল, "লোকটা শুধু বধ-যোগ্যই নয়, তার মাংস খাওয়ার যোগ্য আর চামড়া পেতে শোওয়া যায়।" আমি তখনো অনেক ছোট। কিছুক্ষণ পর্যন্ত আমার হৃদপিণ্ডের গতি বেড়ে গিয়েছিল। যখন ওলফ্ কাব গ্রামের বাসিন্দা আমাদের প্রজাটি মানুষের কলিজা এবং যকৃত ভেজে খাওয়ার গল্প বলেছিল, সে কাহিনী শুনে আমার বড় ভাই তো অবাক হয়ই-নি বরং মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল। সে পরিষ্কার আগের মতোই নিষ্ঠুর। "খাবারের জন্য যখন ছেলেকে বিক্রি" করা যায় তখন এমনি যা কিছু বিনিময় চলে, যে কোনো লোককে খেয়ে ফেলা যায়। আগে সে যা ব্যাখ্যা দিত তা কেবল শুনতাম কিন্তু এখন জানি সে যখন আমাকে বোঝাত, তখন তার ঠোঁটের কোণে কেবল মানুষের চর্বি লেগে থাকত না, সে সমস্ত মন দিয়ে মানুষের মাংস খাওয়ার কথা ভাবত।

॥ ৬ ॥

ভীষণ অন্ধকার! জানি না এখন দিন না রাত্রি। চাও-দের কুকুরটা আবার চেঁচাতে শুরু করেছে।

সিংহের হিংস্রতা, শশকের ভীরুতা, আর শৃগালের ধূর্তামি···

॥ ৭ ॥

তাদের মতি-গতি আমি বুঝি। একবারে মারতে চাইবে না, সেরকম সাহস নেই, কারণ পরিণামের ভয় আছে। তার বদলে সবাই একদল হয়েছে, এখানে ওখানে ফাঁদ পেতেছে, যাতে নিজেকেই হত্যা করতে বাধ্য হই। কয়েকদিন আগে প্রকাশ্য রাজপথে মেয়ে পুরুষের যে ব্যবহার দেখেছি, আর গত দিন কয়েক আমার বড় ভাই যা করেছে, তা থেকেই এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ে যায়। তারা চায় যে কেউ তার নিজের কোমরের বাঁধন খুলে সেটা দিয়ে ঘরের কড়িকাঠে ঝুলে পড়ুক। তাহলেই তারা প্রাণভরে আনন্দ করতে পারবে। মনের বাসনা পূর্ণ হবে অথচ খুনের দায়ে দায়ী হবে না। স্বাভাবিক, এজন্যই তারা আনন্দের অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে। অপরদিকে কেউ যদি ভয় পায়, অথবা ভাবনায় মরে যায়, আর এর ফলে শুকিয়েও মরে তাহলেও তারা খুশি।

তারা কেবল মড়ামাংস খায়। একটা বীভৎস জানোয়ারের কথা কোথায় পড়েছি মনে পড়েছে—কুৎসিত দৃষ্টি জানোয়ারের চোখে, নাম হায়েনা ; এরাও মড়ামাংস খায় অনেক সময়। এমনকি মোটা মোটা হাড়গুলিও চিবিয়ে গুঁড়ো করে গিলে ফেলে ঃ কথাটা ভাবতেও কেমন ভীষণ ভয় লাগে। হায়েনা তো নেকড়ে বাঘের আত্মীয়, আর নেকড়ে বাঘ বিড়াল জাতের পশু। সেদিন চাও-দের

বাড়ির কুকুরটা অনেকবার আমার দিকে তাকিয়েছিল। এটাও নিশ্চয় এই ষড়যন্ত্রে আছে এবং ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। বুড়ো ডাক্তারের চোখ দুটো নোয়ানো থাকলেও আমাকে ঠকাতে পারেনি।

সবচেয়ে জঘন্য আমার বড় ভাই। সেও মানুষ, তবে সে ভয় পায় না কেন? আমাকে খাবার জন্য কেন তাহলে আর সবার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে? তবে কি অভ্যাস হয়ে গেলে আর অপরাধ বোধ থাকে না? অথবা কাজটা অন্যায় জেনেও সেটা করবার জন্য নিজের মনকে কঠিন করে?

নরখাদকদের অভিশাপ দিতে গিয়ে প্রথমেই দেব আমার বড় ভাইকে, আর নরখাদকদের বিরত করতেও শুরু করব তাকে নিয়েই।

॥ ৮ ॥

আসলে এইসব যুক্তিতর্কে অনেকদিন আগেই তাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত ছিল···হঠাৎ কে ভেতরে এল। তার বয়স কুড়ি বছর মতন। তার চেহারাটা আমি ঠিক স্পষ্ট করে দেখিনি। মুখটা হাসিতে ভরা ছিল। কিন্তু সে যখন আমার দিকে তাকাল তখন তার ঐ হাসিটা খাঁটি বলে মনে হলো না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, মানুষের মাংস খাওয়া কি উচিত?

—দুর্ভিক্ষ না হলে মানুষ মানুষের মাংস খাবে কেন? সে জবাব দিল, মুখে তখনো সেই মৃদু হাসি।

তক্ষুণি বুঝতে পারলাম, সেও ওদেরই একজন; তবু আমার সব সাহস কুড়িয়ে একত্র করে আবার তাকে প্রশ্ন করলাম—এটা কি ঠিক?

—ওরকম প্রশ্ন করছ কেন? তুমি নিশ্চয়···ঠাট্টা তামাশা পছন্দ করো··· আজকের দিনটা ভারি সুন্দর, তাই না?

—হ্যাঁ, সুন্দর। চাঁদটাও বেশ উজ্জ্বল। কিন্তু আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এটা কি ঠিক?

কেমন নিরাশ হয়েছে মনে হলো; বিড় বিড় করে জবাব দিল—না···

—না? তবু তারা এখনো করে কেন?

—তুমি কিসের কথা বলছ?

—কি বলছি? ওলফ কাব গ্রামের লোকেরা আজকাল মানুষের মাংস খাচ্ছে। বই-পত্রেও এসব কথা লেখা আছে তুমি দেখতে পাবে—পরিষ্কার লাল কালি দিয়ে লেখা।

তার মুখের ভাব বদলে গেল, বীভৎস রকম ফ্যাকাসে হয়ে গেল—হবেও বা। সে বলল, আমার দিকে ভ্রূকুটি করে। সবসময় তো ঐ রকমই···

—সবসময় ঐরকম হয়েছে বলেই কি এটা ঠিক?

—তোমার সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। যাকগে, তুমিও আর এসব নিয়ে কথাবার্তা বলো না। যারা এ নিয়ে আলোচনা করে তারা

অন্যায় করে !
আমি লাফিয়ে উঠলাম, চোখ বড় বড় করে তাকালাম কিন্তু ততক্ষণে লোকটা সরে পড়েছে। ঘামে ভিজে উঠেছিলাম। সে আমার বড় ভাইয়ের চেয়েও বয়সে ছোট, তবুও এ ব্যাপারে সে যুক্ত ছিল। নিশ্চয় তার মা বাবার কাছ থেকে শিখেছিল ! আমি ভয় পাচ্ছি, সে তার ছেলেকে এর মধ্যেই শিখিয়ে ফেলেছে। এই জন্যই ঐ ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি পর্যন্ত আমার দিকে অমন বিশ্রীভাবে তাকাচ্ছিল।

॥ ৯ ॥

মানুষের মাংস খাবার ইচ্ছা, আবার সঙ্গে সঙ্গে অপরে তাকে খাবে এই ভয়, এই কারণেই তারা সবাই সন্দেহের চোখে তাকায় একে অন্যের দিকে…এই আবেশের কবল থেকে যদি নিজেদের মুক্ত করতে পারত তবে কত আরামপ্রদ হতো তাদের জীবন, তারা শান্তিতে কাজে যেত, ঘুরে বেড়াত, খেত, ঘুমুত এই একটিমাত্র প্রতিকার তাদের করবার আছে। অথচ বাপ-ছেলে, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বন্ধু, শিক্ষক ছাত্র, শত্রু এমন কি অপরিচিত কেউ, সবাই এই একই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে—এই প্রতিকারের পথে নামতে নিরুৎসাহ বোধ করেছে, বাধা দিচ্ছে।

॥ ১০ ॥

আজ ভোর বেলায় দাদাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। সে হলের বাইরে দরজার কাছে আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। পেছন থেকে গিয়ে দরজা আর তার মাঝখানটায় দাঁড়ালাম। অত্যন্ত বিনয় এবং নম্রতার সঙ্গে তাকে বললাম—দাদা, তোমাকে কয়েকটা কথা বলবার ছিল।
—বেশ, কি—বলো। আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল।
—বেশি কিছু না কিন্তু সহজে বলতে পারছি না। দাদা, কি জানো, আমার ধারণা গোড়াতে আদিম মানুষদের কিছু কিছু, মানুষের মাংস খেত। পরে, যেহেতু তাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে শুরু করল, অনেকেই নরমাংস আহার করা একেবারে বন্ধ করে দিল। তারপর নিজেদের উন্নতির দিকে মন দিয়ে তারা ক্রমশ মানুষে, সত্যিকার মানুষে পরিণত হলো। কিন্তু এখনো কেউ কেউ খায়—এই ধরো সরীসৃপদের মতন ! কেউ প্রথমে মাছ, পরে পাখি, বানর এবং সব শেষে মানুষে পরিবর্তিত হলো। কিন্তু কেউ কেউ উন্নতি চায় না, কাজেই এখনও তারা সরীসৃপই রয়ে গেছে। যারা নরমাংস খায় তারা, যারা খায় না তাদের সঙ্গে যখন নিজেদের তুলনা করে, তখন নিশ্চয় তারা লজ্জা বোধ করে। হয়তো সরীসৃপরা বানরের কাছে যতটা লজ্জিত হয় তার চেয়েও বেশি। পুরাকালে ইয়ি-ইয়া তার ছেলেকে সেদ্ধ করেছিল চেয়েহ্ এবং চাউকে

খেতে দেবার জন্যে—এইরূপ কথিত আছে। পান কিউ যখন স্বর্গ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছিল তখন থেকেই মানুষ পরস্পরের মাংস খেয়ে আসছে এই ইয়ি-ইয়ার ছেলের সময় থেকে সুসি-লিনের সময় পর্যন্ত, আবার সুসি-লিনের সময় থেকে মুসি-লিনের সময় যে মানুষটাকে ওলফ কাব গ্রামের লোকেরা ধরেছিল সেই পর্যন্ত। গত বছর ওরা ঐ শহরে একজন দুষ্কৃতকারীকে ফাঁসি দিয়েছিল। একজন ক্ষয়রোগী ঐ লোকটার রক্তে এক টুকরো রুটি চুবিয়ে নিয়ে চুষে খেয়েছিল। ওরা আমাকে খেতে চায়, অবশ্যি একা তুমি ও ব্যাপারে কিছু করতে পার না। কিন্তু তা বলে তুমি ওদের সঙ্গে যোগ দেবে কেন? নরখাদক হিসেবে ওরা সব কিছু করতে পারে। তারা যদি আমাকে খায়, তোমাকেও খেতে পারে তাহলে। একই দলের লোকেরা তাহলে পরস্পরকে খেতে পারে কিন্তু এক্ষুণি যদি তুমি তোমার ধরণ-ধারণ বদলে ফেল, তাহলে সকলেই শান্তি পাবে। যদিও অনাদিকাল থেকে ঐরূপ চলে আসছে, তবু আজকের দিনে সৎ হবার জন্য একটা বিশেষ চেষ্টা করতে পারি নিশ্চয় এবং মুখ ফুটে বলতে পারি এ হতে পারে না! আমার নিশ্চিত ধারণা, দাদা, তুমি এরকম বলতে পার। ঐ সেদিন ঐ প্রজা লোকটা খাজনা কমাবার অনুরোধ করল, তুমি তাকে বলে দিলে এ সম্ভব নয়।

প্রথমে দাদা একটু সিনিকের হাসি হাসল, পরক্ষণেই খুনির চোখের মতো তার চোখও জ্বল জ্বল করে উঠল। যখন আমি গোপন কথা প্রকাশ করে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটা পানসে হয়ে গেল। গেটের বাইরে এক দঙ্গল লোক দাঁড়িয়ে ছিল, মিং চাও এবং তার কুকুরটাও। সবাই গলা বাড়িয়ে বাড়ির ভেতর কী হচ্ছে দেখবার চেষ্টা করছিল। প্রত্যেকের মুখ দেখতে পাই নি, কেননা কেউ কেউ কাপড় দিয়ে ঢেকে মুখোশ পরেছিল। কাউকে দেখলাম ফ্যাকাশে কিন্তু তখনও দেখতে বীভৎস, হাসি গোপন করতে চেষ্টা করছিল। আমি জানতাম এরা সবাই এক দল, সবাই নরমাংস ভোজী। কিন্তু এও আমি জানতাম, এদের সবাই একই রকম চিন্তা করে না। কেউ কেউ ভাবে, যেহেতু চলে আসছে, মানুষের মাংস খেতেই হয়। কেউ কেউ জানে, মানুষের মাংস খাওয়া উচিত নয়, তবু খেতে চায়। তারা ভয় পায় হয়তো তাদের গোপন রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে। কাজেই তারা আমার কথা শুনেই রেগে উঠল। কিন্তু তবু তারা ঠোঁট চেপে সিনিকের হাসি হাসতে লাগল। হঠাৎ আমার ভাই ভীষণ রেগে খুব উঁচু গলায় চেঁচিয়ে উঠল—এখান থেকে বেরিয়ে যাও বলছি সবাই। একটা পাগলের দিকে তাকিয়ে থাকবার কী প্রয়োজন আছে তোমাদের?

তখনই আমি এদের ধূর্তামির কিছুটা বুঝতে পারলাম। নিজেদের মত বদলাতে কোনদিন এরা রাজী হবে না, এদের পরিকল্পনা তখন প্রস্তুত—আমাকে পাগল বলে এরা চিহ্নিত করে নিয়েছে। ভবিষ্যতে যখন আমাকে

খেয়ে ফেলবে, তখন তাদের কোনো অসুবিধে তো হবেই না, বরং মানুষ তাদের উপর কৃতজ্ঞতা বোধ করবে। আমাদের প্রজ্ঞা যখন তাদের গ্রামে 'মানুষ খেয়েছে' এই খবর দিয়েছিল তখন ঠিক এই ধারণাই পোষণ করেছিল। এইটা তাদের পুরনো চাল।

চেন বুড়োও এল, বেশ রেগে। কিন্তু তারা আমার মুখ বন্ধ করতে পারল না, এই লোকগুলিকে আমি বলতে বাধ্য হলাম—তোমরা বদলাও, প্রতি লোমকূপ পর্যন্ত নিজেদের বদলাও। আমি বললাম, জেনে রেখো ভবিষ্যতে নরখাদকদের কোনো স্থান হবে না এই দুনিয়ায়। যদি না বদলাও, তোমরা সবাই একে অন্যকে খেয়ে নিঃশেষ করে দেবে। যদিও প্রচুর মানুষের জন্ম হয়, আসল মানুষ এসে এদের সব নিশ্চিহ্ন করে দেবে। যেমন শিকারী এসে নেকড়ের দলকে সাবাড় করে। ঠিক সরীসৃপদের মতোই।

চেন বুড়ো সবাইকে হটিয়ে দিল। আমার ভাইও কোথায় সটকে পড়েছে। চেন বুড়ো আমাকে আমার ঘরে ফিরে যেতে বলল। ঘরটা ভীষণ অন্ধকার। ঘরের কড়ি বরগা সব যেন আমার মাথায় উপর থর থর করে কাঁপছিল। কিছুক্ষণ কাঁপতে কাঁপতে এগুলো কেমন বিরাট আকার ধারণ করল। চেপে বসল আমার মাথার উপর!

এর ভারে আমি নড়তে পারছিলাম না। এর অর্থ আমার মৃত্যু! আমি জানতাম ঐ ওজনটা মিথ্যে, ঘেমে ভিজে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমাকে বলতে হলো—এই মুহূর্তে বদলাতে হবে, চুলের গোড়া পর্যন্ত বদলাতে হবে। জেনে রেখো, ভবিষ্যতে নরখাদকদের কোনো ঠাঁই হবে না এই দুনিয়ায়…

॥ ১১ ॥

সূর্যের আলো আসে না, দরজা খোলে না, দিনে দুবার খেতে দেয়।

চপ-স্টিক তুলে নিলাম, আমার বড় ভাইয়ের কথা ভাবলাম। আমি জানি আমার ছোট বোনটি কি করে মারা গিয়েছিল: আমার বড় ভাই সেজন্য দায়ী। সেসময় আমার বোনের মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স। আমার এখনো বেশ মনে আছে কি মিষ্টি এবং বিমর্ষ লাগত তাকে। মা কেবল কাঁদত আর কাঁদত কিন্তু আমার বড় ভাই মাকে কাঁদতে বারণ করত। তার কারণ নিশ্চয় সে নিজেই ওকে খেয়ে ফেলেছিল তাই মায়ের কান্নায় সে লজ্জা বোধ করত। যদি তার একটুও লজ্জা বোধ থাকত…

আমার ভাই আমার বোনকে খেয়ে ফেলেছিল, কিন্তু আমি জানিনা আমার মা এটা ঠিক বুঝতে পেয়েছিল কিনা।

মনে হয় দাদা নিশ্চয় জানতে পেরেছিল। কিন্তু যখন সে কাঁদত এই কথাটা

স্পষ্ট বলত না, হয়তো না বলাই উচিত মনে করত। বেশ মনে আছে, আমার তখন চা'র পাঁচ বছর বয়স। হল ঘরে বসেছিলাম। আমার ভাই বলছিল যদি কখনো মা-বাবার অসুখ করে তবে ছেলের উচিত নিজের গা থেকে এক টুকরো মাংস কেটে সেদ্ধ করে তাদের খেতে দেওয়া, তাহলেই তাকে সুপুত্র বলে গণ্য করা হবে। একথা শুনে মা কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করেনি এক টুকরো যদি খাওয়া যায়, তাহলে সবটুকু নিশ্চয় খাওয়া সম্ভব। তা সত্বেও সেদিনকার শোক বিহ্বলতার কথা এখনো মনে করলে আমার বুক থেকে যেন রক্ত ঝরে : এইটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা।

॥ ১২ ॥

একথা আর আমি ভাবতে পারি না।

এইমাত্র হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি যেখানে আমি এতকাল বাস করে আসছি, সেখানে গত চার হাজার বছর ধরে মানুষ মানুষের মাংস খেয়ে আসছে। আমার বোনের মৃত্যুর ঠিক সঙ্গে সঙ্গে দাদা বাড়ির ভার নিয়েছিল। আমাদের খাবার ভাত বা অন্যসব খাদ্যবস্তুতে সে আমার বোনের দেহের টুকরো টুকরো মাংস হয়তো মিশিয়ে দিয়ে থাকতে পারে। অজ্ঞান্তে আমরা ঐ মাংস খেয়েও থাকতে পারি।

এটা খুব সম্ভব, অজ্ঞান্তে আমি আমার বোনের দেহের অনেক কটা টুকরো মাংস খেয়েছি আর এইবার আমার পালা।

আমার মতো একজন লোক, চার হাজার বছরের নরমাংস খাওয়ার ইতিহাস বর্তমান সত্বেও—যদিও প্রথমে এর বিন্দুবিসর্গও আমি বুঝতে পারি নি—কেমন করে একজন আসল মানুষের দেখা পাওয়া আশা করতে পারে?

॥ ১৩ ॥

হয়তো এখনো এমন শিশু আছে যারা নরমাংস খায়নি।

শিশুদের রক্ষা করো…।

A Madman's Diary
April -1918

লুচেনের মদের দোকানগুলি চীন দেশের আর সব জায়গার মদের দোকানের মতো নয়। দোকানের কাউণ্টার সমকোণ বিশিষ্ট রাস্তার দিকে মুখ করা। মদ গরম করবার জন্য সবসময় গরম জল মজুত থাকে। দুপুর বা বিকেলে কাজের শেষে বাড়ি ফিরবার পথে একপাত্র মদ নিয়ে বসে এখানকার মানুষেরা। কুড়ি বছর আগে এর জন্য লাগত মাত্র চারটি তাম্রমুদ্রা, আর আজ এর দাম দশ মুদ্রা। কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে এরা চুমুকে চুমুকে গরম গরম পান করে আর বিশ্রাম নেয়। আর একটি বাড়তি মুদ্রার বিনিময়ে তারা পায় হয় একপাত্র নুন দেওয়া কচি বাঁশের কুঁড়ি অথবা মৌরিমশলা দেওয়া মটর কড়াই আর বারোটা মুদ্রা দিতে পারলে তো কথাই নেই, মিলবে এক প্লেট মাংস। কিন্তু খদ্দেরদের অধিকাংশই খাটো কোট পরা মানুষ, খুব কমই মাংস কিনতে পারে তারা। যাদের লম্বা কোট তারা এসে ঢোকে পাশের ঘরে। মদ আর মাংসের অর্ডার দেয়, আরাম করে বসে বসে খায়।

আমার তখন বারো বছর বয়স; শহরে ঢুকবার ঠিক মুখটায় প্রসপারিটি টেভার্নে আমি ওয়েটারের কাজ নিয়েছিলাম। টেভার্নের মালিক আমার চেহারা দেখেই ধরে নিয়েছিল লম্বা কোটওয়ালা খদ্দেরদের আমি সামলাতে পারব না, তাই বাইরের-ঘরের কাজে দিয়েছিল আমাকে। যদিও খাটো-কোট পরা মানুষগুলি খুব অল্পেতেই খুশি হতো, তবু এদের মধ্যে দু'চারজন আবার বেশ ঝামেলা করত। পাত্র থেকে হলুদ রঙের মদ চামচ দিয়ে দেবার সময় ওরা নিজের চোখে দেখতে চাইত, মদের গেলাসের তলায় জল দেওয়া আছে কিনা, আর ঠিক মতো গরম জলে ডুবানো আছে কিনা। তাই মদে জল মিশিয়ে পাতলা করার সুযোগ মিলত না। কয়েকদিন কাজ করবার পর দোকানের মালিক ঠিক করল আমাকে দিয়ে চলবে না ও-কাজ। আমার সৌভাগ্য, একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সুপারিশে আমার চাকরি হয়েছিল। কাজেই আমাকে ছাঁটাই করতে পারল না। গরম জলে মদের পাত্র ডুবিয়ে গরম করবার নিরস কাজে আমাকে বদলি করে দিল।

তারপর থেকে সারাদিন কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে এক লাগোয়া ডিউটি করেই আমার সময় কেটে যেত। মালিক আমার এই কাজে খুশি হয়েছিল বটে, কিন্তু ক্রমেই এই কাজ আমার কাছে ভীষণ একঘেয়ে হয়ে উঠল এবং নিরর্থক পরিশ্রম মনে হতে লাগল। কর্তাব্যক্তিটি একজন ভীষণ দর্শন মানুষ, তারপর খদ্দেরগুলিও আবার তেমনি বেরসিক। কাজেই মনটাকে একটু হালকা করবার সুযোগ মিলত না। কুঙ আই-চি যখন টেভার্নে আসত কেবল তখনই আমি একটু

হাসতে পারতাম। তাই তার কথা এখনো বেশ মনে আছে আমার।

কুণ্ডই একমাত্র লম্বা-কোট পরা মানুষ, যে বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মদ খেত। বেশ বড়সড় মানুষটি ছিল, অদ্ভুত রকম ফ্যাকাশে দেখতে। মুখের রেখার ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে ক্ষত চিহ্ন দেখা যেত। মুখভর্তি লম্বা অগোছালো দাড়ি, মাঝে মাঝে দুচারটে পাকা। যদিও সে লম্বা গাউন পরত। সেটা ছিল বিশ্রী নোংরা আর প্রায় শতছিন্ন। দেখলে মনে হতো কোনোদিন বুঝি কাচা হয় নি বা রিপু হয়নি। কথায় কথায় এমন সব অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করত যে অর্ধেক কথাই দুর্বোধ্য। তার পদবি কুণ্ড বলে সবাই তাকে 'কুঙ আই-চি' বলে ডাকত। বাচ্চাদের বইয়ের বর্ণমালার প্রথম তিনটি বর্ণ। যখনই সে দোকানে আসত, দেখে সবাই ফিক ফিক করে হাসত। আর কেউ হয়তো ডেকে উঠত—কি গো, আবার চুরি করেছিলে বুঝি ?

— মিছি মিছি বদনাম দেবে না বলছি। দুচোখ বিস্ফারিত করে জবাব দিত সে ?

—বদনাম। বলি গত পরশুদিন তোমাকে হাত পা বেঁধে পিটিয়েছিল না, আমি নিজের চোখে দেখিনি ? হো'র বাড়ি থেকে তুমি বই চুরি করেছিলে না ?

কুঙ রেগে লাল হয়ে উঠত। কপালের শিরাগুলি ফুলে উঠত, সে অভিযোগ কাটাতে গিয়ে বলত—একটা বই তুলে নেওয়াকে চুরি করা বলে না…বই নেওয়া…যারা পড়াশুনো করে বই তো তারা নেবেই… একে চুরি করা বলবে না !

সে আরো এটা ওটা উদ্ধৃতি দিত, তাতে এত সব অপ্রচলিত কথা থাকত যে সবাই হো হো করে হেসে উঠত। সারা টেভার্ন উল্লাসে ফেটে পরত।

পরম্পরায় শুনেছিলাম, কুঙ-আই চি প্রাচীন ধ্রুপদী সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনো করেছিল। অবশ্য কোনো পরীক্ষায় পাশ করেনি। উপার্জনের কোনো রাস্তা বার করতে না পেরে দিন দিন তার অবস্থা খারাপ হতে হতে একরকম ভিক্ষা নির্ভর হয়ে উঠল। তবু সুখের কথা তার হাতের লেখা খুব সুন্দর ছিল বলে নকলনবিশী কাজ করে কোনোরকমে পেট চালাত। তবে তার কতগুলো দোষও ছিল : ভীষণ মদ খেত, আবার তেমনি কুঁড়ে। কাজেই কদিন কাজ করেই সে উধাও হয়ে যেত। বই কাগজ কলম দোয়াত এসব কোনো কিছুর আর হদিশ মিলত না। ফলে কয়েকবার এরকম করার পর কেউ আর তাকে কাজ দিতে চাইত না। মাঝে মাঝে চুরি-চামারি ছাড়া আর তার গত্যন্তর থাকত না। কিন্তু টেভার্নে এলে তার ব্যবহার ছিল চমৎকার। নগদ কিনতে কখনো তার ভুল হতো না। তবে কখনো হাতে কিছু না থাকলে যে বোর্ডে বাকি-খদ্দেরদের নাম লেখা থাকত তার নামও সেই

বোর্ডে উঠত আবার এক মাসের ভেতরই সবসময়ে সে তার দেনা শোধ করে দিত। সঙ্গে সঙ্গে তার নাম বোর্ড থেকে মুছে ফেলা হতো।

আধ গেলাস খেয়েই কুঙ তার মেজাজ ফিরে পেত। তখন কেউ হয়তো তাকে জিজ্ঞাসা করত—কুঙ আই-চি, তুমি সত্যি পড়তে জান ?

এই প্রশ্নে কুঙের চোখে অবজ্ঞার দৃষ্টি ফুটে উঠত। তারা আবার প্রশ্ন করত—তাহলে, এ কীরকম, তুমি কোনো পরীক্ষায় পাশ করনি কেন ?

এ প্রশ্নে কুঙ অসোয়াস্তি বোধ করত। তার মুখের রঙ পাণ্ডুর হয়ে ঠোঁট কাঁপত কিন্তু দু'চারটি অবোধ্য শব্দ কেবল মুখ থেকে বেরিয়ে আসত। সবাই তখন এক সুরে হেসে উঠত, টেভার্নের আবহাওয়াটা আবার আনন্দে হালকা লাগত।

এমনি সময়ে আমিও এসে যোগ দিতাম। কর্তা কিছু বলত না। আসলে সবাইকে হাসাবার জন্য কর্তা নিজেও অনেক সময় কুঙকে এ'ধরণের প্রশ্ন করত। ওদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই বুঝে কুঙ আমাদের মতো অল্প বয়সের ছেলেদের সঙ্গে মিশতে পছন্দ করত। একবার আমাকে জিজ্ঞসা করল—তুমি স্কুলে পড়নি কখনো ?

আমি যখন মাথা নাড়লাম সে বলল—বেশ পরীক্ষা করে দেখব তোমাকে। "হুই-সিয়াং" (মৌরিমশলা) শব্দের "হুই" অক্ষরটা কীভাবে লিখতে হয় বল দেখি।

মনে মনে চিন্তা করলাম পথের ভিখারী এই লোকটা পরীক্ষা করবে আমাকে. সে হয়না। আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম, তাকে কোনো পাত্তাই দিলাম না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সহৃদয়তার ভাব নিয়ে আবার সে বলল—তুমি লিখতে পারবে না, তাই না ? বেশ আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব। দেখো; মনে রাখতে হবে কিন্তু। এগুলো তোমার মনে রাখা দরকার, বড় হয়ে যখন নিজের দোকান করবে তখন এগুলো কাজে লাগবে হিসেব রাখবার জন্যে।

নিজে দোকানের মালিক হওয়া, সে সুদূরপরাহত চিন্তা, তাছাড়া আমার মালিক এইসব মৌরিমশলা হিসেবের খাতায় তোলেই না। মজা লাগলেও রাগের ভান করে আমি বললাম—থাম, তোমার মাস্টারিতে দরকার নেই।

—বটে! বটে! সে মাথা নাড়তে লাগল। কিন্তু এই হুই বর্ণটা চার রকম ভাবে লিখতে হয় তা জান ?

আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। মুখ ভেংচি দিয়ে সরে পড়লাম ওখান থেকে। কুঙ আই-চি মদের পাত্রে আঙুল ডুবিয়েছে কাউণ্টারের ওপর অক্ষরটা লিখবার জন্য কিন্তু যখন দেখল আমি একেবারে উদাসীন সে হতাশ হয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল !

হাসির শব্দ শুনে আশেপাসের ছোট ছেলেমেয়েরাও টেভার্নে ছুটে আসত মজা দেখবার জন্য। কুঙ আই-চিকে ঘিরে ধরত। সে তখন প্রত্যেককে

মৌরিমশলা দেওয়া মটর-কড়াই খেতে দিত। কড়াই খেয়েই আবার তাকে ঘিরে ধরত, লোভ তার ডিসের ওপর। বুঝতে পেরেই হাত দিয়ে ডিসটা ঢেকে ফেলত। একটু উবু হয়ে বলত—খুব বেশি নেই। আমার জন্যও বেশি নেই। মাথা তুলে ডিসটা আর একবার দেখে আবার বলত—বেশি না, খুব বেশি নেই, বিশ্বাস করো।

শিশুরদল হাসতে হাসতে ছুটে যেত।

সঙ্গী হিসাবে কুঙ আই-চি একজন অতি চমৎকার লোক। তবু তাকে ছাড়াও আমার চলত দেখেছি।

একদিন, শরৎ উৎসবের কয়েকদিন আগে হবে হয়তো। টেভার্নের মালিক খুব পরিশ্রম করে দোকানের হিসাব দেখছিল। দেয়ালে টাঙানো বোর্ডটা নামিয়ে সে হঠাৎ বলল—কুঙ আই-চি অনেকদিন আসে না দেখছি। এখনো উনিশ তাম্রমুদ্রা পাওনা আছে তার কাছে।

তখনি আমার খেয়াল হলো, অনেকদিন সে সত্যি আসে না।

—কেমন করে আসবে বলো? একজন খদ্দের বলল ঐদিনকার পিটুনিতে ওর একটা ঠ্যাং ভেঙেছে যে।

—অ্যাঁ!

—আবার চুরি করতে শুরু করেছিল। এবার বোকার মতো মিঃ চিঙ-এর বাড়িতে চুরি করতে গেল, পার পাওয়া সহজ ছিল যেন।

—তাতে কী হলো?

—কী হলো? প্রথমে স্বীকারোক্তি তো লিখে দিতেই হলো, পরে বেদম মারও খেল। প্রায় সারা রাত ধরে মেরেছিল, শেষে ঠ্যাং ভেঙে গেল।

—তারপর?

—তারপর ঠ্যাং ভেঙে দিল।

—তাতো বুঝলাম? কিন্তু এরপর?

—এরপর? কে জানে? হয়তো মরেই গেছে। টেভার্নের মালিক আর প্রশ্ন বাড়াল না। নিজের হিসাব মেলাবার কাজে মন দিল।

শরৎ উৎসবের পর থেকেই ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করে। শীত এসে পড়ে। উনুনের ধারে সবসময় বসে থাকলেও প্যাড-দেয়া জামা আমাকে পরতেই হয়। একদিন বিকেল বেলা, দোকানে তখন কোনো খদ্দের ছিল না, চোখ বুজে বসেছিলাম। হঠাৎ কার কণ্ঠস্বর আমার কানে এল—এক পাত্র মদ গরম বসাও।

কণ্ঠস্বর খুবই ক্ষীণ, পরিচিত, কিন্তু মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম কেউ নেই। উঠে দরজার দিকে তাকালাম। ঠিক দোর-গড়ার কাউণ্টারের নিচে বসে কুঙ আই-চি। মুখখানা খুবই শুকনো জীর্ণশীর্ণ! খুবই খারাপ অবস্থায় আছে মনে হলো। একটা ছেঁড়া জামা গায়ে। পায়ের উপর পা তুলে বসেছিল।

আমাকে দেখে আবার বলল—একপাত্র মদ গরম বসাও।
সেই সময় আমার মালিক কাউণ্টারের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল—কে? কুঙ আই-চি নাকি? তোমার কাছে উনিশ মুদ্রা পাওনা আছে এখনো।
—ওটা…ওটা আমি পরে শোধ করে দেব। হতাশ ভাবে মুখ তুলে কুঙ জবাব দিল। আজকে নগদ দিচ্ছি। একটু ভালো জিনিস দিও কিন্তু।
টেভার্ন মালিক, ঠিক অন্যদিনের মতোই একবার মুচকি হেসে বলল—কুঙ আই-চি, তুমি আবার চুরি করতে শুরু করেছ?
বিশেষ জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ না জানিয়ে শুধু সরলভাবে বলল—ঠাট্টা করতে খুব ভালো লাগে তোমার, কেমন?
—ঠাট্টা? যদি চুরি না করবে তোমার ঠ্যাং ভাঙলো কেমন করে?
—পড়ে গিয়েছিলাম। নিচু গলায় কুঙ জবাব দিল। আছাড় পড়ে পা ভেঙে গিয়েছে।
তার চোখের দৃষ্টি যেন টেভার্ন মালিককে মিনতি করছিল এই প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্য। ততক্ষণ কিছু লোক এসে জড়ো হয়েছে। সবাই হেসে উঠল। আমি মদ গরম করে দোর গোড়ায় ওর কাছে রাখলাম। ছেঁড়া কোটের পকেট থেকে চারটি তাম্র মুদ্রা বার করে সে আমার হাতে দিল যখন দিচ্ছিল, দেখলাম তার হাত কাদা মাটিতে ভরা। বোধহয় হাতে ভর দিয়ে গুড়ি মেরে এতদূর এসেছে। এরমধ্যেই মদটুকু সে এক চুমুকে খেয়ে নিয়েছে। তারপর সবার উচ্ছ্বসিত হাসি আর বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যের মধ্যেই হাতে ভর দিয়ে অতি কষ্টে নিজেকে হিঁচড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে।
এরপর অনেকদিন কেটে গেল। কুঙের সঙ্গে আমাদের আর দেখা হয়নি। বছরের শেষে টেভার্ন মালিক বোর্ড হাতে নিয়ে বলল—কুঙ আই-চির কাছে উনিশ মুদ্রা এখনো পাওনা।
পরের বছর ড্রাগনের নৌকো উৎসবের সময়ও টেভার্ন মালিক আবার ঐ একই কথা বলল কিন্তু শরৎ উৎসব যখন এল তখন আর এ কথা উল্লেখ করল না। তারপর আরও একটি নতুন বছর এল, আমরা কুঙকে আর দেখতে পেলাম না।
আমারও এরপর আর কোনোদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি। হয়তো কুঙ আই-চি সত্যি আর বেঁচে নেই।

Kung I-Ghi
March-1919

তখন শরৎকাল। খুব ভোর বেলা। চাঁদ ডুবেছে কিন্তু সূর্যোদয় তখনও হয়নি। সারাটা আকাশ ঘিরে একটা ঘন নীল পর্দার মতো। কেবল নিশাচর বাদে আর সবাই তখনো ঘুমে। চুয়ান বুড়ো হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে দিয়াশলাই জ্বালিয়ে তেলের প্রদীপটা ধরালো। প্রদীপের আলোতে চা-ঘর, সরাইখানার দুখানা ঘরেই কেমন একটা ভৌতিক আলো ছড়িয়ে পড়ল।
—তুমি এখন বেরুচ্ছ ? এক বৃদ্ধার কণ্ঠে ঐ প্রশ্ন। ভেতরের ছোটো ঘর থেকে এক ঝলক কাশির আওয়াজও ভেসে এল।
—হু-ম্ !
কাপড়-জামা পরতে পরতে চুয়ান কান পেতে শুনছিল, তারপর হাত বাড়িয়ে বলল—হয়েছে, এইবার দাও।
বালিশের তলায় হাতড়ে চুয়ান-পত্নী একটা মোড়কে আঁটা কিছু রূপার ডলার তুলে দিল স্বামীর হাতে। চুয়ান বুড়ো মুদ্রা কয়টা পকেটে পুরে বারদুই চাপড়ে বেশ করে দেখে নিল পকেটটা। একটা কাগজের লণ্ঠন জ্বালিয়ে প্রদীপটা নিভিয়ে চলল ভেতরের ঘরের দিকে। একটু খচমচ আওয়াজ, তারপর আবার কাশির শব্দ। যখন থমল, চুয়ান আস্তে আস্তে বলল—বাপধন।...তুমি উঠো না যেন, কেমন ?...তোমার মা-ই দোকান দেখবে।
কোনো জবাব না পেয়ে চুয়ান ভাবল ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে। সে রাস্তায় নেমে এল। রাস্তার ধূসরতা ছাড়া অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। লণ্ঠনের আলোটা পড়েছে তার চলমান পায়ের ওপর। পথে এখানে ওখানে দুটো একটা কুকুর কিন্তু কেউ কোনো আওয়াজ করল না। ঘরের ভেতর থেকে বাইরে অনেক বেশি ঠাণ্ডা তবু চুয়ান বুড়োর শরীরটা কেমন চনমনিয়ে ওঠে। হঠাৎ যেন তার বয়সটা অনেক কমে গেল। কী একটা জীবন-দায়ী শক্তি তার ভেতর দেখা দিল। সে পা চালাল। রাস্তা পরিষ্কার হয়ে আসছিল। আকাশও তখন অনেকটা উজ্জ্বল।
আনমনা হয়ে চলতে চলতে সামনে একটা চৌমাথায় এসেই হঠাৎ সে চমকে উঠল। কয়েক পা পিছিয়ে একটা দোকানের বন্ধ দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে হলো ভীষণ ঠাণ্ডা।
—দূর ! ওটা একটা বুড়ো !
—বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে না বেটাকে।...
চুয়ান আবার চমকে উঠল, চোখ খুলে দেখল অনেক লোক ছুটছে। ওদের

একজন পেছন ফিরে তাকাল তার দিকে। পরিষ্কার তাকে দেখতে পায় নি তবু মনে হলো, লোকটার চোখে-মুখে লোভের চিকমিক, খাবার দেখলে ক্ষুধার্তের যেমন হয়। হাতের লণ্ঠনটার দিকে তাকিয়ে দেখল সেটা কখন নিভে গেছে। পকেট চাপড়াল—সেই শক্ত প্যাকেটটা ঠিকই আছে। চারদিকে চোখ বোলালে, নজরে পড়ে অদ্ভুত অদ্ভুত সব লোক! কোথাও দুজন, কোথাও তিনজন। সবাই যেন দিশেহারা হয়ে ঘুরছে। যাহোক, তাদের দিকে আবার তাকিয়ে দেখে, কই অদ্ভুত কিছু তো চোখে পড়ে না।
ঐযে জনা কয়েক সৈনিকও রাস্তায় ঘুরছে। তাদের ইউনিফরমের সামনে-পিছনে সাদা সাদা বৃত্ত দূর থেকেও চোখে পড়ছে। যখন কাছে আসছে পোশাকের গায় লাল রঙের বর্ডারগুলিও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তক্ষুনি আর এক দল লোক, হুড়মুড় করে ছুটে গেল তার সামনে দিয়ে। ছোট ছোট দলগুলি যারা আগে এসেছিল তারাও যেন আবার এল কোথা থেকে! চৌমাথার একটু আগেই, তারা থমকে দাঁড়াল সবাই, তারপর একটা অর্ধ বৃত্তাকারে দলবদ্ধ করল নিজেদের।
চুয়ান বুড়ো তাকাল ওদিকে কিন্তু লোকেদের পেছন দিকটাই সে দেখতে পেল। কিছুক্ষণ চারদিক সব চুপচাপ। হঠাৎ কিসের শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলি কেমন বিচলিত হয়ে ওঠে। হুড়মুড় আওয়াজ করে পিছিয়ে এল চুয়ানের পাশ দিয়ে, প্রায় ধাক্কাই মেরে গেল তাকে।
—এই নগদ মুদ্রা কটা দাও, আমিও মাল দিচ্ছি এক্ষুনি।
কালো পোশাক পরা একটা লোক দাঁড়িয়ে তার সামনে, চোখ ছুরির ফলার মতো জ্বলজ্বল করছে। দেখেই চুয়ান যেন অর্ধেক সঙ্কুচিত হয়ে গেল ভয়ে। লোকটা একটা বিরাট হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে, অপর হাতে একটা গরম রুটির টুকরো—লাল মতো কী টপ্‌টপ্‌ করে পড়ছে ঐ রুটির টুকরো থেকে।
পকেট হাতড়ে কাঁপতে কাঁপতে চুয়ান মুদ্রা কয়টা বাড়িয়ে দিল লোকটার দিকে কিন্তু বিনিময়ে বস্তুটা হাতে নিতেও যেন তার কেমন ভ ! অপর ব্যক্তি অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—কিসের ভয় ? নিচ্ছ না কেন ?
চুয়ানের ইতস্তত ভাব কাটেনি তখনো। তার হাতের লণ্ঠন কেড়ে নিল ঐ কালো রঙের জামাপরা লোকটা। লণ্ঠনের কাগজ দিয়ে মুড়ে মোড়কটা গুঁজে দিল চুয়ান বুড়োর হাতে, অপর হাতে নিল মুদ্রা কয়টা। কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল তারপর!
—ওষুধ কার জন্যে ?
চুয়ানকে কে যেন প্রশ্ন করছে। কোনো জবাব দিল না। তার সবটা মন পড়ে ছিল ঐ মোড়কটার। খুব সাবধানে সযত্নে নিয়ে চলছিল ওটাকে, যেন কোন এক বিরাট প্রাচীন বংশের সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রতীকপত্র এটা।

আর কোনো দিকে তার হুঁশ ছিল না। এই নতুন জীবনের শিশু-বৃক্ষকে সে তার গৃহে রোপণ করবে, সুখ আর ঐশ্বর্যের সুফল সে কুড়োবে এ থেকে। ততক্ষণ সূর্য উঠেছে। তার সমুখে তার গৃহের পথে প্রশস্ত রাজপথ সেই আলোয় ঝলমল, ঝলমল চৌমাথার সেই বাড়িটার গায়ে সোনালী অক্ষরে লেখা ফলক, "পুরনো মহল।"

॥ ২ ॥

চুয়ান বুড়ো যখন বাড়ি ফিরল সরাইখানা ততক্ষণে ধুয়ে-মুছে সাফ করা হয়ে গেছে। সারি সারি চায়ের টেবিলগুলি ঝক্ঝক্ করছে কিন্তু কোনো খরিদ্দার তখনো আসেনি। দেয়ালের ধারে একটা টেবিলে বসে তার ছেলে খাচ্ছে। কপালের বিন্দু বিন্দু ঘামে জামাটা গায়ের সঙ্গে সাপটে আছে। কাঁধের হাড় দুটো ভীষণ প্রকট ভাবে বেরিয়ে। এই দেখে চুয়ান বুড়োর কপালটা আবার কোঁচকাল। তার স্ত্রী পাকশাল থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল। চোখে আগ্রহী দৃষ্টি আর ঠোঁটে মৃদু কম্পন—পেয়েছ?

—হ্যাঁ।

দুজনেই পাকশালের দিকে গেল। পরামর্শ করল দুজনে। বুড়ি বাইরে থেকে একটা শুকনো পদ্মপাতা এনে বিছিয়ে দিল একটা টেবিলের ওপর। চুয়ান বুড়ো লণ্ঠনের কাগজের মোড়ক থেকে রক্তক্ষরা রুটির টুকরো বার করে রাখল সেই পদ্মপাতায়। খোকা চুয়ান তার খাওয়া শেষ করেছে ততক্ষণ কিন্তু তার মা ডেকে উঠল—উঠো না খোকা চুয়ান, আরো একটু বসো। এদিকে এসো না এখন।

চুয়ান স্টোভে আগুন ধরিয়ে মোড়কসুদ্ধ রুটির টুকরোটা চাপিয়ে দিল সেই আগুনে। কেমন একটা লালচে-কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল, একটা বিকট গন্ধে ভরে গেল সারাটা সরাইখানা।

—বেশ গন্ধ তো! বলি, কী খাচ্ছ তোমরা?

কুঁজো এসে গিয়েছে। যারা সারাদিন চায়ের দোকানে কাটায় তাদের মধ্যে সে একজন। সবার আগে আসে আর যায় সবার শেষে। রাস্তার ধারের দিককার একটা টেবিলে গিয়ে এইমাত্র বসেছে। তার প্রশ্নের জবাব কেউ দিল না—মুড়ির খিচুড়ি নাকি?

তবু কোনো জবাব নেই। চুয়ান বুড়ো চা করে আনতে গেল কুঁজোর জন্যে।

—এখানে এসো, খোকা চুয়ান। তার মা ভেতরের ঘরে ছেলেকে ডেকে নিয়ে গেল। একটা কাঠের মতন টুলে এনে বসাল ছেলেকে। প্লেটে করে কালো কী যেন একটা বস্তু এনে দিল তাকে। বলল ধীরে ধীরে—এটা খেয়ে ফেলো··· দেখবে, তুমি ভালো হয়ে যাবে।

ঐ কালো মতন বস্তুটা হাতে নিয়ে কি যেন দেখছিল খোকা চুয়ান। তার কেমন অদ্ভুত লাগছিল, বুঝি নিজের জীবনটাই সে হাতের মুঠোয় রেখেছিল।

দু টুকরো করে ভাঙল হাতের বস্তুটাকে। ঝলসানো বস্তুটা ভাঙবার সাথে সাথেই ভেতর থেকে একটা বাষ্প বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, হাতে থাকল দুই টুকরো ময়দার ডেলা। নিমেষের মধ্যেই সবটুকু খেয়ে ফেলল, পড়ে থাকল শূন্য প্লেটটা। তার বাবা-মা তখন দু পাশে দাঁড়িয়ে। কী রকম একটা দৃষ্টি যেন বেরিয়ে আসছিল তাদের চোখ দিয়ে, ঐ দৃষ্টি কী যেন নিঙড়ে নিচ্ছিল। খোকা চুয়ানের বুকের ভেতরটা ধরফড় করতে লাগল, দুই হাতে বুকটা চেপে ধরে আবার কাশতে লাগল।

—একটু ঘুমোও, সব সেরে যাবে দেখো। মা বলল।

বাধ্য ছেলের মতো কাশতে কাশতে সে সত্যি ঘুমিয়ে পড়ল। স্বাভাবিক নিঃশ্বাস না পড়া পর্যন্ত মা পাশেই বসে রইল, তারপর শতচ্ছিন্ন একটা কাঁথা চাপা দিল ছেলের গা।

॥ ৩ ॥

সেদিন চায়ের দোকানে খুব ভিড়। বুড়ো চুয়ান ভীষণ ব্যস্ত। একটা তামার কেটলি হাতে ছুটছে এদিক ওদিক খদ্দেরদের চা দিয়ে। তার চোখের নিচে কেমন কালো রেখার বলয়।

—চুয়ান বুড়ো, কী হয়েছে তোমার? শরীর ভালো নয় কি? বলল একজন।

—না কিছু না।

—কিছু না?...ঠিক, কিছু না, তোমার হাসি দেখে বুঝতে পারছি, কিছু হয়নি। নিজেকে সংশোধন করতে আবার বলল লোকটি।

—চুয়ান বুড়ো খুব ব্যস্ত আজকাল, তার জন্যই বোধহয়! · কুঁজো বলল।— যদি তার ছেলে...কিন্তু সে কথাটা শেষ করতে পারেনি, সেই সময় ভারি চোয়ালওয়ালা একটা লোক এসে ঢুকল সরাইখানায়। গায়ে ঘন বাদামী রঙের শার্ট, বোতাম খোলা, কোমরে একটা তেমনি ঘন বাদামী রঙের কোমর-বন্ধনী আঁটা। ঘরে ঢুকেই সে হাঁক দিল—হ্যাঁগো, ওটা খাইয়েছ? কিছুটা ভালো আছে না? চুয়ান বুড়ো, সে আবার বলল,—তুমি সত্যি ভাগ্যবান। ব্যাপারটা যদি এত তাড়াতাড়ি শুনতে না পেতাম।...

একহাতে কেটলি আরেকটা হাত সোজা সটান করে ঝুলিয়ে রেখে চুয়ান-বুড়ো মৃদু হাসতে হাসতে কথাটা শুনল। আর যারা সেখানে ছিল তারাও বেশ সমীহের সঙ্গে শুনছিল। বুড়ির চোখের নিচেও একই রকম কালচে দাগ। সেও হাসতে হাসতে বাইরে বেরিয়ে এল। তার হাতে একটা বাটিতে কিছু চা পাতা আর একটা জলপাই। চুয়ান বুড়ো গরম জল ঢেলে দিল ঐ বাটিতে নতুন অতিথির জন্যে।

—একেবারে অব্যর্থ ঔষধ। অন্য জিনিসের মতো নয়। ভারি চোয়ালওয়ালা

লোকটা বলল—চিন্তা করে দেখ দেখি, গরম গরম আনলে আর সঙ্গে সঙ্গে খাইয়ে দিলে।

—কথাটা সত্যি। কোঙ খুড়োর সাহায্য না পেলে আমরা এটা যোগাড়ই করতে পারতাম না। বুড়ি আন্তরিকতার সঙ্গে ধন্যবাদ দিল।

—একেবারে অব্যর্থ ঔষধ। একদম গরম গরম খেয়ে ফেলো। এক টুকরো রুটি এরকম করে মানুষের রক্তে চুবিয়ে খাওয়ালে যেকোন ক্ষয়রোগ সারতে বাধ্য। ক্ষয় রোগ কথাটা শুনে বুড়ি কেমন যেন বিমনা হয়ে গেল। যা হোক সঙ্গে সঙ্গে আবার মুখে হাসি ফিরিয়ে আনল, এখান থেকে বেরিয়ে যাবার একটা ছল। এদিকে ঐ বাদামী জামা পরা লোকটার গলা ফাটিয়ে কথা বলবার অসাবধানতার ভেতর ঘরে ঘুম ভেঙ্গে গেল ছেলেটার, আবার শুরু হলো কাশি।

—যাহোক, ছেলের ব্যপারে তুমি সত্যি ভাগ্যবান, চুয়ান বুড়ো। এর অসুখটা নিশ্চিত সারবে, কোনো সন্দেহ নেই দেখো। তোমরা দেখছ না, চুয়ান বুড়ো হাসছে। অবাক হবার কিছু নেই।

কথা শুনে পাকা দাড়িওয়ালা বাদামী জামা পরা লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। গলা নিচু করে বসল : মিঃ কেঙ. শুনলাম আজকে যে লোকটার প্রাণদণ্ড হয়েছে, সে নাকি সিয়া পরিবারের লোক। কে বলুন তো ? প্রাণদণ্ড হলো কেন ?

—কে শুনবেন ? বিধবা সিয়ার ছেলে, আর কে। একটা হতভাগা শয়তান তার দিকে সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে, মিঃ কেঙ বেশ কিছুটা উৎসাহ বোধ করল। তার চোয়াল কাঁপছিল। সে তার গলা আরো চড়িয়ে দিল।

—জানেন, ঐ শয়তান বাঁচতে চায়নি, এক কথায় একদম বাঁচতে চায়নি। তবে শুনবেন, এবার কিন্তু আমার ভাগ্যে কিছু জোটেনি। গায়ের ছাড়া জামা-কাপড়গুলি পর্যন্ত লাল-চোখো ঐ জেলার বেটা নিয়ে গেল। চুয়ান বুড়োই সবার চেয়ে ভাগ্যবান। আর তিন নম্বর বুড়ো সিয়া, সবটা পুরস্কার তার পকেটে গেল, বাইশটা ঝকঝকে রূপার মুদ্রা। অথচ জানেন, এক কপর্দক খরচ করতে হয়নি।

এদিকে চুয়ান খোকা ভেতর ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসেছে। হাত দুটো বুকের উপর চাপা, আর অনবরত কাশছে। এসেই ফের চলে গেল রান্নাঘরের দিকে ; একবাটি ঠাণ্ডা ভাত, তাতে কিছুটা গরম জল মিশিয়ে, তা-ই বসল খেতে।

—একটু ভালো বোধ করছ কি বাবা ? আগের মতোই খিদে পাচ্ছে ? মা বলল।

—অব্যর্থ চিকিৎসা। ছেলেটির দিকে একবার তাকিয়ে কেঙ বলল সবাইকে উদ্দেশ্য করে—তিন নম্বর খুড়ো সিয়া খুব বুদ্ধিমান। সে যদি খবরটা না দিত

হয়তো তার সাকুল্যে পরিবারের প্রাণদণ্ড হতো, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যেত। তার বদলে? ঝক্ ঝকে বুপো। সিয়াদের ঐ শয়তান ছোঁড়াটা হাড়ে হাড়ে বদমায়েস; জানেন, বিদ্রোহ করবার জন্য জেলারকে পর্যন্ত তাতিয়ে ছিল।
—না, এ চিন্তাই করা যায় না।
বছর কুড়ি বয়সের একটা ছেলে, পেছনের দিকটায় বসেছিল। ঘৃণার সঙ্গে সে মন্তব্য করল।
—জানো, ঐ লাল চোখ জেলার যখন ওর গোপন কথা জানবার চেষ্টা করেছিল ও কিন্তু তখন বেশ গালগল্প নিয়ে মেতে উঠেছিল। জেলারকে বোঝাতে চাইছিল, চীন সাম্রাজ্যটা নাকি আমাদেরই। সম্রাট কেউ না। আরে, চিন্তা করে দেখো তো, এটা কি একটা কথার কথা হলো? লাল চোখো জেলার জানত, আপনার বলতে ঐ বদমাসটার কেবল একমাত্র মা-ই বেঁচে ছিল কিন্তু ওরা যে এত গরিব, এ কিন্তু জানা ছিল না। তবে কোনো কথা বার করতে পারেনি ওর কাছ থেকে। না পেরে রেগে দুটো চড় বসিয়ে দিয়েছিল ওর গালে।
—লাল চোখো একজন ভালো বক্সার। ওর চড়টা নিশ্চয় খুব লেগেছিল। দেয়ালের ধারে বসা কুঁজো বলে উঠল।
—ব্যাটার কিন্তু মারের ভয় ছিল না একটুও। তবে জেলারের মুখে শুনেছিলাম চড় মেরে অবশ্য দুঃখ প্রকাশ করেছিল।
—ওরকম বদমাসকে পিটলে আবার দুঃখ কিসের? পাকা চুল বলল।
কেও তাকাল তার দিকে, বলল—ভুল করছ। যেভাবে ও বলছিল তার অর্থ লাল চোখো ওর জন্য খুব দুঃখিত।
শ্রোতারা তাকিয়ে রইল, কেউ কিছু বলল না। চুয়ান খোকা তার ভাত খাওয়া শেষ করেছিল ততক্ষণ। খেতে খেতে ঘেমে উঠেছিল।
—বেচারা লাল চোখো—একটা আস্ত পাগল। নিশ্চয় ওর মাথা খারাপ। পাকাচুল বলল।
—নিশ্চয়। সেই কুড়ি বছর বয়সের ছোকরা মন্তব্য করল। ক্রেতাদের মধ্যে আবার আলোচনার সোরগোল শুরু হয়ে গেল। এই সোরগোলের ভেতর আবার চুয়ান খোকার কাশির ঝলক। কেও তার কাছে গিয়ে পিঠ চাপড়ে বলল—অব্যর্থ চিকিৎসা। ওরকম কাশে না, চুয়ান খোকা! জানো, এ একরকম অব্যর্থ চিকিৎসা।
—পাগল!
মাথা নেড়ে বলল ঐ কুঁজো।

পশ্চিম প্রান্তের ফটকের বাইরে শহর প্রাচীর সংলগ্ন জমিটা গোড়াতে সর্ব-সাধারণের বলে চিহ্নিত ছিল। পথিকের পায়ের চিহ্ন পড়ে যে আঁকা-বাঁকা দু পেয়ে পথটা জমির মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছিল, সেটা একটা স্বাভাবিক সীমানা চিহ্নে পরিণত হয়েছে কালক্রমে। ঐ পথের বাম দিককার জমিটায় প্রাণদণ্ডের আসামী অথবা মৃত জেল কয়েদিদের কবর দেওয়া হতো। আর ডান দিকটা ভবঘুরে নিঃস্বদের গোরস্থান। পথের দুই পাশে সারিবদ্ধ বিভিন্ন আকারের কবরের ঢিবিগুলি দেখে মনে হয় ওগুলি যেন জন্মদিনের ভোজসভার টেবিলে সজ্জিত নানারকমের কেক।

চিঙ মিঙ উৎসবের সময় সে বছর অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পড়েছিল। উইলো গাছে সবেমাত্র দানার মতো কুঁড়ি উঁকি দিয়েছে। ঠিক সন্ধ্যার একটু পরে, চুয়ান বুড়োর পত্নী চারটে পিরিচ আর একবাটি ভাত এনে রাখল কবরখানার ডানদিকের একটা সদ্য নতুন কবরের পাশে। বসে কাঁদল কিছুক্ষণ। কাগুজে মুদ্রা পুড়িয়ে কেমন একটা নেশার ঘোরে বিভোর হয়ে মাটিতে বসে রইল কোনো কিছুর অপেক্ষায়। কিসের জন্য নিজেই সে জানত না। একটু মৃদু মৃদু বাতাস বয়ে গেল। তার মাথার ছোট ছোট চুলগুলি একটু কেঁপে উঠল। সেই চুল এক বছর আগেও যা ছিল, আজ তার চেয়েও যেন বেশি সাদা।

ঐ পথ ধরে এল আর একটি স্ত্রীলোক। শতচ্ছিন্ন পোশাক, মাথায় পক্ক কেশ। সে থেমে থেমে হাঁটছিল। তারও হাতে একটা পুরনো ঝুড়িতে ঝুলানো কাগুজে মুদ্রার একটা মালা। চুয়ান বুড়োর পত্নী তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে একটু থমকে গেল আগন্তুক স্ত্রীলোকটি—তার ফ্যাকাশে মুখের উপর কেমন একটা শরমের ছায়া ছড়িয়ে পড়ল। তবু সে মনে সাহস এনে বাম দিকে গোরস্থানের একটা কবরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, হাতের ঝুড়িটা নামিয়ে রাখল মাটিতে।

চুয়ান খোকার কবরের ঠিক উলটো দিকে ছিল ঐ কবরটা। মাঝখানে কেবল সেই পায়চলা পথ। চুয়ান বুড়োর স্ত্রী দেখল, সেই স্ত্রীলোকটিও চারটি পিরিচ আর এক বাটি ভাত রেখেছে কবরের পাশে। তারপর কাগুজে মুদ্রার মালায় আগুন ধরিয়ে কাঁদল কিছুক্ষণ। সে ভাবল হয়তো বুড়ির ছেলের কবর। দু এক পা উদ্দেশ্যহীন পদচারণার পর কেমন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি; কেমন থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল, বুঝি বা মাথা ঘুরে পড়বে এখুনি।

শোকের ঘোরে হয়তো স্ত্রীলোকটি কিছু করে বসবে, এই আশঙ্কায় পায় চলা পথ পেরিয়ে ঐখানটায় গেল চুয়ান বুড়োর স্ত্রী। ধীরে ধীরে বলল বৃদ্ধাকে—আর শোক করবেন না, চলুন এবার বাড়ি যাই। অপর স্ত্রীলোকটি মাথা নাড়ল কিন্তু চোখের দৃষ্টি তখনো স্থির। বিড়বিড় করে বলল—ঐ দেখ! ওটা কী?

যে দিকে নির্দেশ করল, চুয়ান বুড়োর স্ত্রী সেদিকে তাকিয়ে দেখল সামনের ঐ কবরটার ওপর তখনো কোনো ঘাস গজায়নি। কদাকার চাপ চাপ পরিষ্কার দেখা যায়। কিন্তু আরো একটু ভালো করে লক্ষ্য করে অবাক হয়ে দেখল ঐ কবরের মাটির উপর রাখা একটা সাদা আর লাল ফুলের মালা।

দুজনেরই ক্ষীণ-দৃষ্টি, তবু ঐ সাদা আর লাল ফুলের মালাটা তারা স্পষ্ট দেখছিল। খুব বেশি ফুল ছিল না। তবু যেন একটা সুন্দর বৃত্তাকারে সাজানো। যদিও ফুলগুলি টাটকা নয় তবু পরিষ্কারভাবে সুন্দর করে রাখা। ঘুরে দাঁড়িয়ে চুয়ান বুড়োর স্ত্রী তার নিজের ছেলের কবরের দিকে ফিরে তাকাল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল দুটো একটা পানসে ফুল হয়তো শীতের ছোঁয়ায় কাঁপছে ঐ কবরগুলির উপরও। হঠাৎ কেমন একটা নৈরাশ্য যেন পেয়ে বসল তাকে। ঐ ফুলের মালা সম্বন্ধে আর কোনো কৌতূহল থাকল না তার।

বৃদ্ধা স্ত্রীলোক কবরের আরো কাছে গেল, ভালো করে দেখল।

—গাছের ফুল তো নয়, কোনো গাছ তো দেখছি না। সে নিজের মনে বলল।—এগুলো এখানে তো ফোটেনি। কিন্তু কে এনেছিল এখানে? ছেলেরা তো খেলতে আসে না এদিকে, আমার কোনো আত্মীয়ও আসে নি। তবে?

কেমন হতভম্ব হয়ে গেল ভাবতে ভাবতে। হঠাৎ তার চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল, সে সোচ্চারে কেঁদে উঠল—বাবা আমার, এরা সবাই তোর ক্ষতি করেছে, তুই ভুলতে পারিস নি। তোর মনের দুঃখ কি এখনো তেমনি প্রবল যে, আজ এই অদ্ভুত ব্যাপারের ভেতর দিয়ে তুই আমাকে জানিয়ে দিলি? সে চারদিকে তাকিয়ে দেখল, কেবল একটা পত্রহীন ডালে উপবিষ্ট একটা কাক।

—আমি জানি। আপন মনে বৃদ্ধা বলতে লাগল—এরা তোকে খুন করেছে। কিন্তু এর বিচারের দিন একদিন আসবেই, ভগবান সাক্ষী রইলেন। শান্তিতে ঘুমোও বাপধন আমার······যদি সত্যি তুমি এখানে থেকে থাক আর আমার কথা শুনতে পাও, তাহলে ঐ কাকটাকে বলো, উড়ে গিয়ে তোমার কবরে বসবে।

ততক্ষণ বাতাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুকনো ঘাস স্থির দাঁড়ানো, তামার

তারের মতো সোজা। কেমন একটা মৃদু আওয়াজ যেন বাতাসে ভাসছিল, পরে যেন সেটাও মিলিয়ে গেল। চারদিকে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। শুকনো ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে তারা তাকিয়েছিল শুকনো ডালে লোহার মতো নিথর হয়ে মুখ গুঁজে বসা—ঐ কাকটির দিকে।

সময় কেটে যেতে লাগল। আরো অনেক যুবা, বৃদ্ধ, শিশু আরও কত কে এল কবর দেখতে।

চুয়ান বুড়োর স্ত্রীর হঠাৎ যেন মনে হলো, তার বুকের ওপর থেকে মস্ত বড়ো একটা বোঝা সরে গেছে। যাবার উদ্যোগ করে বলল অপর স্ত্রীলোকটিকে—চলুন এবার যাই।

একটা নিঃশ্বাস ফেলল বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি। কেমন একটা নিস্পৃহ ভাবে। ভাতের বাটি আর পিরিচগুলি হাতে তুলে নিল। একটু ইতস্তত করে চলতে লাগল ধীরে ধীরে। তখনো আপন মনে বলছিল—এর অর্থ কী?

ত্রিশ পা-ও তারা এগোয়নি। পেছন দিক থেকে একটা কাকের ডাক শুনতে পেল। চমকে তাকিয়ে দেখে গাছের শুকনো ডালে বসা ঐ কাকটা। পাখা খুলছে, উড়বার উদ্যোগ করছে। উড়ে গেল দূরে দিকচক্রবাল রেখার দিকে তীরের মতো বেগে।

Medicine
April-1919

আগামী দিন

—কোনো সাড়া-শব্দ নেই ! বাচ্চাটার হয়েছে কী ? পাশের বাড়ির দিকে মাথা নেড়ে ইশারা করে কুও বলল—তার হাতে একপাত্র হলদে মদ ! আহ্‌ বু ও নামিয়ে রাখল হাতের পাত্রটা। দুম করে কুঙের পিঠে কিল বসিয়ে বলে গড়গড় করে—বলি ব্যাপার কী…বড়ো যে গলে পড়ছ !

লু চেন গ্রামটা একটু বেখাপ্পা জায়গায় বলে বেশ কিছুটা সেকেলে। সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে দোকানের ঝাঁপ তুলে দিয়ে সবাই ঢুকে পড়ে যার যার ঘরে। সেদিন মধ্য রাত্রে কেবল দুটো বাড়ির মানুষই তখনও জেগে ছিল। একটা সরাইখানা। গোটা কয়েক পেটুক বারের ধারে বসে তখনও গিলছে। অপর তারই পাশের বাড়ি, চতুর্থ শানের স্ত্রী জন বাস করে সেখানে। বছর দুই আগে বিধবা হয়েছে। একমাত্র নিজ হাতে সুতা কেটে কাপড় বুনে বিক্রি করা, এই তার আর তার ছোট শিশু-পুত্রের জীবিকা। তাই তাকেও জাগতে হয় অধিক রাত পর্যন্ত।

কয়দিন সুতো কাটার কোনো সাড়াশব্দ নেই। সেদিন দুপুর রাতেও কেবল ঐ দুটো বাড়িই জেগে আছে, তাই কুঙ আর তার সঙ্গীরাই কেবল বুঝতে পারে চতুর্থ শানের স্ত্রীর বাড়ি থেকে কোনো সাড়া আসে কি না।

কিল খেয়েও কুঙ রাগে নি। মদের পাত্র গবগব করে চুমুক দিয়ে একটা পল্লীগীতের কলি গেয়ে ওঠে সে।

চতুর্থ শানের স্ত্রী তখন তার বিছানায় বসেছিল। পাও-এর তার একমাত্র সম্পদ, তার কোলে। কাপড় বোনার তাঁতটা অকেজো হয়ে পড়ে আছে ঘরের মেঝের এক ধারে। লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলো পাও-এর মুখে পড়েছে, জ্বরের উত্তাপের আভা ছাপিয়েও মুখটা কেমন ফ্যাকাশে।

—মন্দিরের ধারে কতবারই তো ধরণা দিয়েছি। সে ভাবছিল ! ভগবানের কাছে মানতও করেছি, সেরা ঔষধ খাইয়েছি। এর পরও যদি না সারে, কী করব আমি ? ডাঃ হো সিয়াও-সিয়েন-এর কাছেও নিয়ে যেতে হবে হয়তো। কিন্তু এও তো হতে পারে, আজ রাত্তিরটাই কেবল পাও-এর খারাপ যাবে ; কালকে সূর্য উঠলেই জ্বর ছাড়বে, সহজে নিঃশ্বাস নিতে পারবে। অনেক ব্যারামেরই তো এরকম ধরণ।

চতুর্থ শানের স্ত্রী খুবই সরল মানুষ। এই কিন্তু শব্দটা যে কী ভীষণ সে জানে না। এই কিন্তু শব্দটাকে ধন্যবাদ। এর জন্যে কত খারাপ ব্যাপার ভালো বলে ধরে নিই, আবার কত ভালো মানুষকেও খারাপ ভাবি। গ্রীষ্মের রাত খুবই ছোট। কুঙ আর তার সঙ্গীদের গান যখন শেষ হলো তখন পুবের আকাশ ফরসা হয়ে এসেছে। জানলার ফাঁক দিয়ে ভোরের রূপালী আলো চুইয়ে চুইয়ে আসছে।

ভোরের প্রত্যাশা অপরের কাছে যত সহজ আজকে, তত সহজ নয় চতুর্থ শানের স্ত্রীর কাছে। সময়ের গতি ভীষণ ধীর, হিঁচড়ে চলছিল যেন। পাও-এর এক একটি নিঃশ্বাস যেন এক একটি বৎসর। অবশেষে ভোরের আলো ফুটে উঠল। পরিষ্কার দিনের আলো লণ্ঠনের আলোকে গ্রাস করে নিচ্ছে। এক একটি নিঃশ্বাস নিতে হেঁদিয়ে উঠছে, সঙ্গে সঙ্গে পাও-এর নাকের ডগা কেঁপে উঠছে।

চতুর্থ শানের স্ত্রী কান্না চাপে। সে জানে চোখের জল অমঙ্গলের চিহ্ন, কিন্তু সে কী করবে? ভেবে পায় না। তার একমাত্র শেষ ভরসা ডাঃ হোর কাছে নিয়ে যাওয়া। সে সরল মানুষ কিন্তু ইচ্ছা শক্তির অভাব তো নেই তার। সে উঠে কাবার্ডের কাছে যায়। যা কিছু সঞ্চয় ছিল তার, বার করে আনে সব—তেরোটা ছোটো রুপোর ডলার আর একশত আশিটা তামার মুদ্রা মোটমাট। সবগুলো মুদ্রা পুরে নেয় পকেটে। বাড়ির-দরজায় তালা দিয়ে পাও-এরকে কোলে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়ে ডাঃ হো'র বাড়ির পথে।

খুব সকাল হলেও এর মধ্যেই জনা চারেক রুগী এসে গেছে। নাম রেজেস্ট্রী করতে লাগল চল্লিশটি রুপোর সেন্ট। চার জনের পর পাও-এর পালা। ডাঃ হো দুটো আঙুলে নাড়ী দেখল। উদ্বেগ চাপতে পারে না মিসেস শান। উদ্বিগ্ন মনে জিজ্ঞাসা করে ডাক্তারকে—আমার পাও-এর কী হয়েছে, ডাক্তার?

—হজমের অন্ত্রের অসুখ।

—ভয়ের কারণ আছে কী? সে কি…?

—এই দুটো ঔষধ খাওয়াবেন।

—ওর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, ডাক্তার। নাকের ডগা কেমন কাঁপছে।

—অগ্নির শক্তি ধাতুর শক্তিকে পরাস্ত করেছে। হৃদযন্ত্রের অসুস্থতা ফুসফুসকেও আক্রমণ করেছে। দুটোই অসুস্থ।

বলেই ডাক্তার একবার চক্ষু বুজলেন। আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেল না মিসেস শান। ডাক্তারের বিপরীত দিকে বসে বছর ত্রিশেক বয়সের একটি যুবক। একটা ওষুধ আর ব্যবস্থাপত্র এগিয়ে দিল মিসেস শানকে।

—ব্যবস্থাপত্রের অপর ঔষধটি চিয়াদের দোকানে পাবেন। সে বলল।

মিসেস শান ঔষধ আর ব্যবস্থাপত্র নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। ভাবতে ভাবতে পথ চলতে লাগল। সে সরল মানুষ সন্দেহ নেই কিন্তু সে জানত ডাঃ হো'র বাড়ি, ঔষধের দোকান, আর তার নিজের বাড়ি একটা ত্রিভুজের এক এক মাথায়। কাজেই আগে দোকানে যাওয়াই সহজ হবে তার কাছে। সে দ্রুত পায়ে ছুটতে লাগল ঔষধের দোকানের দিকে। দোকানদার ব্যবস্থাপত্র দেখে ঔষধটা নিয়ে প্যাকেটে মুড়ে দিল মিসেস শানের হাতে। মিসেস শান ততক্ষণ অপেক্ষা করছিল ছেলে কোলে নিয়ে। হঠাৎ পাও-এর তার নিজের মাথায়

চুলের ঝুঁটি হাতের মুঠোয় চেপে ধরে। আগে কখনো করেনি, তার মা ভয় পেয়ে গেল।

সূর্য মাথার অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছে ততক্ষণ। কোলে ছেলে এবং হাতে ঔষধের মোড়ক। পথ চলতে বোঝাটা যেন ক্রমেই বেশি ভারি মনে হয়। মাঝে মাঝে ছেলেও ধড়-ফড়িয়ে ওঠে। পথ যেন আর শেষ হয় না। একটু বিশ্রামের জন্য পথের ধারে এক বাড়ির বন্ধ দরজার সামনে বসে সে। ঘামে গায়ের জামা জাপটে আছে, পাও ঘুমিয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে এগোবে বলে উঠে দাঁড়ায় মিসেস শান কিন্তু ছেলের ভারটা যেন বোঝা বলে ঠেকছে। সে বইতে পারছে না। তার পাশে দাঁড়িয়ে কে যেন বলে ওঠে—মিসেস শান, ছেলেকে দিন, আমি নিচ্ছি। গলা শুনে মনে হলো বুঝি আহ্-বু।

তাকিয়ে দেখল, আহ্-বু। মিসেস শানের পেছন পেছন আসছিল। চোখ তখনো ঘুমে ভারি।

আহ্-বুকে সে পছন্দ করে না। তবু উপেক্ষা করতে পারে না তার অহেতুক আগ্রহ। শিশুটিকে নেবার জন্য তার বুকের কাছ পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে দেয় আহ্-বু। তার সুডৌল স্তনের উপর আহ্-বুর হাতের স্পর্শ অনুভব করে মিসেস শান। তার সমস্ত শিরা যেন উন্মত্ত হয়ে ওঠে সেই স্পর্শে। কান গরম হয়ে ওঠে তার।

দু ফুট আড়াই ফুট ব্যবধানে তারা পথ চলতে লাগল। আহ্-বুর দু একটা মন্তব্যে কোনো সাড়া দেয় না মিসেস শান। কিছু পথ গিয়ে ছেলেকে আবার ফিরিয়ে দিল মার কোলে, বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ আহ্ বু এই অজুহাত। মিসেস শান ছেলেকে তুলে নেয় নিজের কোলে। পথ আর বেশি ছিল না। ওয়াঙ পিসি দোরগড়ায় বসে। দূর থেকে দেখা যায়। ওয়াঙ পিসি ডাকল—কি গো, ছেলে কেমন ?···ডাক্তার বাড়ি গিয়েছিলে নাকি ?

—গিয়েছিলাম। আচ্ছা ওয়াঙ পিসি, তুমি তো বুড়ী হয়েছ, অনেক কিছু দেখেছ। ছেলেটাকে একটু দেখবে, দেখে বলবে ওর···?

—হু-ম !

—হুম কী ?

—ঐ যে···দাঁড়াও···

পাও-কে পরীক্ষা করে দু বার মাথা নোয়ালো ওয়াঙ পিসি, আবার দুবায় মাথা নাড়ল।

যখন পাও-এর ঔষধ খেয়েছে তখন বেলা দুপুর। মিসেস শান ছেলের ওপর নজর রাখে। ধীরে ধীরে কেমন যেন স্থির শান্ত হয়ে আসছিল তার ছেলে। বিকালের দিকটায়, হঠাৎ চোখ খুলে তাকায় একবার, ডেকে ওঠে মাকে। আবার চোখ বোজে। মনে হয় বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। বেশিক্ষণ ঘুমোয়নি। হঠাৎ মনে হলো তার কপালে আর নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম

জমেছে। সেই ঘাম যেন কেমন আঠা আঠা। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় ছেলের বুকে হাত দিয়েই ফুলে ফুলে কেঁদে ওঠে চতুর্থ শানের স্ত্রী।
স্থির হয়ে বুঝতে পারল, ছেলের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। ফুঁপিয়ে কান্নার পরই বেরিয়ে এল বুক ফাটা আর্তনাদ। সবাই এসে জড়ো হতে লাগল একে একে। বাড়ির ভেতরে ওয়াঙ পিসি আহ্ বু এরা সব, আর বাইরে অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল সরাইখানার মালিক আর কুও। ওয়াঙ পিসি ফতোয়া দিলেন কাগুজে মুদ্রার মালা পোড়াতে হবে। কিছু জামা কাপড় আর দুটো একটা আসবাব বন্ধক রেখে মিসেস শানের জন্যে দুটো ডলার ধার নেবার ব্যবস্থা হলো। যারা উপস্থিত তাদের খাওয়াতে হবে।
প্রথম সমস্যা কফিন। চতুর্থ শান পত্নীর এক জোড়া রুপোর ইয়ারিং, একটা সোনার পাতে মোড়া রুপোর চুলের কাঁটা তখনো অবশিষ্ট আছে। এগুলোর বিনিময়ে সরাইখানার মালিক দাঁড়িয়ে অর্ধেক নগদ আর অর্ধেক ধারে একটা কফিন আনবার ব্যবস্থা করবে। আহ্ বুও এগিয়ে এল অর্থ সাহায্য করতে কিন্তু ওয়াঙ পিসি তাকে গ্রাহ্য করে না। আগামী কাল কফিন বইতে সাহায্য করবে ওয়াঙ পিসি কেবল ঐ প্রস্তাবে রাজী সরাইখানার মালিক চলে গেছে। ফিরে এসে খবর দিল কফিনটা যত্ন করে তৈরি করবে, কাজেই আগামী কাল সকাল বেলার আগে পাওয়া দুষ্কর।
সরাইখানার মালিক যখন খবর নিয়ে ফিরে এল সবাই তখন খাওয়া শেষ করেছে। লুচেন গ্রামটা সেকেলে তাই সন্ধ্যা হতেই সবাই যার যার বাড়ি ফিরে গেছে ঘুমুবার জন্য। আহ্ বু মদের গ্লাস হাতে বসে আছে সরাইখানার বারে আর কুও বুড়ো তখন গানে মত্ত।
মিসেস শান বিছানায় বসে অবিশ্রান্ত ধারায় চোখের জল ফেলছে। পাও-এর তার বিছানায় চির নিদ্রায়। কাপড় বোনার তাঁতটা পড়ে আছে অকেজো হয়ে মেঝের এক কোণে। চোখের জল যখন শুকিয়ে এল, পত্নী চোখ খুলল। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল তার দিকে। এ অসম্ভব। এ অলীক স্বপ্ন। এ স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। কালকে ঘুম থেকে জেগে দেখব আমি বিছানায় শুয়ে, পাও-এর আমার পাশে ঘুমিয়ে আছে। সেও জাগবে, জেগেই আমাকে ডেকে উঠবে 'মা' তারপর জোয়ান বাঘের বাচ্চার মতো লাফিয়ে পড়বে বিছানা ছেড়ে। দৌড়বে, খেলবে।
বুড়ো কুও গান থামিয়েছে ততক্ষণ। সরাইখানার আলোও নিভে গেছে। চতুর্থ শান পত্নী তাকিয়ে আছে, তার বিশ্বাস হয় না এসব ঘটেছে! একটা মোরগ ডেকে উঠল কোথায়, ঐ যে পূবের আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। জানলার ফাঁক দিয়ে ভোরের রুপোলী আলো চুঁইয়ে পড়ছে।
ধীরে ধীরে ভোরের রুপো ছড়ানো আলো তামাটে হয়ে ফুটে উঠছে। মিসেস শান এক দৃষ্টে তাকিয়ে নিথর হয়ে বসেছিল, হঠাৎ চমকে উঠল।

কে যেন দরজায় ঘা দিচ্ছে। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। একজন অপরিচিত লোক, কাঁধে ওটা কী! পেছনে দাঁড়িয়ে ওয়াঙ পিসি। কফিন। সে কিনে এনেছে।

সেদিন বিকেল পর্যন্ত কফিনের ঢাকনা বন্ধ করা হয়নি। চতুর্থ শান পত্নীর কান্না থামেনি। বার বার সে ছেলেকে দেখছে। কফিন বন্ধ করতে দেয় না। ওয়াঙ পিসি অধৈর্য হয়ে উঠল। কেমন একটা বিরক্তি আর বিতৃষ্ণায় সে জোর করে সরিয়ে দিল শান পত্নীকে। তারা জোর করে কফিনের ঢাকনা বন্ধ করে দিল।

মিসেস শান সব কিছু করেছিল ছেলের জন্যে, কিছুই বাদ দেয়নি, কিছুই ভোলেনি। কাগুজে মুদ্রার মালা পুড়িয়েছে। কফিনে রাখবার আগে ছেলেকে সাজিয়ে দিয়েছে, বালিশের ধারে ছেলের প্রিয় খেলনাগুলি দিতেও ভোলে নি। একটা ছোটো মাটির পুতুল, দুটো কাঠের তৈরি বাটি, আর দুটি কাঁচের বোতল, রেখেছে তার শিয়রে। ওয়াঙ পিসি হিসেব রেখেছিল, কিছু ভুল হয়নি, বাদ যায়নি।

সারা দিন আহ্ বুর দেখা নেই। সরাইখানার মালিক শান গিন্নির হয়ে দুজন লোক ভাড়া করে এনেছে, ২১০টা বড়ো তামার মুদ্রা মজুরী জন পিছু, ওরাই কফিন বয়ে নিয়ে গেল কবরখানায়; কবর খুঁড়ল। ভোজের ব্যবস্থা করেছে ওয়াঙ পিসি। সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। আস্তে আস্তে সূর্য ডুববার সময় হয়ে এল, অতিথিরাও জানল, এবার তাদের যাওয়ার পালা ঘরে ফিরল সবাই।

শান গিন্নী-অসুস্থবোধ করছিল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সে শান্ত হলো। হঠাৎ সবকিছু যেন কেমন আশ্চর্য লাগে তার কাছে। যা কোনোদিন তার জীবনে ঘটেনি, যা কোনোদিন ঘটবে বলে চিন্তাও করেনি, তাই ঘটল আজকে। যতই চিন্তা করে ততই সে বিস্মিত হয়ে যায়; কেমন যেন তার কাছে বিচিত্র লাগে। হঠাৎ তার ঘরের ভেতরটা কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

উঠে দাঁড়িয়ে ল্যাম্পটা জ্বালাবার সঙ্গে সঙ্গে এই নিস্তব্ধতা যেন আরো বেড়ে গেল।

দরজাটা বন্ধ করতে হাতড়ে হাতড়ে সে এগোয়। বন্ধ করে ফিরে এসে আবার বসে বিছানায়। কাপড় বোনার তাঁতটা অকেজো হয়ে পড়ে আছে ঘরের মেঝের ওপর। নিজেকে সামলে নিয়ে তাকিয়ে দেখল চারদিকে। উঠে দাঁড়াতে বা বসতে কোনোটাই সে পারছে না। ঘরটা শুধু নিস্তব্ধ লাগে না, আয়তনেও যেন বেড়ে গেছে। ঘরের ভেতরটায় যেন শূন্য হয়ে গেছে সবকিছু। বিরাট আয়তন বাড়তে বাড়তে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে, ভীষণ শূন্যতা তাকে চেপে ধরে। তার দম বন্ধ হয়ে আসে।

সে উপলব্ধি করে, তার ছেলে পাও-এর আজ প্রকৃতই মৃত। ঘরের অবস্থিতিটা

সে সহ্য করতে পারে না। আলোটা নিভিয়ে দেয়, মাটিতে পড়ে কাঁদে আর কাঁদে। কত কি ভাবনায় যেন ডুবে যায়। মনে পড়ে সে সুতো কাটত, আর তার পাশে বসে পাও-এর মৌরি-মশলা দেওয়া মটরদানা খেত। তার কালো কালো চোখ নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠত—মা, বাবা বানটুন বিক্রি করত, তাই না মা? আমি যখন বড়ো হব, আমিও বানটুন বেচব। অনেক টাকা আনব, সব তোমার হাতে তুলে দেব।

ঐসব সময়ে তার হাতে বোনা প্রতি-ইঞ্চি সুতোর একটা মূল্য ছিল, ওদের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন? চতুর্থ শানের স্ত্রী বর্তমানের কথা চিন্তাই করেনি কখনো। কোন সমাধান সে ভাবতে পারত? সে শুধু উপলব্ধি, করছিল—তার এই ঘরের ভেতরটা ভীষণ নীরব নিস্তব্ধ, একটা অসীম শূন্যতা! যদিও মিসেস শান অতি সরল মানুষ। সে জানে, যে মৃত সে আর ফিরে আসে না। আর ফিরে পাবে না তার ছেলে পাও-এর কেও। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বলে ওঠে সে—পাও-এর তুমি নিশ্চয় এখানে আছ! আমি স্বপ্নে তোমাকে পেতে চাই, পাও-এর।

সে চোখ বোজে এই আশায় যে সে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়বে। পাও এর-কে দেখতে পাবে। ঘরের এই নিস্তব্ধতায় বিপুলতায় আর মহাশূন্যতায় তার নিজের নিঃশ্বাসের আওয়াজ নিজেই শুনতে পায়।

একটা তন্দ্রার আবেশ তাকে ঘিরে ধরে। ঘরের ভেতরটা যেন নিথর হয়ে আসে। কুঙের গ্রাম্য সংগীত অনেক আগেই থেমে গেছে, একটা গানের কলি গাইতে গাইতে টলতে টলতে বেরিয়ে যায় সে সরাইখানার ভেতর থেকে। পেছন থেকে এসে কুঙের ঘাড়টা চেপে ধরে আহ্ বু, দুজনেই বেরিয়ে যায় টলতে টলতে মত্তের হাসি হাসতে হাসতে।

চতুর্থ শানের স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েছে। কুঙ বুড়ো ও আর সবাই চলে গেছে অনেকক্ষণ। সরাইখানার দোরও বন্ধ হয়ে গেছে। লুচেন গ্রামটা তখন নিস্তব্ধ। শুধু আগামী দিনের ভোরের আলোতে আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় আঁধার ঘেরা নিশা ঐ নিস্তব্ধতায় ছুটে চলেছে আপন পথে। আর অন্ধকার আত্মগোপন করে ঘেউঘেউ করছে কয়টা কুকুর।

Tomorrow
June, 1920.

একটি ঘটনা

গ্রাম ছেড়ে রাজধানীতে আসবার পর ছয়টি বছর কেটে গেছে। ততদিনে তথাকথিত রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আমি অনেককিছু দেখেছি শুনেছি কিন্তু এর কোনটাই তত রেখাপাত করেনি আমার মনে। এসব কিছুর আমার ওপর কী প্রভাব প'ড়েছিল তার ব্যাখ্যা করতে বললে আমি কেবল এইটুকুই বলব যে এগুলো আমার মেজাজকে আরো তিক্ত করে তুলেছিল এবং স্পষ্ট বলতে গেলে আমি ভীষণ রকম মানব বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলাম।

তবে একটি ঘটনা আমাকে বিশেষ করে অভিভূত করেছিল, আমার বিধ্বস্ত মেজাজ থেকে আমি জেগে উঠেছিলাম। সেইজন্য ঐ ঘটনা আমি আজও ভুলতে পারি নি।

এটা ১৯১৭ সনের শীতকালের ঘটনা। একটা কনকনে উত্তুরে হাওয়া বইছিল কিন্তু জীবিকার জন্যে আমাকে খুব ভোরে উঠে বেরুতে হতো। খুব কম দিনই রাস্তায় আমার সঙ্গে কোনো জনপ্রাণীর সাক্ষাৎ হতো। এস—ফটকের পর্যন্ত যাওয়ার জন্য একটা রিকশা পাওয়া কঠিন ছিল। সেদিন হাওয়াটা একটু কম ছিল। পথেও তেমন ধুলো নেই. ততদিনে সব উড়ে গিয়েছে। রাস্তা পরিষ্কার, রিকশাওয়ালা আপ্রাণ ছুটছিল। আমরা তখন এস—ফটকের প্রায় কাছে পৌঁছে গেছি, হঠাৎ একটা লোক রাস্তা পেরুতে গিয়ে রিকশায় জড়িয়ে পড়ে গেল।

একটি স্ত্রীলোক, মাথায় দু একটা পাকা চুল এখানে ওখানে, পরনে শতছিন্ন পোশাক। আমার রিকশার সামনে দিয়ে রাস্তা পেরুতে গিয়ে কোনো সঙ্কেত না দিয়েই পেভমেণ্ট থেকে রাস্তায় নেমে এসেছিল। রিকশাটা যদিও এগিয়ে গিয়েছিল, মেয়েটির বোতাম-খোলা শতচ্ছিন্ন জ্যাকেটের একটা কোণ উড়তে উড়তে রিকশার হাতলে জড়িয়ে গেল। ভাগ্যক্রমে রিকাশাওয়ালা একটু জোরে বেরিয়ে গিয়েছিল নইলে মেয়েটি পড়ে গিয়ে খুবই ভীষণ রকম আঘাত পেত।

মেয়েটি রাস্তার উপর পড়ে গিয়েছিল, রিকশাওয়ালা থামল। মেয়েটি আদৌ কোনো আঘাত পেয়েছে আমার মনে হলো না। তাছাড়া এই ঘটনার আর দ্বিতীয় কেউ সাক্ষী ছিল না। তাই রিকশাওয়ালার ঐ আতিশয্য আমার পছন্দ হলো না। একটা ঝামেলা সৃষ্টি হবে আর আমার দেরি হয়ে যাবে।

—এই, সব ঠিক আছে, কিছু হয়নি। আমি বললাম।—তুমি চলো।

আমার কথায় সে কান দিল না—হয়তো শুনতেও পায়নি—রিকশার হাতল মাটিতে নামিয়ে রেখে ঐ বুড়িকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল। একটা হাতে বুড়িকে ভর রেখে সে জিজ্ঞাসা করল—লাগেনি তো।

—লেগেছে। আস্তে করে পড়েছিল আমি নিজের চোখে দেখেছি, বেশি আঘাত লাগেনি এটা নিশ্চিত। নিশ্চয়ই ও ভান করছে, ভীষণ বিরক্ত লাগল। রিকশাওয়ালা ঝঞ্ঝাট চেয়েছিল, সে তাই পেল। উদ্ধারের পথ এবার করে নিতে হবে নিজেকেই।

কিন্তু বুড়ি 'লেগেছে লেগেছে' বলা মাত্রই রিকশাওয়ালা আর এক মুহূর্তের জন্যও ইতস্তত করল না। বুড়ির হাত ধরে আস্তে আস্তে তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। আমি অবাক হয়ে গেলাম। তাকিয়ে দেখলাম সামনেই একটা পুলিশ স্টেশন। ঝড়ো হাওয়ায় রাস্তায় কেউ ছিল না তখন। রিকশা ওয়ালা একাই ধরে ধরে বুড়িকে গেটের কাছ পর্যন্ত নিয়ে গেল।

হঠাৎ যেন কেমন একটা অনুভূতি জাগল আমার ভেতর। তার অপসৃয়মান ধুলো-বালিতে মাখা মূর্তিটা যেন মুহূর্তেই একটা অতিকায়রূপ ধারণ করল। যতই সে সামনে এগোতে লাগল ততই তার মূর্তিটা যেন বিশালকায় মনে হতে লাগল, অবশেষে এমন কি ঘাড় উঁচিয়ে দেখতে হলো তাকে। সঙ্গে সঙ্গে তার ঐ অতিকায় দেহের চাপ যেন আমি বোধ করতে লাগলাম ; আমার ফারের জামায় ঢাকা ভেতরকার অহমটাকে সে যেন গলা টিপে ধরল।

নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার সমস্ত জীবনীশক্তি বুঝি নিমিষে শুকিয়ে গেল, মন শূন্য হয়ে গেল। তখনই একজন পুলিস থানা থেকে বেরিয়ে এল। আমি রিকশা থেকে নামলাম।

পুলিসটি আমার কাছে এসে বলল, আর একটা রিকশা নিন। রিকশাওয়ালা আপনাকে নিতে পারবে না।

কোনো কিছু না ভেবেই আমি কোটের পকেট থেকে কয়েকটা তামার মুদ্রা বার করে পুলিসটির হাতে দিলাম। রিকশাওয়ালাকে দেবেন। আমি বললাম। তখন হাওয়া একদম বন্ধ। রাস্তা ফাঁকা জনশূন্য। ভাবতে ভাবতে পথ চলতে লাগলাম, কিন্তু আমার চিন্তাকে আত্মমুখি করতে যেন ভয় পাচ্ছিলাম। আগে যা ঘটেছে সেটা যদি বাদও দিই, তবু এই তামার মুদ্রা কটা ওকে দিলাম কেন ? ওর বকশিস ? রিকশাওয়ালার কাজের বিচার করবার আমি কে ? এসব প্রশ্নের কোনো জবাব আমি নিজের কাছে পেলাম না।

আজ পর্যন্ত সেদিনকার ঘটনাটা জ্বলজ্বল করছে আমার স্মৃতিতে, ভাবলেই আমাকে পীড়া দেয়, তখনি আমি আত্ম-সমীক্ষার চেষ্টা করি। সামরিক এবং রাজনৈতিক সমস্ত ঘটনাবলী, বাল্যকালে পড়া ক্লাসিক্সগুলির মতোই সম্পূর্ণ ভুলে গেছি। তবু এই দিনকার ঘটনাটা ফিরে ফিরে আসে আমার মনে। অনেক সময় বাস্তবের চেয়েও জীবন্ত হয়ে আমাকে লজ্জায় অভিভূত করে। আত্ম-সংস্কারের প্রেরণা জাগায়। অফুরন্ত আশা আর নতুন সাহসে মন ভরে তোলে।

An Incident
July—1920

চায়ের পেয়ালায় তুফান।

সূর্যের উজ্জ্বল পীত রশ্মি নদীর কর্দমাক্ত চরের ওপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে। নদীর তীরে টেলো বৃক্ষের পাতা এতক্ষণে উষ্ণ নিঃশ্বাস নিতে পারছে। পাতার আড়ালে ঝাঁক ঝাঁক মশা নৃত্য আর সঙ্গীতে মুখর। তীরবর্তী কৃষক-বস্তির রন্ধনশালার চিমনি দিয়ে তেমন বেশী ধূম উদগীরণ করতে দেখা যায় না। কৃষক-বধূ আর শিশুধু ঘরের দোরে খোলা জায়গায় জল ছিটিয়ে ছোট ছোট টেবিল আর টুল এনে রাখছে। দেখলেই বোঝা যায় সান্ধ্য আহারের সময় হয়েছে ওদের।

বৃদ্ধ আর বয়স্ক পুরুষরা নিচু টুলগুলিতে বসে কলাপাতার পাখা নাড়তে নাড়তে গল্প করতে ব্যস্ত। ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করছে। কেউ বা টেলো বৃক্ষের তলায় বসে পাথরকুঁচি নিয়ে গুলি খেলছে। কৃষক-বধূরা ধুঁয়ো উঠছে এমনি গরম গরম কালো শুকনো সবজি আর হলুদ রঙের ভাত নিয়ে এল এই মাত্র। কয়েকটি ছাত্র যাচ্ছিল পাশ দিয়ে নদী-পথে নৌকোয়। এমনি দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল তারা। বেশ আছে, কোনো ভাবনা নেই, বলে ওঠে ছাত্রের দল—সত্যিকার সুখী এরা।

ছাত্রেরা একটু বেশি বলেছে। কারণ, তারা বুড়ি মিসেস নয়পাউণ্ডের কথাগুলি শুনতে পায়নি। বুড়ি মিসেস নয়পাউণ্ডের মেজাজ তখন পঞ্চমে। আধভাঙা একটা কলা পাতার পাখা টুলের পায়ায় ঠুকছিল ঠুক ঠুক করে।

—উনআশি বছর বেঁচে আছি, অনেক বয়েস হয়েছে না আমার। সে চেঁচাচ্ছিল—সব কিন্তু গোল্লায় যাবে। এ আমি সইব না বলছি। মরে যাব সেও ভালো। এক্ষুনি রাত্তিরের খাবার খেতে দেবে, আর এই দেখ না এরা এখনো ভাজা কড়াই চিবুচ্ছে।

বুড়ির নাতির মেয়ে, ছয় পাউণ্ড, একমুঠো ভাজা কড়াই নিয়ে ছুটে আসছিল তার কাছে কিন্তু বুঝল গতিক সুবিধের নয়, আবার সোজা ছুটে গেল নদীর ধারে, লুকিয়ে রইল একটা টেলো গাছের আড়ালে। জোড়া বিনুনি বাঁধা ছোট্ট মাথাটা বার করে চেঁচিয়ে উঠল একটু পরে—ঐ, মরে না বুড়ি!

অনেক বয়স হলেও বুড়ি মিসেস নয় পাউণ্ড কানে শুনত কিন্তু মেয়েটার কথা সে শুনতে পায় নি। আপন মনেই বিড় বিড় করছিল: ঠিক, ঠিক তাই, এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষ কেবলই খারাপ হচ্ছে!

এই গ্রামের একটা অদ্ভুত রীতি। সন্তান জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই মা শিশুর ওজন নেয়। ওজনে যা হয়, সেই দিয়ে শিশুর নাম রাখে। পঞ্চাশে পা

দিয়েই কেমন একটা খুঁতখুঁতে বাই পেয়ে বসেছে বুড়ি মিসেস নয় পাউণ্ডকে ; কেবলই বলে তার বয়সকালে গ্রীষ্ম কালটায় এত গরম হতো না, কড়াই ভাজা এত শক্ত লাগত না। কোথায় যেন কী একটা হয়েছে এই সংসারে। ছয় পাউণ্ড তার প্রপিতামহের চেয়েও তিন পাউণ্ড আর বাপ সাতপাউণ্ডের চেয়েও এক পাউণ্ড কম হবে কেন ? এই তো অকাট্য প্রমাণ। তাই সে বার বারই বলে, জোর দিয়ে বলে—ঠিক, ঠিক তাই, এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষ নিশ্চিত নিচে নামছে।

নাতবৌ মিসেস সাতপাউণ্ড এক ঝুড়ি ভাত নিয়ে এল। টেবিলের ওপর রেখেই চেঁচিয়ে উঠল—ঐযে আবার শুরু করেছে। বলি, ছয় পাউণ্ড জন্মের সময় ওজনে ছয় পাউণ্ড পাঁচ আউন্স হয়নি ? তোমাদের পাল্লা, বেসরকারী পাল্লা। ওজনে কম। এক পাউণ্ডে আঠারো আউন্স ধরে। ষোল আউন্স মাপের পাল্লায় ছয় পাউণ্ড সাত পাউণ্ডের চেয়েও বেশি বই কম হতো না, তা জানো ? তোমরা বলছ, ওর বাবার আর ঠাকুরদার ওজন আট পাউণ্ড আর নয় পাউণ্ড ছিল। এটা একদম বাজে কথা।

তখনকার দিনে তো চৌদ্দ আউন্সে পাউণ্ড ধরত, তা জানো ?—এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষ নিশ্চিত নিচে নামছে ! বুড়ি কেবলই বিড় বিড় করে। মিসেস সাতপাউণ্ড জবাব দেবার আগেই দেখল গলির মাথায় তার স্বামী আসছে। আক্রমণটা ঐদিকে চালিয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—এত দেরি করলে যে ? কোন চুলোয় ছিলে এতক্ষণ ? খাবার নিয়ে বসে থাকতে হয়, ভ্রূক্ষেপ নেই তোমার ?

মিঃ সাতপাউণ্ড গ্রামে বাস করলেও নিজের অবস্থার উন্নতি করতে সচেষ্ট থাকত। তার পিতামহের আমল থেকে এই পর্যন্ত এই তিন পুরুষের মধ্যে কেউ কোনোদিন কাস্তে হাতে নেয়নি। তার পিতার মতো সেও নৌকো চালায়। সকালবেলা লুচেন থেকে শহরে যায় আবার ফিরে সন্ধ্যায়। কাজেই চার দিককার সব খবর সে ভালোরকম রাখত। গ্রামে বিশেষ ব্যক্তি বলে গণ্য হলেও তার পরিবারের সবাই দেশের রীতি নীতি মেনে চলত। গ্রীষ্মকালে রাতের খাবার খেতে আলো জ্বালত না। সাতপাউণ্ড দেরি করে এলেই বকাবকি শুনত।

সাতপাউণ্ডের এক হাতে একটা বাঁশের পাইপ, ছয় ফুটের চেয়েও লম্বা ! মাথা নুইয়ে ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা ছোট টুলে বসল এসে। ছয় পাউণ্ডও এই সুযোগে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বসল তার পাশে। সে কি যেন বলল কিন্তু সাত পাউণ্ড জবাব দিল না।

—এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষ নিশ্চিত নিচে নামছে ! বুড়ি মিসেস নয় পাউণ্ড গজ গজ করে উঠল আবার।

সাতপাউণ্ড আস্তে আস্তে মাথা তুলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল একটা।

—সম্রাট আবার নাকি সিংহাসনে বসেছে ? সে বলল।

সে কথা শুনেই মিসেস সাতপাউণ্ড একেবারে থ। সংবাদের তাৎপর্য উপলব্ধি করে বলল সে—খুব ভালো কথা। তাহলে সম্রাট আবার হুকুমনামা জারি করবে, তাই না ?—কিন্তু আমার মাথায় যে শিখা নেই। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সাতপাউণ্ড বলল।

—সম্রাট কি শিখা রাখতে বলেছে ?

—বলবে। এইবার চঞ্চল হয়ে উঠল মিসেস সাতপাউণ্ড।

—তুমি কেমন করে জানলে ?

—সরাইখানায় সবাই বলছে।

মিসেস সাতপাউণ্ড তার সহজাত বুদ্ধি থেকে নিশ্চিত বুঝতে পারল সমূহ বিপদ ! কারণ, সব খাঁটি খবর আসে ঐ সরাইখানা থেকেই। সাতপাউণ্ডের ন্যাড়া মাথার দিকে সে তাকাল সরোষ নেত্রে, মনে একটা তীব্র ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা। দুমদাম করে ভরতি এক বাটি ভাত রাখল তার সামনে।

—তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নাও। বসে বসে কাঁদলেই মাথায় শিখা গজাবে না ! গজাবে কি ? সে বলল।

সূর্যের শেষ রশ্মি মিলিয়ে গেছে। নদীর কালো জল ধীরে ধীরে শীতল হয়ে আসছে। বস্তি থেকে বাটি আর চপস্টিকের টুং টাং ঠুক ঠাক আওয়াজ শোনা যায়। সবারই পিঠের জামা ঘামে ভিজে উঠেছে। মিসেস সাত পাউণ্ড তিন বাটি ভাত শেষ করেছে। আচমকা মুখ তুলে তাকিয়েই কী দেখে যেন তার বুকের ভেতরটা ধুক ধুক করে ওঠে। মিঃ চাও-এর বেঁটে মোটা মূর্তিটা এক-কাঠের পুলটা পেরিয়ে আসছে। টেলো গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায়। তার গায়ে নীল রঙের সুতির গাউন। পাশের গ্রামের একটা সরাইখানার মালিক এই মিঃ চাও। দশ মাইলের মধ্যে একজন গণ্যমান্য লোক। লেখাপড়াও জানে কিছুটা। সেই জন্যেই বিগত দিনের ছায়ার কিছুটা দেখা যায় তার মধ্যে। চিন সেঙ-তানের ভাষ্য সহ "রোমান্স—অব থ্রি কিংস" বইখানা বারো কপি তার আছে। সেই বইটা সে পড়ে। বার বার পড়ে। প্রতিটা চরিত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। ঐ যুগের পাঁচজন বাঘা সেনাপতির নামই কেবল সে জানত না। হুয়াঙ চুঙ হ্যান—সেঙ নামে আর মা চাও মেঙচি নামে যে পরিচিত এও সে জানত। বিপ্লবের পর মাথার শিখা বিনুনি পাকিয়ে মাথাব ওপর 'তা-ও' পুরোহিতদের মতো খোপা করে রাখত। প্রায়ই মন্তব্য করত, চাও ইয়ুন বেঁচে থাকলে, সম্রাটের এ দশা হতো না। মিসেস সাত পাউণ্ডের দৃষ্টিশক্তি প্রখর। তার নজর এড়ায়নি। মিঃ চাও তাও পুরোহিতের

মতো চুল বাঁধেনি এবার। মাথার সমুখ দিকটা কামানো লম্বা শিখা পেছন দিকে ঝুলছে। মিসেস সাত পাউণ্ড বুঝতে পারল সম্রাট আবার সিংহাসন ফিরে পেয়েছে। শিখা রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এইবার সাত পাউণ্ডের নিশ্চিত সমূহ বিপদ। মিসেস সাত পাউণ্ড বুঝতে পারল মিঃ চাও তার লম্বা পোশাকটাও অকারণে পরেনি। গত তিন বছরে দুইবার তাকে এটা পরতে দেখেছে। একবার, যখন তার শত্রু আহ্-জু অসুস্থ আর দ্বিতীয় বার, মিঃ লুর মৃত্যুর পর। এই মিঃ লু, মিঃ চাও-এর মদের দোকান পুড়িয়ে দিয়েছিল। এইবার তৃতীয় বার। এর অর্থ তার মনকে উল্লসিত করতে আর তার শত্রুপক্ষকে বিপন্ন করতে সমর্থ এমন কিছু ঘটেছে নিশ্চয়। বছর দুই আগে, মিসেস সাত পাউণ্ডের মনে পড়ে গেল, তার স্বামী নেশার ঘোরে মিঃ চাওকে জারজ বলে গাল দিয়েছিল। এবার তার স্বামীর কত বিপদ পরিষ্কার বুঝতে পারল। বুকের ভেতরটা ভীষণভাবে দপ দপ করতে লাগল।

মিঃ চাওকে আসতে দেখে খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সবাই। ভাতের বাটিতে চপস্টিক ঠেকিয়ে ডাকল—আসুন মিঃ চাও, বসবেন আমাদের সঙ্গে ? মিঃ চাও আসতে আসতে সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে বলল ঃ ধন্যবাদ, আপনারা খান।

সে সোজা সাত পাউণ্ডের টেবিলের কাছে গেল। সবাই স্বাগত জানাল তাকে মিঃ চাও মুচকি হেসে বলল সবাইকে—থাক থাক, আপনারা খান কিন্তু টেবিলের ওপর রাখা খাবারের দিকে এক নজরে তাকিয়ে দেখতে তার ভুল হয় না—ঐ শুকনো সবজির বেশ মিষ্টি গন্ধ, তাইনা ! হ্যাঁ ভালো কথা—তোমরা খবর শুনেছ ?

মিঃ চাও মিসেস সাতপাউণ্ডের বিপরীত দিকে সাতপাউণ্ডের পেছনে দাঁড়িয়েছিল।

—শুনেছি। সম্রাট আবার সিংহাসনে বসছেন—সাতপাউণ্ড জবাব দিল। মিঃ চাও-এর মুখের ভাব লক্ষ্য করে মিসেস সাতপাউণ্ড একটু মুচকি হাসে।

—সম্রাট সিংহাসনে বসছেন, এইবার মকুবনামা জারি হবে কবে ? সে প্রশ্ন করে।

—মকুব নামা ? মকুব নামা আসবে ঠিক সময় মতোই। বলেই মিঃ চাও-এর কণ্ঠস্বর একটু কঠিন হয়ে উঠল। কিন্তু সাতপাউণ্ডের শিখা, তার কি হবে ? এটা খুব জরুরী। জানো তো বাবড়ি-চুলওয়ালাদের আমলে কী হয়েছিল ? চুল রাখবে সঙ্গে মাথা যাবে আর মাথা রাখবে চুল যাবে…

সাতপাউণ্ড বা তার স্ত্রী কেতাব পড়েনি। কাজেই এই পুরাণের কাহিনীর কোনো অর্থ তারা বোঝে না কিন্তু তারা ধরে নিল, যেহেতু মিঃ চাও বলছে, অবস্থা নিশ্চিত খুব ঘোরালো। বাঁচবার কোনো পথ নেই। তাদের মনে হলো

যেন তারা তাদের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা শুনেছে। দুই কান কেমন ভোঁ ভোঁ করে উঠল আর দ্বিতীয় কোনো কথা তারা উচ্চারণ করতে পারল না।

—এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষ নিশ্চিত নিচে নামছে। বুড়ি মিসেস নয় পাউণ্ড মিঃ চাও-এর সঙ্গে কথা বলবার একটা সুযোগ নিল—আজকাল যারা বিদ্রোহ করে তারা কেবল ধরে ধরে শিখাটাই কেটে দেয়। দেখলে কেউ বৌদ্ধও বলবে না তা-ও বাদীও না। আরে বাবা, আগের কালের ওরা কি এরকম ছিল? আমার উনআশি বছর বয়স হয়েছে, অনেক দেখেছি। সেকালের ওরা লাল সাটিন কাপড় দিয়ে মাথা মুড়িয়ে রাখত আর কাপড়ের বাকিটা পায়ের গোড়ালি নাগাত ঝুলে থাকত। রাজার ছেলে হলুদ সাটিনের পোশাক পরত, লম্বা ঝুল থাকত···হলুদ সাটিন, লাল সাটিন···। অনেক দিন বেঁচেছি, অনেক দেখেছি! এই উনআশি বছর বয়স আমার।

—তাহলে কী করা এখন? উঠে দাঁড়িয়ে মিসেস সাতপাউণ্ড বলল—আমাদের মস্ত বড় পরিবার, ছেলে মেয়ে বুড়ো, সবাই ওর ওপর নির্ভর!

কিছু করার নেই। মিঃ চাও বলল: শিখা না রাখবার শাস্তি অক্ষরে অক্ষরে পরিষ্কার করে বইয়ে লেখা আছে! পরিবার বড়ো কি ছোটো কিছু আসে যায় না।

মিসেস সাতপাউণ্ড যখন জানল, বইয়ে লেখা আছে, তখন আর কোনো ভরসা রইল না। উদ্বেগে চঞ্চল হয়ে সাতপাউণ্ডের ওপর মন বিষিয়ে উঠল। সাতপাউণ্ডের নাকের ডগায় চপস্টিকের খোঁচা দিয়ে বলল: নিজের বিছানা নিজে সাজিয়েছো, এইবার ঘুমোও ওতে। বিপ্লবের সময় আমি বার বার বলেছি নৌকোয় বেরিও না, শহরে যেও না কিন্তু তবু যাবেই। শহরে গেল, আর ওখানে সবাই মিলে ধরে শিখা কেটে দিল। চমৎকার কালো চকচকে শিখা। এখন তাকে না বৌদ্ধ, না তাওবাদী কোনোটাই মনে হয় না। নিজের বিছানা নিজে সাজিয়েছো, এবার শুতেই হবে ওতে কিন্তু আমাদের টেনে নিয়েছ কোন অধিকারে?

মিঃ চাও আসবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে সাতপাউণ্ডের টেবিলের ধারে জড়ো হলো! তার মতো একজন গণ্যমান্য লোকের প্রকাশ্যে, স্ত্রীর হাতে এমনি অবমাননার কী অর্থ, সাতপাউণ্ড ভালোই জানত। সে মাথা তুলে বলল ধীরে ধীরে—আজকে অনেক কিছু বলছ কিন্তু সেদিন···

—থাক্ থাক্ অনেক হয়েছে।

উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে বিধবা পা ইয়ির অন্তঃকরণটা একটু নরম। দুবছরের শিশু সন্তান। স্বামীর মৃত্যুর পর ওর জন্ম। ওকে কোলে নিয়ে মিসেস সাত পাউণ্ডের পাশে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়ে যাচ্ছে দেখে শান্ত করবার জন্য বলল সে: ও যাক, মিসেস সাত পাউণ্ড। মানুষ তো আর দেবতা নয়। ভবিষ্যত দেখবে কেমন করে? তখন কি আপনি,

মিসেস সাত পাউণ্ড, বলেন নি যে শিখা কাটলে লজ্জা করবার কিছু নেই? তাছাড়া সরকার থেকে এখন পর্যন্ত তো কোনো হুকুমনামা জারি হয়নি···
কথা শেষ হবার আগেই মিসেস সাত পাউণ্ডের দুই কান লাল হয়ে উঠল। সে তার চপস্টিক ঘুরিয়ে বিধবার নাকের কাছে নিয়ে গেল—এ আমি···না···এ আমি কখনো বলিনি? আপত্তি জানিয়ে বলল মিসেস সাতপাউণ্ড—মিসেস পা ইয়ি এ আপনি বলছেন কেন? ঐরকম বিদঘুটে কথা আমি বলতে পারি কখোনো? ওরকম যখন ঘটল, আমি তিনটে দিন কেঁদে ভাসিয়েছি, সবাই দেখেছে। ঐ বাচ্চাটা, ছয় পাউণ্ড পর্যন্ত কেঁদে উঠেছিল···
ছয় পাউণ্ড এইমাত্র একবাটি ভাত শেষ করেছে। বাটিটা বাড়িয়ে ধরে আরো চাইছে। মিসেস সাতপাউণ্ডের মেজাজ তখন চরমে। ওর মাথায় চপস্টিকের খোঁচা মেরে বলল সে: এই, চুপ। চেঁচাবি না।
খালি বাটিটা ছয়পাউণ্ডের হাত থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েই একটা আওয়াজ! একটা ইটের কানায় লেগে একটা টুকরো ঠিকরে বেরিয়ে গেলো। সাতপাউণ্ড লাফ দিয়ে উঠে ওটা কুড়িয়ে নিতে গেল, টুকরো কটা জোড়া লাগবে তো।
—হতচ্ছাড়া কোথাকার! চেঁচিয়েই ছয়পাউণ্ডের গালে ঠাস করে একটা চড় মারল। মেয়েটা তখন পড়ে গেছে। তার কান্না আর থামে না। মিসেস নয়পাউণ্ড হাত ধরে তুলে শান্ত করল মেয়েকে।
—বলেছি না, এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষ নিশ্চিত নিচে নামছে! বিড় বিড় করতে করতে ছয়পাউণ্ডের হাত ধরে চলে গেল বুড়ি।
এরপর বিধবা পা ইয়ির রাগবার পালা—শুধু শুধু মারলে মেয়েটাকে!
মুচকি হাসতে হাসতে সব দেখছিল মিঃ চাও। কিন্তু যখন বিধবা পাইয়ি বলল সরকারের কোনো হুকুম জারি হয়নি এখনো, তার ভীষণ রাগ হলো। টেবিলের কাছে এসে বলল—একটা বাচ্চাকে মেরে লাভ কি বলুন? রাজকীয় বাহিনী যেকোনো সময় বেরিয়ে পড়বে দেখবেন, জানেন তো, এই সাম্রাজ্যের রক্ষক হলেন জেনারেল চেঙ, তিন রাজত্ব সময়কার কালিন চেঙ-কির বংশধর। তার একটা বিরাট বর্শা আছে। আঠারো ফুট লম্বা। দশ হাজার লোকের একা মোকাবেলা করবার সাহস রাখে। কেউ দাঁড়াতে পারে না তার বিরুদ্ধে। খালি হাত উঠিয়ে, যেন হাতে একটা বর্শা আছে এমনি ভাব দেখিয়ে মিঃ চাও কয়েক পা এগিয়ে গেল বিধবা পা-ইয়ের কাছে—তুমি পারবে তার সাথে? মিঃ চাও বলল। ছেলে কোলে রাগে কাঁপছিল বিধবা পা ইয়ি। কিন্তু মিঃ চাও-এর ঘামে ভেজা বিশ্রি মুখের ভঙ্গি দেখেই ভয় পেয়ে গেল সে। যা বলবার ছিল, না বলেই সরে পড়ল সেখান থেকে। মিঃ চাও চলে গেল। সবাই দোষী করল বিধবা পা ইয়িকে, কী দরকার ছিল তার বলবার। যাদের শিখা ছিল না, তাদের অনেকেই তখন লুকিয়ে ছিল

ভিড়ের ভেতর, পাছে মিঃ চাও দেখে ফেলে, মিঃ চাও সেদিকে নজর না দিয়ে চলে গেল নিজের পথে। ধীরে ধীরে টেলো-গাছ.গুলোকে পেছনে ফেলে এক-তক্তার পুলটা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল মিঃ চাও—তোমরা ভাবছ পারবে তার সাথে ? তার মুখে প্রশ্ন।

বস্তির লোকেরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, মাথায় সবার সেই একই ভাবনা। চেঙ ফেইয়ের সমকক্ষ তারা নয় এটা তারা বুঝতে পারে ; সাত পাউণ্ডের বাঁচবার আর কোনো পথ নেই তাহলে। রাজার আইন ভেঙেছে, মুখে পাইপ নিয়ে শহরে গিয়ে ঐ লম্বা চওড়া কথা বলবার কোন প্রয়োজন ছিল ঐ সাতপাউণ্ডের। এবার বিপদে পড়েছে। হয়েছে তো ? খুব খুশি হয়েছে সবাই। বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করলে হতো কিন্তু কী বলবে ? মশার ঝাঁক বন্ বন্ করে উড়ে গেল তাদের কানের পাশ আর মাথার উপর দিয়ে।

যে যার ঘরে ফিরে গেল বস্তির লোকেরা। ঘরের দরজা বন্ধ হয়েছে, এইবার সবাই নিদ্রার আশ্রয়ে। নিজের মনে বিড় বিড় করতে করতে মিসেস সাতপাউণ্ড থালা বাটি গুছিয়ে নিয়ে টেবিল টুল সব ঘরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে সেও গেল ঘুমুতে।

সাতপাউণ্ড ভাঙা বাটিটা নিয়ে জানালার চৌকাঠের ওপর নীরবে বসে রইল। মুখে সেই লম্বা বাঁশের পাইপ কিন্তু তখনও এমনি গভীর চিন্তায় মগ্ন যে পাইপ টানতেই ভুলে গেল। খেয়ালই নেই, তামাক কখন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ! ভীষণ একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এটা নিশ্চিত। এ থেকে মুক্তি পাবার একটা পরিকল্পনা স্থির করবার জন্য গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল। কিন্তু সব চিন্তা কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। জটিল গ্রন্থি কোনো মতেই শিথিল করতে পারছিল না—শিখা, শিখা, তাই না ? একটা বিরাট আঠারো ফুট লম্বা বর্শা, বলে কি ! এক পুরুষ আর এক পুরুষ থেকে নিশ্চিত নিচে নামছে ! সম্রাট সিংহাসনে বসেছে। ভাঙা বাটিটা শহরে নিয়ে যেতে হবে সারিয়ে আনতে। তার সমকক্ষ জুটি কে আছে ? সব কিছু বইয়ে লেখা আছে। দুত্তোর ছাই…।

অন্যদিনের মতো পরদিনও সকালে সাতপাউণ্ড নৌকো নিয়ে শহরে গেল। ভাতের বাটি আর ছয়ফুট লম্বা বাঁশের পাইপটা নিয়ে সন্ধ্যার দিকেই ফিরে এল লুচেনে। খেতে বসে বুড়ি মিসেস নয়পাউণ্ডকে বলল—বাটিটা সে সারিয়ে এনেছে। এত বেশি ভেঙেছিল যে ষোলটা তামার খিল লাগাতে হলো। এক একটার দাম তিন মুদ্রা। মোট আটচল্লিশ মুদ্রা লাগল।

—এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষ নিশ্চিত নিচে নামছে, আমি বলছি। বিরক্তির সঙ্গে বুড়ি নয়পাউণ্ড বলল। বহুদিন বেঁচেছি। একটা খিলের দাম তিন মুদ্রা। তারপর খিলগুলিও তো ঠিক আগেরটার মতো নয়।

সে সব দিনে…হায়রে…উনআশি বছর আমার বয়স হয়েছে…

সাতপাউণ্ড রোজই শহরে যায় তবু তার পরিবারের মানুষগুলির মন থেকে অন্ধকারের ছায়া কাটে না। গ্রামের প্রায় সবাই তাকে এড়িয়ে চলে। শহরের খবর জানবার জন্য আর আসে না তার কাছে। মিসেস সাতপাউণ্ডের মেজাজও আর ভালো থাকে না। সবসময় মুখে লেগেই আছে গালি আর গালি।

প্রায় একপক্ষকাল পরে একদিন শহর থেকে ফিরে স্ত্রীর মেজাজটা একটু ভালো বলে মনে হলো।

—শহরে কিছু শুনেছ? স্ত্রী বললো।

—না, কিছু না তো?

—সম্রাট সিংহাসনে বসেছে না?

—কেউ তো বলেনি!

—সরাইখানাতেও শোনোনি কি?

—না, কেউ কিছু বলেনি?

—মনে হয়না সম্রাট সিংহাসনে বসবে।

মিঃ চাও'এর মদের দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম আজকে, দেখলাম সে বসে বসে বই পড়ছিল। শিখাটা চুড়ো করে মাথার ওপর গুটিয়ে রাখা। লম্বা আলখাল্লাটাও পরনে ছিল না।

—তোমার কি মনে হয় সম্রাট সিংহাসনে বসবে না?

—আমার মনে হয় বোধহয় বসবে না।

আজকে আবার সাতপাউণ্ডকে তার স্ত্রী আর গ্রামের সবাই সমীহ করে। সম্মান দেখায়। গ্রীষ্মকালে তার পরিবার আবার তেমনি বাড়ির সামনে মাটির চাতালে বসে রাত্রের খাবার খায়। পথিক পথ চলতে চলতে মৃদু হেসে তাদের অভিবাদন জানায়। বুড়ি মিসেস নয়পাউণ্ড তার অশীতম জন্মদিনের উৎসব করেছে এই সেদিন। তেমনি সুস্থ সবল, আবার মুখেও লেগে আছে তেমনি অভিযোগ। ছয়পাউণ্ডের ছোট্ট দুই গোছা চুলের মুঠো মোটা বেণীতে রূপ নিয়েছে। তার খোঁপা বাঁধা শুরু হলেও, এখনো কিছু কিছু কাজ সে করে মিসেস সাতপাউণ্ডের হয়ে। ষোলটা খিলান দেওয়া বাটিতে ভাত নিয়ে আবার তেমনি ছুটোছুটি করে বাড়ির সামনে মাটির চত্তরে।

Storm in a Tea cup
October 1920

দুরন্ত শীতের কুহেলি ভেদ করে সুদীর্ঘ সাতশত মাইল পথ পাড়ি দিয়ে, সেই কুড়ি বছর আগে ছেড়ে যাওয়া আপন ঘরে আমি আবার ফিরে এসেছি।
শীতের শেষ। বাড়ির কাছাকাছি এসে পেঁছুতেই কেমন একটা অন্ধকার চারদিক ছেয়ে গেল। একটা হিমেল হাওয়া নৌকোর কেবিনের ভিতর দিয়ে বয়ে গেল। বাঁশের চিকের ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে ধীর ক্লান্ত পীতাভ আকাশের নিচে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জীবনের চিহ্নবিহীন জনশূন্য গ্রামগুলি কেবলি চোখের সামনে ভাসতে লাগল। কেমন বিষন্ন বোধ করতে লাগলাম।

গত কুড়ি বৎসর আমাদের বাড়ির এই স্মৃতি-ই কি মনকে মথিত করত ?
না, যে বাড়ির কথা আমার স্মৃতিতে আছে সে তো এরূপ ছিল না, যা আমি আজ দেখলাম। সে তো ছিল আরো সুন্দর, মনোরম ! কিন্তু আপনি যদি জানতে চান কোথায় সেই রূপের মাধুর্য, কী তার সৌন্দর্যের বৈচিত্র্য, আমি জানিনা আমার ভাষা নেই প্রকাশ করবার। শুধু মনে হয় বলতে পারি এই রূপই তো ছিল তখনও। নিজের মনের সঙ্গে বোঝা-পড়া করে নিলাম ঃ এখন যা দেখছি, আমার বাড়ি তাই ছিল সবসময়। যদিও কোনো উন্নতি হয়নি তবু ততটা বিষাদমলিন নয় যতটা আমি মনে করছি। আসলে আমার মনের রূপ বদলেছে, কারণ কোনো মোহের আকর্ষণে এবার আমি ঘরে ফিরিনি।

এবার আমি এসেছি বিদায় নিতে। আমাদের পরিবারের বহু বছরের বাসস্থান এই পুরনো ভিটে বাড়ি এরমধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে। বছর শেষ না হতেই চলে যাবে অপরের হাতে। অতি প্রিয় এই পুরনো ভিটেবাড়ির কাছে চিরকালের জন্য বিদায় নেব। আমাদের শহর থেকে বহুদূরে আমার কর্মস্থলে পরিবারের সবাইকে নিয়ে যাব। নববর্ষের আগেই তাই ছুটে আসতে হলো আমাকে।

দ্বিতীয় দিন। তখনও ভোর হয়নি। বাড়ির দোর-গোড়ায় এসে পৌঁছুলাম। বাড়ির-ছাতে আগাছার জঙ্গল, শুকনো মরা ডাল হাওয়ায় উড়ছে। দেখেই বুঝলাম এই পুরনো বাড়ি কেন বেচতে হলো। জ্ঞাতি গোষ্ঠীদের অনেকেই হয়তো এতদিনে ভিটে ছেড়ে চলে গেছে, চারদিক তাই বুঝি নিস্তব্ধ। বাড়ি পৌঁছেই দেখলাম আমাকে অভ্যর্থনা করতে মা দরজায় দাঁড়িয়ে। আমার আট বছর বয়সের ভাইপো হুঙ্-এর। ও ছুটে এসেছে তাঁর পিছু পিছু।
মা খুশি হলেন সত্যি কিন্তু কেমন একটা বিষন্ন ভাব গোপন করতে চেষ্টা

করছিলেন। বসে একটু বিশ্রাম নিয়ে চা-টা খেতে বললেন। বাড়ি বদলের আলোচনা আপাতত স্থগিত রইল। হুঙ-এর আগে আমাকে দেখেনি, দূরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে।

বাড়ি বদলের কথা উঠল। ঘর ভাড়া নিয়েছি আমি বললাম। কিছু আসবাবপত্রও কিনেছি। আরও কিছু কিনবার জন্য এ বাড়ির কিছু ফারনিচার বিক্রি করা দরকার। মা রাজী হলেন। বললেন, মালপত্র সবই প্রায় বেঁধে ফেলেছেন। যেসব ফারনিচার নেওয়া যাবে না তার অর্ধেক বিক্রি হয়ে গেছে, কিন্তু মুশকিল কেনবার লোক নেই।

দু'চার দিন বিশ্রাম নে, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কর। তারপর রওনা হব আমরা। মা বললেন।

—বেশ।

—তারপর জুন-তু। যখনই আসে তোর কথা জিজ্ঞেস করে, তোর সঙ্গে দেখা করতে চায়। তোর আসবার সম্ভাব্য দিনের কথা তাকে বলেছি। যেকোনো সময় সে আসতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ছবি আমার মনের পর্দায় অকস্মাৎ চিকমিক করে উঠল। নীল আকাশের গায় একটা সোনালী চাঁদ তখন ফুটে উঠেছে, নিচে সমুদ্রসৈকত, দূরে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু চোখে পড়ে তরমুজের সবুজ ক্ষেত। তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি এগার বারো বছরের বালক। গলায় একটা রূপার মালা, হাতে একটা লোহার হাত নিড়ানি। ছেলেটা তেড়ে যাচ্ছে একটা "ঝা"কে আর ওটাও ছুটে পালাচ্ছে তার দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে।

এই ছেলেটি জুন-তু। যখন প্রথম পরিচয় হয় তখন তার বয়স মোটে দশ। সেও আজ থেকে তিরিশ বছর আগে। তখন আমার বাবা বেঁচে। পরিবারের অবস্থাও স্বচ্ছল। কাজেই আমিও কিছুটা বকে গিয়েছিলাম। সে বছর পৈতৃক পুজোর পালা আমাদের পরিবারে। এই পালা তিরিশ বছরে একবার আসে। কাজেই খুব গুরুত্ব দেওয়া হতো ওটাকে। প্রথম মাসে পৈতৃক গৃহদেবতার মূর্তিগুলি প্রতিষ্ঠার পর পুজো দেওয়া হতো। গৃহদেবতার কাছে উৎসর্গ করা পাত্রগুলি এতই মূল্যবান এবং পূজার্থীর সংখ্যা এত বেশি যে ওগুলো চোরের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হতো। আমাদের পরিবারে তখন মাত্র একজন ঠিকে মজুর। (আমাদের অঞ্চলে জন-মজুরদের সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হতো। যারা একই পরিবারে সারা বছর কাজ করত, তাদের বলা হতো পাকা-মজুর। কেবল একদিনের জন্য যাদের নেওয়া হতো তাদের বলত দিন মজুর, আর যারা নিজের জমিতে কাজ করত এবং নতুন বছরের দিন অথবা কোনো উৎসব বা পার্বনের দিনে, অথবা খাজনা আদায়ের সময় কোনো এক পরিবারে কাজ করত তাদের বলা

হতো ঠিকে মজুর।) কাজের চাপ বেশি দেখে আমাদের ঠিকে-মজুর তার ছেলে জুন-তুকে উৎসর্গের পাত্রগুলোর পাহারায় দিতে বাবার অনুমতি চেয়েছিল।

বাবা যখন অনুমতি দিলেন, আমি ভীষণ খুশী হলাম, কারণ অনেকদিন জুন-তুর কথা শুনেছিলাম। সে নাকি আমারই বয়সী, একই সন মাসে জন্ম। তাই কুষ্ঠি বিচারের পরই তার নাম রাখা হয়েছিল জুন-তু। ফাঁদ পেতে ছোটো ছোটো পাখী ধরতে সে সিদ্ধহস্ত ছিল।

প্রতিদিন আমি ঐ নতুন বছরের দিনটির জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতাম, কারণ ঐ দিন জুন-তু আসত। তারপর বছর শেষ হলে একদিন মা বললেন জুন-তু এসেছে, আমি ছুটে গেলাম তাকে দেখতে। সে রান্না ঘরের ধারে দাঁড়িয়েছিল। বেশ গোল-গাল গোলাপী ফুটফুটে তার মুখখানা, মাথায় একটা ফেলটের টুপি, গলায় একটা রূপোর মালা ঝুলছিল। ওটা মাদুলির কাজ করত। ভীষণ লাজুক ছিল, আমিই একমাত্র একজন ছিলাম যাকে সে ভয় করত না। যখন আশেপাশে কেউ থাকত না তখনই সে আমার সঙ্গে কথা বলত। অল্প দিনের মধ্যেই আমরা বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম।

তখন কী কথাবার্তা আমাদের ভেতর হয়েছিল জানি না, মনেও নেই। তবে এটা মনে আছে, জুন-তু ভীষণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, কেননা শহরে এসে অনেক কিছু নতুন নতুন জিনিস দেখবার সুযোগ সে পেয়েছিল।

পরদিনই তাকে পাখী ধরতে বললাম।

—পারা যাবে না। সে বলল ঃ বরফ না পড়লে হয় না। আমাদের ওখানে, যখন বরফ পড়ে, কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করে একটা বাঁশের ডগায় একটা ঝুড়ি ঝুলিয়ে দিই, তারপর ঝুড়িটার তলায় কিছু শস্যের দানা ছিটিয়ে দিই। পাখী দানা খেতে এলেই বাঁশের সঙ্গে বাঁধা একটা সুতো ধরে টান মারি। সাথে সাথে ঝুড়ির তলায় আটকা পড়ে পাখীগুলি। অনেক রকমের পাখী পড়ে—বুনো হাঁস, বুনো মুরগী 'বুনো পায়রা' এমনি আরো কত কি…

খুব আগ্রহ নিয়ে, কবে বরফ পড়বে সেই দিনের অপেক্ষায় রইলাম।

—এখন তো ভীষণ শীত। একদিন জুন-তু বলল ঃ গরম কালে আমাদের ওখানে একবার এসো। দিনের বেলায় সমুদ্রের ধারে যাব, শামুক কুড়বো—অনেক রকম শঙ্খ-কড়ি শামুক ঝিনুক পাওয়া যায়, লাল সবুজ কতসব রঙের। বিকেলে বাবা আর আমি যখন তরমুজ ক্ষেতে যাব তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে।

—কেন যাবে, চোর তাড়াতে বুঝি ?

—না। কেউ মাঠের ধার দিয়ে যেতে যেতে তেষ্টা পেলে দুটো একটা তুলেই খায়, আমরা একে চুরি বলি না। খ্যাঁকশেয়াল, সজারু, আর ঝা, এ গুলোকে তাড়াতে হয়। ভীষণ নষ্ট করে। চাঁদের আলোয় ঐ ঝা গুলি যখন

তরমুজে কামড় দেয়, আওয়াজ শুনেই আমরা বুঝতে পারি, নিড়ুনি নিয়ে চুপি চুপি তাড়া করি।

ঝা বস্তুটি কী আমি কিছুই বুঝি নি—এখনও ঠিক বুঝি না—তবু ধরে নিয়েছিলাম কুকুর জাতীয় একটা হিংস্র জানোয়ার কিছু হবে হয়তো।

—কামড়ায় না ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—হাত বিঁদে তোমার হাতে থাকবে। যেতে যেতে নজরে পড়লেই তুমি ও দিয়ে তাড়াবে। ভীষণ ধূর্ত, তোমার দিকেই ছুটে আসবে। সুরুৎ করে তোমার দু পায়ের ফাঁক দিয়ে পালাবে। ওর গায়ের লোম তেলের মতো পিচ্ছিল...

আমি জানতাম না এরকম বস্তুও সব আছে। সমুদ্র সৈকতে রামধনু রঙের কত রকমারি শঙ্খ-কড়ি শামুক ঝিনুক। আর তরমুজ ফলাতে কত ঝকমারি। অথচ এর আগে আমি শুধু জানতাম, সবজির দোকানে তরমুজ বিক্রি হয়।

—সমুদ্রের ধারে যখন জোয়ার আসে, কত রকমের মাছ এসে লাফিয়ে পড়ে। উড়ন্ত মাছ, ব্যাঙের মতো দুটো ঠ্যাং আছে ওদের।

এমনি কত আজব কাহিনীর সোনার খনি এই জুন-তু। আমার পুরনো বন্ধুদের সবার জ্ঞানের বাইরে। এর কিছুই ওরা জানে না। জুন-তু যেমন থাকত সমুদ্রের বিশালতার পাশে. ওরা ঠিক আমার মতোই কেবল দেখত বাড়ির আঙিনার প্রাচীরের উপর দিয়ে এক ফালি আকাশ।

দুর্ভাগ্য নতুন বছরের ঠিক এক মাস কাটতেই জুন-তুকে ফিরে যেতে হতো তার ঘরে। আমি কেঁদে ফেলতাম। সে গিয়ে রান্নাঘরে লুকিয়ে থাকত। কাঁদত, কিছুতেই বেরিয়ে আসত না। তার বাবা জোর করে তাকে নিয়ে যেত। বাড়ি ফিরে বাবার হাত দিয়ে এক প্যাকেট সামুদ্রিক শামুক আর কিছু সুন্দর পাখীর পালক পাঠিয়ে দিত আমাকে। দু একবার আমিও তাকে নানা রকম উপহার পাঠিয়েছি। কিন্তু এরপর আর আমাদের দেখা হয়নি কোনোদিন। মার মুখে এই কথা শুনে, শৈশবের ঐ স্মৃতি জীবন্ত হয়ে বিদ্যুতের মতো ঝলক দিয়ে গেল মনের পর্দায়। আমার পুরনো দিনের সেই অতি সুন্দর বসতবাটি আমি আবার যেন দেখতে পেলাম চোখের সামনে। মার কথায় তাই আমি বললাম—চমৎকার। আর সে...সে কেমন আছে ?

—সে ? তার অবস্থাও তেমন ভালো নয়। মা বললেন, তারপর বাইরে তাকিয়ে আবার বললেন—ঐ যে, ঐ লোকগুলো আবার আসছে। ওরা ফার্নিচারগুলি কিনতে চায়। কিন্তু আসলে কোন একটা নিয়ে কেটে পড়াই ওদের মতলব। যাই দেখিগে...।

মা চলে গেলেন। বাইরে কিছু মেয়েছেলের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। হুঙ-এরকে কাছে ডেকে নানা কথা বলতে লাগলাম. সে লিখতে পারে কিনা,

এ বাড়ি ছেড়ে যেতে তার কষ্ট হচ্ছে কি না, এইসব কথা।

—আমরা কি টেনে করে যাব ?

—হ্যাঁ, টেনে যাব।

—নৌকো করেও ?

—প্রথমে নৌকোয় যাব।

—ওহ্, এই রকম! ইয়া লম্বা গোঁপ ? একটা অচেনা কর্কশ কণ্ঠস্বর আচমকা কোথায় বেজে উঠল!

আমি চমকে উঠে মুখ তুলে তাকালাম। একটি মহিলাকে দেখলাম, বিরাট চওড়া চোয়ালের হাড় আর সরু দুখানা ঠোঁট! হাত দুটো কোমরে রেখে (ঘাগরা পরেনি) ট্রাউজার পরা দুই পা ফাঁক করে আমার সামনে এসে দাঁড়াল, দেখে মনে হলো ঠিক যেন জ্যামিতির বাক্সের কম্পাসের মতো।

আমি হকচকিয়ে গেলাম।

—আমায় চিনতে পারলে না ? সেই ছেলেবেলায় কত কোলে করেছি তোমাকে!

আমি আরও হতভম্ব হয়ে গেলাম। সৌভাগ্য তক্ষুনি মা ফিরে এলেন, বললেন —কতকাল বিদেশে কিনা, তাই তোমাকে চিনতে পারেনি। কিছু মনে করো না। তোমার মনে নেই, মা আমাকে লক্ষ্য করে বললেন : ইনি মিসেস ইয়াঙ, রাস্তার ওধারে থাকেন…ও'দের সয়াবিনের দই বিক্রির দোকান আছে।

তখন আমার মনে পড়ল। আমি তখন বালক, সে সময় মিসেস ইয়াঙ বলে একজন মহিলা সারাদিন ঐ রাস্তার ওপারে সয়াবিনের দই বিক্রির দোকানে বসে থাকত। লোকেরা তাঁকে সয়াবিনের দই সুন্দরী বলে ডাকত। খুব করে মুখে পাউডার মাখত, চোয়াল এত চওড়া আর ঠোঁট সরু লাগত না তখন। তাছাড়া সবসময় বসে থাকত বলে কম্পাসের সঙ্গে তার মিল তখন চোখে পড়েনি। সেকালে লোকে বলত, ঐ দইয়ের দোকানে খুব বিক্রি। কিন্তু হয়তো আমার বয়সের জন্যই, মহিলা তেমন কিছু দাগ কাটেনি আমার মনে। তাই তাকে আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম। যাইহোক, কম্পাসকে খুবই বিরক্ত মনে হলো, কেমন একটা বিতৃষ্ণার দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, যেমন একজন ফরাসী নেপোলিয়নের নাম শোনেনি অথবা একজন আমেরিকাবাসী ওয়াশিংটনকে চেনে না শুনলে কেউ তাকিয়ে দেখবে। একটু বিদ্রূপ মাখা হাসি হেসে মহিলা বলল।

—তুমি ভুলে গেছ তাই না ? স্বাভাবিক, তোমার নজরের যোগ্য নিশ্চয় আমি নই…কি বল ?

—তা কেন…না—আমি—। আমি একটু কাচুমাচু ভাব নিয়ে উত্তর দিলাম।

—তাহলে, মাস্টার সুন, আমি বলছি শোন। তুমি আজকাল বড়লোক হয়েছ,

আর ওগুলো এত ভারি যে কোথাও নিয়ে যাওয়া খুব মুশকিল, তাই বলছি ঐ পুরনো ফার্নিচারগুলি নিশ্চয় তুমি বয়ে নিয়ে যাবে না। তোমার প্রয়োজনও নেই হয়তো। আমাকে বরং এগুলো দিয়ে যাও। আমাদের মতো গরিব মানুষের এগুলো ভীষণ কাজে লাগবে।

—এটা কি বলছেন, বড়লোক আমি মোটেই নই। ওখানে গিয়ে অনেক কিছু কিনতে হবে আমাকে, তাই এগুলো বেচতেই হবে—

—আরে কী বলছ! এরকম একটা বিরাট চাকরি করছ, তবু বলছ বড়লোক হওনি? শুনেছি তো, তুমি তিনজন মেয়ে মানুষ রেখেছ, যখন যেখানে যাও সিডন চেয়ারে বসে যাও। তবু বলবে বড়লোক হওনি? আরে রাখ রাখ, আমার কাছে লুকোতে পারবে না।

জানি কথা বলে লাভ নেই, চুপ করে রইলাম।

—শোন, একটা কথা আছে যে মানুষ যতই পায় ততই কেপ্পন হয়, আবার যতই কেপ্পন হয় ততই পয়সা আসে হাতে—। কম্পাস মন্তব্য করল মুখে একটা বিতৃষ্ণার ভাব; দেখলাম মার হাতের একজোড়া দস্তানা চুপিচুপি নিজের পকেটে পুরে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এরপর আশ-পাশ থেকে জনা কয়েক আত্মীয়স্বজন দেখা করতে এলেন। তাঁদের আদর আপ্যায়নের ফাঁকে ফাঁকে কিছুটা বাঁধা-ছাঁদার কাজও আমি গুছিয়ে নিলাম। তিন চার দিন এই করেই কেটে গেল।

একদিন বিকেল বেলায় ভীষণ ঠাণ্ডা, লাঞ্চের পর আমি চা খাচ্ছিলাম; মনে হলো কেউ এসেছে, আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম—কে। প্রথম দৃষ্টিতেই আপনা থেকে আমি চমকে উঠলাম। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়েই ছুটে গেলাম আগন্তুককে অভ্যর্থনা করে আনতে।

আগন্তুক জুন-তু। যদিও দেখামাত্র তাকে জুন-তু বলে চিনতে পারলাম, তবু আমার স্মৃতির পর্দায় যাকে ধরে রেখেছি এ সেই জুন-তু নয়। আকৃতিতে সে আগের চেয়ে দ্বিগুন বেড়ে গেছে। তার গোলগাল মুখখানা এক সময় কেমন গোলাপী দেখতে ছিল, আর এখন কেমন পানসে লাগল, সমস্ত মুখ জুড়ে রেখা আর কুঞ্চনের ছড়াছড়ি। তার চোখদুটিও ঠিক বাপের চোখের মতোঃ ফোলা ফোলা রক্তবর্ণ, যেমনটি দেখা যায় সমুদ্রের ধারে কৃষকদের। তার মাথায় দুমড়ানো একটা ফেলটের টুপি, গায়ে হালকা মতন জ্যাকেট—তাই মাথা থেকে পা পর্যন্ত থর থর করে শীতে কাঁপছিল। একটা কাগজের বাণ্ডিল আর একটা বাঁশের নল সে বয়ে এনেছিল, হাতদুটো ঠিক সেরকম মোটাসোটা টুসটুসে ছিল না, যেমনি আগে দেখেছিলাম—যেমন রুক্ষ খসখসে, পাইন গাছের বাকলা যেমন, ঠিক তেমনি।

এমন খুশী হয়েছিলাম যে কীকরে নিজেকে প্রকাশ করব বুঝে উঠছিলাম না, কেবল বলতে লাগলাম ঃ

—ওহ্ ! জুন-তু···তুমি···?

এরপর এত বেশী কথা এসে আমার ভেতর ভিড় করছিল যে একের পর এক পংক্তির মালার আকারে বেরিয়ে আসছিল, কত কিছু—ঐ বনমোরগ, উড়ুক্কু মাছ, সমুদ্রের শামুক ঝিনুক শঙ্খ-কড়ি, ঝা—। কিন্তু আমার জিব আটকে গেল, আমি যা কিছু ভাবছিলাম ভাষায় সেসব প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছিল না। সে দাঁড়িয়েছিল, মিশ্র আনন্দ এবং বিষাদ তার চোখে-মুখে ফুটে উঠছিল। তার ঠোঁট নড়ে উঠল কিন্তু কোনো কথা বেরুল না। অবশেষে একটা শ্রদ্ধাবনত ভাব এনে সে পরিষ্কার বলল :

—মাস্টার !···

কেমন একটা কম্পন আমার শিরার ভেতর দিয়ে শির-শিরিয়ে গেল, কারণ আমি তখনই অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বুঝতে পারলাম আমাদের উভয়ের মাঝখানে কত বিশাল একটা প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তবু আমি কোনো কিছু বলতে পারলাম না।

সে পেছনে মুখ ঘুরিয়ে ডাকল :

—সুই-সেঙ, মালিককে প্রণাম করো, বলেই তার পেছনে যে ছেলেটি লুকিয়েছিল তাকে হাত ধরে নিয়ে এল সামনে—কুড়ি বছর আগে জুন-তু যা ছিল এ ঠিক তাই, কেবল একটু বেশি ফ্যাকাশে, একটু বেশি, রোগা আর গলায় রূপার মালা ছিল না।

—এটি আমার পাঁচ নম্বর। সে বলল, মানুষের মধ্যে আসতে অভ্যস্ত নয়, তাই ভীষণ লাজুক।

হুঙ্-এর'কে সঙ্গে নিয়ে মা তখন নিচে নেমে এসেছিলেন, বোধ হয় আমাদের গলার আওয়াজ শুনে।

—কিছুদিন আগে আপনার চিঠি পেয়েছিলাম মাদাম। জুন-তু বলল।—মাস্টার আসছে শুনে খুব খুশী হয়েছিলাম——

—কিন্তু তুমি এত ভদ্রতা দেখাচ্ছ কেন, বল তো ? তোমরা দুজন একসঙ্গে খেলতে না ছেলেবেলায় ? হাসতে হাসতে মা বললেন। আগের মতো ভাই সুন বলেই তুমি একে ডাকবে, বুঝলে ?

—না, না, ও কি বলছেন—, বেয়াদপি হবে—হাজার হোক মনিব তো। তখন শিশু ছিলাম, বুঝতাম না। বলতে বলতে এসে প্রণাম করতে জুন-তু পুত্র সুই-সেঙকে ইশারায় ডাকল। কিন্তু ছেলেটি লাজুক, বাপের পেছনে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

—এই বুঝি তোমার ছেলে সুই-সেঙ্ ? তোমার পাঁচ নম্বর তাই বলছিলে না ? মা জিজ্ঞেস করলেন। কেউ কাউকে চিনি না, ওর লজ্জা পাচ্ছে বলে দোষ দিতে পার না ওকে। হুঙ-এর একে সঙ্গে নিয়ে খেলা করুকগে বরং। এই কথা শুনেই হুঙ-এর সুই-সেঙকে ডেকে নিল। বিনা আপত্তিতে সে

গেল তার সঙ্গে। মা জুন-তুকে বসতে বললেন, কিছুক্ষণ ইতস্তত করবার পর বসল সে। লম্বা নলটা টেবিলের গায় হেলান দিয়ে রেখে কাগজের পোঁটলাটা দিল আমার হাতে, বলল: শীতকালে হাতে করে আনবার মতো কিছু থাকে না। এই ক'টা বিন-কড়াই বাড়িতেই শুকিয়ে ছিলাম আমার বেয়াদপি মাপ করে যদি—

তার দিন কেমন চলছে জানতে চাইলে সে কেবল মাথা নাড়ল। পরে বলল: খুব খারাপ। আমার ছয় নম্বরটিও কিছু কিছু কাজ করে, তবু সবার মুখে জোটে না—কোনো রকম নিরাপত্তা নেই—সবাই এসে টাকা চায়, কোনো নিয়ম, কোনো কানুন, কিছু নেই—আর এদিকে আবার সবসময় মাঠে ভালো ফসল ওঠে না। ফসল ফলাবেন, কিন্তু যখন বাজারে যাবেন বেচতে, শুনবেন এ দিতে হবে, ও দিতে হবে এমনি সব ট্যাক্স দিয়েই সব শেষ, আবার যদি ধরে রাখেন না বেচে সব পচবে গলবে—

কথার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা নড়ছিল। যদিও তার সারা মুখ ভরে বলিরেখার কুঞ্চন। তার একটাও কাঁপে না। যেন সে একটা পাথরের মূর্তি। ভিতরে প্রচণ্ড তিক্ততা জমে উঠেছিল সত্যি কিন্তু প্রকাশ করতে পারছিল না। একটু বিরতির পর তার পাইপটা তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে নীরবে ধূমপান করতে লাগল।

তার সঙ্গে কথাবার্তায় মা বুঝতে পারলেন বাড়িতে অনেক কাজ ফেলে এসেছে, তাই তাড়াতাড়ি পরদিনই ফিরতে হবে তাকে, তখনও তার দুপুরের খাওয়া হয়নি, রান্না ঘরে গিয়ে দুটো ভাত ফুটিয়ে নিতে মা বললেন তাকে।

সে চলে যাওয়ার পর আমি এবং মা দুজনে তার কষ্টময় জীবনের কথা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম; এতগুলো ছেলেমেয়ে তারপর আছে দুর্ভিক্ষের তাড়না, ট্যাক্স, সৈনিকের উৎপাত, ডাকাতের উপদ্রব, সরকারী কর্মচারী আর জমিদারের অত্যাচার, সর্বকিছু মিলে তাকে চুষে নিয়ে ঝাঁঝড়া করে ফেলেছে। মা বললেন, আমরা যেসব জিনিস নিয়ে যাব না সেগুলো একে দিয়ে গেলেই ভালো হবে, ও দেখে নিক কোনটা ওর চাই। আমি স্বীকৃত হয়েছিলাম।

তাই সেদিনই বিকেল বেলায় জুন-তু তার পছন্দের জিনিস বেছে রাখল। দুটো লম্বা টেবিল, গোটা চারেক চেয়ার, একটা ধুনচি, কয়েকটা মোমবাতি আর একটা ওজন পাল্লা। উনানের জমানো ছাইগুলিও সে নেবে বলল। (আমাদের ঐ অঞ্চলে খড়ের জ্বালানি করা হতো, আর ঐ খড়-পোড়া-ছাই মাঠে দেবার সারের কাজে লাগত) আমরা চলে গেলে পর একদিন এসে নৌকো করে নিয়ে যাবে এগুলো।

ঐ রাত্রেও আমরা অনেক কিছু আলোচনা করলাম, অবশ্য বিশেষ জরুরী কিছু না, পরদিন ভোর বেলায় সুই-সেঙকে নিয়ে সে রওনা হয়ে গেল।

তারও নয়দিন পর আমাদেরও যাবার পালা এল। সেদিন সকালেই জুন-তু আবার এল। সুই-সেঙ আসেনি এবার—শুধু ছোট্ট একটা পাঁচ বছরের মেয়েকে সঙ্গে এনেছে নৌকোটার দিকে নজর রাখবার জন্য। সারাদিন আমরা খুবই ব্যস্ত ছিলাম কথা বলবার সময় ছিল না। তাছাড়া আরো অনেকেই সেদিন দেখা করতে এসেছিলেন, কেউ এসেছিলেন আমাদের বিদায় জানাতে, কেউ এসেছিলেন জিনিস-পত্র নিতে আবার কেউ এসেছিলেন উভয় কাজে। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আমরা নৌকোয় রওনা হলাম—সেইটুকু সময়ের মধ্যেই বাড়ির সবকিছু পুরনো বা ভাঙা-চোরা, বড় বা ছোট, ভালো বা মন্দ, সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

গোধূলির ছায়ায় আমরা যখন রওনা হলাম, তাকিয়ে দেখলাম দূরের নদীর দুই তীরে পাহাড়গুলির গায় নীল রঙ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

হুঙ-এর এবং আমি নৌকোর কেবিনের জানালার ধারে বসে দূরের অপসৃয়মান ঐসব অস্পষ্ট হয়ে আসা দৃশ্যগুলির দিকে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে রইলাম; হঠাৎ সে আমাকে প্রশ্ন করে বসল: কাকা, আমরা কবে আবার ফিরে আসব?

—ফিরে আসবে? রওনা হয়েই তুমি ভাবছ কবে ফিরে আসবে?

—সুই-সেঙ যে ওদের বাড়ি যেতে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। কেমন একটা উদ্বেগের ছায়ায় তার কোকিল কালো চোখদুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল। মা এবং আমি দুজনেই কেমন বিষন্ন হয়ে উঠেছিলাম, সেইসময় জুন-তুর প্রসঙ্গ আবার এসে পড়ল। মা বললেন বাঁধা-ছাঁদা শুরু করবার দিন থেকেই দইয়ের দোকানের মিসেস ইয়াঙ প্রতিদিন আসত. রওনা হবার ঠিক আগের দিন ছাই-গাদার ভেতর থেকে কয়টা থালা-বাটি খুঁজে বার করল, কিছুক্ষণ আলোচনার পরও সে জোর দিয়ে বলতে লাগল, এ আর কিছু নয়, জুন-তু'র কাজ, ছাইগুলি নেবার সময় এগুলিও সে নিতে পারবে। এই আবিষ্কারে মিসেস ইয়াঙ খুব খুশী, কুকুর-তাড়ুয়াটা তুলে নিয়ে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল (আমাদের অঞ্চলে মুরগী পালকেরা কুকুর-তাড়ুয়া রাখত। এটা একটা কাঠের বাক্স, ভেতরে খাবার দেওয়া থাকত, মুরগী গলা লম্বা করে ওর ভেতর থেকে খাবার খেতে পারত, কিন্তু কুকুরগুলি মুরগী ধরতে না পেরে কেবল কটমট করে তাকিয়ে থাকত ঐদিকে, মুরগী ধরতে পারত না।) তার ঐ ছোট ছোট পা নিয়ে সে যে কী করে এমন দৌড়ে পালিয়ে গেল এটাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেছিলাম।

আমাদের পুরনো বাড়ি ধীরে ধীরে দূর থেকে আরও দূরে সরে যেতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পুরনো বাড়িকে ঘিরে যেসব নদী আর পাহাড়, তারাও একের পর এক দূর থেকে দূরান্তে মিলিয়ে যেতে লাগল কিন্তু আমার মনে কোনো ক্ষোভ এল না। আমি শুধু অনুভব করছিলাম, একটা বিরাট উঁচু অদৃশ্য প্রাচীর আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, আপন জনের কাছ থেকে আমাকে

দূরে সরিয়ে নিয়ে। এইটাই আমার মনকে ক্রমশঃ ভারাক্রান্ত করে তুলছিল। রুপোর মালা গলায় তরমুজ ক্ষেতের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকা ঐ ছেলেটির ছবি সেদিন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট ছিল আমার কাছে কিন্তু আজকে যেন অকস্মাৎ ঐ দুটি কেমন অস্পষ্ট হয়ে উঠল। আমার মনের বিষণ্ণতাকে আরো বাড়িয়ে দিল।

মা এবং হুঙ-এর ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আমিও শুয়ে পড়লাম। নৌকোর তলায় নদীর জলের কুলকুল ধ্বনি আমার কানে আসতে লাগল। বুঝতে পারলাম, আমি এগিয়ে চলেছি আমার পথে। আমার মনে হলো, যদিও আজ দেখছি আমার এবং জুন-তুর ভেতর এমনি একটা বিরাট ব্যবধান গড়ে উঠেছে, তবু বুঝি শিশুমনের অভিন্নতা এখনো বর্তমান। কারণ এই হুঙ-এর কি সুই-সেঙ'এর কথাই এখন ভাবছেনা? আমি বিশ্বাস করি আমাদের মতো তারা হবে না। তাদের ভেতর ব্যবধানের প্রাচীর তারা গড়ে তুলবে না। কিন্তু এও আমি চাইব না তারা আমার মতো পায়ে বেড়ি বেঁধে জীবন কাটিয়ে যাক, জুন-তুর মতো কাঁধে জোয়াল নিয়ে জীবন তাদের অসাড় হয়ে পড়ুক। নয়তো বা আর সবার মতো কেবলি ব্যর্থতায় তাদের সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাক। তাদের পেতে হবে নতুন জীবন। যে জীবনের স্বাদ পাইনি আমরা।

এমনি আশার সঞ্চার হঠাৎ আবার কেমন ভয় জাগিয়ে তুলল আমার মনে। সেদিন যখন জুন-তু আমাদের কাছে ধুনচি আর মোমবাতি কটা নিতে চেয়েছিল আমার মনে ভীষণ হাসি পেয়েছিল এই ভেবে যে, এখনো এই সব পূজো আচ্চায় বিশ্বাস আছে তার, এখনো মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি এই সব সংস্কার। অথচ যাকে আমি আশা বলে আখ্যা দিচ্ছি সেও তো আমারি হাতে গড়া পূজোর পুতুল, এ ছাড়া আর তো কিছু নয়! দুয়ে শুধু এইটুকু তফাৎ যে সে যা চেয়েছিল সেটা তার হাতের মুঠোয় আর আমি যা চেয়েছি তা সহজে পাওয়ার ও নাগালের বাইরে।

তন্দ্রার ঘোরে হঠাৎ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল ঘন সবুজে ঢাকা এক টুকরো সমুদ্রতট। আর মাথার উপরে গাঢ় নীল আকাশের গায়ে ঝুলছে গোলাকৃতি একটি সোনালী চাঁদ। আমি ভাবতে লাগলাম, আশা বলে কিছু আছে বলতে পারি না, নেই তাও তো বলা যায় না। এ যেন ধরিত্রীর বুকে অাঁকা পায়ে চলা পথেরই মতো। মানুষ চলে, তারপরই না সৃষ্টি হয় চলার পথ, কুমারী পৃথিবীর বুকের উপর।

My old home
January–1921

গত কুড়ি বৎসরের ভেতর আমি মাত্র দু'বার চীনদেশীয় অপেরা দেখেছি। প্রথম দশ বছরে আমি কোনোদিন যাইনি, যাবার ইচ্ছাও হয়নি, সুযোগও ঘটেনি। যে দু'বার গেছি তাও গত দশ বছরের মধ্যে কিন্তু প্রতিবারই হতাশ হয়ে ফিরেছি, আমার ভালো লাগেনি, কিছুই আমি পাইনি।

প্রথমবার ১৯১২ সনে, তখন আমি পিকিং-এ নবাগত। আমার এক বন্ধু বলেছিল পিকিং শহরেই নাকি সব চেয়ে সেরা অপেরা দেখা যায়, এ অভিজ্ঞতা থেকে যেন বঞ্চিত না করি নিজেকে। ভাবলাম অপেরা দেখতে খুবই ভালো লাগবে নিশ্চয়, বিশেষকরে পিকিং-এ। তাই বেশ উঁচু আশা মনে নিয়ে একদিন ছুটলাম একটা থিয়েটার হলের দিকে। সেটার নাম অবশ্য আমি ভুলে গেছি। অনুষ্ঠান তখন শুরু হয়ে গেছে। বাইরে থেকেই আমি ঢাকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। ঠেলেঠুলে ভেতরে ঢুকতেই উজ্জ্বল রঙ চোখ ঝলসে দিল এবং প্রেক্ষাগৃহের ভেতরে অনেক মাথা দেখতে পেলাম। সারাটা হল ঘরে একবার চোখ বুলিয়ে দেখলাম, মাঝখানে কয়েকটা আসন খালি ছিল কিন্তু বসবার জন্য সেখানে গিয়ে হাজির হতেই কে যেন কী বলে উঠল। আমার কানের ভেতর চারদিক থেকে এমন বন্‌বন্ ধুপ্‌ধাপ্ আওয়াজ আসছিল যে অতি কষ্টে বুঝতে পারলাম তার কথা। সে বলছিল : দুঃখিত, এই আসনে লোক আছে।

আমরা পেছনে ফিরে এলাম কিন্তু তেল চুকচুকে শিখাওয়ালা এক ভদ্রলোক এসে পাশের দিকে নিয়ে গিয়ে একটা খালি আসন দেখিয়ে দিল। আমার উরুর তিন ভাগের একভাগ চওড়া হবে বসবার ঐ বেঞ্চিটা কিন্তু ঠ্যাংগুলি আবার আমার ঠ্যাং-এর চেয়েও দ্বিগুণ লম্বা। ওটার ওপর চড়ে বসবার সাহস আমার হলো না। তারপর এটা দেখে মানুষকে শাস্তি দেবার একটা যন্ত্র-বিশেষের কথা আমার মনে পড়ে গেল, এবং একটা অজানিত ভয়ের তাড়নায় আমি তক্ষুনি ছুটে পালিয়ে এলাম সেখান থেকে।

কিছুটা দূরে গিয়েছি, শুনতে পেলাম বন্ধুর কণ্ঠস্বর, ডেকে বলছে : আরে, কী হলো ?

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম সে আমার পিছু নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। খুবই অবাক হয়েছে মনে হলো।

—কিছু না বলে অমন করে ছুটছ কেন ? সে শুধলো।

—দুঃখিত, আমি বললাম—আমার কানে এমন ভীষণ ধুপ্‌ধাপ্ আওয়াজ হচ্ছে যে তোমার কোনো কথাই শুনতে পাচ্ছি না।

এই ঘটনার কথা পরে যখনই আমার মনে পড়েছে আমি খুব অবাক হয়েছি,

এবং মনে হয়েছে বোধহয় সেদিনকার অপেরা অনুষ্ঠান নিতান্তই নিম্নশ্রেণীর হয়েছিল অথবা ঐ থিয়েটারে গিয়ে দেখাটাই বোধহয় আমার ভালো লাগেনি।

দ্বিতীয় প্রচেষ্টা কবে করেছিলাম আমার ঠিক মনে নেই কিন্তু এটা মনে আছে সেবার হুপ-এর বন্যাক্লিষ্ট মানুষের ত্রাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং পিকিং অপেরার তদানিন্তন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা তান সিন-পেই তখনো জীবিত। মাত্র দুই ডলার মূল্যের একটা টিকিট কিনে ত্রাণ তহবিলে সাহায্য করতে হবে, আর প্রথম সারির কোনো থিয়েটারে গিয়ে তান সিন-পেই'র মতো বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীদের অভিনয়সমৃদ্ধ অপেরাও দেখা হবে। প্রধানত সংগ্রহককে সন্তুষ্ট করবার জন্যই আমি একখানা টিকিট কিনেছিলাম কিন্তু কেনার পর একজন ব্যস্তবাগীশ ব্যক্তি আমাকে বিশেষ করে বুঝিয়ে, দিলেন তান সিন-পেইর অভিনয় কেন দেখব আমি। তাইতে কয়েক বছর আগেকার অভিজ্ঞতার কথা আমি ভুলে গেলাম এবং থিয়েটারে গেলাম, তাছাড়া এত দাম দিয়ে টিকিট কিনে সেটার সদ্ব্যবহার না করে আমি ঠিক স্বস্তি বোধ করছিলাম না। শুনলাম তান সিন-পেই সন্ধ্যার শেষদিকে মঞ্চে অবতীর্ণ হন, আর তাছাড়া এক নম্বর থিয়েটার খুবই আধুনিক, আসনে বসতে গিয়ে হুটোপাটি করতে হয় না। এইতেই আমি আশ্বস্ত বোধ করলাম এবং রওনা হতে সেই নয়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। পৌঁছে আমি বিস্মিত হয়ে দেখলাম হাউস ফুল। একটু দাঁড়াবার ঠাঁই পর্যন্ত ছিল না। তাই পেছনদিককার ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে একজন অভিনেতা এক বৃদ্ধা মহিলার পার্ট বলছে দেখলাম। মুখের দুদিকে দুটো কাগজের পলতে জ্বলছে। অনেক চিন্তা করে ঠিক করলাম এ নিশ্চয় বুদ্ধের প্রধান শিষ্য। মৌদ্গল্যায়ণের মা। অভিনেতাকে চিনতে না পেরে, আমার পাশের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, পিকিং অপেরার আর একজন বিখ্যাত অভিনেতা, এর নাম কুঙ য়ুন-ফু। কথাটা বলতে কেমন একটা বাঁকা দৃষ্টিও নিক্ষেপ করল ভদ্রলোক। আমার এই অজ্ঞতার জন্য লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলাম। মনে মনে ঠিক করলাম, আর কোনো কারণেই কাউকে প্রশ্ন করব না। তারপর দেখলাম নায়িকা এবং তার সহচরীর সঙ্গীতাংশ, তারপর এল একজন বৃদ্ধ এবং আরো কয়েকটি চরিত্র, যেগুলোকে আমি চিনতে পারিনি। তারপর দেখলাম একদল লোকের এলোপাথাড়ি লড়াই, তারপর দুতিন জন— নয়টা থেকে দশটা, দশটা থেকে এগারোটা, এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটা, সাড়ে এগারোটা থেকে বারোটা বেজে চলল কিন্তু তান সিন-পেইকে দেখলাম না।

জীবনে এত ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করিনি কোনোদিন কোনো কিছুর জন্য। কিন্তু আমার পাশের মোটা ভদ্রলোকটির অনবরত নিঃশ্বাস ফেলবার ফোঁস ফোঁস আওয়াজ, মঞ্চের উপর ঢং ঢং এবং টিং টিং শব্দ, ঢাকের এবং ঘন্টা-

ধ্বনি, উজ্জ্বল আলোর চোখ ঝলসানি এবং রাতের গভীরতায় হঠাৎ আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, এই স্থান আমার জন্য নয়।
যেন যান্ত্রিকভাবেই আমি ঘুরে দাঁড়ালাম এবং সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে বেরিয়ে আসবার রাস্তা করতে চেষ্টা করলাম। বুঝতে পারলাম, আমার পেছনে ছেড়ে আসা শূন্যস্থানটা, সেই মোটা ভদ্রলোকটি তাঁর ডান দিকটা কিছুটা সম্প্রসারিত করে আমার শূন্য জায়গাটুকু দখল করে নিলেন। পেছনে ফেরবার পথ বন্ধ হওয়ায় স্বভাবতই দরজার বাইরে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত ঠেলে ঠেলে পথ করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না। থিয়েটার দেখতে আসা লোকদের জন্য অপেক্ষমান রিকশাগুলি ছাড়া বাইরের আর কোনো লোক চোখে পড়ল না কিন্তু জনাকয়েক লোক তখনো গেটের কাছে দাঁড়িয়ে প্রোগ্রাম দেখছিল আর একদল যদিও কিছু দেখছিল না তবু মনে হয় থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আসা মেয়েদের দেখবার জন্যই অপেক্ষা করছিল। তান সিন-পেইর কোনো কিছুই নজরে পড়ল না…
রাতের হাওয়া তখন এত তীব্রগতিতে বইছিল যেন আমার দেহ ভেদ করছে। পিকিং'এ এই প্রথম আমি এত সুন্দর হাওয়া পেলাম।
সেই রাতেই আমি চীনদেশের অপেরাকে নমস্কার করে বিদায় জানালাম। এ সম্বন্ধে আর চিন্তাও করিনি কখনো, এবং কখনো ঘটনাচক্রে কোনো থিয়েটার হলের পাশ দিয়ে গেলেও কোনো খেয়ালই হয়নি, কেননা আত্মিকভাবে তখন আমাদের ভেতর বহু যোজন ফারাক তৈরি হয়ে গেছে।
কয়েকদিন আগে আমি একখানা জাপানী বই পড়েছিলাম—দুর্ভাগ্যবশত বইটির নাম এবং লেখকের নাম ভুলে গেছি। তবে মনে আছে, ওটা চীনদেশীয় অপেরা সম্বন্ধে। বইটার একটা পরিচ্ছেদে লেখক এই কথাই বলতে চেয়েছেন, চীনদেশীয় অপেরায় ঢাকের আওয়াজ ঘণ্টার আওয়াজ এত বেশী এবং চিৎকার এবং লম্ফ-ঝম্প, যে দর্শকদের মাথা ঘুরে যায়। কোনো থিয়েটার হলে এর প্রয়োগ দুরূহ। তবে যদি মুক্ত আকাশের তলে এর অভিনয় হয় এবং দূরত্ব রেখে দেখা যায় তাহলেই শুধু এর সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। আমার মনের ভেতর যে কথাটা দানা বেঁধেছিল এটাকে তারই সঠিক ভাষায় প্রকাশ বলে আমি অনুভব করলাম। কারণ আমার পরিষ্কার মনে আছে এ দেশের সত্যিকার অপেরা আমি একবার দেখেছি। ওরই প্রভাবে হয়তো পিকিং এসে আমি দু-দু'বার থিয়েটারে গিয়েছিলাম। সত্যি খুব দুঃখের বিষয়. যেকোনো কারণেই হোক, ঐ বইটার নাম আমি একদম ভুলে গেছি।
সেই সত্যিকারের অপেরা আমি দেখেছিলাম, সেই কোন দূর—দূর অতীতে। তখন আমার বয়স হয়তো এগারো কি বারোর বেশি ছিল না। সেসময় লুচেনে, যেখানে আমরা থাকতাম, একটা প্রথা ছিল যে, যেসব বিবাহিতা মেয়েরা তখনো সংসারের ভার পায়নি তাদের গ্রীষ্মকালটা বাপের বাড়ি গিয়ে

কাটাতে হতো। যদিও আমার বাবার মা, ঠাকুমা যথেষ্ট শক্ত সামর্থ ছিলেন তবু আমার মাকে বেশ কিছু সংসারের কাজ করতে হতো। গ্রীষ্মকালে মা বেশীদিন বাপের বাড়ি থাকতে পারতেন না। পূর্বপুরুষদের সমাধিস্থান দেখে এসে আর মাত্র দিন কয়েক থাকতেন। আমি সবসময় মায়ের সঙ্গে যেতাম। সেই গ্রামের নাম ছিল পিঙ চাও, সমুদ্রের ধার থেকে বেশী দূরে নয়। নদীর পারে অবস্থিত একটি দূরাতিক্রম্য অতি নগন্য ছোট্ট গ্রাম—গোটা তিরিশেক পরিবারের। বাস, কিছু চাষী কিছু জেলে আর মাত্র একটি মুদিখানা দোকান। আমার চোখে কিন্তু সেই গ্রাম স্বর্গ বলে লাগত, কেননা আমি সেখানে কেবল একজন মান্য অতিথি বলেই গণ্য হতাম না, আমি সেখানে 'বুক অফ্ সঙ' বইখানাও পড়বার সুযোগ পেতাম।

অনেক ছোটো ছোটো ছেলে সেখানে আমার খেলার সাথী ছিল। আমার মতো এত দূর থেকে আসা একজন সম্মানিত অতিথির সঙ্গে কাজ ফেলেও খেলবার অনুমতি তারা পেত। ঐরকম নগন্য গ্রামে এক পরিবারের অতিথি গ্রামসুদ্ধ সবার অতিথি বলেই গণ্য হতো। আমরা সবাই প্রায় একই বয়সের ছিলাম কিন্তু কে বয়োজ্যেষ্ঠ এটা ঠিক করতে গেলে অনেকেই আমার মামা অথবা দাদামশায় হোতো কারণ গ্রামের সবাই একই পদবিধারী ও একই বংশের সন্তান। আমাদের ভেতর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল এবং যদি কখনো ঝগড়া লাগতো আমি হয়তো আমার দাদামশাইকে হঠাৎ মেরে বসতাম, তখন ছেলেরা গ্রামের বয়জ্যেষ্ঠরা একে বড়োর প্রতি অসম্মান বলে মনে করত না। এদের মধ্যে প্রতি একশত জনের ভেতর নব্বই জনই পড়তে বা লিখতে জানত না। দিনের বেশী সময়ই আমরা কেঁচো খুঁড়ে বড়শিতে টোপ গেঁথে চিংড়ি মাছ ধরবার জন্য ছিপ ফেলে নদীর ধারে বসে থাকতাম। এই চিংড়ি মাছ সবচেয়ে বোকা জলজ প্রাণী। স্বেচ্ছায় ওরা দাঁড়া দিয়ে বড়শি ধরে মুখে পুরে দেয়। সুতরাং কয়েক ঘণ্টার ভেতরই আমরা হাঁড়ি-ভরতি মাছ ধরতাম। সবগুলি মাছই ওরা আমাকে দিয়ে দিত। আর একটা কাজ ছিল আমাদের, বাড়ির গোরু—মোষগুলিকে মাঠে নিয়ে যেতাম। হয়তো এরা উচ্চশ্রেনীর প্রাণী বলেই এই ষাঁড় আর মহিষ জাতটা অচেনা লোককে আদৌ পছন্দ করে না, তাই আমাকে অবজ্ঞার চোখে দেখত এবং আমিও ভয়ে ওদের কাছে যেতে সাহস পেতাম না। দূর থেকে ওদের পেছন পেছন থাকতাম। ঐ সময়ে আমার ঐ ছোটো ছোটো বন্ধুরা, আমি ভাল কবিতা আবৃত্তি করতে পারতাম বলেও আমাকে বিশেষ পাত্তা দিত না, খাতির করত না। বরং আমাকে ওরকম করতে দেখলে ওরা সবাই মিলে হো হো করে হেসে উঠত।

যেজন্য আমি অতি আগ্রহে অপেক্ষা করতাম সেটা হলো চাওচুয়াঙ গিয়ে অপেরা দেখা। এই চাওচুয়াঙ মাইল দুই দূরের একটা মোটামুটি বড় গ্রাম। পিঙচুয়াও খুবই ছোটো গ্রাম বলে নিজেদের পক্ষে এককভাবে অপেরা

বন্দোবস্ত করা সম্ভব ছিল না। কাজেই প্রতি বছর চাওচ্‌য়াঙ-এ অপেরা ব্যবস্থা করবার জন্য কিছু চাঁদা দেওয়া হতো। প্রত্যেক বছরেই কেন অপেরা হতো সেটা জানবার জন্য সেসময় আমার কোনো কৌতূহল হতো না। এখন চিন্তা করে দেখছি হয়তো বসন্তের উৎসব অথবা গ্রামের বলিদান উৎসব উপলক্ষ করেই বিশেষকরে এই অপেরার ব্যবস্থা করা হতো।

সে বছর, যখন আমার এগারো বারো বছর বয়স তখন আমার দীর্ঘকালের অভিষ্ট দিনটি এল। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, সেদিন সকালে কোনো ভাড়া নৌকো পাওয়া গেল না। পিঙ্‌চিয়াও গ্রামে মাত্র একটা পাল খাটানো ভাড়াটে গহনার নৌকো ছিল। সকালে ছেড়ে যেতো আর বিকেলে ফিরে আসত। খুব বড়ো নৌকো। একা ভাড়া নেওয়া সম্ভব ছিল না। আবার অন্য নৌকোগুলি এতই ছোটো যে একেবারে অকেজো। পাশের গ্রামগুলিতে খোঁজ করতে পাঠানো হলো কিন্তু সব চেষ্টা নিষ্ফল—সব নৌকো ভাড়া হয়ে গিয়েছে। আমার দিদিমার মেজাজ বিগড়ে গেল। মামাতুত ভাইদের গালিগালাজ করতে লাগলেন, আগে থেকে নৌকোর ব্যবস্থা করে রাখেনি বলে। মা তাকে এই বলে বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন যে এইসব ছোটো ছোটো গ্রামের তুলনায় লুচেনের অপেরা অনেক ভালো। তাছাড়া প্রতিবছর অনেক বারই তো হয় সুতরাং আজকে গিয়ে কাজ নেই। কিন্তু হতাশ হয়ে আমি প্রায় কেঁদেই ফেলেছিলাম। মা আমাকেও বোঝাতে অনেক চেষ্টা করলেন—এরকম হৈচৈ করা আমার মোটেই উচিত নয়, দিদিমার মেজাজ আরো খারাপ হয়ে যাবে, কষ্ট পাবেন; তারপর বাইরের লোকের সঙ্গে যাওয়া ঠিক হবেনা, কেননা দিদিমা চিন্তা করবেন।

এক কথায়, সব পণ্ড হয়ে গেল। দুপুরে খাওয়ার পর, যখন বন্ধুরা সব এদিক ওদিক চলে গেল। অপেরাও বুঝি শুরু হয়ে গেছে ততক্ষণ! কল্পনায় আমি যেন ঘন্টা আর ঢাকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম তাছাড়া বন্ধুরা অপেরা দেখতে দেখতে মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে সয়াবিনের দুধ খাচ্ছে এও যেন মানশ্চক্ষে দেখছিলাম।

সেদিন আমি চিংড়ি মাছ ধরিনি, বেশি খাইওনি। মায়ের মেজাজটাও খুব ভালো ছিল না কিন্তু তাঁর কিছু করবারও ছিল না। সন্ধ্যাবেলা খাওয়ার সময় দিদিমা আমার মনের অবস্থা অনুভব করতে পারলেন। বললেন ঃ আমার রাগ করা স্বাভাবিক, ওদের সবার আরো তৎপর হওয়া উচিত ছিল, অতিথির সঙ্গে এ ধরনের ব্যবহার এর আগে কেউ করেনি কখনো। খাওয়ার পর, যেসব ছেলেরা অপেরা দেখে তখন ফিরে এসেছিল, তারা সবাইকে ঘিরে ধরে কী দেখে এসেছে বলতে লাগল। একমাত্র আমি নীরব রইলাম; ওরা সবাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আমার জন্য দুঃখ প্রকাশ করল! হঠাৎ সুয়াঙ-সি বলে একটি ছেলে বলে উঠল ঃ ঐ যে, একটা বড় নৌকো ফিরে এসেছে না?

আরো ডজন খানেক ছেলে কথাটাকে লুফে নিল। ঐ নৌকোয় আমাকে নিয়ে যাবার জন্য সবাই লাফিয়ে উঠল। আমিও খুশী হলাম। কিন্তু দিদিমা সাহস পেলেন না। সবাই ছোট ছোট ছেলে, ঠিক নির্ভরযোগ্য নয়। মা বললেন ঃ বাড়ির বড়দের কালকে সকালে অনেক কাজ, কাজেই আমাদের সঙ্গে গিয়ে রাত জাগা তাদের মোটেই উচিত হবে না। আমাদের ভাগ্য যখন এমনি এক ক্ষীণ সুতোয় ঝুলছিল, সুয়াঙ-সি সমস্যার গোড়ায় জোর টান দিয়ে সোচ্চারে বলল ঃ আমি কথা দিচ্ছি, সব ঠিক থাকবে! বড় নৌকো, সুন-ভাই নিশ্চয় লাফালাফি করবে না, আর তাছাড়া আমরা তো সবাই সাঁতার জানি।

কথাটা সত্যি। সাঁতার জানতো না এমন একজনও ছিল না। তার মধ্যে দু-চার জন ছিল উঁচুদরের সাঁতারু।

দিদিমা এবং মা বিশ্বাস করলেন এবং আশ্বস্ত হলেন, আর কোনো আপত্তি তুললেন না। দুজনই কেবল একটু হাসলেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই আমরা ছুটে বেরিয়ে পড়লাম।

আমার ভারাক্রান্ত মন আবার হালকা হয়ে গেল। মনে হলো যেন, আমি হাওয়ায় উড়ছি। যখন আমরা বাইরে এলাম, আমি চাঁদের আলোয় দেখলাম পুলের ধারে একটা নৌকো বাঁধা। আমরা লাফিয়ে নৌকোয় উঠলাম, সুয়াঙ-সি সামনে লগা নিল এবং আহ্-ফা নিল পিছন দিককার লগা; ছোটো ছোটো ছেলেরা আমার সঙ্গে নৌকোর মাঝখানে বসল। বড় ছেলেরা হাল ধরতে গেল। —সাবধানে যেও কিন্তু! মায়ের মুখ থেকে ওকথা বেরুতে না বেরুতেই নৌকো তখন ছুটেছে। পুলের কাছ থেকে সরে এসে কয়েক ফুট পিছিয়ে এলাম আমরা তারপর তীরের গতিতে ছুটলাম পুলের তলা দিয়ে। দুটো দাঁড় ফেলা হলো, দুজন করে ছেলে বসল এক একটা দাঁড়ের কাছে, প্রতি তিন মাইলের পর এক-একজন হাত বদলাবে। জলের কলকলের সঙ্গে আমাদের কলকল, হাসি আর চিৎকার এক হয়ে মিশে গেল। আমরা যতই চাও চুয়াঙের দিকে এগুতে লাগলাম। দেখলাম নদীর দুইধারে ডান আর বাঁয়ে বিন আর গমের সবুজ ক্ষেত।

নদীর জলের উপর কুয়াশার আবরণ। বিন গম আর নদীর জলের গাছ-গাছড়ার গন্ধ এসে নাকে লাগছে। কুয়াশার আবরণ ভেদ করে অস্পষ্ট চাঁদের আলো চোখে ভাসছে। ঐ দূরে কোনো উল্লম্ফীত লৌহদানবের উঁচুনিচু পিঠের মতো ধূসর পাহাড়গুলি আমাদের নৌকোর পাশ দিয়ে যেন ছুটছিল দ্রুতবেগে। তবু আমার মনে হচ্ছিল আমাদের গতি যেন খুবই মন্থর। বড় বাহকেরা যখন চার বার হাত বদলেছে তখন মনে হলো যেন চাওচুয়াঙের অস্পষ্ট রেখা দেখা যায় ঐ দূরে আর সঙ্গীতের সুর যেন ভেসে আসে দূর থেকে। কিছু আলোও দেখা গেল। আমরা ধরে নিলাম এগুলো অভিনয়

মঞ্চের আলো, যদি জেলে নৌকোর আলো না হয়।
আমরা বোধহয় বাঁশীর সুর শুনছিলাম। বাঁশীর সুর একবার উঁচু পর্দায় একবার নিচু পর্দায় চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে মনে প্রশান্তির ছোঁয়া লাগিয়ে যেন স্বপ্নের ঘোরে বিভোর করে আনছিল। এমনি অনুভূতিতে ডুব দিয়েছিলাম যেন বিন গম আর বুনো ঘাসের গন্ধে ভার হয়ে ওঠা বাতাসের কোলে ভাসতে ভাসতে আমি কোনো দূরান্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছিলাম।
দূরে দেখা আলোর সন্নিকটে এসে বুঝলাম, এগুলো জেলে নৌকোর আলো এবং আমি বুঝতে পারলাম চাওচুয়াঙের দিকে আদৌ আমার দৃষ্টি ছিল না। আমাদের ঠিক সামনে একটা পাইন বন। গত বছর এখানে খেলা করেছিলাম। বন পেরিয়ে নদীর একটা বাঁক ঘুরে নৌকো একটা খাঁড়িতে পড়ল। তখন চাওচুয়াঙ সত্যি সত্যি আমাদের সামনে ভেসে উঠল।
গ্রামের বাইরে নদীর ধারে একটা ফাঁকা জমির উপর নির্মিত অভিনয় মঞ্চটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দূরের চাঁদের আলোয় কিছুটা ঝাপসা পরিবেশ ছেড়ে আপন রূপে যেন উদ্ভাসিত। মনে হলো যেন ছবিতে দেখা পরীর দেশ জীবন্তরূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে আমাদের সামনে। নৌকো তখন ছুটছিল বেশ দ্রুতগতিতে, ধীরে ধীরে মঞ্চের উপর মানুষের মূর্তিও স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। দেখছিলাম উজ্জ্বল আলোর চুমকি আর মঞ্চের অদূরে প্রবাহিত নদীর বুকে নৌকো, আর সব বুঝি কালো স্রোতের একটা অবিচ্ছিন্ন ধারা।
—মঞ্চের কাছে কোনো জায়গা নেই দেখছি, চলো দূর থেকে দাঁড়িয়েই আমরা দেখব আহ্‌ফা বলল।
নৌকোর গতি ততক্ষণ মন্থর হয়ে এসেছিল, এবং একটু পরেই আমরা পৌঁছুলাম আমাদের গন্তব্যস্থানে। দেখলাম, সত্যি ঐ মঞ্চের কাছে ঘেঁসা দুষ্কর। মঞ্চ থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে আমাদের নৌকো বাঁধতে হলো। আমরা দুঃখ করিনি, কারণ সাধারণ কালো কালো ছোটো ছোটো ডিঙ্গিগুলির সঙ্গে আমাদের নৌকো মিশে যাবে এটা আমরা চাইনি—আর তাছাড়া কোনো খালি জায়গাও ছিল না—
তাড়াতাড়ি করে আমরা যখন নৌকো নোঙর করলাম, তখন মঞ্চের উপর দেখলাম, লম্বা কালো দাড়িওয়ালা একটা লোক, তার পিঠের সঙ্গে গোটা চারেক পতাকা বেঁধে দেওয়া। হাতে বর্শা নিয়ে সে একদল নিরস্ত্র লোকের সঙ্গে লড়াই করছিল। সুয়াঙ-সি বলল : ও লোকটা নাকি একজন বিখ্যাত দড়াবাজিকর, একসঙ্গে একটার পর একটা চুরাশিবার ডিগবাজি খেতে পারে। আজকে সকালে সে নিজেই নাকি শুনেছে।
আমরা সবাই নৌকোর গলুইর ধারে এসে ভিড় করলাম ঐ খেলা দেখবার জন্য কিন্তু ঐ বাজিকর তখন কোনো ডিগবাজি খেলবে না। নিরস্ত্র লোকদের কেউ কেউ একআধবার ডিগবাজি খেয়েই মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

তারপর এল একটি মেয়ে, সে গান গাইতে লাগল গলা ছেড়ে।
—সন্ধ্যাবেলায় লোকের তেমন ভিড় নেই। সুয়াঙ-সি বলল : সেইজন্যেই বাজিকর বোধহয় গা করছে না। বেশী দর্শক না থাকলে খেলা জমে না। এটা সাধারণ কথা সন্দেহ নেই, তখন সত্যি সত্যি প্রচুর দর্শক ছিল না। গ্রামের লোকদের কাজ থাকে সকাল বেলা, বেশী রাত তারা জাগতে পারে না, তাই সবাই বাড়ি ফিরছে ঘুমুবার জন্যে। চাওচুয়াঙ বা পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে কিছু লোক হয়তো ছিল তখনো। স্থানীয় বড়লোকদের পরিবারের লোকেরা তাদের নৌকোয় বসে, অপেরা দেখার তেমন আগ্রহ ছিল না কারও। অধিকাংশ লোক গেছে মঞ্চের তলায় বসে কেক খাবে বলে বা তরমুজ খাবে বলে। ওদের আর দর্শক বলবে কে।
সত্যি বলতে কি ঐসব ডিগবাজি খেলা দেখার আমার আদৌ কোনো আগ্রহ ছিল না। আমি বিশেষ করে দেখতে চেয়েছিলাম শ্বেতবস্ত্রে জড়ানো নাগরাজের বিদেহী আত্মার মূর্তি। মাথার উপর দুই হাত দিয়ে ধরে থাকা কাষ্ঠদণ্ডে সর্পমুণ্ড। আর দ্বিতীয়ত দেখতে চেয়েছিলাম, পীতাবরণযুক্ত লম্ফনোন্মুখ ব্যাঘ্র। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম কিন্তু দুটোর একটিরও দর্শন মিলল না। মেয়েটি চলে যাওয়ার পর এল যুবকের পার্ট বলতে বলতে এক বৃদ্ধ। আমার বিরক্তি ধরে গেল। কুয়েই-শেঙকে একপাত্র সয়াবিনের দুধ কিনে আনতে বললাম। একটু পরেই ফিরে এসে বলল : দুধ নেই। ঐ কানে-খাটো লোকটা যে দুধ বেচত সে চলে গেছে অনেকক্ষণ। দিনের বেলায় ছিল, দু এক পাত্র আমিও খেয়েছিলাম তখন। দাঁড়াও, একপাত্র খাবার জল এনে দিচ্ছি তোমাকে।
আমি জল খাই নি, শেষপর্যন্ত তেষ্টা সহ্য করে টিকে রইলাম। জানিনা কী দেখলাম কিন্তু মনে হলো, যেন অভিনেতাদের মুখের আকৃতি অদ্ভুত রূপ নিয়েছে। চেহারাগুলো ধীরে ধীরে কেমন অস্পষ্ট হয়ে উঠল যেন সমতলভূমির সঙ্গে মিশে একেবারে মিলিয়ে গেল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ঘুম উঠে গিয়েছিল, আর বড়োদের মধ্যে বক বক শুরু হলো। যখন একটা ভাঁড় মতো লোককে ধরে এনে মঞ্চের উপর একটা থামের সঙ্গে বেঁধে সপাং সপাং ঘোড়ার চাবুক মারতে শুরু করেছে, আমরা সবাই আবার আগ্রহে জেগে উঠলাম, হো হো করে হাসতে লাগলাম। আমার মতে সেদিন সন্ধ্যায় এইটাই ছিল সবচেয়ে সেরা দৃশ্য।
কিন্তু তখন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি আবার বেরিয়ে এল। এই চরিত্রটির অভিনয়ে কেমন যেন ভয় পেলাম আমি। বিশেষ করে যখন সে গান গাইতে বসে পড়েছিল। কেমন একটা কুৎসিত। সবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, একই আতঙ্কের ছাপ তাদেরও চোখে মুখে। সেই বৃদ্ধা মঞ্চের উপর কেবলি চলছে ফিরছে উঠছে আর বসে পড়ছে গান গাইতে গাইতে। অদ্ভুত বিশ্রী

লাগছিল, আমরা তবু ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম, হয়তো থামবে। কিন্তু নিষ্ফল আশা, একইভাবে চলল তার গান আর অভিনয়। নৌকোর ছেলেরা প্রায় সবাই তখন হাই তুলছে সুয়াঙ-সিও এইবার ধৈর্য হারিয়ে ফেলল। বলে উঠল ঃ এই বুড়ি নিশ্চয় সেই ভোর অবধি গেয়ে চলবে! চল এবার পালাই আমরা। আমরা সবাই তক্ষুনি রাজী হয়ে গেলাম। যে আগ্রহ নিয়ে এসেছিলাম ফিরবার জন্য ঠিক সেই একই আগ্রহে আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। কেউ কেউ নৌকোর হালের দিকে গেল, আর কেউ বা লগী হাতে নিয়ে নৌকোটাকে কিছুটা পিছিয়ে ঘুরিয়ে দিল সমুখের দিকে। ওই বুড়ি গাইয়ের মুণ্ডুপাত করতে করতে দাঁড় বেয়ে আমরা এগিয়ে চললাম পাইন বনের দিকে। চাঁদের অবস্থান দেখে বুঝতে পারলাম, আমরা বেশীক্ষণ থাকিনি। চাওচুয়াঙ ছেড়ে আসবার কিছুটা পরেই চাঁদের আলো খুব অদ্ভুতরকম উজ্জ্বল মনে হলো। পেছন ফিরে লণ্ঠনের আলোতে সাজানো মঞ্চের দিকে তাকিয়ে আসবার সময় যা দেখেছিলাম ঠিক তেমনি লাগল। পরীর দেশের আবছা আবছা আলো, গোলাপী কুয়াশায় ঢাকা। আবার তেমনি মিষ্টি বাঁশীর সুর আমাদের কানে এসে বাজতে লাগল। ভাবলাম মঞ্চের বুড়ি হয়তো তার গান বন্ধ করেছে কিন্তু আবার ফিরে যাবার কথা পাড়তে ভরসা পেলাম না। পাইন বন আমরা পেছনে রেখে এলাম। আমাদের নৌকো ছুটছিল তীরের গতিতে কিন্তু ততক্ষণ চারদিক থেকে এমন অন্ধকার জেঁকে বসল যে, আমরা ধরে নিলাম অনেক রাত হয়ে গেছে। অভিনয় আর অভিনেতাদের কথা আলোচনা করতে করতে দাঁড়ির দাঁড় পড়ছিল আপন গতিতে। নৌকোর গলুই-এর উপর ঘা খেয়ে জলের ছল-ছলাৎ আওয়াজ খুবই স্পষ্ট লাগছিল আমাদের কাছে। সফেন নদীর জলের উপর শিশুদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ভাসমান বিরাট শ্বেত মৎস্যের মতো মনে হচ্ছিল নৌকোটিকে। রাতভোর জেগে যেসব জেলেরা মাছ ধরছিল, হর্ষধ্বনির সঙ্গে আনন্দ জোগালো আমাদের!

পিঙচিয়াও থেকে আমরা তখনো প্রায় এক তৃতীয়াংশ মাইল দূরে। আমাদের নৌকোর গতি মন্থর হয়ে এল। এতক্ষণ দাঁড় টেনে ওরা সবাই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে আমাদের কিছু খাওয়া হয়নি। এইবার কুয়েই-সেঙ একটা জবর বুদ্ধি ঠাওরাল। মাঠের কড়াই তখন পেকেছে আর নৌকোতে জ্বালানির অভাব ছিল না। কড়াইগুলো সহজেই সেদ্ধ করে নেওয়া যায়। সবাই রাজী হলো। আমরা নৌকো নদীর ধারে নিয়ে গেলাম। অন্ধকারে ঢাকা মাঠগুলি রসালো কড়াইয়ে ভর্তি।

—এই, আহ্ ফা ঐতো ওটা তোমাদের ক্ষেত আর এটা লিউ-ইয়াদের। কোনটায় যাব বলো? বলেই সুয়াঙ-সি সবার আগে মাঠে নেমে পড়ল। নদীর পারে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল।

আমরা সবাই তীরে লাফিয়ে নামতেই আহ্‌ ফা বলল ঃ

—একটু দাঁড়াও, আমি একবার ঘুরে দেখেনি।

সে মাঠের এমাথা থেকে ওমাথা ঘুরে কড়াইগুলি পরীক্ষা করে বলল সবাইকে ডেকে ঃ এসো এদিকে, আমাদের মাঠ থেকেই নাও। কড়াইগুলো বেশ পুষ্ট হয়েছে।

সবাই হৈ হৈ করতে করতে আহ্‌-ফা'দের মাঠে নেমে পড়লাম। সবাই মুঠো মুঠো তুলে নিয়ে নৌকোয় ফিরে এলাম। সুয়াঙ-সি বুঝতে পারল সবাই যদি বেশি তুলে নিই, আর আহ-ফা-র বাড়ির লোকেরা টের পায় খুব মুশকিলে পড়তে হবে তাহলে। কাজেই প্রত্যেকে আরো এক এক মুঠো তুলবার জন্য লিউ-ইয়-দের জমিতেও গেলাম আমরা।

তারপর আবার আমাদের যাত্রা শুরু হলো ধীর মন্থর গতিতে বড় ছেলে কয়টি বসল দাঁড় নিয়ে। বাকি ছেলেদের কেউ লেগে গেল উনান ধরাতে, আর আমরা কজন বসলাম কড়াইয়ের দানা ছাড়াতে। কিছুক্ষণের মধ্যে এগুলো সেদ্ধ করা হয়ে গেল। আমরা সবাই গোল হয়ে খেতে বসলাম, আর নৌকো ধীরে ধীরে আপনমনে ভাসতে লাগল। খাওয়া শেষ করে আমরা আবার চলতে লাগলাম, নৌকোর দাঁড় চলল। পাত্রটা ধুয়ে আর খোসাগুলি নদীর জলে ফেলে দিয়ে সব চিহ্ন লোপ করে দিলাম। সুয়াঙ-সি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিল। নৌকোর জ্বালানিকাঠ আর লবণ আমরা শেষ করে ফেলেছি। বুড়ো অষ্টম খুড়ো ভীষণ চালাক। নিশ্চিত ধরে ফেলবে। ক্ষেপে যাবে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করলাম, কী হবে ভয় করে! যদি বকাবকি করে! গত বছর যে নদীর ধার থেকে পাইন কাঠ নিয়েছিল সেগুলো ফেরত চাইব তাহলে।

—যাক, এইবার আমরা ফিরে এসেছি। কী আর হতো? আমি বলিনি কিছু হবে না? সুয়াঙ-সি বলে উঠল গলুইর কাছ থেকে।

তাকে ছাড়িয়ে দূরে তাকিয়ে দেখলাম আমরা পিঙচিয়াও পৌঁছে গেছি। পুলের ধারে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে চোখে পড়ল—চিনলাম। মা। মাকে লক্ষ্য করেই সিয়াঙ্‌-সি ঐ কথাটা বলেছিল। আমি যখন গলুইর কাছটায় পৌঁছলাম ততক্ষণ নৌকো পুলের তলা দিয়ে পেরিয়ে গেছে। নৌকো এসে যথাস্থানে থামল, আমরা সবাই তীরে নেমে পড়লাম। মা ভীষণ রেগে গিয়েছিল, এত দেরি হলো কেন জানতে চাইল—দুপুররাত পেরিয়ে গিয়েছিল তখন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার মেজাজ ঠিক হয়ে গেল, একবার মুচকি হেসে সবাইকে ডাকল বাড়ি যেতে, মুড়ি খেতে দেবে।

তারা বলল ঃ আমরা খেয়েছি, খুব ঘুম পেয়েছে, এক্ষুনি শুয়ে পড়ব। বলেই সবাই চলে গেল যে যার বাড়িতে।

পরদিন দুপুরের আগে আমার ঘুম ভাঙলো না। বুড়ো-অষ্টম খুড়োর নুন

আর কাঠ শেষ করার ব্যাপারে কোনো কথাই উঠল না। বিকেলে আমরা যথারীতি গেলাম চিংড়ি মাছ ধরতে।

—সুয়াঙ-সি হতভাগা শয়তান কোথাকার! কালকে আমার জমি থেকে কড়াই চুরি করেছ তোমরা? শুধু তোলনি, ক্ষেত মাড়িয়ে একশা করে দিয়েছ!

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম লিউ-ইয় কড়াই বিক্রি করে শালতি বেয়ে ফিরছিল। শালতির ভেতর ঝুড়িতে কিছুটা কড়াই তখনো ছিল দেখলাম।

—নিয়েছি তো, একজন বিদেশী অতিথিকে খাইয়েছি! আর খালি তোমার জমি থেকেই তো নিইনি, সুয়াঙ-সি বলল ঃ ঐ দেখ, সব চেঁচামেচি করে আমার মাছগুলো সব ভাগিয়ে দিয়েছে।

বুড়ো আমাকে দেখেই হেসে ফেলল।

—অতিথি সৎকার করছিলে না? তা বেশ তা বেশ।

পরে বুড়ো প্রশ্ন করল আমাকে ঃ কালকের অপেরা ভালো লেগেছিল তোমার?

—হ্যাঁ। মাথা নেড়ে জবাব দিলাম।

—কড়াই খেয়ে পছন্দ হয়েছিল?

—ভীষণ ভালো লেগেছিল। আমি আবার মাথা নেড়ে বললাম।

অবাক হয়ে গেলাম, বুড়ো খুব খুশী হয়েছে। একটা বুড়ো আঙুল মটকে যেন সন্তুষ্টির ভাব নিয়ে সে বলে উঠল ঃ

—যারা লেখাপড়া শিখেছে সেই সব শহরের মানুষরা জানে কোনটা সত্যিকার ভালো। আমি কড়াই বুনবার আগে একটা একটা করে বীজ বেছে নিই। গ্রামের মানুষেরা কী ভালো কী মন্দ কিছুই বুঝেনা, বুঝলে? তাই ওরা বলে আমার কড়াই নাকি অন্যের চেয়ে ভালো নয়। মরুকগে ছাই—দাঁড়াও, আমি কিছু কড়াই পাঠিয়ে দেব তোমার মার জন্যে, খেয়ে দেখবে—

সে তার শালতি বেয়ে চলে গেল।

রাত্রে খাবার টেবিলে দেখলাম আমার জন্য এক বাটি সেদ্ধ কড়াই, লিউ-ইয় মা এবং আমার জন্য পাঠিয়েছিল। শুনলাম মার কাছে আমার খুব প্রশংসা করেছে, বলেছে ঃ এত অল্প বয়স, অনেক কিছু জানে। দেখবে সব পরীক্ষায় ও ভালো পাশ করবে। দেখবে, তোমার ভাগ্য নিশ্চিত খুলবে!

কিন্তু কড়াইগুলো খেয়ে দেখলাম গত রাত্রে যেগুলি খেয়েছিলাম সেরকম ভালো লাগল না।

তবে এটা সত্যি আজ পর্যন্ত সেই রাত্রে যে কড়াই খেয়েছিলাম সেরকম ভালো কড়াই আর খাইনি কোনোদিন আর যে অপেরা দেখেছিলাম সে রকমটিও দেখিনি কখনো।

---

village opera
October—1922

চীনদেশীয় প্রাচীন চান্দ্র পঞ্জিকা মতে নববর্ষ-পূর্ব দিনগুলি মোটামুটি অনেকটা আসল নববর্ষের পূর্ব দিনটির মতোই মনে হয়। কেননা, শহর বা গ্রামের মানুষদের চালচলনের কথা বাদ দিলেও, এমন কি চারদিকের হাওয়ার স্পর্শেই অনুভব করা যায় নববর্ষ আগত প্রায়। ধূসর সান্ধ্য মেঘ চিরে চিরে ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক, তারই পেছনে শোনা যায় বাস্তু-দেবতার বিদায়ী-সম্বর্ধনা উদ্‌যাপনে আতশবাজির গুরুগম্ভীর আওয়াজ ; তারপর আরো কাছে পটকা বিস্ফোরণের আওয়াজ যেন আরো সোচ্চার, ঐ কর্ণপটাহ বিদারণকারী আওয়াজ মিলিয়ে যেতে না যেতেই হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে আসে বারুদের হালকা গন্ধ। এমনি এক রাত্রে আমি আমার জন্মস্থান লুচেন-এ ফিরে এসেছিলাম। যদিও আমি জন্মস্থান বলছি, তবু সেখানে আমার নিজেদের বলতে কোনো বাড়ি-ঘর ছিল না অনেক কাল। তাই কোনো এক মিঃ লুয়ের, (তিনি তাঁর পরিবারের চতুর্থ সন্তান) বাড়িতে সাময়িকভাবে থাকতে হয়েছিল আমাকে। আমাদের একই বংশের লোক, এক পুরুষ আগের, তাই তাঁকে "চতুর্থ খুড়ো" বলেই বলব। চিঙ বংশের রাজত্বকালীন সব চেয়ে সেরা শিক্ষায়তন রাজ কলেজের তিনি একজন প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। নব-কনফিউশীয় মতবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। খুব বেশী পরিবর্তন দেখিনি সেবার। শুধু কিছুটা বয়স বেড়েছিল, কিন্তু তখনো গোঁফ রাখেননি। যখন দেখা হলো কুশল সংবাদ আদান প্রদানের পর তিনি মন্তব্য করলেন আমি কিছুটা মোটা হয়ে গেছি। তারপর শুরু করলেন বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ। আমি জানতাম এটা তাঁর মনের কথা নয়, কারণ তাঁর আক্রমণের আসল লক্ষ্য ছিলেন কাঙ ইয়-ওয়েই, সেই বিখ্যাত সংস্কারবাদী নেতা, ১৮৫৮ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত যিনি বেঁচে ছিলেন এবং শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন। তাহলেও, দুজনের কথাবার্তা আর বেশী এগুলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম সেই ঘরে (স্টাডি রুম) তখন আমি একা।

পরদিন ঘুম থেকে উঠতে আমার বেশ দেরি হয়ে গেল, দ্বিপ্রাহরিক আহার সেরে বেরিয়ে পড়লাম, জনাকয়েক আত্মীয় এবং বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করব। পরদিনও তাই করলাম। দেখলাম কারো খুব বেশী পরিবর্তন হয়নি, কেবল বয়স বেড়েছে ; প্রত্যেক পরিবারেই "বলিদান" উৎসবের জন্য প্রস্তুতি চলছিল। লুচেনে এটা বর্ষশেষের একটা বড়ো উৎসব। সবাই তখন ঐশ্বর্যের দেবতাকে ভক্তিভরে আবাহন করে। আগামী বছরের জন্য সুখ সমৃদ্ধির প্রার্থনা করে। তারা মুরগি বলি দেয়, হাস বলি দেয়, শুয়োরের মাংস কেনে,

মেয়েরা কাপড় চোপড় কাঁচে, আর ঘর দোর ধোয়া-মোছা করে—অনবরত জল ঘ'টতে ঘ'টতে তাদের হাত লাল হয়ে ওঠে। কেউ কেউ এখনো রূপোর ব্রেসলেট পরে। মাংস রান্না করে তার মধ্যে এলো মেলো দুটো একটা চপস্টিক গুঁজে দেয় একেই বলা হয় উৎসর্গ করা। ভোর না হতেই উৎসবের সুরু, ধূপ-ধুনো আর মোমবাতি জ্বালায়, উৎসর্গ করা নৈবেদ্য গ্রহণ করতে ঐশ্বর্যের দেবতাকে আবাহন করে। এই পূজো কেবল পুরুষরাই করে থাকে, বলি হয়ে যাওয়ার পর আবার বাজি-পটকার বিস্ফোরণ। উৎসর্গ করবার নৈবেদ্য কিনবার ক্ষমতার অভাব না হলে প্রতি বছর প্রতি রবিবার এই উৎসবের সমারোহ হয়।

দিনটা কেমন ঘোলাটে হয়ে উঠেছিল সেদিন। বিকেলের দিকে সুরু হলো তুষার-বৃষ্টির তাণ্ডব। এক একটা বড়ো বড়ো তুষার-পালক ফুলের পাপড়ির মতো উড়ছিল আকাশ জুড়ে। ঐসব তুষারকণা ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে সারা লুচেন অঞ্চলটা যেন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। আমি যখন কাকার বাড়িতে পড়ার ঘরে ফিরে এলাম তখন তাঁর বাড়ির ছাত বরফে সাদা হয়ে গিয়েছে। ঘরের ভেতরটা বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। জানালার তলায় টেবিলের উপর ছড়ানো বইগুলি দেখছিলাম। কাঙ সি'র অভিধানের কয়েক খণ্ড (সম্রাট কাঙ সি'র রাজত্বকালীন ১৬৬২ থেকে ১৭২২ পর্যন্ত ঐ অভিধান সঙ্কলিত হয়েছিল) চিয়াঙ ইয়াঙ রচিত চুমি'র দর্শন, এবং কনফুশীয় ক্লাসিকসের এক খণ্ড ঐ টেবিলের উপর পড়ে থাকতে দেখলাম। যাইহোক, আগামীকাল যেকরে হোক আমি চলে যাব ঠিক করলাম।

তাছাড়া গতকাল সিয়াঙ লিনের স্ত্রীর সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎ হওয়ায় কথাটা মনে পড়তেই আমার কেমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। তখন বিকেলবেলা। গ্রামের পূর্বাংশে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ঐ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে নদীর ধারে ওর সঙ্গে দেখা, যেভাবে আমার দিকে তাকিয়েছিল তাইতে আমার সঙ্গে কথা কইতে চাইছে বুঝতে পারলাম। এবার লুচেন এসে যাদের সাথে দেখা হয়েছে তাদের কারো এতটা পরিবর্তন হয়নি যতটা এর হয়েছে দেখলাম। পাঁচ বছর আগে দু একটা পাকা চুল চোখে পড়ত, কিন্তু এবার দেখলাম সবগুলি চুল একদম সাদা তার মতো চল্লিশ বছর বয়সে স্টো সত্যি অস্বাভাবিক। তার মুখটা ভয়ঙ্কর রকম জীর্ণশীর্ণ পাণ্ডুরতায় মলিন, আগেকার বিষণ্ণতার ছাপ যেন বর্তমান ছিল না, যেন প্রাণহীন স্পন্দনহীন একটি কাঠের পুতুল। চোখের কোণে মাঝে মাঝে দুটো একটা ঝলকই কেবল দিল জীবনের পরিচয়। তার হাতে ছিল একটা বাঁশের চুপড়ি, তার মধ্যে একটা ভাঙা বাটি, শূন্য। অন্যহাতে একটা বাঁশের লাঠি, তার চেয়েও লম্বা লাঠিটা, নিচের দিকটায় চেরা। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম সে ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে।

আমি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম, আমার কাছে এসে পয়সা চাইবার অপেক্ষায়।

—তুমি ফিরে এসেছ ? সেই প্রথম জিজ্ঞাসা করল।

—হ্যাঁ। আমি বললাম।

—খুব ভালো। কত লেখাপড়া শিখেছ, অনেক দেশ ঘুরেছ, আর অনেক কিছু দেখেছ। আমি ক'টি কথা জিজ্ঞেস করব তোমাকে। তার চোখের নিস্প্রাণ দৃষ্টি যেন হঠাৎ চমকে উঠল।

এ ধরনের কথা বলবে আমি আন্দাজ করতে পারিনি। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

—কথাটা এই। দুই পা আমার কাছে এগিয়ে এল, তারপর অতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে ফিসফিস করে বলল ঃ মানুষ মরলে কি ভূত হয়, না হয় না ?

তার দৃষ্টি তখন আমার উপর নিবদ্ধ, কিসের একটা পূর্বাশঙ্কা যেন আমাকে পেয়ে বসল। মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে একটা শিহরণ শিরশির করে বয়ে গেল। স্কুলে পরীক্ষা দিতে গিয়ে মাস্টার মশাই পাশে এসে দাঁড়ালে যত নার্ভাস না হয়েছি তার চেয়ে যেন বেশী নার্ভাস হয়ে গেলাম। ব্যক্তিগত ভাবে এই ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি কোনো চিন্তাই করিনি কোনোদিন। এমনি আপতকালে তার এই প্রশ্নের কী উত্তর দেব ? একটু ইতস্তত চিন্তা করলাম ঃ ভূত-প্রেত বিশ্বাস করা এখানকার রীতি, অথচ মনে হয় সে অবিশ্বাসী —আবার সে আশাবাদী, তাই থাকুক না সে। অবিনশ্বরতায় করুক না বিশ্বাস। তার মনের কষ্টকে কী লাভ বাড়িয়ে ? তার মনের আশাকে জাগিয়ে রাখতে বলি না কেন, ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব আছে।

—আমার মনে হয়, আছে হয়তো। একটু ইতস্তত করে আমি বললাম তাকে।

—তাহলে, নরকও আছে নিশ্চয় ? ,

—নরক ? চমকে উঠলাম, এই প্রশ্নের উত্তর কেবল এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করতে লাগলাম—নরক ? যুক্তি মানলে বলতে হয় নিশ্চয় আছে কিন্তু এর প্রয়োজন কোথায় ? ওনিয়ে কে মাথা ঘামায় ?…

—তাহলে একই পরিবারের যারা মারা যায় তাদের সবার আবার দেখা হয় ?

—কিন্তু, দেখা হয় কি হয় না, এ ব্যাপারে…এইবার আমি উপলব্ধি করতে পারলাম আমি· কত নির্বোধ ; আমার সমস্ত ইতস্ততা, সমস্ত চিন্তা সত্বেও আমি তার ঐ তিনটি প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারিনি। সঙ্গে সঙ্গে আমার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেললাম, যা বলেছি তার ঠিক বিপরীত কথা বলতে আগ্রহী হয়ে উঠলাম—এই ব্যাপারে…দেখ…বলতে গেলে কি…সত্যি আমি নিজেই কিছু জানিনা…আসলে, ঐ ভূত-প্রেতের ব্যাপারে আমিও ঠিক কিছু জানি না।

বৃদ্ধার মুখ থেকে আরো নাছোড়বান্দা প্রশ্ন এড়াবার উদ্দেশ্যে আমি চলতে শুরু করলাম। ভীষণ অস্বোয়াস্তি বোধ করে একরকম ছুটে পালিয়ে গেলাম কাকার বাড়িতে। নিজের মনে চিন্তা করলাম—আমার উত্তরের প্রতিক্রিয়া ভালো হবে না হয়তো তার উপর। হয়তো আর সবাই যখন উৎসবের আনন্দে মশগুল থাকবে, নিজের মনে হয়তো সে নিঃসঙ্গ বোধ করবে। কিন্তু এছাড়া অন্য কোনো কারণও কি আছে তার এই নিঃসঙ্গতার জন্যে? কোনো পূর্বাশঙ্কা করছে কি? যদি অন্য কোনো কারণ না থাকে, এর ফলে যদি সত্যি কিছু ঘটে, তবে হয়তো আমার এই উত্তরের জন্যই কোন এক অনির্দিষ্ট দায়িত্ব চাপবে আমার ঘাড়ে। কিছুটা জবাবদিহি হয়তো করতে হবে আমাকে। যাহোক, শেষপর্যন্ত আত্মধিক্কারের পর আমি চিন্তা থেকে বিরত হলাম। এইবার আমি পরিষ্কার বলেছি, "আমি ঠিক জানিনা"। আগের উত্তরকে তো এই কথাতেই খণ্ডন করছি। কাজেই যদি কিছু ঘটেও, আমার কোনো দায়িত্ব থাকবে না।

"আমি ঠিক জানিনা।" এইটাই সবচেয়ে সেরা কথা।

অনভিজ্ঞ আর হঠকারী যুবকেরা অপরের সমস্যা সমাধানের ভার স্বেচ্ছায় ডেকে নেয় নিজেদের ঘাড়ে অথবা ব্যারামের ডাক্তার ডেকে আনে, পরে যদি ব্যতিক্রম কিছু ঘটে, সব দোষ পড়ে তাদের ঘাড়ে; কিন্তু আমি ঠিক জানিনা এই কথা বলে এড়িয়ে গেলেই রেহাই পায় দায়িত্ব থেকে। এসময় এ কথাটার প্রয়োজন এবং গূঢ় অর্থ বিশেষ করে অনুভব করলাম, কেননা একজন ভিক্ষুকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েও এই কথাটার প্রয়োজন আছে নিঃসন্দেহে বুঝলাম।

তবুও আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম, একটা রাত্রির পূর্ণ বিশ্রামের পরও এই ব্যাপারটা আমার মাথা থেকে গেল না। যেন কোনো এক অপ্রত্যাশিত দুঃখময় পরিস্থিতির পূর্বাভাস আমি অনুভব করছিলাম। ঐ বিশ্রী বরফ-পড়া আবহাওয়ায় বন্ধ অন্ধকার পড়ার ঘরে বসে থেকে ঐ অস্বস্তিভাবটা যেন আরো অসহনীয় হয়ে উঠছিল। এখান থেকে চলে যাওয়াই বুঝি শ্রেয়। পরদিনই আমি নিশ্চিত শহরে চলে যাব। ফু সিও রেস্তোরাঁয় হাঙর মাছের সেদ্ধ ডানার একটা বেশ বড়ো টুকরোর তখন দাম নিত এক ডলার। কে জানে ঐ সুস্বাদু অথচ সস্তা খাবারের দাম বেড়েছে কি না। যদিও সেকালে যেসব বন্ধুরা এক সঙ্গে থাকতাম এবং ঐ রেস্তোরাঁয় খেতাম তাদের প্রায় সবাই এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে। তাহলেও একাই একবার গিয়ে দেখব সেখানে। যাহোক, কালকেই চলে যাব বলে মনস্থির করে ফেললাম।

অনেকবারই আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে, যা আশা করেছি, তা ঘটেনি। আর যা ঘটেছে তার আশাই করিনি। এইবারও ঠিক তাই ঘটবে এই ভয়েই মন আমার আঁকু-পাঁকু করছিল। আর বাস্তবিক খুবই অদ্ভুত ব্যাপার সব ঘটতে লাগল। সন্ধ্যার দিকটায় বাড়ির ভেতরের কিছু কথা আমার কানে

আসছিল—কারা যেন পরামর্শ করছিল মনে হলো ; কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। শুনতে পেলাম, আমার কাকা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী সব বলতে বলতে বেরিয়ে আসছিলেন। আগেও নয়, পরেও নয়। ঠিক এই সময়—একটা নিশ্চিত কুলক্ষণ, কিছু একটা বদ মতলব আছে নিশ্চয় -তিনি বলছিলেন।

প্রথমে আমি একটু অবাক হয়েছিলাম, তারপর অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। মনে হতে লাগল, আমাকে লক্ষ্য করেই বুঝি কথাগুলো বলছিলেন। দরজার বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, কেউ সেখানে ছিল না। খুব কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রাখলাম, যতক্ষণ না বাড়ির চাকর একপাত্র চা গরম করতে এল। তখনই তাকে জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ পেলাম।

—মিঃ লু কার উপর রাগ করছিলেন, বলতে পার ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—কেন, এখনো ঐ সেই সিয়াঙ লিনের স্ত্রী, আবার কে ? সে কম কথায় জবাব দিল।

—সিয়াঙ লিনের স্ত্রী ? কেন, তার কী ব্যাপার ? আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম।

—সে মারা গেছে।

—মারা গেছে ? হঠাৎ যেন আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন একটি বারের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। আমি চমকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে হয়তো আমার মুখ চোখের চেহারাও বিবর্ণ হয়ে গেল। লোকটা মাথা তোলেনি বলে আমার চকিত পরিবর্তন বুঝতে পারল না। নিজেকে সংযত করে নিলাম, বললাম ঃ কখন মারা গেছে ?

—কখন ? কালকে রাত্রে, কি জানি আজ সকালে নাকি, আমি ঠিক জানিনা।

—কী করে মারা গেল ?

—কী করে ? কেন, গরিব বলে, আবার কি ? ধীর শান্তভাবে উত্তর দিল এবং তখনো মাথা না তুলে, ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু আমার চাঞ্চল্য ক্ষণিকের ; কারণ যখন একটা কিছু ঘটবে বলে আমি শঙ্কিত ছিলাম, তা ঘটেও গেল। তখন নিজেকে শান্ত করবার জন্য' আমি ঠিক জানিনা, এই যুক্তির আড়ালে আশ্রয় নেবার আর কোনো প্রয়োজন রইল কীনা। আমার বুকের ভেতরটা এর মধ্যেই হালকা হয়ে গেল কিন্তু তাহলেও থেকে থেকে কিসের যেন একটা চাপ বোধ করছিলাম। রাত্রে যখন খেতে বসেছি, কাকাও একই সঙ্গে বসেছিলেন। সিয়াঙ লিনের স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করব ভাবলাম কিন্তু আমি জানতাম 'ভূত-প্রেত প্রাকৃতিক বস্তু' এই কনফিউসীয় মত সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলেও আমার কাকা অনেকগুলো কুসংস্কার মনে মনে

পোষণ করতেন এবং "বলিদান" উৎসবের ঠিক আগের দিন মৃত্যু বা পীড়া কুলক্ষণ। এ সম্বন্ধে আলোচনার কোনো প্রশ্নই আসে না। খুব প্রয়োজনে পরোক্ষ উক্তি সম্ভব ছিল কিন্তু দুঃখের বিষয়, কীকরে বলতে হয় আমি জানতাম না, কাজেই যদিও প্রশ্নের পর প্রশ্ন আমার জিভের ডগায় এসে ভিড় জমাচ্ছিল, ওগুলো সামলে নিতে হলো আমাকে। কাকার মুখে একটু আগেকার মন্তব্যের কথা ভেবে হঠাৎ আমার মনে সন্দেহ জাগল যে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন আগে নয় পরে নয়, ঠিক এই মুহূর্তে আমি এসেছি তাঁকে বিপদে ফেলব বলে। আমি একজন দুষ্ট প্রকৃতির কুলক্ষুণে মানুষ। সুতরাং তাঁর মনের চাঞ্চল্য শান্ত করবার জন্য খাবার টেবিলে বসেই তাঁকে বললাম, আগামী কালই আমি লুচেন ছেড়ে শহরে চলে যাব ঠিক করেছি। তিনিও আমাকে থাকবার জন্য আর পীড়াপীড়ি করলেন না। আমরাও বেশ শান্তিতে নৈশভোজ শেষ করলাম।

শীতকালের দিন ছোটো, আবার বরফ পড়ছিল। ঘন অন্ধকার এর মধ্যেই সারাটা গ্রাম আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সবাই ল্যাম্পের আলোয় যার যার কাজে ব্যস্ত কিন্ত জানলার বাইরে সব নিস্তব্ধ শান্ত। স্তূপীকৃত বরফের ওপর তুষার-পালক ঝুরঝুর করে পড়ছিল। আমি যেন আরো নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগলাম। প্রদীপের পীতাভ আলোয় বসে নিঃসঙ্গ আমি ভাবছিলাম :

ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া অপ্রয়োজনীয় ছিন্নভিন্ন হতশ্রী খেলনার মতো মনুষ্য-সমাজ পরিত্যক্ত ঐ হতভাগ্য স্ত্রীলোকটিও এই ধুলোতেই তার পদচিহ্ন রেখেছিল একদিন। জীবনকে যারা ভোগ করে তারাই কেবল অবাক হয়ে ভেবেছিল হয়তো, কেন ওর নিজের অস্তিত্বকে টেনে বাড়াবার এই অপচেষ্টা কিন্তু আজ ঐ মহাকালের স্রোতধারা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তার অস্তিত্বকেও। ভূত প্রেত আছে কি নেই আমি জানিনা কিন্তু আজকের পৃথিবীতে অর্থহীন অস্তিত্বের যখন অবসান হয়ে যায়, যখন যাকে দেখতে চাই না তাকে আর দেখিনা, তখন তার পক্ষে বা অন্যের কাছেও এমনি অস্তিত্বে বিশ্বাস, এই তো মঙ্গল।

ধীর ভাবে কান পেতেছিলাম জানলার বাইরে তুষারপাতের শব্দ শুনতে শুনতে চিন্তার ধারাগুলো তখনো ছিল মাথায়, ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল মনের অসোয়াস্তি।

ঐ হতভাগ্যা স্ত্রীলোকটির জীবনের খণ্ড খণ্ড অংশগুলি কিছু দেখা কিছু শোনা, এক সূত্রে গ্রথিত হয়ে রূপ নিল একটা পূর্ণ জীবনের।

লুচেনের মেয়ে নয় সে। কোনো এক বছরে, শীতের ঠিক প্রথম দিকটায়, মিসেস ওয়েই নিয়ে এসেছিলেন মেয়েটিকে। আমার কাকার বাড়িতে সে সময় একজন লোকের বিশেষ প্রয়োজন। সেদিন মেয়েটির মাথার চুল সাদা ফিতেয় জড়ানো, পরনে কালো রঙের স্কার্ট, নীল জ্যাকেট আর হালকা

সবুজ রঙের বডিস। ওর বয়স তখন পঁচিশ ছাব্বিশ বা এমনি কিছু। গায়ের চামড়ার রঙ ভীষণ ফ্যাকাশে দেখতে। যদিও গাল দুটো টুকটুকে রাঙা। মিসেস ওয়েই মেয়েটিকে সিয়াঙ লিনের বউ বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেনঃ মেয়েটি তাঁর মামার দেশের লোক, তাঁদেরই প্রতিবেশী। স্বামীর মৃত্যুতে রোজগারের খোঁজে বাইরে বেরিয়েছে। আমার কাকা মেয়েটিকে দেখেই কপাল কুঁচকোলেন। কাকী বুঝতে পারলেন মেয়েটি বিধবা বলে কাকার অপছন্দ। তবু মনে হলো মেয়েটি কাজের লোক, বেশ শক্তসমর্থ হাত পা, নম্র স্বভাব ; কোনো কথা বলল না মেয়েটি। বোঝা গেল পরিশ্রম করতে পারবে। কাজেই কাকী কাকার অপছন্দকে আমল দিলেন না। মেয়েটিকে কাজে বহাল করলেন। শিক্ষানবিশীর সময় সে রাতদিন খেটে কাজ করল, বিশ্রাম নেবার কথা মনেই এল না। শরীরে এমনি শক্তি যে পুরুষের সমান কাজ করে গেল। তিন দিন কাজ করবার পরই তাকে স্থায়ী ভাবে বহাল করলেন। মাসিক মাইনে পাঁচশত ছোট মুদ্রা।

সবাই তাকে সিয়াঙ লিনের বউ বলেই ডাকত। কেউ তার নিজের নাম জানতে চাইত না যেহেতু ওয়েই গ্রামের একজন তাকে নিয়ে এসেছিল এবং তাদেরই আত্মীয়ের প্রতিবেশী বলে পরিচয় দিয়েছিল। মেয়েটির নামও ওয়েই বলে ধরে নেওয়া হলো। বেশি কথা বলত না, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে কেবল জবাব দিত এবং সেসব জবাবও খুব অল্প কথায়। প্রায় বারো বা এমনি কিছু দিন কাটবার পর ধীরে ধীরে জানা গেল মেয়েটির বাড়িতে একজন কড়া শাশুড়ী এবং বছর দশেক বয়সের একজন কর্মক্ষম দেওর তখনো বর্তমান। তার স্বামী পেশায় কাঠুরিয়া ছিল। সেই বছর বসন্তকালে মারা গেছে। তার স্বামী বয়সে তার চেয়েও প্রায় বছর দশেকের ছোট ছিল। (দশ বারো বছর বয়সের বালকের সঙ্গে যুবতী মেয়েদের বিয়ে দেবার একটা প্রথা ছিল প্রাচীন চীন দেশে।) শুধু এইটুকু কাহিনী জানা গিয়েছিল তার কাছে। দিনগুলি বয়ে গেল দ্রুতগতিতে। একই ভাবে চলল তার পরিশ্রম। যা পেত তাই খেত. কোনো কিছুতে আপত্তি করতো না। সবাই একবাক্যে স্বীকার করল, লু পরিবার একজন সত্যিকার ভালো পরিচারিকা পেয়েছে। যেকোনো একজন পুরুষের চেয়েও বেশি কাজ পাওয়া যায় তার কাছ থেকে। বছরের শেষে ধোয়া-মোছা, বাড়ি পরিষ্কার হাঁস মুরগী বলি দেওয়া, বলির মাংস রান্না করে ভোগ সাজানো, এ সবকিছু সে এক হাতে করত, বাইরের লোক রাখতে হতো না। সে নিজেও সন্তুষ্ট ছিল। ধীরে ধীরে তার মুখের কোণে হাসির রেখা দেখা দিতে লাগল। বেশ মোটাসোটা চামড়ার রং পরিষ্কার হলো আগের চেয়েও।

নতুন বছরের উৎসব তখনো শেষ হয়নি। একদিন নদীর ঘাট থেকে চাল ধুতে গিয়ে ফিরে এল মেয়েটি। তার মুখের চেহারা কেমন ফ্যাকাসে, বলল ঃ নদীর

ওপারে দূর থেকে সে একটা লোককে দেখতে পেয়েছে, মনে হলো তার স্বামীর কোনো এক তুতো-ভাই। হয়তো তার খোঁজে বেরিয়েছে। আমার কাকীও ভয় পেয়ে গেলেন। খোঁজখবর নিতে চেষ্টা করলেন কিন্তু বিশেষ কিছু জানতে সক্ষম হলেন না। কাকা শুনেই ভুরু কুঁচকোলেন একবার, বললেন : ব্যাপার খুবই ভীষণ, সন্দেহ নেই। মেয়েটা নিশ্চয় তার স্বামীর বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে।

সে পালিয়ে এসেছিল এই ধারণাই সত্য প্রমাণিত হলো কিছুদিনের ভেতর। প্রায় এক পক্ষকাল পরে, সবাই এ প্রসঙ্গটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল হঠাৎ একদিন মিসেস ওয়েই এসে হাজির হলো, সঙ্গে বছর ত্রিশেকের একজন স্ত্রীলোক—বাড়ির চাকরানীর শাশুড়ী বলে তার পরিচয় দিল। স্ত্রীলোকটিকে পল্লীগ্রামের মেয়ে বলে মনে হলেও তার কথাবার্তা আর ব্যবহারে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব যেন পরিষ্কার। উপস্থিত বুদ্ধিরও অভাব দেখা গেল না। ভদ্রতাসূচক কথাবার্তা আদান প্রদানের পর তার পুত্রবধুকে নিতে চাইছে বলে সে ক্ষমা চাইল সবার কাছে। বলল : আগামী বসন্ত ঋতুতে অনেক কাজ নিজেদের বাড়িতে। শুধু বৃদ্ধ আর শিশু ছাড়া কাজ করবার কোনো জোয়ান লোক নেই।

—মেয়েটির শাশুড়ী তাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছে, এর ওপর আর কী আছে বলবার ? আমার কাকা মন্তব্য করলেন।

কাজেই তার মজুরী হিসাব করা হলো। এক হাজার ছয়শত পঞ্চাশ ছোটমুদ্রা তার পাওনা। সবটাই মনিব গিন্নীর হেফাজতে রেখেছিল। একটি মুদ্রাও খরচ করেনি। আমার কাকী পুরো টাকাটা শাশুড়ীর হাতে তুলে দিলেন। মেয়েটির কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিল তার শাশুড়ী তারপর মিঃ এবং মিসেস লু-কে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি ছেড়ে! তখন দ্বিপ্রহর হয়ে গেছে।

—আরে! চাল—চালগুলি কই ? সিয়াঙ লিনের বউ চাল ধুতে নিয়ে গিয়েছিল না ? কিছুক্ষণ বাদে আমার কাকী চেঁচিয়ে উঠলেন। হয়তো খিদে পেয়ে গিয়েছিল তাই হঠাৎ দুপুরের খাওয়ার কথা মনে পড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে চালের ঝুড়ির খোঁজ পড়ল। কাকী প্রথমেই রান্নাঘরে গেলেন, তারপর হল ঘরে, শোবার ঘরেও একবার। কোথাও কোনো চিহ্নও দেখলেন না। আমার কাকা বাইরে খুঁজতে গেলেন। নদীর ধারে গিয়ে হদিশ মিলল, এক বাণ্ডিল সবজীও পাশে পড়ে আছে ঐসঙ্গে।

কেউ কেউ বলল : সকালের দিকটায় ছইওয়ালা একটা নৌকো নোঙর করতে দেখেছে কিন্তু ছইয়ে সারাটা নৌকো ঢাকা ছিল, নৌকোর ভেতরকার কিছু তাই চোখে পড়েনি। এই ঘটনার কথা শুনবার আগে এদিকে কেউ লক্ষ্যই করেনি। যখন সিয়াঙ লিনের বউ চাল ধুতে নদীর ধারে এসেছিল সেই সময় দুটো গেঁয়ো মতন লোককে নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়ে জোর করে

মেয়েটিকে নৌকোয় তুলে নিতে দেখেছিল। দু একটা চীৎকারের পর সিয়াঙ লিনের বউ-এর আর কোনো সাড়া মেলেনি। হয়তো তার মুখ চেপে ধরেছিল। তারপর এল দুটি স্ত্রীলোক, একজন অচেনা আর দ্বিতীয় জন মিসেস ওয়েই বোধহয়। তারা নাকি নৌকোর ভেতরটাও উঁকি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু স্পষ্ট কিছু দেখতে পায়নি। মনে হলো হাত-পা বেঁধে নৌকোর ভেতর ফেলে রেখেছিল সিয়াঙ লিনের বউকে।

—ছি, কী লজ্জার ব্যাপার! কাকা বললেন।

সেদিন দুপুর বেলার রান্না কাকীকেই রাঁধতে হলো। তুতো-ভাই আহ নিউ উনুন ধরিয়ে দিয়েছিল।

দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর মিসেস ওয়েই আবার এলেন।

—কী লজ্জার ব্যাপার, বলুন তো! আমার খুড়ো আবার বললেন।

—এর অর্থ কী, বলতে পারেন? আবার এসেছেন? লজ্জা করে না? কাকী বাসন মাজছিলেন। ওকে দেখেই শুরু হলো তার গালাগাল আর চীৎকার— আপনিই না সুপারিশ করেছিলেন। চক্রান্ত করে আবার ওকে সরিয়ে নিয়েছেন। এ কেমন ধারা বাপু, লোকে কী ভাববে? সারাটা পরিবারকে হাস্যাস্পদ করবার ব্যবস্থা করেছেন না আপনি?

—সত্যি, আমি ভীষণ লজ্জিত এর জন্যে! ব্যাপারটা খোলশা করতেই এসেছি এবার। যখন কাজ জোগাড় করে দিতে বলল ঃ আমি কী করে জানব বলুন যে সে তার শাশুড়ীর অনুমতি না নিয়ে চলে এসেছে? সত্যি, আমি খুব দুঃখিত মিঃ এবং মিসেস লু। বুড়ো হয়েছি, বুদ্ধি-সুদ্ধি সব গেছে, নইলে এমন করে আপনাদের মুশকিলে ফেলি! তবু আমার সৌভাগ্য, আপনাদের দয়ার প্রাণ, ছোটদের ওপর নির্দয় হন না। ভুল শোধরাতে, দেখবেন, এইবার আমি আপনাদের একজন খুব ভালো লোক এনে দেব।

—এখনো…বলতে বলতে কাকা থামলেন।

সিয়াঙ লিনের বউ-এর প্রসঙ্গ এইখানেই সমাপ্ত হলো এবং কিছুদিনের মধ্যেই ভুলেও গেল সবাই।

এরপর বাড়িতে যেসব কাজের লোক এল তাদের কেউ বা আলসে, কেউ বা খাবার জিনিস চুরি করত অথবা কেউ কেউ দুই-ই। একটিও ভালো লোক জোটেনি। তাই কেবল আমার কাকী সিয়াঙ লিনের বউ-এর কথা প্রায়ই বলতেন। এইসব সময় নিজের মনে মনেই তিনি বলতেন—কে জানে ওর না জানি কী হলো? আবার ফিরিয়ে নেবার ইচ্ছা প্রকাশ পেত এইসব কথায়। কিন্তু পরের বছর নববর্ষের উৎসবের সময় তিনিও ছেড়ে দিলেন তার আশা। নববর্ষ উৎসবের দিনগুলি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। একদিন মিসেস ওয়েই এঁদের সম্মান জানাতে এলেন, বললেন ঃ তিনি ওয়েই গ্রামে তাঁর মার কাছে

গিয়েছিলেন। দিন কয়েক সেখানে কাটিয়েছিলেন বলেই এ বাড়িতে আসতে দেরি হলো কদিন। কথাবার্তার সময় স্বভাবতই সিয়াঙ লিনের বউ-এর প্রসঙ্গ এসে পড়ল।

—ওর কথা বলছেন? বেশ খুশি মনে মিসেস ওয়েই বললেন: ওতো এখন মহাসুখে আছে। তার শাশুড়ী তাকে এ বাড়ি থেকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাবার আগেই হো-গ্রামের কোন এক হো পরিবারের ষষ্ঠ ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবার কথা দিয়ে রেখেছিল। বাড়ি নিয়ে যাবার কিছুদিনের মধ্যেই কনের পিড়িতে বসিয়ে বিদেয় করে দিয়েছিল মেয়েটাকে।

—হায় ভগবান! কী শাশুড়ী রে বাবা! অবাক হয়ে আমার খুড়ি বলে উঠলেন।

—সত্যি ভালো কথা বলেছেন আপনি! আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক, গরিব মানুষ, ও রকম আমরা ভাবতেই পারি না। এখনও ওর একজন দেওর আছে বিয়ের বাকি। ওকে বিয়ে না দিলে ওর দেওরের বিয়ের টাকার ব্যবস্থা হয় না। ওর শাশুড়ী সত্যিকার চালাক লোক বলব, একজন কাজের মানুষ। কেমন করে দাঁও মারতে হয় বেশ ভালো করেই জানে। তাই দূরে ঐ পাহাড়িয়া অঞ্চলে ওকে বিয়ে দিয়ে বিদেয় করে দিয়েছে। নিজের গ্রামে বিয়ে দিলে কি আর এত টাকা পেত? ঐ পাহাড়িয়া অঞ্চলে কোন মেয়েছেলে যেতে চায় বলুন? আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে এই বিয়ে দিয়ে। ঐ টাকাতেই দ্বিতীয় ছেলের বিয়ে দিয়েছে। যৌতুক ইত্যাদিতে লেগেছে পঞ্চাশ হাজার, আর তারপর বিয়ের আর সব খরচ মিটিয়েও তার হাতে রয়ে গেছে প্রায় দশ হাজারের চেয়েও বেশি মুদ্রা। একবার ভেবে দেখুন, একে দাঁও-মারা বলবেন না তো কী বলবেন, বলুন...?

—কিন্তু সিয়াঙ লিনের বউ কি রাজী ছিল?

—রাজী থাকা না থাকার কথাই ওঠেনি। অবিশ্যি যেকেউ হোক, আপত্তি করত এটা ঠিক তবে ওরা ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে বিয়ের চেয়ারে বসিয়ে ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল ছেলের বাড়িতে। ওখানে নিয়ে মাথায় বিয়ের মুকুট পরিয়ে কাজ সমাধা করে দুজনকেই বন্ধ করে রেখেছিল একটা ঘরে। তবে সিয়াঙ লিনের বউও একজন স্ত্রীলোক বটে! শুনেছি খুব নাকি বাধা দিয়েছিল। আর ও যে ঐ লেখাপড়া জানা মানুষের বাড়িতে থেকে একটু ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ হয়েছিল এটা কিন্তু কেউ অস্বীকার করেনি! আর জানেন, আমরা ঐ যারা এসব ব্যাপারে মধ্যস্থতা করি, তারা দেখেছি অনেক কিছু—অনেক কিছু অভিজ্ঞতা। যখন বিধবা মেয়েমানুষ বিয়ে করে, কেউ কেউ কাঁদে, কেউ বা চেঁচামেচি করে, আবার কেউ আত্মঘাতী হবার ভয় দেখায়, কেউ আবার ছেলের বাড়িতে জবরদস্তি নিয়ে গেলেও বিয়ের ক্রিয়াকলাপের কিছুতেই বসে না, কেউ দেখেছি ভাঙচুর করে সব। কিন্তু

সিয়াঙ লিনের বউ ছিল সবার থেকে ব্যতিক্রম। ওদের কাছে শুনেছি সারা রাস্তা সে চেঁচিয়েছে, শাপ-মান্যি দিয়েছে বটে, তবে ছেলের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে গলায় আর স্বর বেরোয়নি। চেয়ার থেকে নামিয়ে (যদিও বা দুইজন বাহক আর তার দেওর যথেষ্ঠ বলপ্রয়োগ করেছিল), তারা জোর করে বিয়ের পিঁড়িতে বসাতে পারেনি তাকে। ওরা একটু অন্যমনস্ক হতেই, টেবিলের কোণে মাথা ঠুকতে ঠুকতে সে এক কাণ্ড বাঁধিয়ে বসল। প্রচুর রক্ত বেরুলো, একমুঠো ধুনোর ছাই দিয়ে বেশ করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধবার পরও কিন্তু রক্ত বন্ধ হয়নি। তারপর তাকে জোর করে বিয়ের আসনে বসিয়ে স্বামীর সঙ্গে বাসর ঘরে বন্ধ করে দিয়েছিল।

এই বলেই মিসেস ওয়েই চুপ করলেন।

—এরপর কী হলো? কাকী প্রশ্ন করলেন।

—পরদিনও নাকি সে ঘর ছেড়ে বাইরে আসেনি। মিসেস ওয়েই মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন: তারপর?

—তারপর? তারপর সে বেরিয়েছিল, বছরের শেষে তার একটি পুত্রসন্তান জন্মালো। এই নববর্ষে ঐ ছেলের দু বছর বয়স হতো। (চীন দেশীয় রীতি অনুযায়ী জন্মের সঙ্গেই শিশুর বয়স এক বছর গণনা করা হয়, তারপর নববর্ষের দিন তার বয়সের সঙ্গে আরো এক বছর যোগ হয়।) সেবার আমি কিছুদিন আমাদের গ্রামে ছিলাম। সে সময় কেউ কেউ হো-গ্রামে গিয়েছিল, তাদের মুখেই শুনলাম তারা ওর ছেলেকেও দেখে এসেছে—মা আর ছেলে দু জনেই বেশ মোটা-সোটা দেখতে। ওখানে ওর মাথার ওপর কোনো শাশুড়ী ছিল না, ওর স্বামী বেশ জোয়ান পুরুষ, খেটে রোজগার করতে পারে। বাড়িটাও তাদের নিজেদের। সত্যি, বেশ সুখে আছে সে!

এরপর আমার কাকী—সিয়াঙ লিনের বউ সম্বন্ধে আর কোনো কথা বলতেন না!

কিন্তু কোনো এক শরৎকালে, দুটো নববর্ষ কেটে গেছে তখন। সিয়াঙ লিনের বউ যে কতখানি সুখে ছিল তা জানা গেল। সে সত্যি সত্যি একদিন এসে আবার আবির্ভূত হলো আমার কাকার বাড়ির দোরগড়ায়। একটা গোল মতন ঝুড়ি আর একটা বিছানার পুঁটলি তার সঙ্গে। সাদা ফিতে দিয়ে মাথার চুল জড়ানো, একটা কালো রঙের ঘাগরা পরণে। সেই আগের মতোই নীল রঙের জ্যাকেট আর সবুজ রঙের বডিস গায়। গায়ের চামড়ায় পাণ্ডুর বর্ণ প্রকট হয়ে আছে, গালের গোলাপী আভা আর নেই। দৃষ্টি নত করে দাঁড়িয়েছিল। অশ্রু সিক্ত মলিন দুটি চোখের ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে গেছে। আগের মতো এবারও সেই মিসেস ওয়েই তাকে নিয়ে এসেছেন সঙ্গে করে। তিনিই বুঝিয়ে বললেন সব কথা: সত্যি, ব্যাপারটা বিনা মেঘে বজ্রপাতের

মতোই। তার স্বামী খুবই স্বাস্থ্যবান। কেউ ধারণা করতে পারেনি তার মতো অমন একটি জোয়ান ছেলে টাইফয়েডের কবলে পড়ে প্রাণ হারাবে। কিছুটা সেরে উঠেছিল কিন্তু তর সইল না। একবাটি ঠাণ্ডা ভাত খেয়ে বসল ফলে অসুখটাও বেড়ে গেল। তবু যাহোক রক্ষে, ছেলেটা ছিল! সে নিজেও কাজ করতো, কাঠ কাটাই হোক, চা পাতা কুড়ানো হোক বা গুটি পোকা বাছাই হোক—সবকিছু সে পারত। কাজেই প্রথম দিকটায় সে চালিয়ে নিচ্ছিল কোনো প্রকারে। দিন কাটছিল। তারপর কে ভাবতে পেরেছিল ঐ একমাত্র ছেলেটাকেও নেকড়ে বাঘে খাবে? বসন্তকাল শেষ হয়ে এলেও সেবার নেকড়ে বাঘের উপদ্রব দেখা দিয়েছিল, এটাই বা কে ধারণা করতে পারত? আজ আর তার কেউ নেই। সম্পূর্ণ একা। তার দেওর এসে বাড়িটাও কেড়ে নিয়ে বার করে দিয়েছে। তাই এসেছে পুরনো মনিবের আশ্রয়ে। এছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই তার কাছে। সৌভাগ্যের কথা, এবার আর কেউ নেই বাধা দেবে। আর আপনিও একজন লোক খুঁজছিলেন শুনলাম, তাই নিয়ে এলাম একে। আমার মনে হয় একজন নতুন লোকের চেয়ে যে আপনাকে চেনে এরূপ লোক নেওয়াই বোধহয় ভালো আপনার পক্ষে।

—আমি বোকামি করেছিলাম…সিয়াঙ লিনের বউ তার উদাস দৃষ্টি তুলে বলল। আমি জানতাম, শীতকালে যখন বরফ পড়ে তখন জঙ্গলে কিছু খাবার পায় না বলে নেকড়েবাঘ মানুষের বস্তিতে আসে; আমি জানতাম না বসন্তকালেও ওরা আসে কখনো। ভোর বেলা উঠে ঘরের দরজা খুলেছিলাম। এক ঝুড়ি কড়াই বার করে দিয়ে আহ্ মাওকে বাইরের দাওয়ায় বসে খোসা ছাড়াতে বলেছিলাম। খুব বাধ্য ছিল ছেলেটা, যা বলতাম তাই করত সব সময়; কড়াইগুলি নিয়ে সে বাইরে গিয়ে বসেছিল। সেই সময় আমিও রান্নার কাঠ আনতে বাড়ির বাইরে পেছন দিকে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে কড়াইগুলো সেদ্ধ করব মনে করে আহ্ মাওকে ওগুলো নিয়ে আসতে ডাকলাম। কিন্তু কোনো সাড়া পেলাম না। খোঁজ নিতে বাইরে গিয়ে দেখলাম, কড়াই গুলো চারদিক ছড়িয়ে আছে কিন্তু আহ্ মাও নেই কোথাও। অন্য কারো বাড়িতে সে খেলতে যেত না কখনো তবু প্রত্যেক বাড়িতে খুঁজতে গিয়ে দেখলাম সে কোথাও যায়নি। আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম, সবাইকে কত খোসামোদ করলাম তাকে খুঁজে দিতে। বিকেলের দিকটায় সবদিক দেখে তারা পাহাড়ি উপত্যকার ঐ জলা জায়গাটায় খুঁজে দেখল। সেখানে এক পাটি জুতো। বুঝতে পারল, ছেলে নেকড়ে বাঘের কবলে পড়েছে। আরো একটু ভেতরে খোঁজাখুঁজি করে নেকড়ের আড্ডায় পাওয়া গেল তাকে—নাড়ি-ভুঁড়ি সব খেয়ে ফেলেছে। এক হাতে ঝুড়িটা তখনো শক্ত করে ধরে…।

এইটুকু বলেই সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। মুখের কথাটাও শেষ করতে পারল না।

কাকী প্রথমে একটু ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু কাহিনী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের পাতাও ভারি হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তাকে জিনিসপত্রগুলো নিয়ে চাকরদের থাকবার ঘরে রেখে আসতে বললেন। মিসেস ওয়েই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, যেন একটা বিরাট ভারি বোঝা তাঁর কাঁধ থেকে নেমে গেল। প্রথম বারের চেয়েও যেন এবার বেশি সপ্রতিভ বোধ করল সিয়াঙ লিনের বউ। আর কোনো কথার জন্য অপেক্ষা না করে শান্তভাবে বেরিয়ে গেল বিছানার পুঁটুলিটা নিয়ে। লুচেনের বাড়িতে চাকরানীর কাজে বহাল রইল সে।

সবাই তখনো তাকে সিয়াঙ লিনের বউ বলেই ডাকে।

যাহোক, অনেক পরিবর্তন হয়েছিল তার। তিন দিনও কাটেনি, বাড়ির কর্তা এবং গৃহিনী উভয়েই বুঝে নিলেন আগের মতো দ্রুতগতিতে সে আর কাজ ক'র না। কিছুই মনে রাখতে পারত না। তার নিষ্প্রাণ মুখের অবয়বে একটিও হাসির রেখা ফুটত না। কাকী সন্তুষ্ট হননি এটা প্রকাশ পেল অল্প দিনের মধ্যেই। এবার যখন মেয়েটি এল আগের মতো এবারও কাকা ভুরু কুঁচকে ছিলেন কিন্তু চাকর-বাকর নিয়ে এতদিন খুব অসুবিধে ভোগ করছিলেন বলেই তেমন আপত্তি জানাননি তিনি। কেবল গোপনে কাকীকে সাবধান করে দিয়েছিলেন এই বলে, এদের দেখে মনে দয়ার উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু নীতিগত ভাবে এদের সংস্পর্শ মোটেই সুখকর নয়। সাধারণ কাজকর্ম করবে আপত্তি নেই কিন্তু বলির উৎসবের প্রস্তুতির কাজে কোনোমতেই হাত দিতে দেওয়া চলবে না তাকে। এসব কাজ করবে বাড়ির লোক নিজেরা—নইলে অপবিত্রতার দোষে পিতৃকুল অসন্তুষ্ট হবেন, তাদের পূজা গ্রহণ করবেন না।

আমার কাকার পরিবারে পিতৃকুলের নামে উৎসর্গের উৎসব দিনগুলি বছরের বিশেষ দিন। সে সময়টার আগে সিয়াঙ লিনের বউকেই বিশেষ করে ব্যস্ত থাকতে হতো এক সময় কিন্তু আর সে দিন নেই, কিছুই আর তার করবার নেই। হলঘরের মাঝখানে টেবিলটা পেতে জানলার পর্দাগুলো ঠিক মতো টাঙানোর পর তার ঠিক মনে পড়ে, সেকালে কেমন করে মদের গ্লাস আর চপস্টিক সাজিয়ে রাখত টেবিলে। সে এগোয়, হাত বাড়ায় সে কাজের দিকে।

—ওগো বাছা, সিয়াঙ লিনের বউ, ওসব থাক। কাকী বলে উঠলেন তাকে বাধা দিয়ে। ও আমি করব।

অপ্রতিভ হয়ে লাজুক ভাবে হাত সরিয়ে নিতো সে। মোমবাতি জ্বালাতে যেত।

—ওগুলোও থাক, সিয়াঙ লিনের বউ। আবার বাধা দিতেন আমার কাকী। মোমবাতি আমি জ্বালবখন।

এদিক ওদিক ঘুরে কিছুই আর করবার থাকে না তার, ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। চুল্লির ধারে বসে আগুনে কাঠ যোগানো, এই হলো তার সেদিনকার সারাদিনের কাজ।

শহরের লোকেরাও তখনো তাকে সিয়াঙ লিনের বউ বলেই ডাকত কিন্তু এইবার ডাকবার ভঙ্গি আর গলার স্বর একটু অন্যরকম। তারা কথা বলত তার সঙ্গে কিন্তু আন্তরিকতার অভাব থাকত। সে কিছু মনে করত না, কেবল সবার মুখের দিকে সোজা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত। বলে যেত সবাইকে তার কাহিনী—কি রাত, কি দিন, এ কাহিনী তার মন থেকে যেত না কখনো…

—আমি বোকার মতো কাজ করেছিলাম, সে বলত সবাইকে। জানতাম যখন বরফ পড়ে, বুনো জন্তুরা খাবারের খোঁজে জঙ্গল আর পাহাড় ছেড়ে মানুষের বস্তি গ্রামে আসে কিন্তু জানতাম না, বসন্ত কালেও ওরা নেমে আসে। সেদিন সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে রেখে বাইরে বেরিয়েছিলাম। একঝুড়ি কড়াই দিয়ে আমার ছেলে আহ মাও'কে দাওয়ার বাইরে গিয়ে বসতে বলেছিলাম। ওখানে বসে বসে খোসা ছাড়াবে। সে খুব বাধ্য ছেলে, যা বলতাম তাই করত। সেদিনও আমার কথা মতো বাইরে গিয়ে বসেছিল। আমি কাঠ কুড়ুব আর রান্নার চাল ধুয়ে আনব বলে বাড়ির পেছন দিকে গিয়েছিলাম। চাল হাঁড়িতে চাপিয়ে সঙ্গে কড়াই সেদ্ধ করব মনে করে ছেলেকে ডাকলাম ভেতরে আসতে কিন্তু কোনো সাড়া এল না; যখন দেখবার জন্য বাইরে গেলাম, দেখলাম কেবল কড়াইগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। আহ মাও নেই। প্রতিবেশীদের বাড়িতে সে কখনো খেলতে যেত না; তবু যেখানেই খুঁজতে গেলাম কোথাও তার হদিশ মিলল না। আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম, যাকে পেলাম তাকেই খোসামোদ করতে লাগলাম আমার ছেলেকে খুঁজে দিতে। সবদিক খুঁজে-পেতে সন্ধ্যার দিকটায় পাহাড়ি উপত্যকার জলা জায়গাটায় খুঁজতে গিয়ে ছেলের পায়ের একপাটি জুতো পেল। যারা খুঁজতে গেছল তারা বুঝতে পারল ছেলে নিশ্চিত নেকড়ের পেটে গেছে। তাই হলো। তারা জঙ্গলের ভেতর ঢুকে দেখল ধড়টা পড়ে আছে, পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি সব খেয়ে ফেলেছে, ঝুড়িটা কিন্তু তখনো হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা…

এইপর্যন্ত বলেই সে আর পারে না, কাঁদতে থাকে, তার কণ্ঠস্বর বন্ধ হয়ে আসে।

বার বার উচ্চারিত এই কাহিনী কিছু কাজে এল। এরপর যারাই শোনে সবাই তাদের হাসি বিদ্রূপ বন্ধ করে, ভারাক্রান্ত মনে নিজের পথে চলে যায়। মেয়েরাও তাকে শুধু ক্ষমাই করে না, বিদ্রূপাত্মক মনোভাবও তারা ভুলে যায়। তার চোখের জলে সবার চোখের জল এসে মেশে। কিছু বৃদ্ধা রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার কাহিনী শোনেনি, একদিন তারাও তার বাড়ি যায় তার দুঃখের

কথা শুনতে। বলতে বলতে তখন তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, চোখ ফেটে জলের ঝর্ণা নেমে আসে। কেউ পারে না সংবরণ করতে, চোখের জলে তাদেরও বুক ভাসে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে নীরবে তারা চলে যায় নিজ নিজ ঘরে।

তার কাহিনী সে বার বার শোনাবে, সবাইকে শোনাবে, একে ওকে তাকে জড় করে শোনাবে। এইটুকুই কেবল ছিল তার চাওয়া কিন্তু কিছুদিনের ভেতরই তার এই কাহিনী সবার মুখস্থ হয়ে যায়। আর কারো চোখে জলও আসে না। শহরের প্রত্যেকটি লোক পারে তার কাহিনী বর্ণনা করতে, কেউ আর শুনতে চায় না, বিরক্তি আসে, তারা ক্রুদ্ধ হয়।

—সত্যি আমি খুব বোকামি করেছিলাম···তবু সে বলতে চায়।

—হ্যাঁ, তুমি জানতে কেবল বরফ পড়বার সময়ই পাহাড়ে জন্তুদের খাবার থাকে না। তাই ওরা প্রথমে আসে খাবার খুঁজতে···তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে তারা। তারপর চলে যায় যে যার পথে।

হাঁ করে সে দাঁড়িয়ে থাকে। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তারপর সেও চলে যায় তার পথে। যেন সেও অপ্রতিভ বোধ করে। তবু মন থেকে যায় না ঐ চিন্তাগুলি। মনকে বিক্ষিপ্ত করতে চায়—ঐতো একটা ঝুড়ি, কিছু কড়াই, প্রতিবেশীদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা, এমনি আরও কত কি! তবু ঘুরে ফিরে তার সেই আহ্ মাও-র কথা। দু'বছর বা তিন বছর বয়সের কোনো শিশু দেখলেই বলে ওঠে—হা ভগবান! আহ্ মাও বেঁচে থাকলে এমনি বড়োটি হতো আজকে··· !

তার চোখের দৃষ্টি দেখলে শিশুরা ভয় পায়, মায়ের আঁচল ধরে মুখ লুকিয়ে নেয়। আবার তেমনি সেই নিঃসঙ্গ একা, হতাশ মনে চলে যায় সে সবার পরিবেশ ছেড়ে। দিনে দিনে সবাই বুঝে নিল তাকে। একটি শিশুকে তার কাছে আসতে দেখলে বিদ্রূপ করে কেউ কেউ বলে—কিগো সিয়াঙ লিনের বউ, তোমার আহ মাও বেঁচে থাকলে ঠিক এই ছেলেটির মতো বড়ো হতো তাই না গো ?

হয়তো সে বুঝতে পারত না, তার এই কাহিনী বলতে বলতে আর শুনতে শুনতে বাসি হয়ে গেছে সবার কানে, তারা বিরক্ত হয়, তারা তাকে বিদ্রূপ করে। তাদের চোখ-মুখের হাসিতে বিদ্রূপের ইঙ্গিত সে বুঝতে পারে। কখনো কিন্তু কোনো কথা বলে না। শুধু তাকিয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল করে। কোনো কথার জবাব দেয় না।

লুচেনের মানুষেরা নববর্ষের উৎসব পালন করে বেশ ঘটা করে। দ্বাদশ মাসের কুড়ি তারিখ থেকেই শুরু হয় তাদের প্রস্তুতিপর্ব। সেবছর আমার কাকার বাড়িতে অল্পদিনের জন্যে একজন কাজের লোক রাখবার দরকার হলো। কেননা, গোছগাছ করবার অনেক কাজ তখনো বাকি। তাই আর একজন

মেয়েছেলে ঠিক করলেন।
মেয়েটির নাম লিউ মা। হাঁস মুরগী বলি দিতে হবে। কিন্তু লিউ মা ভক্ত মানুষ, জীব হত্যা করতো না, মাংস ছুঁতো না, সে কেবল পুজোর বাসন মাজতে রাজি হলো। সিয়াঙ লিনের বউ কেবল উনান জ্বালানোর কাঠ জোগায়। বেশি কাজ থাকে না, বসেই থাকে অধিক সময়, বিশ্রাম নেয়। লিউ মা পুজোর বাসন মাজে, তাই সে বসে বসে দেখে।
কিছু হালকা মতন বরফ পড়তে শুরু করেছে তখন।
—আমি কী বোকামিই না করেছিলাম···আপন মনেই বলতে থাকে সিয়াঙ লিনের বউ। বিস্ফারিত দৃষ্টি থাকে আকাশের দিকে, বুক চিরে বেরিয়ে আসে দীর্ঘনিঃশ্বাস।
—কিগো সিয়াঙ লিনের বউ, আবার বুঝি শুরু করলে। কেমন অধৈর্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলে লিউ মা—বলছি শোন, তোমার কপালের ঐ কাটা দাগটা কিসের গো, ঐ তখন হয়েছিল নাকি ?
—তা, তা···কি জানি, জানিনা। সে এড়িয়ে যায়।
তোমায় জিজ্ঞেস করছি, বলি রাজি হয়েছিলে কেন ?
—কে, আমি ?
—হ্যাঁ। আমার মনে হয় নিশ্চয় তুমি রাজি ছিলে, নইলে···
—তুমি জাননা, কত জোর ছিল ওদের গায়।
—ও আমি বিশ্বাস করি না। ওদের গায়ে এত জোর ছিল তুমি ঠেকিয়ে রাখতে পারোনি, এটা একটা কথা হলো। নিশ্চয় তোমারও ইচ্ছে ছিল—ওদের গায়ের জোর, এটা তোমার একটা অজুহাত।
—একবার গিয়ে দেখই না নিজে। মুখে একটু ক্ষীণ মুচকি হাসির রেশ।
লিউ মা'র কুঞ্চিত মুখের উপরও মুচকি হাসির একটা ঝলক ফুটে উঠল। তার পুঁতির মালার মতো ছোট ছোট দুটি চোখের দৃষ্টি সিয়াঙ লিনের বউয়ের কপালের উপর বুলিয়ে নিয়ে নিবদ্ধ হলো চোখের উপর। যেন কেমন অপ্রস্তুত হয়েই সিয়াঙ লিনের বউয়ের মুখের হাসির ভাব মিলিয়ে যায়। লিউ মা-র দৃষ্টি এড়িয়ে বাইরে বরফের দিকে তাকিয়ে থাকে।
—জানো সিয়াঙ লিনের বউ, তুমি কিন্তু ওটা ভালো করনি। লিউ মা কেমন একটা রহস্য ঘন ভাব নিয়েই যেন বলতে লাগল ঃ তুমি যদি আরো একটু টিকে থাকতে, না হয় মরেই যেতে, তাহলেও কিন্তু ভালো হতো তোমার। ব্যাপারটা দাঁড়ালো কি যে কমসে কম দুটি বছরও দুই নম্বর স্বামীর ঘর না করে ভীষণ অপরাধী হয়ে রইলে তুমি। মনে করে দেখ ঃ ভবিষ্যত তুমি যেন নরকে গেছ, তখন এই দু জনার প্রেতাত্মা তোমাকে নিয়ে আপোষে লড়াই করবে। তখন কার কাছে তুমি যাবে বল তো ? নরকের রাজার তখন আর কোনো উপায় থাকবে না, বাধ্য হয়ে তোমাকে কেটে দু টুকরো করবে,

ভাগ করে দেবে দু জনার মধ্যে। তখন...
কেমন একটা ভয়ের ছায়া নেমে আসে সিয়াঙ লিনের বউ-র চোখে, মুখে। এরকম কথা তো সে শোনেনি কখনো এ পাহাড়িয়া অঞ্চলে।
বহুদিন থেকে সিয়াঙ লিনের বউ আর কথা বলত না কারো সঙ্গে. কেউ তার আহ মাও-এর কাহিনী সহজ ভাবে নেয়নি বলে। কখনো সে জবাব দিত না কারো প্রশ্নে, কেবল স্থির নেত্রে তাকিয়ে থাকত প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে। সারাদিন ঠোঁট দুটি শক্ত করে বন্ধ করে রাখত। নীরবে সে তার কাজ করে যেত, দোকানে যেত, ঘর ঝাড়ু দিত, শাকসবজি কাটা-ধোয়া, কখনও বা ভাত রান্না করত।
পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে বলিদানের উৎসব দিনে নিজেকে সে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করতে চাইল। পূজোর বাসন নিয়ে আহ লিউ-এর সঙ্গে যখন কাকিমা যাচ্ছিলেন আর হলঘরে যখন টেবিলটি বসানো হলো মনে বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়েই মোমবাতি আর চপস্টিক আনবার জন্য ঠিক আগেকার মতো এবারও সে এগিয়ে গেল।
—ওগুলো তোমাকে ধরতে হবে না, সিয়াঙ লিনের বউ। কাকিমার ব্যস্ত কণ্ঠস্বর।
যেন আগুনের তাপ লেগেছে, চট করে সিয়াঙ লিনের বউ তার হাত সরিয়ে নিল, মুখের চেহারা ছাইয়ের মতো হয়ে গেল। মোমবাতিতে হাত না দিয়ে কেমন বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কাকা ধুপ জ্বালাতে এসে যখন তাকে যেতে বললেন, চুপচাপ সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।
এইবার শুরু হলো তার পরিবর্তন। পরদিনই তার চোখ দুটি কেবল বসে গেল না, সমস্ত উদ্দীপনা যেন একেবারে নিভে গেল। উপরন্তু কেমন যেন একটা ভীরু ভীরু ভাব এসে গেল তার ভেতর। অন্ধকার আর ছায়া যেকোন একটা দেখলেই সে ভয়ে আঁৎকে উঠতো, কারো দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারত না। এমন কি বাড়ির কর্তা বা গৃহিনীকেও কেমন যেন ভয় হতে লাগল তার। দিনের আলোয় গর্তের বাইরে এসে ইঁদুর যেমন ভয় পায় ঠিক তেমনি। সবার সামনে প্রাণহীন কাঠের পুতুলের মতো স্থির হয়ে বসে থাকত। ছয় মাসও কাটেনি, তার মাথার চুলে পাক ধরে গেল, স্মৃতিশক্তি দুর্বল হলো, রেঁধে খাওয়ার কথাও সে ভুলে যেতে লাগল।
—সিয়াঙ লিনের বউ-এর হলো কী ? ওকে কাজে না নিলেই ভালো ছিল। কাকিমা বিড় বিড় করতেন ওর সামনেই।
এমনি ভাবে দিন কাটতে লাগল। সুস্থ হয়ে শুধরে উঠবার কোনো লক্ষণই প্রকাশ পেল না। তাঁকে বিদায় করে দেবার সিদ্ধান্তই করলেন শেষপর্যন্ত। মিসেস ওয়েই-এর বাড়িতে চলে যেতে বললেন তাকে। আমি যতদিন লুচেনে ছিলাম তখন তাঁরা শুধু এ ব্যাপারে আলোচনাই করছিলেন কিন্তু পরে যা

ঘটেছিল শুনেছিলাম, তা থেকে এটাই মনে হয় যে তখনই তাঁরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবে আমার কাকার বাড়ি ছেড়ে যাবার পর থেকেই সে ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় নিয়েছিল নাকি মিসেস ওয়েই-এর বাড়িতে গিয়েছিল তারপর ভিক্ষার পথে নেমেছিল সে আমি জানিনা।

•

কাছাকাছি কোথাও আতস-বাজির আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তেলের প্রদীপের হলুদ রঙের আলো আমার চোখে পড়ল। বলিদান উৎসব উপলক্ষে আমার কাকার বাড়ি তখন আতস-বাজি ফুলঝুড়িতে রাঙা, তারই মুখর শব্দ শুনছিলাম। ভোর হয়ে গেছে বুঝতে পারলাম। কেমন হতভম্ব হয়ে স্বপ্নের ঘোরে শুনতে পাচ্ছিলাম আতস-বাজির বিভ্রান্তিকর বিচ্ছিন্ন আওয়াজের একটা স্রোত ধোঁয়ার জালের মতো আকাশে উঠে সারাটা আকাশ মেঘের ছায়ায় ছেয়ে গিয়েছে আর ধীরে ধীরে সারাটা শহরময় যেন ঐ টুকরো টুকরো মেঘ বরফের পালকের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। এমনি মিশ্রিত শব্দজালে আচ্ছন্ন হয়ে ভোরের আমেজে গা এলিয়ে দিয়ে আমার বোধ হচ্ছিল, যে সন্দেহটা সেই ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমাকে জাপটে ধরেছিল তা যেন উৎসবের পরিবেশের ছোঁয়ায় কোথায় ভেসে গেছে। আমি অনুভব করলাম, এই পুজোর বলির অর্ঘ্য আর ধুপ-ধুনোর আরতি নিশ্চয় পৌঁছেছে স্বর্গমর্তের দেবতার কাছে। তাঁরা গ্রহণ করেছেন। আকাশের ঐ পেছন থেকেই বুঝি লুচেনের মানুষগুলির উপর বর্ষণ করবার জন্য অফুরন্ত সৌভাগ্যের ডালা তাঁরা সাজিয়ে চলেছেন।

The New Year's Sacrifice
February 7, 1924.

সেবার উত্তর থেকে দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে যাবার পথে প্রথম আমাদের গ্রাম এবং পরে স-শহরের দিকে একটু বাঁক নিয়েছিলাম। এই শহরটি আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় মাইল দশেক দূরে। ছোটো নৌকোয় আধা দিনের চেয়েও কম সময়ের পথ। ওখানে একটি স্কুলে আমি বছর খানেক মাস্টারি করেছিলাম। তখন শীতের প্রাবল্যে তুষারপাতের পর প্রকৃতি কেমন বিমর্ষ বিবর্ণ। আলস্য এবং দেশে ফিরবার আকুলতা এই দুই মিলে শেষপর্যন্ত আমাকে সেখানকার লো জু সরাইখানায় (যে সরাইখানা—তখনকার দিনে ছিল না) ক'টা দিন কাটিয়ে যেতে বাধ্য করল। শহরটি খুবই ছোটো। পুরনো কোনো সহকর্মীর সঙ্গে দেখা হবে মনে করে তাদের কারো কারো খোঁজ করলাম। অনেকদিন তারা এদিক ওদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। স্কুলটার সামনে দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম, স্কুলের নাম চেহারা দুটোই বদলে গেছে। নিজেকে ভীষণ অচেনা বহিরাগত মনে হলো। দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই সব উৎসাহ উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে গেল। কেন এলাম! এই কথাটা ভেবে আমি নিজেকেই ভর্ৎসনা করতে লাগলাম।

যে সরাইখানায় উঠেছিলাম, সেখানে কেবল ঘর ভাড়া পাওয়া যায়, খাবার দেয় না। বাইরে থেকে ভাত-তরকারি আনিয়ে নেওয়া চলে। কিন্তু সেসব একেবারে অখাদ্য, কাদার মতো বিস্বাদ। জানলার বাইরে কেবল একটা পুরনো এবড়ো-খেবড়ো শ্যাওলায় ঢাকা দেওয়াল নজরে পড়বে। মাথার ওপর স্লেট রঙের ঘোলাটে আকাশ, একেবারে ফ্যাকাসে সাদা, ছোঁয়াচও নেই কোনো রঙের। একটু হালকা মতো তুষার পড়তে শুরু করেছে সেদিন। একটা মামুলি ধরনের লাঞ্চ খেয়ে নিয়ে দিনটা শুরু করেছিলাম। সময়টা কাটাবার জন্যে কোনো কাজ বা কিছুও ছিল না হাতে। কাজেই সেকালে যেতাম, খুবই পরিচিত একটা ছোট্ট মদের দোকানের কথা মনে এল। দোকানটির নাম 'এক পিপের ঘর'। হোটেল থেকে খুব দূর হবে না হিসেব করে দেখলাম। ঘরে তালা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম ঐ শুঁড়িখানায় যাব বলে। আসলে এখানে থাকবার একঘেয়েমিটা কাটাবার জন্যই ঐরকম সিদ্ধান্ত নিলাম। মদ খাওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না। গিয়ে দেখলাম এক পিপের ঘর ঠিক সেইখানেই আছে। বেশ সরু ছাঁচে ঢালা সামনেটা, আধা-ভাঙা সাইনবোর্ডটা তখনও তেমনি অপরিবর্তিত। কিন্তু মালিক থেকে শুরু করে বেয়ারা পর্যন্ত একটি মানুষকেও চিনলাম না। এক পিপের ঘরে

এদেশও নিজেকে সম্পূর্ণ অচেনা, বিদেশী মনে হলো। তবু অতি পরিচিত সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় সেই ছোট্ট কোণটিতে হাজির হলাম। পাঁচটা ছোটো ছোট কাঠের টেবিল তখনও ঠিক তেমনি অপরিবর্তিত। শুধু পেছন দিককার জানলাটা, যেখানে কাঠের জাফরি ছিল সেটা বদলে কাচের শার্সি বসেছে।

—এক বোতল হলুদ মদ। খাবার ? গোটা দশেক ভাজা বিন-কার্ড আর তার সঙ্গে বেশ কিছুটা লঙ্কার আচার! এতেই চলবে।

আমার পেছন পেছন যে বেয়ারাটি এসেছিল, তাকে অর্ডার দিয়ে পেছন দিককার জানলার ধারে একটা টেবিলে গিয়ে বসলাম। দোতালার ঘরটি তখন একদম ফাঁকা। যার জন্যে সবচেয়ে সেরা টেবিলটা দখল করতে সক্ষম হলাম। সেখানে বসে নিচে পরিত্যক্ত প্রাঙ্গণটি এবং বাইরেটা আমি বেশ স্পষ্ট দেখতে পারছিলাম। বাইরের প্রাঙ্গণটা বোধহয় শুঁড়িখানার দখলে নয়। সেকালেও অনেকদিন আমি ঐ খোলা প্রাঙ্গণটির দিকে তাকিয়ে থাকতাম, বিশেষ করে অনেকদিন তুষার পড়লেও। উত্তর অঞ্চলের নৈসর্গিক দৃশ্যের সঙ্গে পরিচিত আমার দুটো চোখের কাছে এমনি দৃশ্য খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, বৈচিত্র্যময়। কয়েকটা কুল গাছে অজস্র ফুল ফুটেছে! শীত ঋতুকে যেন আমলই দেয়নি। তাছাড়া আঙ্গিণার এক কোণে ভেঙেপড়া মণ্ডপের কাছে সেদিনকার সেই ক্যামেলিয়া তেমনি একক স্থির দাঁড়িয়ে তখনও। তারই ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে কয়টি গোলাপী রঙের ফুল। বরফের গায় যেন জ্বলছে ক্রুদ্ধ উদ্ধত উজ্জ্বল অগ্নিচ্ছটা। বিস্মিতের বিস্ময়ের কাছে অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল এখানকার নিচের ঐ বরফের স্তূপ তো ভেজা, আলোয় জ্বলছে চিকচিক করে. উত্তরে ধবধবে সাদা শুকনো বরফ থেকে অভিন্ন—যেগুলো ঝড়ো হাওয়ায় ভেঙে চুরচুর হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আকাশময় ঘন কুয়াশার আকারে...

—আপনার মদ, স্যার...বেয়ারা বলল। কাপ, চপস্টিক, মদের পাত্র আর খাবারের ডিস রাখল টেবিলের ওপর।

মদ দিয়ে গেল। টেবিলের দিকে মন দিলাম। সব গুছিয়ে নিয়ে কাপে মদ ঢেলে নিলাম। আমার মনে হতে লাগল যেন আমি নিশ্চয়ই উওরাঞ্চলের বাসিন্দা নই। অথচ দক্ষিণে এসে নিজেকে লাগে বহিরাগত। ওখানে শুকনো বরফ গুড়োগুড়ো পাউডারের মতো আকাশে ওড়ে। আর এখানে বরফ নরম। গায়ে যেন সাপটে যায় অথচ দুটোই অপরিচিত লাগে আমার কাছে। একটু বিষণ্ণ মনে একটিবার আলতো ভাবে চুমুক দিলাম মদের পেয়ালায়। সত্যি খুবই খাঁটি মদ, বিন-কার্ড ভাজাটাও চমৎকার রেঁধেছিল। একটু দোষ লঙ্কার আচারটা। কেন যেন হালকা মতন। তবে এই স-শহরের লোকেরা বুঝি ঝালের স্বাদ জানেনা।

হয়তো বিকেল বলেই সরাইখানার পরিবেশ অসৌন তখনও। এর মধ্যেই

তিন পেয়ালা শেষ করে ফেলেছি, কিন্তু আমাকে বাদ দিয়ে ঐ ঘরে তখনও চারটি কাঠের টেবিল খালি। জনবিরল আঙ্গিনার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন নিঃসঙ্গ বোধ করছিলাম নিজেকে, অথচ আমি চাইনি অন্য কেউ আসুক এ ঘরে। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজে বিরক্ত বোধ না করে পারছিলাম না, কিন্তু যখন দেখলাম কেউ নয়, বেয়ারা, স্বস্তি বোধ করলাম। তারপর আরও দু পেয়ালা পান করলাম।

…এইবার নিশ্চয় কোনো খরিদ্দার এসেছে আমি নিজের মনে মনে বললাম। কেননা সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ ওয়েটারের চেয়েও ধীরগতি মনে হলো। যখন মনে মনে হিসাব করে ঠিক করে নিলাম যে পদশব্দ ঠিক সিঁড়ির মাথায় এসেছে, ঐ অনাকাঙ্ক্ষিত আগন্তুককে দেখবার জন্য মাথা উঁচু করে তাকালাম সেদিকে। চমকে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমি কখনও ধারণা করতে পারিনি যে সব জায়গা ছেড়ে এই শুঁড়িখানায় অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হবে আমার এক অতি পরিচিত পুরনো বন্ধুর সঙ্গে! অবশ্য সেও যদি বন্ধু বলে স্বীকার করতে রাজী থাকে এখনও। আগন্তুক আমার এক পুরনো সহপাঠী। যখন শিক্ষকতা করতাম সেসময় সে আমার সহকর্মীও ছিল। সে দেখতে অনেকটা বদলে গিয়েছিল তবু আমি প্রথমবার দেখেই তাকে চিনেছিলাম। কেবল তার চলাফেরার গতি একটু মন্থর হয়েছিল, সেকালের লুওয়েই-ফু্র পক্ষে যেটা খুবই অস্বাভাবিক।

—আরে, ওয়েই-ফু! তুমি! এখানে তোমার সঙ্গে দেখা হবে আশাই করিনি।

—ওহ, তুমি? আমিও তো…

আমার টেবিলে বসতে অনুরোধ করলাম তাকে। কিন্তু বেশ কিছুটা ইতস্ততার পর যেন বসতে রাজি হলো বলে মনে হলো। প্রথমে আমি একটু অবাক, কিছুটা আহতও বোধ করলাম। মনে মনে অসন্তুষ্টও হলাম। তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখি তার মাথার এলোমেলো চুল দাড়ি তখনও বজায় আছে। লম্বাটে মুখখানা কেমন ফ্যাকাশে, কিন্তু অনেকটা দুর্বল, রোগা লাগল। খুব শান্ত দেখলাম। কি জানি, হয়তো বা কিছুটা নির্জীব। কালো মোটা মোটা ভুরু-যুগলের তলায় চোখদুটি যেন তার স্বাভাবিক গতি-চঞ্চলতা হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু যখন সে ধীরে ধীরে ঐ নির্জন আঙিনাটার দিকে তার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল, অকস্মাৎ তার চোখ থেকে একটা তীক্ষ্ণ গভীর দৃষ্টি বিচ্ছুরিত হলো। যে দৃষ্টির সঙ্গে আমি আশৈশব স্কুল জীবন থেকে বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলাম।

—কী বলো, প্রায় দশ বছর আমাদের দেখা সাক্ষাৎ নেই, তাই না? বেশ প্রফুল্ল মনে অথচ কিন্তু বিদঘুটে ভাবে আমি বললাম: অনেকদিন আগে শুনেছিলাম তুমি সিনানে আছ, কিন্তু এমনি কুঁড়ে হয়ে গিয়েছি যে লিখবার সময়ই করে…!

—আমারও তাই। মাকে নিয়ে আজ প্রায় দু বছর ধরে আমি তাইওয়ানে আছি। সেবার মাকে নিতে এসে শুনলাম তুমি তখন চলে গিয়েছ, বরাবরের জন্যই নাকি।

—তাইওয়ানে কী করছ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—আমাদেরই স্বদেশী এক পরিবারে পড়াচ্ছি।

—তার আগে?

—তার আগে? পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করল। সিগারেটটা ধরাল তারপর মুখে দিল, ধোঁয়ার কুণ্ডলি বের করে তারই গতি লক্ষ্য করতে করতে সুচিন্তিত মনে বলল: শুধু নিস্ফল নিরর্থক খাঁটুনি মাত্র, কিছু না করবারই সামিল।

আমাদের ছাড়াছাড়ি হবার পর থেকে আমি কী করেছি সে-ও জানতে চাইল। মোটামুটি বললাম। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা পেয়ালা এবং চপস্টিক নিয়ে আসতে ওয়েটারকে বললাম, যাতে আমার টেবিলেই আমার বন্ধুটি শরিক হতে পারে। আরো দুই পাত্র মদ গরম করতে বললাম। কিছু খাবারেরও অর্ডার দিলাম। সেকালে আমরা আনুষ্ঠানিক ভদ্রতা জানতাম না, কিন্তু আজকে ঐ ভদ্রতাবোধ এমন করে চেপে ধরল যে, খাবার অর্ডার দিতে উভয়েই আমরা ইতস্তত করছিলাম, শেষপর্যন্ত ওয়েটারের পছন্দ মতোই খাবার বেছে নিতে হলো—মৌরিমশলা দেওয়া মটরশুঁটি, ঠাণ্ডা মাংস, ভাজা বিন-কার্ড এবং নোনা মাছ।

—এসেই বুঝতে পারলাম বোকামি করেছি। এক হাতে সিগারেট আর অন্য হাতে মদের পেয়ালা নিয়ে তিক্ত হাসির সঙ্গে সে বলল: যখন যুবক ছিলাম মাছি বা মৌমাছি কেমন করে কোথাও বসত লক্ষ করতাম। কোনো রকম ভয় পেলেই উড়ে যেত, কিন্তু কিছুক্ষণ চক্রাকারে ঘুরে আবার সেই পূর্বের জায়গায় ঘুরে আসত; ওটাকে নির্বুদ্ধিতা মনে করতাম, আবার দুঃখজনকও মনে হতো। কিন্তু কিছুটা দূর ঘুরে আমি নিজেই আবার ফিরে আসব এখানে, ভাবিনি কখনও। আর তুমিও আসবে তাও ভাবতে পারিনি। আরও কিছু দূরে গেলে কি পারতে না?

—বলা শক্ত। বোধহয় আমিও কিছুটা ঐ চক্রাকারে ঘুরেছি। কতকটা তিক্ত হাসি হেসেই বললাম: কিন্তু তুমি আবার ফিরে এলে কেন?

—খুব একটা তুচ্ছ ব্যাপারে। এক ঢোকে পেয়ালাটা খালি করে ফেলল, তারপর সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে চোখটা কিছুটা বিস্ফারিত করল। তুচ্ছ কাজ… কিন্তু তোমাকে বলতে পারি।

ওয়েটার নতুন করে গরম করা মদ আর খাবারের কয়েকটা ডিস এনে টেবিলে রাখল। ধোঁয়া আর ভাজা বিন-কার্ডের সুগন্ধে সারাটা দোতলার ঘর মোহিত হয়ে গেল। বাইরে তখন বরফ পড়ছিল ঘন হয়ে।

—তুমি বোধহয় জানতে, সে বলতে লাগল,—আমার একটি ছোটো ভাই তিন বছর বয়সে মারা গিয়েছিল, এইখানে গ্রামাঞ্চলে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। তার চেহারাটাও আমার স্পষ্ট মনে নেই, মার মুখে শুনেছি খুব নাকি মিষ্টি স্বভাব ছিল তার, আর আমার খুব প্রিয়পাত্র ছিল। এখনো তার কথা বলতে মার চোখে জল এসে যায়। গত বসন্তকালে আমাদের এক তুতো-ভাই জানিয়েছিলেন, নদীর ভাঙনে কবরের কাছাকাছি অনেক মাটি নদীতে নিয়ে গেছে, হয়তো কিছুদিনের মধ্যে কবরটাও নদীগর্ভে তলিয়ে যাবে ; আমাদের খুব তাড়াতাড়ি একটা কিছু ব্যবস্থা করা অবশ্য প্রয়োজন। মা খবরটা শুনেই ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠলেন, কয়েক রাত তাঁর ঘুম হলো না। তুমি বোধহয় জানো না, মা কিন্তু চিঠি পড়তে পারতেন। কিন্তু আমি কী করতে পারতাম ? আমার অর্থ ছিল না, সময়ও ছিল না। তাছাড়া করবার মতো এমন কিছু ছিলও না। নববর্ষের ছুটির সুযোগ নিয়ে এইতো মাত্র সেদিন দক্ষিণে এসে কবরটা সরাবার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছি।

সে আরো এক পেয়ালা গলাধকরণ করে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—উত্তর অঞ্চলে এরকম তুমি দেখতে পেতে ? কঠিন বরফের উপর ফুল ফোটে আর সেই বরফের নিচের মাটি জমে যায় না। পরশুদিন আমি একটা ছোট্ট কফিন কিনলাম, ধরে নিয়েছিলাম মাটির তলায় কফিনের হয়তো কোনো চিহ্নই পাব না, পঁচে গিয়ে থাকবে এতদিনে। তুলো, বিছানাপত্র এসবও নিলাম, চারজন মজুর ঠিক করলাম। সবকিছু নিয়ে কবর খুঁড়তে গ্রামের দিকে চলে গেলাম। হঠাৎ যেন আমার মনটা কেমন খুশিতে ভরে উঠল। কবর খুঁড়বো, যে ছোটো ভাই আমাকে এত ভালবাসতো তার দেহটা দেখতে পাব, সব মিলে একটু অদ্ভুত নতুন অনুভূতি জাগলো আমার মনে। নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা যখন কবরের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম, দেখলাম নদী এগিয়ে এসেছে খুবই কাছে, মাত্র ফুট দুই দূরে। গত দু বছর ধরে কবরে কোনো মাটি চাপান হয়নি, কাজেই অনেকটা বসে গিয়েছিল। আমি বরফের উপর দাঁড়িয়ে রইলাম, মজুরদের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে বললাম ঃ খুঁড়তে থাকো।

—আমি সত্যি একজন অতি সাধারণ মানুষ। সে বলে যেতে লাগল। বুঝতে পারলাম তখনকার ঐ পরিবেশে আমার কণ্ঠস্বর খুবই অস্বাভাবিক লাগছিল. আর ঐ যে হুকুম দিলাম এটাও যেন আমার জীবনের মস্তবড়ো একটা কাজ আমি করলাম। কিন্তু মজুরদের কোনো অদ্ভুত লাগল না। তারা কবর খুঁড়বার কাজে লেগে পড়ল। খুঁড়তে খুঁড়তে ঠিক কফিনের কাছে যখন পৌঁছল আমি তাকিয়ে দেখলাম কফিনের প্রায় কোনো চিহ্নই বর্তমান নেই, পড়ে ছিল কেবল কয়েকটা এ ও তা, আর কিছু কাঠের টুকরো। আমার হৃদপিণ্ড দ্রুতগতিতে স্পন্দিত হতে লাগল, ঐ টুকরোগুলি

আমি নিজেই খুব সতর্কতার সঙ্গে সরিয়ে রাখতে লাগলাম, এই আশা আমার ছোটো ভাইটিকে আবার দেখতে পাব। কিন্তু আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। বিছানা কাপড় চোপড়, এমন কি কঙ্কালটিও পর্যন্ত কোনো কিছুর কোনো চিহ্নই ছিল না। সব যেন মিলিয়ে গেছে কোথায়! মনে করলাম, নিশ্চয়ই সব পচে গেছে। শুনেছিলাম চুল নাকি কখনো পচে না, নিশ্চয়ই অন্তত কয়েকটা চুল দেখতে পাব। উবু হয়ে খুব সতর্কতার সঙ্গে মাটির ভেতর খুঁজে দেখলাম, সে দিকটায় বালিশটা ছিল কিন্তু একটিও চুল পেলাম না। কোনো চিহ্ন ছিল না।

হঠাৎ আমি লক্ষ্য করলাম, বন্ধুটির চোখ দুটো যেন কেমন লাল হয়ে উঠেছে, তক্ষুনি বুঝতে পারলাম ওটা সুরাপানের ফল। খাবারটা খুব কমই সে ছুঁয়েছে, কিন্তু তার মদ্যপান চলছিল অবিরাম। ততক্ষণে এক কেটির চেয়েও বেশি মদ সে গিলেছে, তার চোখমুখ এবং হাব ভাব সবই কেমন উত্তেজিত। সেকালে যাকে আমি লু ওয়েই-ফু বলে জানতাম তাকেই যেন ধীরে ধীরে আমি আবার ফিরে পেলাম। আমি বেয়ারাকে ডেকে আরো দু পাত্র মদ গরম করতে বললাম। ঘুরে বসে মদের পেয়ালা হাতে নিয়ে তার মুখোমুখি হয়ে বসলাম এবং নীরবে তার কাহিনী শুনে যেতে লাগলাম। সে বলতে লাগল :

সত্যি বলতে কি, কবরটাকে সরিয়ে নেবার আর কোনো প্রশ্নই থাকল না। মাটিটাকেই কেবল সমান করে দেওয়া আর নতুন কফিনটাকে বেচে দেওয়া, এই ছিল মাত্র আমার কাজ। কফিনটাকে বেচতে নিয়ে যাওয়া খুবই একটা অদ্ভুত লাগত বটে, তবু দামটা কমিয়ে দিলেই যেখান থেকে কিনেছিলাম সেই দোকানদারই খুশি হয়ে নিয়ে নেবে, আর আমিও কয়েকটা মুদ্রা বাঁচাতে পারব মদ কেনবার জন্য। কিন্তু তা করলাম না। কফিনের ভেতর বিছানাটা পেতে দিলাম, যেখানে আমার ভাইকে কবর দেওয়া হয়েছিল সেখানকার কিছুটা মাটি তুলোয় মুড়ে কফিনের ভেতর রাখলাম। যেখানে আমার বাবাকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল তারই পাশে বয়ে নিয়ে কফিনটাকেও কবর দিলাম। কফিনটার চার পাশে ইঁটের বেড়া দিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমার সারাটা দিন কেটে গেল। এই ভাবেই কাজটা শেষ করলাম। অন্তত মাকে ফাঁকি দিতে, তাঁর মনকে শান্ত করবার মতো ব্যবস্থা করা হলো। আরে…আরে…তুমি অমন করে তাকিয়ে আছ আমার দিকে! এতটা বদলে গেছি ভেবে ধিক্কার দিচ্ছো আমাকে। হ্যাঁ, আমার এখনো পরিষ্কার মনে আছে তুমি আমি দুজনে 'তুতেলারি' দেবতার মন্দিরে গিয়েছিলাম ঐ দেবতার দাড়ি উপড়ে ফেলতে। তারপর সারাটা দিন তর্ক করে কাটিয়েছিলাম কেমন করে সারা চীন দেশে একটা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনব! শেষপর্যন্ত দুজনে মিলে ঘুষোঘুষিও করেছিলাম। আর এখন সেই আমি এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি, সবকিছুকে

বয়ে যেতে দিচ্ছি, আপন মনোবৃত্তির আশ্রয় নিয়ে দিন কাটিয়ে দিতে চাইছি। অনেক সময় আমি ভাবি পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে যদি এখন আমার দেখা হয়, হয়তো তাহলে তারা বন্ধু বলেই স্বীকার করবে না আমাকে।

সে আরও একটা সিগারেট বের করল, দুই ঠোঁটে চাপ দিয়ে ধরে তারপর জ্বালাল। কথা সে আবার শুরু করল ঃ

তোমার মুখের ভাব দেখে মনে হয় তুমি এখনো আমার সম্বন্ধে আশাবাদী। স্বাভাবিক, আমি আগের চেয়েও অনেক স্থূলবুদ্ধি, কিন্তু কতকগুলো এমন কিছু এখনো আছে আমার ভেতর যা আমি উপলব্ধি করতে পারি। এই জন্যে তোমার কাছেই আমি কৃতজ্ঞতা বোধ করি, আবার মনে মনে অসোয়াস্তিও বোধ হয়। কি জানি আমার ভয় হয়, হয়তো আমি আমার সব পুরনো বন্ধুকেই, যারা এখনো আমার সম্বন্ধে আশা রাখে, হারিয়ে ফেলেছি···

বলতে বলতে সে থামল তারপর বার কয়েক সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে আস্তে আস্তে বলে যেতে লাগল ঃ

এই আজকেই, এখানে এই এক পিপে ঘরে আসবার একটু আগে একটা নিরর্থক তুচ্ছ কাজে ব্যাপৃত ছিলাম, অথচ এই তুচ্ছ কাজটুকু করতে আমি আনন্দ পেয়েছিলাম। সেসময় আমাদের বাড়ির পূর্ব দিকের প্রতিবেশী ছিল চাঙ ফু নামে একজন লোক। সে নৌকো চালাত। আহ সুন নামে তার একটি মেয়ে ছিল। সেকালে তুমি যখন আমাদের বাড়ি আসতে তখন হয়তো তাকে দেখে থাকবে। তবে সেসময় তোমার চোখে নাও পড়ে থাকতে পারে, কারণ বয়সে সে তখন খুবই ছোটো। দেখতেও তেমন ভালো ছিল না, এই বাদামী কৃশ ধরণের মুখখানা, রঙটাও তেমনি কেমন একটু ফ্যাকাশে, ঠিক চোখে পড়বার মতো নয় মোটেই। তবে তার চোখ দুটি ছিল অস্বাভাবিক রকম বড়ো বড়ো, লম্বা লম্বা চোখের পাতা, চোখের সাদা অংশ মেঘমুক্ত আকাশের মতো স্পষ্ট। উত্তর অঞ্চলের মেঘমুক্ত আকাশের কথাই বলছি, যখন কোনো হাওয়া বয় না, এখানে কিন্তু আকাশ তত পরিষ্কার লাগে না। মেয়েটা খুবই কাজের মেয়ে ছিল। কিশোর বয়সেই তার মা মারা যায়। তারই একটা ছোট্ট ভাই এবং বোনকে সে-ই দেখাশুনো করত। বাবাকেও দেখতে হতো। এসব কাজ সে বেশ নৈপুণ্যের সঙ্গেই করতে পারত। বেশ মিতব্যয়ী স্বভাবের ছিল, ফলে অল্পদিনের মধ্যেই পরিবারটা সচ্ছল হয়ে উঠেছিল। এমন কোনো প্রতিবেশী ছিল না যারা তার সুখ্যাতি না করত। চাঙ ফু নিজেও মেয়ের উপর খুবই সন্তুষ্ট ছিল। এবার যখন আসছিলাম ওর কথা আমার মার মনে পড়ে গেল। সত্যি বুড়োদের স্মরণ শক্তি খুবই প্রখর বলব। তাঁর মনে পড়ল সেসময় কোনদিন আহ সুন অন্য একটি মেয়ের খোপায় লাল রঙের মেকি ফুল দেখে নিজেও একটা পরতে চেয়েছিল। না পেয়ে নাকি সারা রাত কেঁদে ভাসিয়েছিল। এর জন্যে ওর বাবার হাতে মারও

খেয়েছিল খুব। চোখ দুটো বেশ লাল ফুলো ফুলো ছিল দুচারদিন এর জন্যে। সেকালে ঐসব কাগুজে মেকি ফুল বাইরের অন্য অঞ্চল থেকে আনত, আমাদের এই স-শহরে এইগুলো পাওয়া যেত না। তাই সে কী করে আশা করতে পারে বলো? তাই এবার যখন আমি আসছিলাম মা বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন ঐরকম দু গোছা কাগুজে ফুল কিনে ওকে দিয়ে যেতে।

ঐ কাজের ভার পেয়ে, সে বলতে লাগল, বিরক্ত তো হই নি, বরং খুব খুশি হয়েছিলাম। আহ সুনের জন্য কিছু করতে পারব ভেবে সত্যি আমি আনন্দ পেয়েছিলাম। গত বছরের আগের বছর আমি মাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছিলাম। একদিন চাও ফু বাড়িতে আছে জেনে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সে খিচুড়ি খাবার নিমন্ত্রণ করতে চাইল আমাকে। খিচুড়িতে তার বাড়িতে সাদা চিনি দেয়। নৌকোর মাল্লার ঘরে যদি সাদা চিনি থাকে তাহলে ভেবে দেখ, নিশ্চয় সে গরিব নয়। যাহোক, অনেক ভেবে ওর নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করেছিলাম। তবে একটা শর্ত ছিল, এক পাত্রের বেশি আমি কিছুতেই খাব না। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে ঐ অদ্ভুত বস্তুটি নিজের হাতে তৈরি করে আহ সুন যখন এক পাত্র এনে আমার সমুখে রাখল আমি দেখেই আঁৎকে উঠলাম। একটা বিরাট পাত্র ভর্তি। সারাদিন ধরে খেলেও বুঝি শেষ করতে পারব না। জীবনে এই বস্তুটি আমি খাইনি কোনোদিন। এইবার খেয়ে বুঝলাম একটা সত্যিকার অখাদ্য বস্তু। যদিও খুব মিষ্টি কিছুটা গলাধকরণ করলাম অতি কষ্টে, আর খাব না ঠিক করলাম। কিন্তু তক্ষুনি দেখলাম ঘরের এক কোণে আহ সুন দাঁড়িয়ে। তখন চপস্টিক নামিয়ে রাখতে পারলাম না। তার মুখের উপর আশা এবং আশঙ্কার ছাপ ফুটে উঠেছে লক্ষ করলাম। আশঙ্কা নিশ্চিত তার বোধহয় ভালো হয়নি, আর আশা এই যে আমি পছন্দ করব। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যদি বেশি ফেলে যাই নিশ্চিত সে নিরাশ হবে, মনে কষ্ট পাবে। কাজেই সাহস ফিরিয়ে আনলাম, মুখ খুলে হাঁ করে সবটুকু বস্তু ঢুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলাম। আমি বুঝতে পারলাম জোর করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে খাওয়ার কী কষ্ট। মনে আছে ছেলেবেলায় ক্রিমির জন্য একবাটি ওষুধের সঙ্গে লাল চিনি মিশিয়ে এক ঢোক সবটা গিলে ফেলতে আমার ঠিক এমনি কষ্ট হতো। তাহলেও, মনে মনে কোনো বিরক্তি বোধ করিনি। কারণ পাত্রগুলি নিয়ে যেতে এলে তার মুখে আধা লুকোনো পরিতৃপ্তির হাসি আমি দেখলাম তাই যেন আমার সকল কষ্টকে উন্মূল করে দিয়ে গেল। সেই রাত্রিতে, যদিও বদহজমের জন্য অনেক রাত্ত পর্যন্ত ঘুম হয়নি, আজে বাজে স্বপ্ন দেখেছি, তার জন্যে আমি সারা জীবনের সুখ কামনা করেছি এবং আশা করেছি তার মঙ্গল হবে। এইসব চিন্তাগুলি যেন আমার সেই পুরনো দিনের

স্বপ্নের রেশ মাত্র। পরমুহূর্তেই কেমন হাসি পেল, সঙ্গে সঙ্গে আমি সব ভুলে গেলাম।

তখন আমি জানতাম না যে, তার বিবৃতি চলতে লাগল, ঐ একগুচ্ছ কাগুজে ফুলের জন্যই মার খেতে হয়েছিল তাকে। কিন্তু মা যখন বললেন তখনি খিচুড়ি খাওয়ার নিমন্ত্রণের ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল। আমি বিশেষ তৎপর হলাম। প্রথম তাইওয়ানে খোঁজ করলাম, কিন্তু সেখানকার কোনো দোকানে দেখলাম না। কিন্তু যখন আমি সিনানে গেলাম…

জানলার বাইরে কিসের একটা খস খস শব্দ কানে এল। বরফের গায়ে নুয়ে পড়া ক্যামেলিয়ার ডাল থেকে ঝরে পড়া একতাল বরফের শব্দ। তাকিয়ে দেখলাম বরফের টুকরোগুলি ঝরে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই গাছের ডালগুলি আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল, আবার বেরিয়ে এল সবুজ পাতা আর গুচ্ছ গুচ্ছ লাল ফুলের সমারোহ। আকাশের স্লেট রঙ যেন আরো গাঢ় হয়ে এল। ছোটো ছোটো চড়ুই পাখির একটা দল কিচির মিচির করে উঠল, হয়তো সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে তাই। মাটি বরফে ঢাকা, খাবার কই, তাই বুঝি তারা ফিরে এসেছে নিজের বাসায়।

একমাত্র যখন আমি সিনানে গিয়েছিলাম…এক মুহূর্তের জন্য বন্ধুটি তাকাল জানলার বাইরে, পরমুহূর্তেই আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল ভেতরে, এক পেয়ালা মদ তলিয়ে গেল তার গলা দিয়ে, সিগারেটের ধোঁয়োর কুণ্ডলি বেরুল দু একবার, সে বলতে লাগল : তখনই ঐ লাল রঙের কাগজে ফুলের গুচ্ছ আমি পেয়েছিলাম। জানিনা ঠিক এই ধরনের ফুলের জন্যই সে মার খেয়েছিল কি না, তবু এইগুলো ভেলভেটের তৈরি বলেই আমি কিনে ফেললাম। এও আমি জানতাম না, গাঢ় রঙ না ফিকে রঙ কোনটা তার পছন্দ। তাই কিনলাম এক গোছা লাল এক গোছা গোলাপী দু গোছা ফুলই নিয়ে এসেছিলাম।

আজকেই বিকেলে, দুপুরের খাবার কিছু পর, চাঙ ফুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। এই জন্যই ঠিক একটা দিন বেশি থেকে গেলাম এখানে। বাড়ির ঠিকানা ঠিকই ছিল তবে বাইরে থেকে বাড়িটা কেমন গুমোট লাগল। কি জানি, হয়তো বা ওটা আমার কল্পনা। তার ছেলে এবং দ্বিতীয় কন্যা আহ চাও তখন দরজায় দাঁড়িয়ে। দুজনেই বেশ বড়োটি হয়েছে দেখলাম। আহ চাওকে তার বড়ো বোনের চেয়ে অন্যরকম লাগল। অনেকটা বেশ সাদা-সিধে। যখন আমাকে তাদের বাড়িতে ঢুকতে দেখল, সে ছুটে পালিয়ে গেল বাড়ির ভিতর। ছোটো ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, চাঙ ফু বাড়ি ছিল না। তোমার দিদি ? বিস্ফারিত চোখে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে তাকে খুঁজছি কেন জানতে চাইল। তাছাড়া কেমন একটা হিংস্রভাব তার চোখমুখে। বুঝি আমাকে আক্রমণ করবে। একটু ইতস্তত

করে আর এগুলাম না। আজকাল কোনো কিছুকে আমি বাধা দিই না, বয়ে যেতে দিই। বলতে পার আপস মনোবৃত্তি…

তুমি ধারণা করতে পারবেনা, একটু থেমে সে আবার বলে চলল ঃ আগের চেয়েও আমি এখন কত বেশি ভয় পাই কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে! কারণ আমি ভালো করেই জানি, আমি কেমন অনাকাঙ্ক্ষিত। নিজেকেই আমার খারাপ লাগে। তাই মনে হয়, অকারণ নিজেকে চাপিয়ে দিচ্ছি অপরের উপরে? কিন্তু এবার সিদ্ধান্ত করল্লাম, এ কাজ আমাকে করতেই হবে। তাই কিছু একটা চিন্তা করে ঐ বাড়ির ঠিক বিপরীত দিকে একটা জ্বালানি কাঠের দোকানে গেলাম। দোকানদারের মা মিসেস ফা দোকানে ছিল তখন। আমাকে দেখেই চিনতে পেরে দোকানে গিয়ে বসবার জন্য আমাকে ডাকল। কয়েকটা এ-কথা ও-কথার পর আমার স-শহরে আসবার উদ্দেশ্য সবিশেষ বললাম তাকে। বললাম চাও ফুর সঙ্গে দেখা করব। হতবাক হয়ে গেলাম যখন সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল ঃ দুর্ভাগ্য! তোমার বয়ে আনা এ ফুলগুলো নেওয়ার সৌভাগ্য আহ সুনের আর হলো না।

সে আমাকে সব কথা খুলে বলল ঃ গত বছর বসন্ত কালেই আহ সুন যেন দিন দিন কেমন রোগা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মধ্যে কেমন কেঁদে কেঁদে উঠত। জিজ্ঞাসা করলেও কিছু বলত না। কোনো কোনো দিন সারা রাত কেঁদে কেঁদেই কাটিয়ে দিত। চাও ফু রেগে যেত, গালাগালি করত ঃ বলত এতকাল বিয়ে না করে মাথাটা বিগড়ে গেছে ওর। শরৎকাল শুরু হতেই প্রথম প্রথম তার একটু সর্দি হলো। পরে বিছানা নিল কিছুদিনের মধ্যেই, কিন্তু এরপর সে আর বিছানা ছেড়ে উঠল না। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে চাও ফুকে বলেছিল, ঠিক তার মায়ের মতোই তারও অনেকদিন থেকেই থুথুর সঙ্গে রক্ত উঠত। রাত্রে কাস হতো। এসব কথা সে লুকিয়ে রেখেছিল। পাছে ভয়ে বাড়ির সবাই বিব্রত বোধ করে। একদিন তার এক কাকা চাও কেঙ কিছু টাকা ধার চাইতে এসেছিল। ওরকম প্রায়ই নিত। এবার সে দিতে রাজি হয়নি। তার কাকা বিরক্ত হলো। তেতো হাসি হেসে বলে উঠল ঃ এত দেমাক ভালো না। তোমার মরদ আমার চেয়েও কেমন ভালো জানা আছে। খুব ব্যথা পেল আহ সুন কিন্তু বলল না কাউকে। শুধু কাঁদত গুমরে গুমরে। চাও ফু জানতে পেরে অনেক সান্ত্বনা দিল মেয়েকে কিন্তু সবই ব্যর্থ হলো। সেই সান্ত্বনা বাক্যে আস্থা রাখতে পারল না ঃ যা হবার হয়ে গেছে আর কিছু করবার নেই। আহ সুন বলত। তারপর একদিন সব শেষ। আঘাতটা বেজেছিল বেশি।

বুড়ি আমাকে আরো বলল, বলে যেতে লাগল—সত্যি বলতে কি, আহ সুনের জন্য নির্বাচিত ছেলেটি চাও কেঙ-এর চেয়ে ভালো ছিল সন্দেহ নেই।

আহ সুনের অন্ত্যেষ্টির সময় এসেছিল। বেশ পরিষ্কার ফিটফাট দেখতে। চোখের জল ফেলতে ফেলতে বুড়ি আরো বলল, বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করেছিল ছেলেটি আহ সুনকে বিয়ে করার জন্য, কিন্তু সবই বিফলে গেল। আর চেঙ কেঙ-এর সেই মিথ্যে কথাটা বিশ্বাস করে, ব্যর্থ মনে প্রাণটা দিল বেচারা আহ সুন।

—আমার কাজও ফুরিয়ে গেল সেই সঙ্গে। বন্ধু বলল : আমার কিনে আনা ঐ ফুলগুলি কী করব। আহ চাওকে দিয়ে দিতে আমি বুড়িকে অনুরোধ করলাম। সেই আহ চাও ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল আমাকে দেখে। ইচ্ছে ছিল না ফুলগুলো ওকে দিতে। তবু ওকেই দিতে বললাম। মাকে তো বলতে পারব ফুলগুলো দিয়েছি। ও পেয়ে খুশি হয়েছে। এইসব তুচ্ছ ব্যাপার কার তত মাথা ব্যথা। সবই না এড়াতে চায়। আমিও ভুলে যাব। আমিও আবার চলে যাব এখান থেকে কনফিউসীয় ক্লাসিক্স পড়াতে।

সে থামল। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : তুমি তাই পড়াতে নাকি ?

—নিশ্চয়! বন্ধু জবাব দিল। তুমি কি ভাবছিলে আমি ইংরেজি পড়াই ? প্রথমে আমার ছাত্র ছিল মাত্র দুজন। একজন পড়ত বুক অব সঙস আর অপরটি পড়ত মেনসিয়াস। হালে আরও একজন নিয়েছি, সে একটি ছাত্রী, সে পড়ে ক্যানন ফর গার্লস। আমি অঙ্ক পড়াই না। কোনোদিন পড়াব না তা নয়, আসলে তারা পড়তে চায় না।

—তুমি এইসব বই পড়াও আমি ভাবতে পারিনি। আমি বললাম।

—তাদের বাবার ইচ্ছে। আমি বাইরের মানুষ, আমার কাছে সবই সমান। এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কে ভাবে বলো ? কোনো গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন মনে করে না।

তার চোখমুখ কেমন লাল হয়ে উঠেছে! অত্যধিক মদ পান করে চোখের উজ্জ্বলতা কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। বলবার মতো কিছুই খুঁজে পেলাম না। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনলাম। বোধহয় কোনো খরিদ্দার এসেছে। প্রথম লোকটা কেমন বেঁটে গোল মুখ। দ্বিতীয়টি বেশ লম্বা তেমনি উন্নত নাসা, রক্তিম বর্ণ। তাদের পেছন পেছন আরও কয়েকজন। তাদের পায়ের ভারে দোতলার পাটাতন বুঝি কেঁপে উঠল। আমি লু ওয়েই-ফুর দিকে তাকালাম, সেও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। আমি ওয়েটারকে ডাকলাম বিল দেবার জন্য।

—তোমার মাইনেতে তোমার চলে ? যাবার জন্য প্রস্তুত হতে হতে আমি বললাম তাকে।

—মাসে কুড়ি ডলার পাই। ঠিক মতো চলতে গেলে যথেষ্ঠ নয়।

—তাহলে ভবিষ্যতে কী করবে ভাবছ ?

—ভবিষ্যতে ? জানি না। একবার ভেবে দেখ : অতীতে আমরা যে পরিকল্পনা করেছিলাম তার একটিও কি আশানুরূপ সার্থক হয়েছে ? কোনো কিছু সম্বন্ধে নিশ্চিত নই। এমন কি কাল কী করব তাও জানিনা, এমন কি পরমুহূর্তে'ও...

ওয়েটার বিল এনে আমার হাতে দিল। এবারও ওয়েই ফু তেমন ফরমালিটি দেখাল না, শুধু সিগারেট টানতে টানতে তাকাল। বিলটা আমাকেই পরিশোধ করতে দিল।

দু জনেই একসঙ্গে শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে এলাম। তার হোটেল আমার হোটেলের বিপরীত দিকে। তাই আমরা দরজায় এসে পরস্পরের কাছে বিদায় নিলাম। যেতে যেতে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া আর পেঁজা তুলোর মতো বরফ এসে পড়ছিল চোখেমুখে। তবু আমি বেশ স্বাচ্ছন্দ বোধ করতে লাগলাম। দেখলাম, আকাশ ততক্ষণে অন্ধকারাছন্ন। ঊর্ণনাভের জালের মতো ঘন বরফের আস্তরণে আকাশ ঘরবাড়ি পথঘাট সব যেন জড়িয়ে একাকার।

In The Wine Shop
February 16, 1924

একটি সুখী পরিবার

মানুষ যা অনুভব করে তাই সে লেখে : এ ঠিক সূর্যালোকের মতো। অসীম জ্যোতিষ্কের উৎস থেকে বিচ্ছুরিত। চকমকি পাথর আর লোহার ঘর্ষণে আগুনের ফুলকি নয়। একমাত্র এই হলো খাঁটি শিল্প। আর এমনি লেখকই সত্যিকার শিল্পী...কিন্তু আমি...আমি কোন পর্যায়ের ?

এইপর্যন্ত ভাবতে ভাবতে অকস্মাৎ সে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে পড়ল। পরিবার পোষণ করবার জন্য লিখে কিছু অর্থ উপার্জন করবার কথাটা তার হঠাৎ মনে এসেছিল। 'হ্যাপি মানথলি পত্রিকার প্রকাশকের কাছে তাই পাণ্ডুলিপি পাঠানোর সিদ্ধান্ত সে এর মধ্যে করে ফেলেছিল, কেননা মোটামুটি ভালো মজুরী ওরা দেয়। তবে এদের বেলায় রচনার বিষয়বস্তু নির্বাচন কিছুটা সীমাবদ্ধ এই যা, এই গণ্ডির বাইরে কিছু তারা গ্রহণ করে না। বেশ তো, হোক না সীমাবদ্ধ। যুব মানসে আজ কোনো কোনো মুখ্য সমস্যা আঁকু-পাঁকু করে ? নিঃসন্দেহে এ সমস্যা দুটো একটা নয়, হয়তো অনেক :

প্রেম, বিবাহ আর পরিবার এমনি অনেক কিছু···হ্যাঁ, নিশ্চয় এইসব প্রশ্ন বিভ্রান্ত করছে অনেকের মনকে, এখনো তার আলোচনা চলছে। তাহলে, পরিবারের সমস্যা নিয়ে লেখা? কিন্তু কেমন করে লেখা? নইলে তো লেখা ওরা নেবে না। কিন্তু নেবেনা এমনি কথা আগে থেকেই জপে রাখা কেন? তবু···

বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে দু চার পা হেঁটে সে তার টেবিলে গিয়ে বসল। সবুজ রঙের রুল টানা এক পৃষ্ঠা কাগজ বের করে নিল স্বচ্ছন্দে অতি সহজে লেখার শিরোনাম লিখল ঃ "একটি সুখী পরিবার।"

তারপর সঙ্গে সঙ্গেই তার কলম স্তব্ধ হয়ে গেল। সে মাথা তুলে সিলিংএর উপর দুই চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। এই সুখী পরিবারের কী পরিবেশ আর আবেষ্টনী হবে তাই স্থির করতে ভাবতে লাগল।

"পিকিং" সে ভাবল। "হবে না, খুব পুরনো চারদিকের আবহাওয়াটাও যেন একদম প্রাণহীন। ঐ পরিবারকে ঘিরে যদি চারদিকে উচু পাঁচিলও তুলে দেওয়া যায়, তাহলেও হাওয়াটাকে পৃথক করে রাখা সম্ভব হবে না, কখনো না, সে কখনো সম্ভব নয়। কিয়াংসু এবং চেকিয়াং-এর মধ্যে লড়াই লেগে যেতে পারে যেকোনো দিন, আর ফুকিয়েনের প্রশ্ন তো আর ওঠে না। জেচুয়ান? কোয়াঙটুঙ? এদের মধ্যে তো যুদ্ধ চলছেই। শানটুঙ আর হোনান হলে কেমন হয়? ওখানে পরিবারের কাউকে হয়তো বলপূর্বক হরণ করে নিয়ে যাবে, তাই যদি হয় তাহলে এই সুখী পরিবার অসুখী হবে। সাংহাই আর তিয়েনৎসিনের বিদেশী এলাকায়, বাড়ি ভাড়া খুবই বেশি··· বিদেশে কোথাও হলে কী হয়? উদ্ভট চিন্তা। আমি জানিনা ইউনান বা কোয়েইচাও জায়গাগুলি কেমন, তবে যাতায়াতের ব্যবস্থা খুবই খারাপ···"

সে তার মগজ ঘোলা করে ফেলল, একটা ভালো জায়গার নাম ভেবে ঠিক করতে না পেরে। আপাতত এ-কেই সাব্যস্ত করল। তারপর আবার সে ভাবতে লাগল ঃ

আজকাল অনেকে বিদেশী বর্ণমালার প্রথম বর্ণটা দিয়ে কোনো মানুষের বা কোনো জায়গার নাম রাখতে আপত্তি করে, বলে ওতে পাঠকের আগ্রহ কমে যায়। হয়তো, ঝুঁকি এড়িয়ে, আমার গল্পের কোনো কিছুর এমনি নাম না রাখাই ভালো এবারকার মতো! তাহলে ভালো জায়গা কোনটা হবে? হুউনানেও তো লড়াই চলছে; দাইরেণেও বাড়ি ভাড়া ইদানিং আবার বেড়ে গেছে। শুনেছি চাহার, ফিরিন এবং হেই লুঙকিয়াঙ-এ নাকি গুণ্ডার উপদ্রব আছে, তাহলে ওখানেও তো হবেনা!—

একটা ভালো জায়গার নাম ঠিক করতে আবার সে মগজ তোলপাড় করতে লাগল, কিন্তু সব নিষ্ফল; সুতরাং শেষপর্যন্ত ঐ এ—নামই সাময়িক ভাবে ঠিক করতে মনস্থ করল, যেখানে তার গল্পের সুখী পরিবার বাস করবে।

এই সুখী পরিবারকে অবশ্য এ-শহরে থাকতেই হবে। এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। স্বভাবতই এই পরিবারে থাকবে স্বামী আর স্ত্রী-গৃহকর্তা আর গৃহকর্ত্রী—যারা ভালোবেসে বিয়ে করেছে। তাদের বিয়ের দলিলে চল্লিশটার বেশি নানারকমের শর্ত আছে, যার জন্যে তাদের উভয়ের যেমন নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা আছে তেমনি ঐক্যও বর্তমান। উপরন্তু উভয়েই উচ্চশিক্ষা পেয়েছে এবং কৃষ্টি সম্পন্ন উচ্চ সমাজের মানুষ। জাপান ঘুরে আসা এখন আর ফ্যাশন নয়, কাজেই তারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ধরে নেওয়া যেতে পারে। বাড়ির কর্তা সবসময় বিদেশী পোশাক পরে, তার সার্টের কলার সবসময় তুষারের মতো সাদা রঙ থাকে। তার স্ত্রীর মাথার কোকড়ান চুল সবসময় চড়ুই পাখির বাসার মতো সামনের দিকটায় উঁচু করে থাকে, ধবধবে সাদা দাঁতগুলো কেবলি উঁকি দেয় কিন্তু সে পরে "চীনা পোশাক—"

—ওতে হবে না। ওতে হবে না পাঁচিশ কেটি!

জানলার বাইরে একটি পুরুষ কণ্ঠ শুনতে পেয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে তাকায় বাইরে। জানলার পর্দার ফাঁকে সূর্যের আলো চোখে পড়ে চোখ ঝলসে দেয়। টুকরো কাঠের বাণ্ডিল মাটিতে ছুঁড়ে ফেলবার আওয়াজ তার কানে আসে। "মরুক গে।" সে ভাবে আবার মুখ ঘুরিয়ে বসে, কিন্তু পাঁচিশ কেটি কী? তারা কৃষ্টিমান উচ্চ সমাজের মানুষ, শিল্পানুরাগী কিন্তু সুখী পরিবেশে উভয়েই মানুষ হয়েছে, তারা রুশীয় উপন্যাস পছন্দ করেনা। রুশীয় উপন্যাসে বেশির ভাগই নিম্নস্তরের মানুষের কথা থাকে। তাদের সমাজের সঙ্গে খাপ খায় না। পাঁচিশ কেটি! মরুক গে! তাহলে, কোন বই তারা পড়ে? বায়রনের কবিতা? কীট্‌স? ও চলবে না, কেউ নিরাপদ নয়—এই যা, ঠিক পেয়েছিঃ দুই জনেই আদর্শ স্বামী বইটা পড়তে খুব পছন্দ করে। যদিও আমি নিজে এই বইটা পড়িনি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাও বইটির এতো প্রশংসা করেন যে, আমি নিশ্চিত এ দুজনেরও নিশ্চয় ভালো লাগে। তুমি পড়ো, আমিও পড়ি—দুজনেরই একটি করে বইটি আছে, পরিবারে মোট দুখানা বই-—"

নিজের পেটের ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা মনে হতেই হাতের কলমটা নামিয়ে রাখে, হাতের উপর মাথার ভড় রাখে, যেন দুটো আক্‌সলের উপর ভূ গোলকটা ভর দিয়ে আছে।

—ওরা দুজন এখন লাঞ্চ খেতে বসেছে। ভাবে সে খাবার টেবিলের উপর বরফের মতো সাদা টেবিলক্লথ পাতা, পাচক খাবার নিয়ে এসেছে—চীন দেশীয় খাবার। পাঁচিশ কেটি'। কিসের? মরুক গে! চীন দেশীয় খাবার হবে কেন? পাশ্চাত্যের লোকেরা বলে থাকে চীন দেশীয় খাবারই নাকি অতি আধুনিক, স্বাদে সবার সেরা, সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর, পুষ্টিকর; তাই তারা চীন দেশীয় খাবারই খায়। প্রথম ডিস নিয়ে এসেছে, কিন্তু এই প্রথম ডিসটা

কিসের— ?

—জ্বালানী কাঠ—

চমকে উঠে সে মুখ ফিরে তাকায়, তার স্ত্রী তার বাম দিকে দাঁড়িয়ে, বিষণ্ণ দুখানা চোখ তারই মুখের উপর নিবদ্ধ।

—কী ? বিরক্তি মিশিয়েই সে প্রশ্ন করে, একে তার কাজে বাধা দিয়েছে, তাই।

—জ্বালানী কাঠ ফুরিয়ে গেছে, তাই কিছুটা আরো কিনেছি। গতবার কিনেছিলাম দশ কেটি দু শত চল্লিশ দিয়ে, কিন্তু আজকে চাইছে দু শত ষাট। দু শত পঞ্চাশ হলে ঠিক হয় না, কী বলো ?

—তাই, দু শত পঞ্চাশ, তাই দাও।

—ওজনটাও ঠিক দেয়নি। সে কেবলি ধরে আছে মোট সাড়ে চল্লিশ কেটি নাকি আছে, কিন্তু আমি যদি বলি সাড়ে তেইশ কেটি, তাহলে ?

—ঠিক আছে। সাড়ে তেইশ কেটিই ধরো।

—তাহলে, পাঁচ-পাঁচে হয় পঁচিশ, আর তিন পাঁচে পনেরো—

—হ্যাঁ, পাঁচ-পাঁচে পঁচিশ, আর তিন পাঁচে পনেরো—

—তাই, পাঁচ-পাঁচে পঁচিশ, আর তিন পাঁচে পনরো—

এর বেশি আর এগুতে পারে না সে, চুপ করে থাকে কিছুক্ষণের জন্যে। হঠাৎ কলমটা তুলে নিয়ে ঐ সবুজ কালির দাগ টানা যে কাগজটায় সে একটি সুখী পরিবার এই শিরোনাম লিখেছিল সেটা টেনে এনে লেগে পড়ে হিসাব কষতে। কিছুক্ষণ পর আবার বলে মুখ তুলে ঃ মোট পাঁচশত আশি মুদ্রা হয়েছে।

—তাহলে, অত তো আমার কাছে নেই ; আশি কি নব্বুই মতোন কম পড়বে বোধহয়—

টেবিলের ড্রয়ার টানে, সব কটা মুদ্রা বের করে আনে। কুড়ি বা ত্রিশ মুদ্রা। স্ত্রীর হাতে তুলে দেয় ঐ মুদ্রা কটা। তাকিয়ে দেখে স্ত্রী বেরিয়ে গেছে, তারপর আবার ঘুরে বসে টেবিলের ধারে। তার মাথার ভেতরটা যেন ফেটে যাচ্ছিল, ভেতরটা কতকগুলি ধারালো লোহার টুকরোয় যেন ভরতি। পাঁচ পাঁচে পঁচিশ—কতগুলো আরবীয় সংখ্যা যেন তখনো গিজ গিজ করছে তার মস্তিষ্কের ভেতর। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, আবার একটা গভীর নিঃশ্বাস ভেতরে টেনে নেয়, যেন এমনি ভাবেই মস্তিষ্কের ভেতর থেকে দূর করে দিতে পারবে এই ভাবনাগুলি, জ্বালানী কাঠ, পাঁচ পাঁচে হয় পঁচিশ, এমনি কতগুলো এখানে ওখানে ছড়ানো আরবীর সংখ্যা—এরা যেন লোহার শলার মতো গেঁথে আছে মাথার ভেতর। এখনি নিঃশ্বাস ফেলবার পর তার হৃদপিণ্ডটা যেন হালকা হয়ে আসে, আবার সে চিন্তা করতে ডুব দেয় ঃ

কোন্ খাবার ? আসে যায় না যদি কিছুটা ব্যতিক্রমও হয়। ভাজা শুয়োরের

মাংস, ভাজা চিংড়িমাছের ডিম, আর সামুদ্রিক শামুক, এগুলোতে তো কোনো বিশেষত্ব নেই, অতি মামুলী। আমি তাদের ড্রাগন এণ্ড টাইগার খেতে বলব। কিন্তু আসলে ওটা কোন পদার্থ? কেউ বলে সাপ আর বিড়ালের মাংস দিয়ে তৈরি, ক্যানটনের উচ্চশ্রেণীর মানুষদের খাবার, বড়ো বড়ো ভোজে দেয়। কিয়াংসুর একটা রেস্তোরাঁয় খাদ্য-তালিকায় ঐ বস্তুর নাম দেখেছি। তাই বলে কিয়াংসুর মানুষরা সাপ আর বিড়ালের মাংস খায় বলে ধরে নিতে পারি না। সুতরাং এটা নিশ্চয়, যেমন আর এক জনের মুখে শুনেছি, ব্যাঙ আর পাঁকাল মাছ দিয়ে তৈরি করে। তাহলে এই দম্পতি কোথাকার লোক বলে ধরে নেব? মরুক গে। মোট কথা, যে-অঞ্চলের মানুষই হোক, সুখী পরিবার যাতে নষ্ট না হয় সেজন্যে সাপের বা বিড়ালের মাংস (কিংবা ব্যাঙ অথবা পাঁকাল মাছ) যাহোক, নিশ্চয় খেতে পারে। যাহোক, তাদের খাবারে প্রথম দফায় থাকবে ড্রাগন এণ্ড টাইগার—কোনো সন্দেহ থাকবে না এ সম্বন্ধে।

এইবার এই ড্রাগন এণ্ড টাইগারের প্লেটটা টেবিলের মাঝখানে রাখা হলো, দুজন একই সঙ্গে তাদের চপস্টিক তুলে নিল, খাবারের ডিসটা দেখিয়ে দিল, একে অন্যের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল, তারপর বিড় বিড় করে কী বললে বিদেশী ভাষায়—

"তারপর আবার তারা তুলে নেয় চপস্টিক একই সঙ্গে দুজনে, দু এক গ্রাস সাপের মাংস মুখে তুলে নেয়—না, না, সাপের মাংস কথাটা ভারি বিশ্রী লাগে শুনতে; বরং বলি এক গ্রাস পাঁকাল মাছের মাংস। তাহলে এটাই ঠিক হলো, ড্রাগন এণ্ড টাইগার বস্তুটা ব্যাঙ আর পাঁকাল মাছের তৈরি। তারা একই সঙ্গে আবার দুই গ্রাস পাঁকাল মাছ মুখে দেয় দুজনে, যেন ঠিক একই পরিমাণ। পাঁচ পাঁচে হয় পঁচিশ, তিন পাঁচে—দুত্তোর মরুক গে। তারপর একই সঙ্গে মুখে দেয়—

নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও একবার পেছন দিকে ফিরে তাকাতে তার ইচ্ছে হলো, কারণ তার পেছনে কিসের একটা ভীষণ উত্তেজনার আভাস পাচ্ছিল সে, কাদের যেন আনাগোনা। তাহলেও সে জোর করে চেষ্টা করে গেল।

নিজের চিন্তার সূত্রকে আবার বিক্ষিপ্ত চিত্তে চেপে ধরল।

ব্যাপারটা যেন একটু বেশীরকম ভাবপ্রবণ লাগছে; কোনো পরিবার নিশ্চয় এরকম করবে না। এতটা অস্পষ্ট আমি হচ্ছি কিসের জন্য? আশঙ্কা করছি, এত সুন্দর বিষয়বস্তু নিয়ে লেখাই হবে না শেষপর্যন্ত—অথবা তাদের বিদেশ ফেরত হবার দরকারটাই বা কোথায়? চীন দেশে থেকে উচ্চ শিক্ষা পেলেই তো যথেষ্ট, একই তো কথা। দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, এতেই হলো, কৃষ্টিসম্পন্ন সেরা সমাজের মানুষ—পুরুষ লোকটি একজন

লেখক; মহিলাটিও লেখে, অথবা ধরুন একজন সাহিত্য রসিক অথবা একজন কবি; ভদ্রলোকটিও কবিতা ভালোবাসে, মেয়েদের শ্রদ্ধা করে। অথবা—"

শেষপর্যন্ত সে আর সংযত রাখতে পারল না নিজেকে। ঘুরে বসল।

তার পেছন দিকে বুক-কেসটার ধারে কতকগুলি বাঁধা কপির একটা স্তূপ তার নজরে পড়ল, নিচের সারিতে তিনটে, দুটো উপরে আর একটা সবার উপরে, ঠিক একটা বিরাট বড়ো ইংরেজি বর্ণমালার প্রথম বর্ণ "A"র মূর্তিতে যেন দাঁড়িয়ে পড়ল তাকে মুখোমুখি করে।

ওহ! সে চমকে ওঠে, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে, গাল দুটো যেন গরম হয়ে যায়, মেরুদণ্ডের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত কেমন চিড়বিড়িয়ে ওঠে। আহ! একটা গভীর নিঃশ্বাস সে টেনে নেয় ভেতরে, মেরুদণ্ডের ভেতর ঐ চিড়বিড়ে ভাবটা কাটিয়ে উঠবার জন্য। তারপর আবার ভাবতে থাকে: "এই সুখী পরিবারের বাড়িতে নিশ্চয় প্রচুর ঘর থাকবে। একটা ভাঁড়ার ঘর আছে, বাঁধাকপি বা এমনি কিছু সেখানেই থাকে। গৃহকর্তার পড়ার ঘর আলাদা। দেয়ালে দেয়ালে অনেকগুলি বইয়ের তাক; এটা স্বাভাবিক কথা যে বাঁধাকপি সেখানে রাখা হবে না। বইয়ের তাকগুলি চীন ভাষার বই আর বিদেশী বইয়ে ভরতি। আদর্শ স্বামী বইখানা তো অবশ্যি আছে মোটামুটি দুই খণ্ড। তারপর একখানা আলাদা শোবার ঘর, একটা ধাতুনির্মিত খাট, জেলখানার কয়েদীদের হাতে গড়া এম্ কাঠের অতি মামুলী খাট হলেও চলতে পারে। বিছানার তলাটাও বেশ পরিষ্কার—"

নিজের খাটের তলাটায় সে তাকিয়ে দেখল। জ্বালানী কাঠগুলি শেষ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, খালি একটা আঁটি বাঁধবার খড়ের দড়ি পড়ে আছে, একটা মড়া সাপের মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে।

সাড়ে তেইশ কোট। মনে হলো, যেন আঁটির পর আঁটি জ্বালানী কাঠ এসে জমেছে খাটের তলায়, যেন এর শেষ নেই। আবার তার মাথা ধরে। উঠে দাঁড়ায় সে, দৌড়ে যায় দরজার কাছে ওটা বন্ধ করবার জন্য। কপাটের গায় তখনো সে হাত দেয়নি হঠাৎ যেন মনে হয় এর প্রয়োজন নেই। থাকুক না খোলা, ধুলোয় ভরতি দরজার পর্দাটাই সে নামিয়ে দেয়। সে ভাবতে থাকে:

ঘরের ভেতর বন্ধ হয়ে থাকবার মতো মারাত্মক অনুভূতির হাত থেকে এই উপায়ে রক্ষা পাওয়া যায়, দরজাটা খোলা রাখবার অস্বস্তিও থাকে না; কনফিউসীয় দর্শনের মধ্যপন্থার নীতিও মানা হয়।

—সুতরাং, বাড়ির কর্তার পড়ার ঘর বন্ধ থাকে সবসময় সে ফিরে এসে আবার বসে টেবিলের ধারে। আবার সে ভাবতে থাকে: যার প্রয়োজন আছে সে এসেই প্রথমে দরজায় টোকা দেবে, ভেতরে আসবার অনুমতি

চাহবে ; একটা অবশ্য করনীয়। ধরো, বাড়ির কর্তা পড়ার ঘরে আছে আর বাড়ির গৃহিনী সাহিত্য আলোচনা করতে এসেছে, সেও তখন দরজায় টোকা দেয়—এতে অন্তত একটা ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা যায়—সে কোনো বাঁধা-কপি সঙ্গে আনবে না।"

কিন্তু বাড়ির কর্তার যদি সাহিত্য আলোচনা করবার সময় না থাকে, তাহলে ? বাইরে দাঁড়িয়ে দরজায় টোকা দিতে শুনেও সাড়া না দিলে অপমান করা হবে না তাকে ? না, বোধ হয় হবে না। কে জানে হয়তো এসব কথা ঐ আদর্শ স্বামী বইতেই লেখা আছে—নিশ্চয়ই ওটা একখানা চমৎকার উপন্যাস ! আমার এই লেখাটার জন্য যদি কিছু পাই তাহলে ঐ বই একখানা নিশ্চিত কিনব পড়বার জন্য।"

চটাস্ !

তার পিঠটা শক্ত হয়ে উঠল। তার অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে তাদের তিন বছর বয়সের শিশুকন্যার মাথায় চাটি মেরে তার স্ত্রী ঐ চটাস্ আওয়াজ করেছে।

"একটি সুখী পরিবারে—" মেয়ের ফোঁপানো কান্না শুনে সে আবার ভাবতে লাগল, তার পিঠটা তখনো টানটান শক্ত হয়ে আছে। সন্তান জন্মাতে দেরি হয়ে যায়, হ্যাঁ, সত্যি-খুব দেরি হয়। অথবা একদম না হলেই ভালো হয় বোধহয়। মাত্র দুইজন লোক, আর কোনো বন্ধন নেই—অথবা হোটেলে থাকাই বোধহয় তার চেয়েও ভালো, ওরাই সব দেখাশুনো করবে, কেবল একজন, আর কিছু, মেয়ের ফুঁপিয়ে কান্না বাড়ছে শুনে সে উঠে দাঁড়াল, পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল ভাবতে ভাবতে। কাল মার্কস দ্যাস ক্যাপিটাল লিখেছিলেন যখন তাঁর ছেলেমেয়েরা তাঁকে ঘিরে কান্নাকাটির সোর তুলত। নিশ্চয় তিনি একজন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন—

সে বাইরে বেরিয়ে পড়ে, দরজাটা খোলে, সঙ্গে সঙ্গে পোড়া মোমের কড়া গন্ধ নাকে লাগে। দেখল মেয়ে তখন দরজার একধারে মাটিতে পড়ে ছিল উবু হয়ে। তাকে দেখেই মেয়ে আবার শুরু করে তারাস্বরে চীৎকার।

—থাক্ থাক্ হয়েছে ! কাঁদেনা, আর কাঁদে না। লক্ষী মেয়ে সোনা মেয়ে ! সে একটু নিচু হয়ে হাত ধরে তুলে নিল মেয়েকে। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে দরজার বাম দিকে দাঁড়িয়ে আছে তার স্ত্রী, রাগের প্রতিমূর্তী। তারও পিঠ কেমন শক্ত হয়ে উঠেছে, পেছন দিকে কোমরের কাছে ঝুলানো হাত, বুঝি এক্ষুনি সে নামছে শারীরিক কসরৎ করতে।

—তুমিও এলে জ্বালাতন করতে। কোনো সাহায্য তো করোই না, কেবল অসুবিধে করা। মোমের বাতিটা উলটে দিয়ে প্রমাণ করেছে মেয়ে ! আজ রাত্তিরে জ্বালাবেটা কী ছাই ! হয়েছে, হয়েছে ! আর কাঁদতে হবে না। স্ত্রীর কাঁপা গলার আওয়াজ শুনেও সে ভ্রূক্ষেপ করে না। ঘরের ভেতর

চলে যায় মেয়েকে কোলে নিয়ে, তার মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে।
—লক্ষ্মী মেয়ে, সে পুনরাবৃত্তি ক'রে আদর করতে করতে।
নামিয়ে দেয় মেয়েকে, তারপর বসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে। দুই হাঁটুর মাঝখানে মেয়েকে দাঁড় করিয়ে সে হাত তুলে : কাঁদে না লক্ষ্মী মেয়ে, কাঁদে না।
আদর পেয়ে এইবার হেসে ফেলে মেয়েটি।
—এই তো, এই তো লক্ষ্মী সোনা! বলে সে। মেয়ে হাসছে তার দিকে তাকিয়ে, চোখে তার তখনো বিন্দু বিন্দু অশ্রু। মেয়ের মিষ্টি এবং সরল মুখখানার দিকে তাকিয়ে তার হঠাৎ মনে পড়ে ঠিক পাঁচ বছর আগে তার স্ত্রীর মুখখানাও যেন ঠিক এমনি ছিল, বিশেষ করে তার উজ্জ্বল টুকটুকে লাল ঠোঁট দুটি। সেদিনটাও ঠিক এমনি এক শীতের উজ্জ্বল দিন ছিল, সেই দিনই সব বাধা কাটিয়ে সর্বকিছু ত্যাগ করবার প্রতিশ্রুতি তার স্ত্রী শুনেছিল তার মুখ থেকে, সেদিনও তার স্ত্রী ঠিক এমনি ভাবে তাকিয়েছিল তার দিকে, ঠোঁটে মিষ্টি হাসি আর চোখে বিন্দু বিন্দু অশ্রু। কেমন হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে ছিল সে, যেন কোন এক নেশায় বিভোর।
"আহ, কী সুন্দর মিষ্টি দুটো ঠোঁট।" সে ভাবে।
হঠাৎ দরজার পর্দাটা ভেতরের দিকে সরে গেল, জ্বালানী কাঠের বাণ্ডিল ক'টা নিয়ে এসেছে ভেতরে।
অকস্মাৎ সম্বিত ফিরে দেখল তার শিশু কন্যার চোখ তখনো সজল, তার উজ্জ্বল টুকটুকে লাল ঠোঁট দুটো ফাঁক করে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। "ঠোঁট—" জ্বালানী কাঠগুলি ভেতরে আনছিল, তেছরা নজরে দৃষ্টি ফেরায় সেদিকে। "—এগুলো আবার নিশ্চয় সেই পাঁচ পাঁচে হয় পঁচিশ, এ ছাড়া আর কি ত'বে!—আর, আর ঐ দুটি বিষণ্ণ চোখ—" ভাবতে ভাবতে শিরোনাম লেখা আর অঙ্ক কষা ঐ সবুজ লাইন টানা কাগজটা তুলে নেয় আচমকা, হাতের মুঠোয় দুমড়ে ফেলে। তারপর আবার খোলে কাগজটা। শিশু কন্যার নাক চোখ মুছিয়ে দেয় : লক্ষ্মী মেয়ে, এইবার যাও, খেলো গে যাও! ঠেলে দেয় মেয়েকে। সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দেয় হাতের মুঠোয় দুমড়ানো কাগজটা বাজে কাগজের ঝুড়িতে।
কেমন দুঃখ বোধহয় মেয়ের জন্যে, মুখ ঘুরিয়ে তার দৃষ্টি চ'লে নীরবে নিঃশব্দে অপসৃয়মাণ কন্যার পিছু পিছু, আর জ্বালানী কাঠের বোঝা ফেলবার শব্দে তার শ্রুতি তখন নিবদ্ধ। মনঃসংযোগ সে করবেই, কৃতনিশ্চিত সে আবার মুখ ফেরায়, চোখ বুজে সে চেষ্টা করে বিচ্ছিন্ন চিন্তাগুলিকে দুই হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে। বসে থাকে শান্তভাবে, নিশ্চিন্ত সে।
চোখ বুজে সে যেন দেখতে পায়, চোখের সামনে দিয়ে যেন ভেসে যায় একটা গোল চ্যাপটা মতন ফুল, কালো কালো ফুটকি ফুটকি সবগুলো পাঁপড়িতে

আর মাঝখানটায় সবুজ রঙের একটা ছোপ, বাম চোখের বামদিক থেকে ভাসতে ভাসতে মিলিয়ে যায় ডানদিকে ; পরক্ষণেই আবার একটি উজ্জ্বল সবুজ রঙের ফুল, গাঢ় সবুজ তার কেন্দ্র বিন্দু ; আর তারপর ছয়টা বাঁধাকপির একটা স্তূপ যেন ইংরেজি বর্ণমালার এ অক্ষরটির মতো একটা বিরাট মূর্তি দাঁড়িয়ে তার চোখের সামনে।

(লু সুনের সমসাময়িক লেখক
সু চিন-ওয়েন রচিত
An Ideal Companian গল্পের
রচনা শৈলীর অনুসরণে
রচিত A Happy Family
গল্পের অনুবাদ।)
March 18, 1924

হেলে-পড়া দিনের আলোয় উত্তরের জানলাটার দিকে পিঠ রেখে সু-মিনের স্ত্রী, তার আট বছর বয়সের মেয়ে সিউ-এরহকে নিয়ে যখন মৃতের উদ্দেশে 'কাগুজে মুদ্রা, আঁটছিল সেই সময় কার কাপড়ের জুতোর ধীর অথচ ভারি পদক্ষেপের আওয়াজ কানে এল। বুঝতে পারল তার স্বামী বাড়ি ফিরেছে। সেদিকে মন না দিয়ে সে ব্যস্ত রইল তার কাজ নিয়ে। কিন্তু কাপড়ের জুতোর আওয়াজ কাছে এল, পরে আরও কাছে, এসে থামল তারই পাশে। না তাকিয়ে পারল না সে, সু-মিন তখন তার সমুখে দাঁড়িয়ে, কাঁধ বাঁকিয়ে সামনের দিকে ন্যুয়ে কী যেন হাতড়াচ্ছিল তার লম্বা গাউনের ভেতরের পকেটে।

মচড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা কসরতের পর একটা প্যাকেট সহ সে বের করে আনল তার হাতটা, লম্বাটে ধরণের একটা প্যাকেট দিল স্ত্রীর হাতে। হাতে নিতেই একটা অপূর্ব আকর্ণনীয় সুগন্ধ তার নাকে লাগল, মনে হলো যেন অলিভের গন্ধ। সবুজ রঙের মোড়কটার ওপর নানা কারুকার্য করা চকচকে সোনালী সিলমোহর। সিউ-এরহ গলা বাড়িয়ে দেখতে চাইল ওটাকে, মা সরিয়ে দিল মেয়েকে।

—দোকানে গিয়েছিলে বুঝি ? প্যাকেটটা দেখতে দেখতে বলল সু-মিনের স্ত্রী।

—তা—হ্যাঁ। স্ত্রীর হাতে মোড়কটার দিকে নজর রেখে জবাব দিল সু-সিন।

প্যাকেটটা মোড়ানো সবুজ রঙের কাগজটা খুলে ফেলল, তারপর আবার একটা হালকা কাগজে জড়ানো, ওটাও সূর্যমুখী ফুলের রঙ, জড়ানো কাগজটা খুলবার পর আসল বস্তু নজরে এল—বেশ চকচকে অথচ শক্ত, সূর্যমুখী ফুলের হলদে সবুজ বাদেও সেখানে নানারকম সূক্ষ্ম কারুকার্য। হালকা কাগজটা অনেকটা ঘিয়া রঙ-এর। খুলবার সাথে সাথে অলিভের গন্ধের মতো সাবানের অবর্ণনীয় সুগন্ধ যেন আরো তীব্র লাগল।

—সত্যি, খুব ভালো সাবান !

সাবানটা নাকের কাছে নিয়ে আবার শুঁকতে শুঁকতে বলল সু-মিনের স্ত্রী।

—হ্যাঁ, এবার এটা গায়ে মাখো—

বলতে বলতে আড়-চোখে সে দেখছিল স্ত্রীর নগ্ন ঘাড়ের দিকে। লক্ষ্য করে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে সু-মিনের স্ত্রী। অনেক সময় ঘাড়ের কাছটায় বিশেষ করে কানের পেছনটায় রগড়াতে গিয়ে কেমন যেন খড়খড়ে লাগত ! যদিও সে বুঝত এটা বহুদিনের জমানো ধুলোবালি ময়লার ফল, তবু গা করত না। কিন্তু আজকে স্বামীর নজরেও পড়েছে দেখে এই বিদেশী সবুজ রঙের অদ্ভুত সুগন্ধি সাবানটার দিকে তাকিয়ে নিজের মনের লজ্জা সে আর সংযত রাখতে পারল না, তার কানের ডগা পর্যন্ত রঙিন হয়ে উঠল। সে মনে মনে স্থির

করল আজই রাতের খাবার শেষ করে বেশ করে স্নান করবে এই সাবানটা মেখে।
—শরীরের অনেক জায়গা আছে যেখানটা কেবল মৌ-পোকার গুঁটি দিয়েই সাফ করা যায় না। আপন মনে বিড়বিড় করে সু-মিন পত্নী।
—মা, আমি নেব ওটা?
সিউ-এরহ যখন মোড়কের সবুজ রঙের কাগজটা নিতে হাত বাড়িয়েছে ছোটো মেয়ে চাও-এরহ তক্ষুনি এসে হাজির। সু-মিনের স্ত্রী দুজনকেই সরিয়ে দিল। পাতলা কাগজ দিয়ে সাবানটা মোড়ানো, তারপর আগের মতোই সবুজ কাগজে জড়িয়ে রাখল। স্নানের জায়গায় সব চেয়ে উঁচু তাকে তুলে রাখল সাবানটা। আবার ফিরে এল কাগুজে মুদ্রার কাজে।
—সুয়েহ-চেঙ!
মনে হলো সু-মিনের কী একটা কথা মনে পড়েছে। ডাকল জোর গলায়। স্ত্রীর ঠিক বিপরীত দিকে একটা উঁচু-পিঠ-ওয়ালা চেয়ারে বসেছিল সে।
—সুয়েহ-চেঙ! সু-মিনের স্ত্রীও ডাকল স্বামীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে।
সাড়া দিল কিনা শুনতে সে কান পাতল বাইরের দিকে, কিন্তু কোনো আওয়াজ পেল না। যখন তাকিয়ে বুঝল স্বামী অধৈর্য হয়ে উঠেছে, নিজেও কেমন বিব্রত বোধ করল যেন।
—বলছি, এই সুয়েহ-চেঙ, কানে যাচ্ছে না? সে আবার ডাকল গলা ফাটিয়ে। এইবার কাজ হলো। চামড়ার জুতোর আওয়াজ এগিয়ে আসছে তারা শুনতে পেল, সুয়েহ-চেঙ তখন তাদের সামনে এসে হাজির। তার গায়ে খালি সার্ট, তার গোলগাল মুখটা ঘামে ভিজে আছে।
—কী করছিলে? বিরক্তির ভাব দেখিয়ে বলল সু-মিনের স্ত্রী। তোমার বাবা ডাকাডাকি করছিল এতক্ষণ ধরে, শুনতে পাওনি?
—বক্সিং অভ্যাস করছিলাম—সঙ্গে সঙ্গে বাপের দিকে ফিরে তাকাল, চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি।
—সুয়েহ-চেঙ! O du fu কথাটার অর্থ কী জান? (চীনা ভাষায় শব্দটির অর্থ দুষ্ট স্ত্রী অনুবাদক)
—O-du-fu কথাটার মানে বোধহয় ভীষণ মেয়ে মানুষ। তাই তো?
—কী বাজে বকছ! সু-মিন ভীষণ রেগে গেল: আমি মেয়েমানুষ নাকি?
দুপা পিছিয়ে সুয়েহ-চেঙ দাঁড়িয়ে রইল আরো সটান হয়ে। পিতার চলার ধরণটা অনেকটা পিকিং অপেরার বুড়োদের কথা মনে করিয়ে দিলেও, তার পিতা মেয়েমানুষের মতন এটা তার মনে আসেনি কখনও। সে বুঝতে পারল ঠিক হয়নি তার জবাবটা।
—O du fu কথাটার অর্থ ভীষণ মেয়েমানুষ এ যেন আমি জানি না! আরে তাহলে কি আর জিজ্ঞাসা করতাম তোমাকে? এটা চীনে ভাষা নয়, এটা বিদেশী শয়তানদের ভাষা, আমি বলছি তোমাকে শুনে রাখ। তুমি জান

এর মানে ?

—আমি—আমি জানিনা।

সুয়েহ-চেঙ যেন আরও বেশি অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

—মলো যা ! এতগুলো পয়সা খরচা করে তোমাকে ইস্কুলে পাঠিয়েছি কী করতে, যদি এই ছোট্ট কথাটার অর্থ তুমি বুঝতে না পার ? তোমার ইস্কুল তো দেখি খুব বড়াই করে, তারা নাকি যেমন কথা বলতে শেখায় তেমন শব্দের অর্থ শিখাতেও জোর দেয় বেশী করে। তা সত্বেও কিছুই তো শেখায়নি তোমাকে। ঐ শয়তানের ভাষায় শব্দটা যারা বলছিল তাদের বয়স এই চৌদ্দ কি পনরো, হয়তো বা তোমার চেয়েও বয়সে ছোটো। বক বক করছিল ওরা এই কথাটা নিয়ে, আর এর অর্থ তুমি বলতেই পারছ না। বলতে সাহস পাচ্ছ, তুমি জান না ? যাও, এর মানে খুঁজে বের করে আন শিগগির।

—আচ্ছা। সুয়েহ-চেঙ গম্ভীর ভাবে জবাব দিল, তারপর বেরিয়ে গেল তার পিতার সামনে থেকে।

—ভেবে পাইনা আজকালকার ছেলেরা কী সব হচ্ছে, কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সু-মিন আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলতে লাগল ঃ সত্যি বলতে কুয়াঙ সুর (১৮৭৫-১৯০৮) আমলে আমরা সবাই নতুন নতুন স্কুল খোলার পক্ষপাতী ছিলাম কিন্তু কখনো বুঝতে পারিনি এর পরিণতি এমনি দাঁড়াবে। কোন্ 'মুক্তি' আর স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা ? সত্যিকার শিক্ষার কোন অস্তিত্বই নেই, আজকে সবই অবাস্তব আর অর্থহীন। বেশ কিছু খরচ করেছি সুয়েহ-চেঙ এর পেছনে, সবই দেখছি ব্যর্থ হয়েছে। এই আধা [illegible] আর আধা চীন দেশী স্কুলে ভর্তি করাতে কি কম বেগ পেয়েছি। শুনেছি এরা নাকি ইংরেজি বলা আর শব্দের অর্থ শেখায় জোর দেয় বেশী। তুমি আমি ভেবেছি সবই ভালো হবে নিশ্চিত। কিন্তু—কিন্তু একটি বছর কেটে যাওয়ার পরও O-du-fu শব্দটার অর্থই সে বুঝে না। তবু ঐসব মৃতকল্প পুঁথিগুলি তাকে পড়ে যেতে হবে। আমার জিজ্ঞাসা, এইসব স্কুলের প্রয়োজন কি ? এর সবগুলো বন্ধ করে দাওনা।

—হ্যাঁ ঠিকই বলেছ, এগুলো বন্ধ করে দেওয়াই ভালো। সমবেদনার সঙ্গে স্বামীর কথায় সায় দিয়ে বলল সু-মিন পত্নী।

—শোন সিউ-এরহ আর তার বোনকে আর ইস্কুলে পাঠিয়ে কাজ নেই। আমার ঠাকুরদা ঠিকই বলতেন, মেয়েদের স্কুলে গিয়ে কাজ কী ? যখন তিনি মেয়েস্কুল স্থাপনে বিরোধিতা করতেন তখন তাঁকে আমি নানাভাবে আক্রমণ করতাম, তাঁকে বিদ্রূপ করতাম কিন্তু এখন দেখছি বৃদ্ধ ঠিকই করতেন। ভেবে দেখ না, আজকাল মেয়েরা পথে ঘাটে যেরকম করে ঘুরে বেড়ায় সবই কি রুচিকর, এরা আজকাল নিজেদের মাথার চুল ছেটে ফেলতে চায়। ছোটো চুল মাথায় স্কুলের মেয়েদের দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। আমি বলি ঃ

ডাকাত বা সেপাইদের বেলায় হয়তো কিছু অজুহাত আছে, কিন্তু এই মেয়েগুলি যা করে তার কি মানে, সবই যেন উলটেপালটে দেয়। এদের শাসন করা দরকার—

—তাই। পুরুষরা সাধুদের মতো চুল ছাটে এই যেন যথেষ্ট নয়, আবার মেয়েগুলোও শুরু করেছে!

—সুয়েহ-চেঙ! কই।

সুয়েহ-চেঙ একটা বই হাতে ছুটে এসে বইটা দিল তার পিতার হাতে।

—দেখ তো, এরকম কিনা। বইটার একটা অংশ পিতাকে দেখিয়ে সে বলল— এই যে এখানে...!

সু-মিন বইটা হাতে নিয়ে দেখল সেই অংশটা। সে বুঝতে পারল বইটা একটা অভিধান। তবে ছাপা অক্ষরগুলো খুবই ছোটো ছোটো, ভীষণ ঠাসাঠাসি করে ছাপা। একবার কপাল কুঁচকে জানলার দিকে ফিরে তাকাল, চোখের দৃষ্টি মোচড় দিয়ে সুয়েহ-চেঙ এর দেখানো অংশটা পড়তে চেষ্টা করল।

—পরস্পরের সাহায্যের নিমিত্ত অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত একটি সমিতি— না, না ও না, ও হতে পারে না—শব্দটা উচ্চারণ করবে কেমন করে?

শয়তানের ভাষায় শব্দ কয়টা তার সমুখে ধরে দিল।

—অড্‌ফেলাম। সুয়েহ-চেঙ বলল।

—না, না, এরকম তো বলেনি।

আবার সু-মিনের মেজাজ গরম হয়ে গেল।

—আমি বলিনি তোমাকে, ওরা খারাপ কথা বলছিল। গালি গালাজ করেছিল মনে হচ্ছিল। বুঝেছ? যাও, আবার ভালো করে দেখে এস। সে বলল।

সুয়েহ-চেঙ বার কয়েক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সু-মিনের দিকে, কিন্তু এক পাও নড়ল না।

—এ যে দেখছি এক কঠিন সমস্যা। এর মাথা মুণ্ডু ছাই ও-ই বা ঠিক করবে কেমন করে? প্রথমে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝিয়ে দাও ওকে, তারপর তো ও বলতে পারবে। সু-মিনের স্ত্রী বলল।

—আমি সদর রাস্তার উপর কুয়াঙ ইয়ুন সিয়াঙ দের দোকানে সাবান কিনতে গিয়েছিলাম। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সু-মিন বলল: সে সময় দেখলাম দোকানে আরও তিনজন ছাত্র খরিদ্দার। ওরা ভাবল আমার বুঝি খুঁত খুঁতে মেজাজ। আমি পাঁচ ছয় রকমের সাবান দেখলাম, সবগুলোরই চল্লিশ সেন্টের উপরে দাম, কোনোটাই পছন্দ হলো না। তারপর কয়েকটা দশ সেন্ট দামের সাবান দেখলাম, খুব ভালো লাগল না, কোনোটারই একদম কোনো গন্ধ ছিল না। ভাবলাম মাঝামাঝি দামের কোনো একটা নিলেই বোধহয় ভালো হয়। তখন এই সবুজ রঙের সাবানটা চব্বিশ সেন্ট দামে নেব ঠিক

করলাম। দোকান কর্মচারী যুবকটিকে কেমন যেন লাগল, কেমন একটা অদ্ভুত মুখ ভঙ্গি করে কটমট করে সে তাকাল আমার দিকে। তখনই ঐ ছোকরা কয়টিও পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে কী যেন বলাবলি শুরু করল, ওদের ঐ শয়তানের ভাষায়। দাম দেবার আগে সাবানটা খুলে দেখে নিতে চাইলাম কেননা ঐসব বিদেশী কাগজে মোড়া অবস্থায় কিকরে বুঝব জিনিসটা ভালো কি মন্দ? ঐ উন্নাসিক লোকটা দেখতে তো দিলই না উপরন্তু কতকগুলো ভীষণ বিশ্রী অপমানকর মন্তব্য করে বসল, যার জন্য ঐ বদ ছেলেগুলি পর্যন্ত হো হো করে হেসে উঠল। ওদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোটো যেটি সেটিই ঐ কথাটা বলেছিল আমাকে, সোজা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। অন্য ছেলে কয়টিও হেসে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে। নিশ্চয়ই ওটা খারাপ কথা ছিল। বলেই সে ফিরে তাকাল সুয়েহ-চেঙএর দিকে।

—যে অংশে অপ-ভাষার উল্লেখ আছে ওখানটায় দেখ।

—আচ্ছা। সুয়েহ-চেঙ জবাব দিল গম্ভীর গলায়, তারপর বেরিয়ে গেল সেখান থেকে।

—তবু এরা চেঁচিয়ে বেড়ায় নবকৃষ্টি নবকৃষ্টি! দুনিয়ার চারদিকে যখন এমন অবস্থা! এই কি যথেষ্ট খারাপ নয়? ছাত্রদের নীতিজ্ঞান বলে কিছু নেই, সমাজের কোনো নীতি নেই। যদি এ ব্যাধির যথাবিধ ঔষধ খুঁজে বের করতে না পারি তাহলে চীন দেশ শেষ হয়ে যাবে। জানো, কী করুণ দেখতে ছিল সেই মেয়েটি—

—কে? তার স্ত্রী আলতোভাবে জিজ্ঞেস করল, কোনো আগ্রহ ছিল না তার প্রশ্নে।

—ঐ কাঁচ কাঁচ আহ্লাদী দেখতে মেয়েটা। সু-মিনের দৃষ্টি ঘুরে এসে নিবদ্ধ হলো স্ত্রীর মুখের উপর। তার কণ্ঠে ছিল শ্রদ্ধার সুর। আসতে আসতে সদর রাস্তার উপর ছ জন ভিখিরী দেখে এলাম। একটি মেয়ে, বয়স আঠারো উনিশ। এ বয়সে ভিক্ষে করা ঠিক নয় অবশ্য, তবে সে করছিল তাই। তার সঙ্গে ছিল প্রায় সত্তর বছর বয়সের এক বুড়ি, মাথার সবগুলো চুল পেকে সাদা আর একটিও দাঁত নেই মুখে। একটা কাপড়ের দোকানের ছাইচের তলায় দাঁড়িয়ে ওরা ভিক্ষে করছিল, খুব দয়া হলো মেয়েটির জন্যে। বুড়ি ঐ সঙ্গী মেয়েটার ঠাকুরমা। খুদ-কুড়ো যা পেল, আমি লক্ষ্য করলাম, মেয়েটি দিয়ে দিল বুড়িকে নিজে না খেয়ে। কিন্তু তোমার কি মনে হয়, এমনি কাঁচ আহ্লাদী মেয়েটাকে ভিক্ষে দেবে কেউ?

তার দৃষ্টি তখনো স্ত্রীর মুখের উপর, যেন তার বুদ্ধিকে সে পরখ করছিল। সু-মিনের স্ত্রী কোনো জবাব দিল না, নিজের দৃষ্টিও স্বামীর উপর নিবদ্ধ রাখল, যেন ব্যাপারটা বুঝতে চাইছিল তার কাছ থেকে।

—না, দেবে না। সু-মিন নিজেই জবাব দিল নিজের প্রশ্নের—অনেকক্ষণ

ধরে লক্ষ্য করলাম, দেখলাম কেবল মাত্র একটি লোক একটা তাম্রমুদ্রা দিল তাকে। বহুলোক এসে ভিড় জমালো কেবল তামাসার জন্য। দুটো নিচুস্তরের লোকও উপস্থিত ছিল সেখানে। একজনের ধৃষ্টতা লক্ষ্য করলাম। সে বলে উঠল ঃ হায়রে কপাল, ঐ সুন্দর বস্তুটার উপর একটু ধূলো ময়লা দেখেই পিছিয়ে যেও না বাপ। দুটো সাবান কিনে একটু ঘষে মেজে নিলেই দেখবে মেন্দা ফল খারাপ হবে না! একবার চিন্তা করে দেখো, লোকটার কী ধরনের কথা!

ভেঁাস ভেঁাস আওয়াজ করে মাথা নোয়াল সু-মিনের স্ত্রী। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল সে ঃ তুমি কিছু দিয়েছিলে মেয়েটাকে?

—দিয়েছিলাম? না, দিই নি। দু একটা ছোটো মুদ্রা দিতে আমার লজ্জা বোধ হলো যে, সে ভিখিরী তো নয়? বুঝলে? কিছু ছিল না সঙ্গে—

—তা বটে! তাকে কথাটা শেষ করবার সুযোগ না দিয়ে উঠে দাঁড়াল সু-মিনের স্ত্রী। তারপর ধীরে ধীরে চলে গেল রান্না ঘরের দিকে। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, রাত্রের খাবারের সময় প্রায় তখন।

সু-মিনও উঠে দাঁড়াল, হাঁটতে হাঁটতে আঙিনার দিকে গেল। বাইরে তখনো বেশ আলো আছে। প্রাচীরের ধারে, এক কোণে সুয়েহ-চেঙ বকসিং শিখছিল। এইটা তার বাড়ির কাজ। দিন আর রাতের মাঝখানের সময়টাকে সে বেশ করে ভাগ করে নেয় সুবিধে মতো। প্রায় ছয় মাস ধরে সে বকসিং শিখছে। সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে সু-মিন আঙিনায় পায়চারি করতে লাগল, তার হাত দুটি পেছন দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই টবে রাখা পাতাবাহার গাছের সবুজ চওড়া পাতাগুলো অন্ধকারের গ্রাসে পড়ে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসছিল। পেঁজা তুলোর মতো ইতস্তত ছড়ানো সাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে এক একটি তারা মিটমিট করছিল। তখন রাত হয়ে এসেছে। ক্রমবর্দ্ধিত মনের তিক্ততাকে সু-মিন কিছুতেই দমন করতে পারছিল না। কোনো বড়ো কাজের আহ্বান যেন তার কানে আসছিল, এই কুৎসিত সমাজ আর অপদার্থ ছাত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার একটা আবেগ যেন চেপে ধরছিল তাকে। ধীরে ধীরে তার মনের সাহস যেন আরো বাড়তে লাগল। পদক্ষেপ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগল। কাপড়ের জুতোর গোড়ালির চাপের আওয়াজ যেন আরও সোচ্চার হয়ে উঠল। ওদিকে খোপের ভেতর মুরগী আর ছানাগুলি জেগে উঠে ভয়ে কিচির মিচির করে উঠেছে।

হলঘরে একটা আলো জ্বলে উঠল। খাবার প্রস্তুত এ তারই ইঙ্গিত—মাঝখানে টেবিলটার চারদিকে পরিবারের সবাই এসে জড়ো হয়েছে। আলোটা টেবিলের শেষ দিকটায় রাখা, আর সু-মিন বসেছে টেবিলের প্রধান আসনে। তার গোলগাল ভারি মুখটা ঠিক সুয়েহ-চেঙের মুখের আদল, কেমন এখানে ওখানে ছড়ানো কয়েকটা দাড়ি বাদ দিলে। সুপের গরম গরম বাষ্পের

ধূয়ার ভেতর দিয়ে তাকালে মন্দিরে ঐশ্বর্যের দেবতার মূর্তির মতোই মনে হয় সু-মিনকে। বামদিকে বসেছে সু-মিন পত্নী আর চাও এরহ, ডানদিকে সুয়েহ-চেঙ আর সিউ এরহ। বাটির মধ্যে চপস্টিকের আওয়াজ বৃষ্টির ধারার মতো পড়ছে। যদিও কেউ একটি কথাও উচ্চারণ করল না, তবু তাদের খাবার টেবিলটা জীবন্ত হয়ে উঠল।

চাও-এরহ তার বাটিটা উলটে দিয়েছে। সুপ পড়ে সারাটা টেবিল ভেসে গেছে। সু-মিন তার সরু সরু চোখ দুটো বিস্ফারিত করে তাকাল মেয়ের দিকে। যখন দেখল সে কাঁদবার উপক্রম করেছে তখনই সে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল, দু টুকরো বাঁধাকপি তুলে নিতে নিজের চপস্টিক বাড়িয়ে দিল। কিন্তু সেই দুটি টুকরো হঠাৎ যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। ডান-বাঁয়ে তাকিয়ে দেখল, সুয়েহ-চেঙ তখন সেগুলো পুরতে যাচ্ছে তার বিরাটা মুখের হা-এর ভেতর। হতাশ হয়ে শুধু কয়েক টুকরো হলুদ রঙের পাতা মুখে তুলে নিল সু-মিন।

—সুয়েহ-চেঙ, সে ছেলের দিকে তাকাল—ঐশব্দটা খুঁজে পেয়েছ, না এখনো পাওনি ?

—কোনটা ?...ও, না, এখনো পাইনি !

—তুমি একটি অপদার্থ, বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই তোমার। কিছু জানো না, শুধু জানো খেতে ! ঐ আহ্লাদী ভিখিরী মেয়েটার কাছে তোমার শেখবার আছে। হোক না সে ভিখিরী, নিজে না খেয়ে বুড়িকে খেতে দেয়। তা জানো ? আর তোমাদের মতো ঐ উদ্ধত ছাত্ররা কী করে ? কিছু জানো। না। ওগুলোর মতোই হবে তোমরাও !

—বোধহয়, কথাটা বলতে গিয়ে থেমে যায় সুয়েহ-চেঙ।...কী জানি ওটা ঠিক হবে কিনা...বোধহয়, ওরা হয়তো বলে থাকবে O-du-fu-la (bad fool শব্দের চীনা রূপান্তর অনুবাদক)।

—ঠিক বলেছ। বোধহয় তাই। ঠিক এ রকমই যেন উচ্চারণটা : o du-fu-la ! কিন্তু এই শব্দটারই বা অর্থ কী ! তুমিও তো ঐ দলের, নিশ্চয় ওটার মানে জানো।

—মানে ?...না, আমিও ঠিক জানিনা।

—ননসেন্স। আমাকে ঠকাতে চেষ্টা করো না। তোমরা সব একদলের অপদার্থ ?

মাথায় বাজও পড়ে না এদের, চেঁচিয়ে উঠল সু-মিনের স্ত্রী : বলি, মেজাজটা এমন তিরিক্ষি করেছ কেন আজকে ? খেতে বসেও কুকুর তাড়াতে গিয়ে মুরগী না মেরে পার না ? ঐ বয়সের ছেলে অত কী বুঝে বলো ?

—কী বললে ? সু-মিন জবাব দিতে গিয়ে থমকে গেল, দেখল তার স্ত্রীর গর্তে ঢুকে যাওয়া গাল দুটি রাগে কাঁপছে, মুখের রঙ বদলে গেছে, কেমন

একটা ভয়চকিত দিপ্তী চিক চিক করে উঠেছে তার চোখ দুটিতে। সে সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর পালটে দিল। মেজাজ খারাপ করছি না তো! সুয়েহ-চেঙকে বলছি চারদিক দেখেশুনে একটু শিখতে।

—তোমার মনের ভেতর কী আছে ও জানবে কেমন করে? আগের চেয়েও রাগতভাবে বলল সু-মিনের স্ত্রী: যদি তার জ্ঞান থাকত এক্ষুনি একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে অথবা মশাল নিয়ে ছুটতো ঐ আহ্লাদী মেয়েটাকে খুঁজে আনতে। তুমি ওকে একটা সাবান কিনে দিয়েছ নিশ্চয়ই: এখন বাকি আছে ওকে আরও একটা কিনে দেওয়া…

—ননসেন্স! ঐ ছোটোলোকগুলি যা বলছিল তোমার মুখেও সেই কথা!

—কি জানি, জানি না। যাও, আর একটা সাবান কিনে বেশ করে স্নান করিয়ে দাও গে মেয়েটাকে, তারপর পূজো করো গিয়ে ওকে, তাহলেই দুনিয়ার শান্তি হবে।

—এসব কী বলছ তুমি? ওসব কথা আসছে কেন? কী সম্পর্ক? আমার মনে পড়ল তোমার সাবান নেই সেই জন্যে…

—সম্পর্ক নেই? খুব আছে। তুমি সাবানটা কিনেছিলে আসলে ঐ আহ্লাদী মেয়েটার জন্যে: যাও না ওকেই ওটা দিয়ে বেশ করে স্নান করিয়ে এসো। আমি এর উপযুক্ত নই! এ আমি চাই না। চাইনা, এ মেয়েটার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই না।

—এসব তুমি কী বলছ? অস্পষ্ট ভাবে বলল সু-মিন: তোমরা মেয়েরা… সুয়েহ-চেঙ মুষ্টিযুদ্ধ করে ফিরে এসে যেমনি ঘামছিল সেও তেমনি ঘামতে লাগল, কি জানি হয়তো খাবারটা বেশী গরম ছিল তাই।

—আমরা মেয়েরা কী জানতে চাইছ? আমরা মেয়েরা তোমাদের মতো এইসব পুরুষদের চেয়ে ঢের ভালো জানবে। আঠারো—উনিশ বছর বয়সের ছাত্রদের তোমরা গালিগালাজ করবে, অথচ এইসব একই বয়সের ভিখিরী মেয়েগুলোকে প্রশংসা করতেও বাধবে না তোমাদের। এমনি পোড়া কুৎসিত মন তোমাদের! অসহ্য!

—শোননি কী বলেছি তোমাকে। ঐ বদছোকরাগুলোও তো ঠিক এমনি কথাই বলেছিল সেইদিন।

সু-মিন! বাড়ি আছ নাকি?

বাইরে অন্ধকারের ভেতর থেকে কে যেন ডাকল বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে।

—কে? তাও-টুঙ নাকি? দাঁড়াও আমি আসছি। সু-মিন বুঝতে পারল তাও-টুঙের কণ্ঠস্বর। ঐ জোরালো গলা সবার পরিচিত। সেও জবাব দিল তেমনি জোরালো গলায়, যেন মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদী কণ্ঠের উৎফুল্ল স্বর।

সুয়েহ-চেঙ একটা মোমবাতি জ্বালল, পশ্চিম দিককার ঘরে নিয়ে গেল তাও-টুঙকে। তাদের পেছনে এল পু-ওয়েই-ইউয়ান।

—আমি নিজে এসে তোমাদের ডাকিনি বলে সত্যি খুব দুঃখিত। মাপ করো ভাই। তার মুখে তখনো ভাতের গ্রাস. সেই অবস্থাতেই সে এগিয়ে এসেছিল তাদের স্বাগত জানাতে। এসো না, আমাদের সঙ্গে বসে দু মুঠো যা হোক কিছু হবে—

আমরা খেয়ে এসেছি, থাক। এগিয়ে এসে ওয়েই-ইউয়ান বলল। মরাল রিআমামেণ্ট লিটারারি লিগের প্রবন্ধ এবং কবিতা প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা খুব জরুরী বলে এত রাত্রে আসতে বাধ্য হয়েছি। কালকে সতরো তারিখ, মনে আছে তোমার ?

—তার মানে. আজকে ষোল তারিখ ? তাইত ! বিস্ময়ের সঙ্গে সু-মিন বলল।

—সব ভুলে বসে আছ দেখছি। বলল তাও-টুঙ।

—আজকে রাত্রেই কিছু মাল মশলা খবরের কাগজের অফিসে পাঠাতে হবেই আমাদের, যাতে কালকেই ছেপে বেরোয়।

—প্রবন্ধের শিরনাম আমি লিখে রেখেছি। তোমরা দেখ পছন্দ হয় কিনা। বলতে বলতে তাও-টুঙ তার রুমালের ভাজের ভেতর থেকে একটা কাগজ বের করে সু-মিনের হাতে দিল।

সু-মিন আলোর কাছে একটু এগিয়ে গেল। কাগজের ভাঁজ খুলে পড়তে লাগল : "সমগ্র জাতির নামে আমরা অতি বিনীত ভাবে একটি প্রবন্ধে প্রস্তাব করছি যে এই মুমূর্ষ পৃথিবীর পুনরুত্থান এবং জাতীয় চরিত্র রক্ষার জন্য মেনসিয়ান জননীর পূজা আর কনফিউসীয় ক্লাসিক্‌সের প্রচার কল্পে একটি আদেশ জারি করতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রার্থনা জানানো হোক।" চমৎকার ! অতি চমৎকার। তবে একটু বেশী দীর্ঘ হয়ে গেছে, তাই না ?

—ওতে কিছু এসে যাবে না। একটু জোর দিয়ে জবাব দিল তাও-টুঙ।—আমি হিসাব করে দেখেছি, বিজ্ঞাপনের খরচও বেশি লাগবে না। কিন্তু কবিতার নাম কী হবে ?

—কবিতার নাম ? আমি একটা নাম বেছে রেখেছি। বেশ যেন সবিনয়ে বলল সু-মিন। "আহ্লাদী কন্যা"। কেমন লাগে নামটা ? একটা সত্য ঘটনা আছে এ নামের পেছনে। সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে। আজকেই সদর রাস্তার উপর…

—থাক থাক ! ওরকম নাম চলবে না। ওয়েই-ইউয়ান বলে উঠল কথার মাঝখানে, হাত নেড়ে সু-মিনকে থামিয়ে দেবার জন্য।—ঐ মেয়েটি তো ? আমিও দেখেছি ওকে। মেয়েটা এ অঞ্চলের কেউ নয়। তার ভাষা বুঝতে পারি নি, সেও বুঝতে পারেনি আমার কথা। জানিনা কোন অঞ্চলের মেয়ে। এটা ঠিক, সবাই বলে মেয়েটার ভীষণ আহ্লাদী আহ্লাদী ভাব। কিন্তু কবিতা লিখতে তো পারে না মেয়েটা। পারলে ভালো হতো না কি !

—কিন্তু বিশ্বস্ততা আর সন্তান জনোচিত করুণা যেখানে বড়ো কথা, সেখানে সে কবিতা লিখতে না জানলেও কিছু আসবে যাবেনা।…

ওয়েই-ইউয়ান হাত তুলে আপত্তি জানালো সু-মিনের কথায়।

—তবু, কবিতার নাম ঐ হোক। সু-মিন বলল ঃ একটা কিছু ব্যাখ্যা সংযোগ করে ওটা ছাপতে দাও। প্রথমতঃ এতে তার কাজের প্রশংসা হবে, দ্বিতীয়ত, সমাজকে সমালোচনা করবার একটা অস্ত্র বলে ব্যবহার করতে পারব। পৃথিবীটা কোন পথে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না? অনেকক্ষণ আমি লক্ষ্য করলাম, একটা সেন্ট বের করে ওর হাতে দিতে কাউকে আমি দেখলাম না। মানুষ দয়ামায়া হারিয়ে ফেলেছে…

—থামো, সু-মিন। আবার বাধা দিল ওয়েই-ইউয়ান—সব নেড়া মাথাকে সাধু অপবাদে গাল দিচ্ছ। আমি কিছু দিইনি তখন আমার পকেটে কিছু ছিলনা বলে।

—অতটা স্পর্শকাতর হয়োনা ওয়েই-ইউয়ান। সু-মিন বলল ঃ তুমি একটা ব্যতিক্রম, এটা মানছি। আমাকে শেষ করতে দাও। বহুলোক ওদের ঘিরে ভিড় জমিয়েছিল! একটুও সহানুভূতি দেখায়নি, কেবল বিদ্রূপ করেছে, ঠাট্টা করেছে। দুটো বদমায়েশ লোকও ছিল ঐ ভিড়ের ভেতর। ভীষণ আস্পর্দ্ধা আর সাহস দেখলাম ঐ লোক দুটোর। ওরা কি বলল শুনবে? "দুটো সাবান কিনে বেশ করে মেজে-ঘষে নাও, ফল খুব খারাপ হবে না দেখো।" ভাবতে পার এর অর্থ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ!—দুটো সাবান! তাও-টুঙ হো হো করে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল সবার কানের পর্দা ফাটিয়ে দেবার মতো সে আওয়াজ। বলি দুটো সাবান কেন? হো, হো, হো—

—তাও-টুঙ, তাও-টুঙ। থামো। ওরকম করে হাসছ কেন? সু-মিন যেন কেমন চমকে উঠেছিল ঐ হাসিতে।

—বেশ করে মেজে-ঘষে নিও, কেমন? হো, হো—হো—

—তাও-টুঙ। সু-মিন এইবার কঠিন হয়ে উঠল। আমরা জরুরী ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম ভুলে যাচ্ছ কেন। তুমি এসব কিরকম হট্টগোল করছ! কান ঝালাপালা হবার জোগাড়। শোন আমার কথা, আমরা এই দুইটি শিরনামই মেনে নেব! সোজা খবরের কাগজের অফিসে পাঠিয়ে দাও, যাতে কালকেই ছেপে বেরুতে পারে। তোমাদের দুজনকেই কষ্ট করতে বলব এগুলো পেঁাছে দিতে।

—বেশ, বেশ তাই হবে। ওয়েই ইউয়ান রাজী হলো সঙ্গে সঙ্গে।

—হো, হো, হো, কী সুন্দর ঘষলে মাজলে—

—তাও-টুঙ! আবার ধমকে উঠল সু-মিন।

এইবার হাসি বন্ধ করল তাও-টুঙ। সংযোজন অংশটা রচনা শেষ হতেই সেটাকে একটা কাগজে পরিষ্কার করে লিখে ফেলল ওয়েই-ইউয়ান, তারপর রওনা হয়ে গেল খবরের কাগজের অফিসের দিকে, সঙ্গে থাকল তাও-টুঙ।

মোমবাতি হাতে নিয়ে সু-মিন ওদের পথ দেখিয়ে দিতে এগিয়ে গেল। তারপর ফিরে এল ঘরের ভেতর। একটু ইতস্তত করেছিল দোরগড়ায় এসেই। ঘরে ঢুকে তার চোখে পড়ল সাবানের সবুজ রঙের মোড়কটার সোনালী অক্ষরগুলি আর সঙ্গেকার কারুকার্যগুলি চিকচিক করছিল চোখের সামনে লণ্ঠনের আলোতে। সিউ-এরহ আর চাও-এরহ খেলা করছিল ঘরের মেঝেতে বসে। আর ডানদিকে বসে সুয়েহ-চেঙ তার অভিধান নিয়ে ব্যস্ত। ল্যাম্প থেকে অনেকটা দূরে ল্যাম্পের ছায়ায় উঁচু-পিঠওয়ালা চেয়ারে উপবিষ্ট তার স্ত্রীকে আবিষ্কার করল সু-মিন। নিষ্ক্রিয় মুখের চেহারায় না ছিল রাগের চিহ্ন, না ছিল আনন্দের আভাস, কোনো বিশেষ কিছুতে দৃষ্টিও ছিলনা তার।

—ঘষে মেজে কী সুন্দর দেখতে, বটেই তো। কিন্তু কী বিশ্রী না?

সিউ-এরহ-এর কণ্ঠস্বর পেছন থেকে শুনতে পেল সু-মিন। সে ফিরে তাকাল, কিন্তু সিউ-এরহ নড়ল না। কেবল চাও-এরহ দুই হাতে মুখ ঢেকে যেন কার লজ্জা ঢাকছিল।

এ ঠাঁই তার জন্যে নয়। সু-মিন ফু দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দিল। পায়চারি করতে বাড়ির আঙিনার দিকে বেরিয়ে গেল। চুপিসারে কোনো শব্দ না করে যাওয়ার কথাটা ভুলে গিয়েছিল সে। মুরগীর বাচ্চাগুলো আবার কিচির মিচির করে উঠল তার পদশব্দে। এইবার কোনো শব্দ না করে চলতে লাগল সে আরও দূর দিয়ে। অনেকক্ষণ পরে লক্ষ্য করল হল ঘরের ল্যাম্পটা সরিয়ে নিয়েছে শোবার ঘরের দিকে। চাঁদের আলোটা যেন সাদা কাপড়ের টুকরোর মতো ছড়িয়ে ছিল মাটির উপর। আবার ক্ষণে ক্ষণে মেঘের আড়ালে একটা ঘন কৃষ্ণবর্ণের থালার মতো লাগছিল চাঁদটাকে।

একটুও হতাশ হলো না সু-মিন, সেই আদুরে কন্যার মতোই যেন নিঃসঙ্গ একা সে। অনেক রাতেও সে রাতে তার ঘুম এল না।

পরদিন প্রভাতে সু-মিন পত্নী কিন্তু সাবানটাকে সম্মান দিল কাজে লাগিয়ে। অন্যাদিনের চেয়েও কিছুটা দেরিতে ঘুম থেকে উঠে সু-মিন দেখল স্নানের জায়গায় দাঁড়িয়ে তার স্ত্রী ঘাড়ের কাছটায় রগড়াচ্ছে সাবান দিয়ে। সারা গায় ছড়িয়ে আছে সাবানের ফেনা। মৌচাকের মোমে তৈরি সাবানের ফেনা আর এই সাবানের ফেনা যেন আকাশ পাতাল তফাত। এরপর সবসময় সর্বদিনই যেন কেমন একটা অবর্ণনীয় সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হতো সু-মিনের স্ত্রীর দেহ থেকে, মনে করিয়ে দিত অলিভের গন্ধ! ছয় মাসও কাটেনি হঠাৎ ঐ গন্ধও যেন বদলে গেল, সবাই যেন নিশ্চিত এ আর কিছু নয় বুঝি চন্দন কাঠের গন্ধ।

'Soap'
March 22, 1924

আজকে ভাবতে বসে মনে হয় ওয়েই লিয়েন শু'র সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হওয়াটা সত্যি একটা অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। একটা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করে এর শুরু এবং এতেই শেষ।

তখন স-শহরে থাকতাম, শুনতাম সবাই তাকে একজন অদ্ভুত মানুষ বলে উল্লেখ করত; প্রাণিবিদ্যা নিয়ে পাশ করে এক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষকতা করত। সে সবার সঙ্গে সৌজন্যহীন ব্যবহার করত, অথচ সবার ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে পছন্দ করত। একদিকে পারিবারিক প্রথা বিলোপের কথা বলত, আবার স্কুলে যেদিন মাইনে পেত সেইদিনই টাকাটা তার ঠাকুরমাকে পাঠিয়ে দিত। এমনি আরও অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ছিল যা নাকি শহরের মানুষের জিব নাড়াবার পক্ষে যথেষ্ট বলব। সেবার হানশিশানে এক হেমন্তকালে আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে কিছুদিন ছিলাম, তাঁদের পদবীও ওয়েই—আমার বন্ধুর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। যাহোক, এঁরাও তাকে ঠিক বুঝতেন না, কেমন অপরিচিতের ভাব দেখাতেন। ও ঠিক আমাদের মতো নয়, তাঁরা বলতেন।

আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, যদিও চীন দেশে কুড়ি বছর ধরে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে, তবু হানশিশানের মতো পল্লীতে একটা অতি সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ও ছিল না। সেই একমাত্র ছেলে যে ঐ পার্বত্য গ্রাম থেকে পড়তে বাইরে গিয়েছিল; কাজেই গ্রামের লোকদের চোখে সে ছিল একটি উদ্ভট সৃষ্টি। সবাই তাকে ঈর্ষা করত, যদিও সবাই আবার বলত যে সে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে।

ঐ হেমন্তকালের শেষ দিকটায় হঠাৎ ব্যাপক আমাশায় রোগ দেখা দিয়েছিল সেই গ্রামে, আতঙ্কে শহরে ফিরে যাব এইরূপ ভাবছিলাম। তার ঠাকুরমাও নাকি এই ব্যাধির কবলে পড়েছেন। ধীরে ধীরে বয়সের দরুণ তাঁর অবস্থা বেশ সঙ্গীন হয়ে উঠল। ঐ গ্রামে একজনও ডাক্তার ছিল না। এই ঠাকুরমা ছাড়া ওয়েই-র আর কেউ ছিল না, বুড়ি এক চাকরানী নিয়ে অতি সরল ভাবে জীবন কাটাতেন। শৈশবে পিতামাতা উভয়কে হারিয়ে এই ঠাকুরমার কাছেই সে মানুষ হয়েছিল। সবাই জানত এক সময় তারা খুব কষ্টে থাকলেও এখন স্বচ্ছন্দে তাদের দিন কাটছে। ওয়েই-র স্ত্রী বা ছেলে মেয়ে কিছুই ছিল না, তাই তার ছোট্ট পরিবারে বেশ শান্তি ছিল। আর এজন্যই বোধ হয় সবাই তাকে প্রকৃতির উদ্ভট খেয়াল মনে করত।

ঐ গ্রামটি শহর থেকে স্থলপথে ত্রিশ মাইল, আর জলপথে কুড়ি মাইলের চেয়েও বেশি হবে বোধহয়, কাজেই ওয়েইকে খবর দিয়ে নিয়ে যেতেও যাবে

চারদিন। অবশ্যি অজ পাড়াগাঁয়ে এধরনের ঘটনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিত সবাই, মুখে মুখে খবর রটে যেত চারদিকে। পরদিনই বুড়ির অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠল, লোকও তখন পাঠানো হয়ে গিয়েছে। যাহোক, ভোর না হতেই তিনি মারা গেলেন। তাঁর মুখে শেষ কথা ছিলঃ আমার নাতিকে তোমরা দেখতে দিলে না ?

সমাজের প্রধান ব্যক্তিরা, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন তার ঠাকুরমার পরিবারের লোকেরা এবং অন্যান্য অনেকে অধীর চিত্তে ওয়েই-র সময় মতো এসে পেঁাছবার প্রতীক্ষায় বুড়ির মৃত্যু শয্যার পাশে বসে রইল। কফিন এবং শবআচ্ছাদন অনেকক্ষণ আনা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সবার সমস্যা ঐ নাতিটিকে নিয়ে, কারণ সবাই জানে অন্ত্যেষ্টির নিয়ম অনুযায়ী কার্যকলাপে সে নিশ্চিত বাধা দেবে। পরামর্শের পর ঠিক হলো, তিনটি শর্ত তাকে অবশ্যই মানতে হবে। প্রথম, শোকের পোশাক তাকে পরতেই হবে ; দ্বিতীয়, কফিনের সামনে কাউটাউ (কাউ টাউ, চীন দেশীয় প্রথায় ভূমিতে লুটাইয়া প্রণাম করা) করতে হবে ; তৃতীয়, বৌদ্ধ-সাধু এবং তাও পুরোহিত দিয়ে প্রার্থনা করাতে তাকে সম্মত হতে হবে !

এই সিদ্ধান্তে আসবার পর তারা আরও ঠিক করল, ওয়েই বাড়ি ফিরবার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই মিলে তাকে চেপে ধরবে এবং এই আলোচনায় যাতে সবাই একমত হয়, কোনোরকম আপসরফায় না যায় তাও লক্ষ্য রাখবে। গ্রামের সবাই ঘটনার গতি লক্ষ্য রেখে অপেক্ষা করতে লাগল। আধুনিক এবং বিদেশী রীতিনীতিতে বিশ্বাসী বলেই ওয়েই সবার কাছে অবিবেচক বলে গণ্য হতো। কাজেই একটা সংঘাত অবধারিত, ফলে একটা নতুন কিছু ঘটতে পারেও হয়তো।

শুনলাম, বিকেলের দিকে সে বাড়ি ফিরেছে। বাড়ি ঢুকেই ঠাকুরমার শবদেহের কাছে মাথা নুইয়ে একবার প্রণাম জানাল। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারেই প্রধানেরা সবাই এসে জড়ো হলো সঙ্গে সঙ্গে। তাকে হল ঘরে ডেকে নিয়ে দীর্ঘ ভূমিকার পর আসল প্রশ্ন তুলে ধরল। এক সুরে সবাই মিলে স্পষ্ট ভাষণের পর তর্ক করবার কোনো সুযোগই দিল না। দীর্ঘ বক্তৃতার পর সবাই থামল, একটা গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এল সারা হল ঘরটায়। আতঙ্কের সঙ্গে সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ রইল তার ঠোঁটের ওপর। কিন্তু মুখে ভাবের অভিব্যক্তির কোনো পরিবর্তন না [illegible]ন সে জবাব দিল কেবল একটি কথায়ঃ তাই হবে।

একেবারে অপ্রত্যাশিত সবার কাছে। তাদের মন থেকে একটা বিরাট বোঝা নেমে গেল, তবু বুকের ভার যেন আরো বেড়ে গেল, তার এই উদ্ভট উক্তিতে উদ্বেগ বাড়লো সবার ভেতর। একটা কিছু খবরের মতো খবর পাবে এই আশায় এসে নিরাশ হলো গ্রামের মানুষরা—তাদের মুখে কেবল একটি কথাঃ

অবাক কাণ্ড! সে বললে কিনা, তাই হবে! দাঁড়াও দেখি মজাটা! ওয়েই-র মুখে, তাই হবের অর্থ সবকিছু হবে প্রচলিত প্রথা অনুসারে, সুতরাং দেখবার তো আর থাকে না কিছু! তবু গ্রামের মানুষ অপেক্ষা করবে স্থির করল। সন্ধ্যার পর দর্শকে ভরতি হয়ে গেল হলঘর।

তাদের মধ্যে আমিও একজন গেলাম, কিছু ধূপ আর মোমবাতি আগেই পাঠিয়েছিলাম। আমি পৌঁছে দেখলাম শবআচ্ছাদন দিয়ে শবদেহ ঢাকা। বেশ রোগা পাতলা মানুষটি আমার ঐ বন্ধু, চৌকো ধরণের কোণা। কাটা মুখখানা, মাথার এলোমেলো চুলেই যেন প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। কালো ঘন ভুরু আর গোঁফ। চোখের দীপ্তি কেমন ক্ষীণ প্রাণহীণ। শবদেহকে সে সুন্দর অভিজ্ঞ হাতে সাজিয়ে দিল। স্থানীয় প্রথা অনুসারে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা সুপরিচালিত হলেও খুঁত বের করা একটা রীতি, তাই সে নীরব থাকল, সবার ইচ্ছাকে পুরণ করল, কোনো ভাবের অভিব্যক্তি ফুটল না তার চোখে মুখে। এক বৃদ্ধাকে দেখলাম আমার সামনে দাঁড়িয়ে সশ্রদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

প্রথানুযায়ী শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান শেষ করে কফিনের ঢাকনা বন্ধ করা হলো। কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা, পরক্ষণেই কেমন একটা বিস্ময় আর হতাশার চঞ্চলতা লক্ষ্য করলাম চারদিকে। হঠাৎ আমিও অনুভব করলাম একটি বিন্দু অশ্রুপাত করেনি ওয়েই। শোকার্তের বসবার মাদুরে সে বসেছিল চুপ করে। ক্ষীণ আলো জ্বলছিল তার দুই চোখে।

এমনি বিস্ময় আর অসন্তুষ্টির আবহাওয়ার ভেতরই তখনকার মতো সেদিনকার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। হতাশ শোকার্ত প্রতিবেশীরা তখন বাড়ি ফেরবার মুখে কিন্তু ওয়েই তখনও সেই মাদুরেই বসা, কোন গভীর চিন্তায় বুঝি মগ্ন। হঠাৎ অশ্রু ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল তার দুই চোখ বেয়ে। পরক্ষণেই গভীর নিশীথে উন্মুক্ত প্রান্তরের বুকে আহত নেকড়ের আর্তনাদের মতোই তার কণ্ঠ চিড়ে ফেটে পড়ল এক বিরাট আর্তনাদ করে। কেমন যেন ক্রোধ আর বেদনায় ভরা চীৎকার। প্রচলিত রীতির পরিপন্থী। বিস্ময়ে অভিভূত আমরা বিমুঢ় হয়ে গেলাম। একটু ইতস্ততের পর কেউ কেউ এগিয়ে গেল তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য। ধীরে ধীরে যোগ দিল অনেকেই। একটা ভিড় জমে গেল দেখতে দেখতে তাকে ঘিরে। তার বিলাপ চলতে লাগল, নিথর হয়ে বসে রইল লৌহমূর্তির মতো।

হতবুদ্ধি জনতা মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে। ওয়েই-র বিলাপ এমনি চলল প্রায় আধঘণ্টা ধরে, তারপর থেমে গেল হঠাৎ, শোকার্তদের কোনোকিছু না বলে সে সোজা চলে গেল নিজের ঘর হয়ে ঠাকুরমার ঘরে। তারপর বিছানায় শুয়ে বিভোর হয়ে গেল গভীর ঘুমে।

দিন দুই পর, আমি শহরে ফিরব প্রস্তুত হচ্ছিলাম। শুনতে পেলাম গ্রামবাসীরা

নিজেদের ভেতর আলোচনায় ব্যস্ত। খুবই যেন উদ্বিগ্ন মনে হলো সবাইকে। ওয়েই নাকি তার ঠাকুমার পরিত্যক্ত সব কিছু পুড়িয়ে ফেলবে স্থির করেছে। শুধু কিছু দিয়ে যাবে ঠাকুরমার চাকরানীকে, যে সারা জীবন ধরে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত ছিল বুড়ির শয্যা পার্শ্বে, বাড়িটাও দিয়ে যাবে তাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য। তার আত্মীয়দের কোনো যুক্তি গ্রাহ্য হলো না, তার সিদ্ধান্ত থেকে তাকে নড়ানো গেলো না।

শহরে ফিরবার পথে, হয়তো কেবল একটু-কৌতূহলের বশেই, তার বাড়ির ধার দিয়ে যাবার সময় ভেতরে ঢুকেছিলাম। মনে করলাম, যাবার আগে একটু শোক প্রকাশ করাও হবে। সেলাই ছাড়া শোকার্তের সাদা কাপড়ের পোশাক পরনে সে আমাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল ভেতরে। তার মুখের হাবভাব তেমনি নিষ্প্রাণ, উদাসীন। এতটা বিচলিত না হবার জন্য তাকে পরামর্শ দিলাম, অগ্রাহ্যসূচক একটা আওয়াজ করা ছাড়া সে মাত্র বলল ঃ আপনার এমনি উদ্বেগের জন্য ধন্যবাদ।

॥ ২ ॥

সেই বছরই শীতের প্রথম দিকটায় তৃতীয় বারের মতো দেখা হলো আমাদের দুজনের। স-এর একটা বইয়ের দোকানে। আমরা দুজনে পরিচিত এ ভাবটা প্রকাশ করবার জন্য আমরা উভয়েই একসঙ্গে অভিবাদন সূচক মাথা নেড়েছিলাম। কিন্তু ঐ বছরেরই শেষ দিকে যখন আমার চাকরি খোয়ালাম তখনই আমাদের দুজনের বন্ধুত্ব পাকাপাকি স্থাপিত হল। তারপর থেকে হামেশাই যেতাম ওয়েই-র বাড়িতে। প্রথমে অবশ্যি হাতে কোনো কাজ থাকত না বলে যেতাম সময় কাটাবার জন্য ; আর দ্বিতীয়ত স্বভাব চাপা হলেও সে নাকি খোঁড়া কুকুরের সমাদর করত। যাহোক, ভাগ্যদেবী চঞ্চলা বলেই খোঁড়া কুকুরও খোঁড়া থাকে না বরাবর, সুতরাং তার প্রকৃত বন্ধু খুব কমই ছিল। প্রতিবেদন সত্য প্রমাণিত হলো, কারণ আমার কার্ড পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম সে এসে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। তার বসবার ঘরটা দুটো ঘরকে এক করে নেওয়া একেবারে নিরাভরণ, টেবিল আর গুটিকতক চেয়ার বাদে আর ছিল না কিছু। কয়েকটা বুক কেস ছিল অবশ্যি। যদিও সে ভীষণ রকম আধুনিক বলে প্রসিদ্ধ ছিল, খুব কম কয়টাই আধুনিক বই ছিল তার বুক-কেসগুলিতে। সে জানত আমার চাকরি নেই কিন্তু পরস্পর সাধারণ সৌজন্যসূচক কয়েকটি মন্তব্য বিনিময়ের পর অতিথি এবং গৃহকর্তা উভয়েই নির্বাক বসে রইলাম কিছুক্ষণ। পরস্পরকে বলবার কোনো কথাই যেন রইল না। লক্ষ্য করলাম নিমেষের মধ্যেই সে তার মুখের সিগারেট শেষ করে ফেলল। সিগারেটের শেষ প্রান্তে জ্বলন্ত টুকরোটার উত্তাপ হাতে লাগার সঙ্গে সঙ্গে সে ফেলে দিল টুকরোটা।

—নিন একটা সিগারেট খান। সে একটা সিগারেট আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল অকস্মাৎ।

একটা সিগারেট নিলাম। টানবার ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষকতা আর বই-টই সম্বন্ধে দু একটা কথা বললাম। তারপরও যেন কথা খুঁজে পেলাম না। আমি ঠিক যখন উঠব ভাবছিলাম তক্ষুনি বাইরে কাদের গলার স্বর আর পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। চারটি ছেলেমেয়ে ছুটতে ছুটতে এল ঘরের ভেতর। সবার বড়টির হবে আট বা নয় বছর বয়স আর সর্বকনিষ্ঠটির বয়স চার কি পাঁচ। তাদের হাত পা মুখ আবার জামাকাপড় সবই কেমন বিশ্রি নোংরা, সবাইকে অনাকর্ষণীয় লাগল। তথাপি দেখলাম আনন্দে ওয়েই-র মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং তক্ষুনি উঠে চলে গেল পাশের ঘরে বলতে বলতে ঃ তা-লিয়াঙ, এর-লিয়াঙ, তোমরা এসো এখানে। সবাই এসো আমার কাছে। দেখবে এসো, মাউথ অরগান এনেছি তোমাদের জন্যে। কালকে চেয়েছিলে না ?

ছেলেরা সবাই ছুটে গেল তার পিছু পিছু। প্রত্যেকে একটা করে মাউথ অরগান পেয়েই আবার উধাও সঙ্গে সঙ্গেই। বাইরে গিয়েই আবার শুরু হলো তাদের ঝগড়া, কেঁদে উঠেছে একটা ছেলে।

—সমান, সমান! প্রত্যেককেই তো একটা করে দিয়েছি, আবার ঝগড়া কিসের ? ওদের পিছু পিছু বাইরে গিয়ে বলল সে।

—এরা কাদের ছেলে ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম সে ফিরে এলে।

—বাড়িওয়ালার। এদের মা নেই। ঠাকুরমা আছে।

—আপনার বাড়িওয়ালা কি বিপত্নীক ?

—হ্যাঁ। বছর তিন চার আগে স্ত্রী মারা গেছেন। তিনি আর বিয়ে করেননি। নইলে আমার মতো একজন অবিবাহিতের কাছে ঘরভাড়া দিতেন না কখনো। একবার নিষ্প্রাণ হাসি হেসে বলল সে।

ইচ্ছে হলো জিজ্ঞাসা করি কেন সে এতকাল বিয়ে করেনি, কিন্তু তার সঙ্গে আমার ভালো পরিচয় হয়নি তখনো।

একবার ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলে সে প্রাণখুলে কথা বলবে। আইডিয়ায় ভরতি ছিল তার মাথাটা, তারমধ্যে বেশীরভাগই অপূর্ব। তার কোনো কোনো অতিথিকে আমি একদম সহ্য করতে পারতাম না। তাই বোধহয়, ইউ তা-ফু'র (লু-সুনের সমসাময়িক লেখক) রোমাণ্টিক গল্পগুলি আদৌ ভালো লাগত না, এর দলের সবাই সবসময় নিজেদের ভাগ্যহীন যুবক, নয়তো শ্রেনীচ্যুত বলে পরিচয় দিত নিজেদের। কুঁড়ে গুমড়োমুখোদের মতো বড়ো বড়ো চেয়ারে হাত পা ছেড়ে বসে এরা খালি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলত, সিগারেট ফুঁকত আর কেবল ভ্রূকুটি করত।

তারপর ঐ বাড়িওয়ালার ছেলেগুলি, অদ্ভুত ঝগড়াটে। বাড়ির বাটি প্লেট

সবকিছু ভেঙ্গে চুড়মার করত, কেক খাবার জন্য কেবল বায়না ধরত, আর সবসময় কান ফাটিয়ে চেঁচিয়ে মরত। অথচ এদের দেখলেই ওয়েই-এর স্বভাবজাত নিষ্প্রাণ ভাবটা দূর হয়ে যেত আর এরাই তার জীবনের মহা মূল্যবান সম্পদ বলে মনে হতো! তৃতীয় ছেলেটার নাকি একবার হামজ্বর হয়েছিল। আমার বন্ধুটি এমনি উতলা হয়ে পড়েছিল যে তার মুখের রঙে বুঝি কালির ছোপ লেগে গিয়েছিল। তেমন কিছু হয়নি যাহোক। ওদের ঠাকুরমা প্রায়ই তাকে এ নিয়ে ঠাট্টা করতেন।

আমার অধৈর্য মনোভাব বুঝতে পেয়ে সে কথা বলবার সুযোগ নিল একদিন, বলল : জানেন, শিশুরা কত সুন্দর কত সৎ! তারা কত সরল কত···

—সবসময় নয় কিন্তু। আমি জবাব দিলাম।

—সবসময়। বড়দের দোষ কখনো পাবেন না শিশুদের ভেতরে। পরবর্তীকালে যদি তারা অসৎ হয়, আপনার যা ধারণা, সে জন্য দায়ী তাদের জীবনের আবেষ্টনী যা তাদের গড়ে তুলে। মূলত শিশুরা কখনো অসৎ নয় এটা নিশ্চিত জানবেন। তারা সরল···আমার ধারণা চীনদেশের একমাত্র আশা এই শিশুরা।

—একমত হতে পারছিনা আপনার সঙ্গে। অসতের শিকড় যদি না থাকে পরবর্তী কালে অসতের ফল আসবে কোথা থেকে? একটা ছোট্ট বীজের কথাই ধরুন। একটা বীজের ভেতর পাতার ভ্রূণ, ফুলের ভ্রূণ আর ফলের ভ্রূণ আছে বলেই না পরে পাতা ফুল আর ফলের জন্ম সম্ভব! একটা হেতু থাকতে হবে···।

উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে যেমন বৌদ্ধধর্মে দিক্ষা নেয়, আমিও তেমনি আমার বেকার জীবনের সূত্রপাতের পর থেকে বৌদ্ধসূত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেছিলাম। বৌদ্ধদর্শন আমি ঠিক বুঝতাম না যদিও, তবু এখানে ওখানে অনবরত বঁকে যেতাম।

সে যাহোক, ওয়েই বিরক্ত হলো। আমার দিকে ভীষণ দৃষ্টিতে একবার তাকালো, কোনো কথা বলল না। ঠিক বলতে পারলাম না, কোনো কিছু বলবার ছিল না, নাকি আমার সঙ্গে যুক্তিতর্কে নামবার কোনো প্রয়োজন সে বোধ করল না। কিন্তু আবার সে শীতল দৃষ্টিতে তাকাল, অনেকক্ষণ এমনি তাকায়নি; তারপর দুটো সিগারেট একটার পর একটা নীরবে টেনে যেতে লাগল। সে যখন তিন নম্বর সিগারেট ..াতে যাবে সেই অবসরে আমি কেটে পড়লাম।

আমাদের ছাড়াছাড়ি রইল তিন মাস। তারপর কতক ভুলে যাওয়ার দরুণ, আর কতক ঐ নির্দোষ শিশুদের সম্বন্ধে মত বদলের জন্যই হোক, সে শিশুদের সম্বন্ধে আমার বিরূপ মন্তব্যকে যেন ক্ষমাই বলে মেনে নিল। কি জানি হয়তো বা এমনি আমার আন্দাজ। আমার বাড়িতেই একদিন

ব্যাপারটা ঘটল। সেদিন দুএক গ্লাস মদ খাওয়ার পর কেমন একটা বিমর্ষভাব নিয়ে একটু উদ্ধতভাবেই মাথাটা তুলে সে বলেছিল ঃ জানেন, কথাটা ভাবতেও কেমন অদ্ভুত লাগে। এখানে আসবার পথে একটা ছোট্ট ছেলের সঙ্গে দেখা, ওর হাতে একটা নল। ছেলেটা ঐ নলটা আমার দিকে উ'চিয়ে চে'চিয়ে উঠল, মারব ? তখনো কিন্তু ভালো করে হাঁটতে শেখেনি...

—তার আবেষ্টনী তাকে এমনি গড়েছে।

কথাটা বলেই আবার ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে হলো। ভাগ্যিস, কথাটায় তেমন কান দেয়নি সে। আপন মনে মদ খেয়ে যাচ্ছিল, তারই ফ'াকে ফ'াকে একটার পর একটা সিগারেট উন্মাদের মতো ফ'ুকে চলছিল।

—আপনাকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম। প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্য আমি বললাম ঃ আপনি সাধারণত লোকের বাড়ি গিয়ে দেখা করেন না, কিন্তু আজকে হঠাৎ এলেন যে ? আপনার সঙ্গে পরিচয় এক বছর, কিন্তু আমার বাড়িতে এসেছেন এই প্রথম।

—আমিও আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম, কিছুদিন আমার বাড়ি যাবেন না। এক বাপ আর তার ছেলে এসেছে আমার ওখানে, একেবারে কীট বিশেষ। মানুষই বলা চলে না।

—বাপ আর ছেলে ? তারা কারা ? আমি একটু বিস্মিত হয়েছিলাম।

—আমার এক তুতো-ভাই আর তার ছেলে। ছেলে ঠিক বাপের প্রতিমূর্তি।

—আপনাকে দেখতে আর শহরে কয়টা দিন একটু স্ফূর্তি করে কাটাতে এসেছে বোধহয়।

—না। ঐ ছেলেটিকে আমার কাছে পোষ্য দেবার প্রস্তাব নিয়ে এসেছে।

—কী বললেন ? আপনি পোষ্য নেবেন ? আমি অবাক হয়ে বলে উঠলাম ঃ কিন্তু আপনি তো এখনো বিয়ে করেননি।

—তারা জানে আমি বিয়ে করব না। ওতে তাদের কিছু আসে যাবে না। আসলে ঐ গ্রামে আমার একটা আধভাঙা বাড়ি আছে, ঐটার উপস্বত্বের ওয়ারিশ হতে চায়, ঐ তাদের লাভ! আপনি তো জানেন, এছাড়া আর কোনো কিছু নেই আমার। আমার হাতে যখন যা আসে তাই আমি খরচ করে ফেলি। ঐ বাড়ি আমার একটিমাত্র সম্বল। আপাতত ঃ ঐ বাড়িতে যে বুড়ি ঝি-টা আছে তাকে তাড়ানোই হলো ওদের একমাত্র মতলব।

তার মন্তব্যে এমনি অসূয়ক মনোবৃত্তির প্রকাশ দেখে আমি থমকে গেলাম। যা হোক, তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করলাম, বললাম ঃ আপনার আত্মীয়েরা অতটা খারাপ হবে না নিশ্চয়! একটু সেকেলে, এই যা। এই ধরুণ না, সে বছর আপনি যখন খুবই কান্নাকাটি করছিলেন তখনএ'রা সবাই তো এসেছিলেন।

—জানেন, যখন নিতান্তই বালক, আমার বাবা মারা গেলেন, আমি ভীষণ কেঁদেছিলাম সেদিন। সবাই মিলে সেদিন এসেছিল বাড়িটা দখল করে

জোর করে দলিলে সই করিয়ে নিতে। আবার ওয়েই তখন এসেছিল আমাকে সান্ত্বনা দিতে...

সে মুখ তুলে তাকাল উপরের দিকে, যেন সেদিনকার ঘটনার কিছুটা স্মৃতি ছড়িয়ে আছে হাওয়ার সঙ্গে।

—সমস্যার মূল কথা হলো, কোনো সন্তান নেই আপনার। কাজেই বিয়ে করে ফেলেন না কেন?

প্রসঙ্গটা চাপা দেবার আবার একটা সুযোগ পেলাম এবং অনেকদিন ধরে এই প্রশ্নটা করবার সুযোগের সন্ধান আমি করছিলাম। এটাকে প্রকৃষ্ট সময় বলে মনে করলাম।

বিস্ময়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর চোখের দৃষ্টি নিজের হাঁটুর উপর নামিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফুঁকতে লাগল। আমার প্রশ্নের কোনো জবাব পেলাম না।

॥ ৩ ॥

তবু তার এই বৈশিষ্ট্যহীন অস্তিত্বকেও শান্তিতে উপভোগ করতে দিল না। ক্রমশ গোত্রহীন কাগজগুলিতে তার বিরুদ্ধে বেনামী আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশিত হতে লাগল এবং তার সম্বন্ধে নানা রকম গুজব স্কুল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। সেকালের সাধারণ খোসগল্প বলে কেবল এ গুলোকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না, রীতিমত ক্ষতিকারক হয়ে উঠল। আমি জানি নানা পত্রপত্রিকায় সে যেসকল প্রবন্ধ লিখত এসব তারই ফল। কাজেই এতে আমি কান দিইনি। স-এর বাসিন্দারা স্পষ্ট কথা পছন্দ করত না, কাজেই এ দোষে যে দোষী সে তাদের গোপন আক্রমণের অবধারিত লক্ষ্য হয়ে উঠত। এই ছিল প্রচলিত রীতি এবং ওয়েই নিজেই তা জানত। যাহোক, সেবার বসন্তকালে যখন শুনলাম, স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে চাকরিতে ইস্তফা দেবার আদেশ দিয়েছে, স্বীকার করতে বাধ্য যে আমি খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। অবশ্যি এটা প্রত্যাশিত ছিল, তবু আমি বিস্মিত হয়েছিলাম এই কারণে, আমি আশা করেছিলাম আমার বন্ধুটি এই সঙ্কটকে এড়িয়ে যেতে পারবে। তবে স-এর বাসিন্দারা সাধারণত যা ঘটে থাকে তার চেয়ে বেশি কিছু যে করেনি এটা ঠিক।

আমার নিজের সমস্যা নিয়ে আমি তখন ব্যস্ত। শানিয়াঙ-এর একটা স্কুলে চাকরির জন্য কথাবার্তা চালাচ্ছিলাম। তাই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার অবসর ছিল না। তখনকার ঝামেলার হাত থেকে উদ্ধার পেতে তিন মাসের চেয়েও বেশি সময় কেটে গেল। তখনও তার সঙ্গে দেখা করতে যাবার কথাটা খেয়ালই হয়নি। একদিন সদর রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একটা পুরনো বইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। ওয়েই-এর নিজস্ব সংগ্রহ

Comentaries on Ssuma Chien Historical Recoads (তাঙ রাজত্বকালিন, ৬১৮-৯০৭, সুমা চেন) বইখানার প্রথম সংস্করণের একটা খণ্ড ঐ দোকানে আছে দেখে একটু বিস্মিত হলাম। আমার বন্ধুটি সমজদার না হলেও বই ভালোবাসত এবং জানতাম এই বইখানার প্রভূত মূল্য ছিল তার কাছে। নিশ্চয়ই ভীষণ অর্থকষ্টে পড়ে সে বইখানা বেচে দিয়েছে। চাকরি যাবার দু এক মাসের মধ্যেই সে এতটা আর্থিক দুর্দশায় নেমে আসবে এটা সম্ভব চিন্তা করাও কঠিন লাগল ; তবু এটা জানতাম অর্থ হাতে আসলেই সে খরচ করে ফেলত, কখনও সঞ্চয় করত না। তার সঙ্গে দেখা করব ঠিক করলাম। ঐ রাস্তার একটা দোকান থেকে এক বোতল মদ, দুই প্যাকেট পিনাট, দুটো মাছের মাথা ভাজা কিনে সঙ্গে নিলাম।

তার বাড়ির দরজা বন্ধ ছিল। দুই দুই বার ডাকলাম, কোনো সাড়া পেলাম না। ভাবলাম সে হয়তো ঘুমিয়ে আছে তাই আরো চেঁচিয়ে ডাকলাম এবং জোরে জোরে দরজায় ঘা দিতে লাগলাম।

—বোধহয় বাইরে বেরিয়েছেন।

ঐ ছেলেগুলির ঠাকুরমা, মোটা মহিলার কুঁতকুঁতে চোখ, উলটো দিকের জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন এবং বেশ অধৈর্যের সঙ্গেই বললেন।

কোথায় গেছেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—কোথায়? কী করে বলব...কোথায় তিনি গেছেন! একটু অপেক্ষা করতে পারেন, হয়তো আসবেন এক্ষুনি।

দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে আমি তার বসবার ঘরে ঢুকলাম। খুব বদলে গেছে ঘরের ভেতরকার চেহারাটা, শূন্যতায় একেবারে নিঃসঙ্গ নির্জন। খুব কম ফার্নিচারই অবশিষ্ট ছিল, তার লাইব্রেরীতে কেবল ঐসব বিদেশী বইগুলি ছিল যেগুলো বিক্রি করা সম্ভব ছিল না। ঘরের মাঝখানটায় সেই বিরাট টেবিলটা ছিল, যার চারদিক ঘিরে এক সময় ঐসব বীর পুরুষ যুবকেরা জনা কয়েক অস্বীকৃত প্রতিভা আর ঐ নোংরা হট্টগোলপ্রিয় ছেলেগুলি জটলা করত। সব কেমন নিস্তব্ধ লাগল। সারা টেবিলটার উপর এক আস্তর ধুলো। বোতল আর প্যাকেট কয়টা টেবিলের উপর রেখে একটা চেয়ার টেনে নিলাম। টেবিলের ধারে দরজার দিকে মুখ করে বসলাম সেই চেয়ারটায়।

খুব শীগগির বলব, ঘরের দরজা খুলে গেল। কে যেন ছায়ার চেয়েও নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল। ওয়েই। গোধুলির ছায়ায় হয়তো তার মুখটা আঁধার লাগছিল কিন্তু তার মুখের ভাব অপরিবর্তিত।

—আরে, আপনি? কতক্ষণ এসেছেন? বেশ খুশী হয়েছে মনে হলো।

—বেশীক্ষণ নয়। আমি বললাম ঃ কোথায় গিয়েছিলেন?

—তেমন কোথাও না। এই একটু হাঁটছিলাম।

সেও একটা চেয়ার টেনে টেবিলের ধারে বসল। দুজনে মদের গ্লাস নিয়ে

বসলাম, তার চাকরি যাবার কথা উঠল। তবে ঐ ব্যাপারে খুব বেশী কিছু সে বলতে চাইল না, কারণ এটাই প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক। এরকম ঘটনা আরও অনেকবার হয়েছে। বিচিত্র কিছু নয়, কাজেই আলোচনার কিছু নেই। যা তার অভ্যেস, প্রচণ্ড মদ খেল, সমাজ আর ইতিহাস নিয়ে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দিল। হঠাৎ কি জন্য যেন শূন্য বইয়ের সেলফগুলির দিকে আমার নজর গেল, এবং Comentaries on Ssuma Chien Historical Records' বইটার কথা স্মরণ করে কেমন একটা নিঃসঙ্গত বিষণ্ণতা বোধ জাগল আমার মনে।

—আপনার বসবার ঘরটা ভীষণ ফাঁকা ফাঁকা লাগছে—এর মধ্যে বেশী লোক আসেননি বোধহয় আপনার কাছে ?

—কেউ আসেনি। আমার মুড ঠিক না থাকলে কেউ এসে মজা পায় না। মেজাজ খারাপ থাকলে সত্যি লোকে অসোয়াস্তি বোধ করে। যেমন ধরুন শীতকালে কেউ পার্কে বেড়াতে যায় না—

মদের গ্লাসে পর পর দুবার চুমুক দিল, তারপর সম্পূর্ণ নীরব। হঠাৎ মুখ তুলে সে বলে উঠল : আমার মনে হয় একটা কিছু জোটাবার ভাগ্য আপনারও হয়নি বোধহয় ?

যদিও জানতাম নিতান্ত নেশার ঘোরেই সে নিজের মনকে উন্মুক্ত করে দিচ্ছিল, তবু তার প্রতি মানুষের ব্যবহারের কথা ভেবে ঘৃণায় মন ভরে উঠল। আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ সে কান খাড়া করে উঠল, তারপর এক মুঠো পি-নাট হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে ছেলেদের হাসি আর হৈহুল্লোড় শুনতে পাচ্ছিলাম।

কিন্তু সে বাইরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দল চুপ করে গেল। মনে হলো যেন ওখান থেকে ওরা সব চলে গিয়েছে। তাদের পিছু পিছু গিয়ে সে যেন কী বলল তাদের, কিন্তু তাদের কোনো জবাব আমার কানে এল না। তারপর ছায়ার মতো নিঃশব্দে ঘরে ফিরে মুঠো ভরতি পি-নাটগুলি ঠোঙাটার ভেতর রেখে দিল।

—আমি কিছু দিতে গেলে ওরা আর এখন নেয়না। বিদ্রূপের সুরে নিচু গলায় বলল সে।

—ও কিছু না, ওয়েই। আমি বললাম ঠোঁটের কোণে একটুখানি মৃদুহাসি আনবার চেষ্টা করে। যদিও অন্তরে ছিল দুঃখের জ্বলুনি : আমার মনে হয় নিজের মনকে অযথা কষ্ট দিচ্ছেন আপনি। নিজের পরিজনদের এত ছোটো করে ভাবেন কেন ?

বিশ্বনিন্দুকের মৃদু হাসি তার ঠোঁটে।

—দাঁড়ান, এখনো শেষ করিনি। আমার ধারনা আপনি মনে করেন আমার মতো যারা মাঝে মাঝে আসে আপনার কাছে, তারা কেবল সময় কাটাতে

অথবা আপনার সময়ের বিনিময়ে নিজেদের আনন্দ দিতেই আসে, তাই না ?
—না, তা আমি ভাবি না। তবে হ্যাঁ, মাঝে মাঝে মনে হয় বটে। হয়তো কথা বলবার কিছু খোরাক পায় তারা।
—তাহলে এ আপনার ভুল। মানুষ এরকম নয়। আপনি রেশম পোকার গুটিতে জড়িয়ে ফেলছেন নিজেকে। আরও প্রফুল্ল মনে সবকিছু দেখা উচিত আপনার। আমি একটা নিঃশ্বাস ফেললাম।
—হয়তো বা। কিন্তু আমায় বলুন তো, এই রেশম গুটির সুতো আসে কোত্থেকে ? হয়তো, এ ধরনের মানুষ অনেক আছে সে সত্যি ; এই আমার ঠাকুরমার কথাই ধরুন না। যদিও আমার ধমনিতে তাঁর দেহের এক ফোঁটা রক্তও নেই তবু তার ভাগ্যের ওয়ারিশন পেতে পারি আমি। কিন্তু ওতে কিছু আসে যায় না, তাঁর সঙ্গে নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে বিলাপ অনেক করেছি। তার ঠাকুরমার অন্ত্যেষ্টির সময় কী হয়েছিল হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল। আমি চোখের সামনে যেন সেদিনকার ঘটনার সবকিছু জলজ্যান্ত দেখতে পাচ্ছিলাম।
—আমি এখনো কিন্তু বুঝতে পারিনা এত কান্না কেন কেঁদেছিলেন আপনি। দুম করে আমি বলে ফেললাম।
—আমার ঠাকুরমার অন্ত্যেষ্টি দিনের কথা বলছেন ? না, সে আপনি বুঝবেন না। সে ল্যাম্পটা জ্বালাল। আমার মনে হল ঠিক এই জন্যই আমাদের বন্ধুত্ব সম্ভব হয়েছে। ধীর শান্তভাবে সে বলল ঃ জানেন, আমার এই ঠাকুরমা আমার ঠাকুরদার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন। বাবার শৈশব অবস্থাতেই তিন বছর বয়সে তাঁর নিজের মা মারা যান। কোন এক চিন্তায় বিভোর হয়ে নীরবে সে মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে চলল, সঙ্গে সঙ্গে একটা মাছের মুড়ো-ভাজা শেষ করে ফেলল।
—গোড়াতে আমি জানতাম না। সে বলে যেতে লাগল। কেবল ছেলেবেলা থেকেই আমার কেমন একটা ধাঁধা লাগত। তখনো আমার বাবা বেঁচে ছিলেন এবং আমাদের পরিবারের তখন স্বচ্ছল অবস্থা। প্রতি বছর চন্দ্র নববর্ষের দিন পূর্ব পুরুষদের ছবি টাঙানো হতো, ধুমধামের ভেতর বলি-উৎসব হতো। ঐসব সুন্দর পোশাকে সজ্জিত মূর্তিগুলি দেখে আমি অপূর্ব আনন্দ পেতাম। সে সময় বাড়ির কোনো ঝি আমাকে কোলে করে নিয়ে এক একটা করে ওগুলো দেখাত এবং একটা বিশেষ ছবির কাছে নিয়ে ওটাকে দেখিয়ে আমাকে বলত ঃ ইনি তোমার আসল ঠাকুরমা। নমস্কার করো, যাতে তোমাকে রক্ষা করেন, আশীর্বাদ করেন যেন সুস্থ সবল হয়ে তুমি বড়ো হতে পার। আমার পাশে যিনি আছেন, যাঁকে দেখছি, তাঁকে ছাড়া আর একজন ঠাকুরমা কেমন করে হলো আমি ঠিক বুঝতাম না। তবু আমি ছবির এই ঠাকুরমাকেও ভালোবাসতাম, যিনি নাকি আমার আসল ঠাকুরমা ছিলেন। বাড়িতে যিনি

ছিলেন সেই ঠাকুরমার মতো আমার আসল ঠাকুরমার তত বয়স ছিল না! তন্বী এবং সুন্দরী, দেখতে অনেকটা আমার মায়ের মতন। পরনে সোনালী কাজ-করা লাল রঙের পোশাক, মাথায় মুক্তোর মালা সমেত টুপি। তাকালেই মনে হতো যেন তাঁর দুটি চোখ তাকিয়ে আছে আমার দিকে, ঠোঁটের কোণে অস্পষ্ট হাসি। আমি জানতাম আমাকেও তিনি হয়তো নিশ্চয় ভালোবাসতেন।

কিন্তু বাড়িতে যিনি ছিলেন সেই ঠাকুরমাকেও আমি ভালোবাসতাম, সে বলল: তিনি সারাদিন জানলার ধারে বসে সেলাই নিয়ে বিভোর হয়ে থাকতেন। যতই খুশীতে হাসি না কেন, যতই তাঁর সমুখে নাচি আর হৈহুল্লোড় করি না কেন, আর যতই বা ঘুরে ফিরে তাঁরই কাছে যাই, কখনো তাঁকে হাসাতে পারতাম না। এতে তাঁকে প্রাণহীন মনে হতো আমার যেমন অন্য সব ঠাকুরমাদের হতো না। তবু তাঁকে আমার ভালো লাগত। পরবর্তীকালে আমার মন ধীরে ধীরে তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিল, আমার বয়স বাড়ছিল বলে নয় এবং তিনি আমার আপন ঠাকুরমা নন জেনেছিলাম বলেও নয়, বরং অনবরত দিনের পর দিন ঐ সেলাই নিয়ে বসে থাকতেন বলে আমি বিরক্ত হয়ে উঠতাম। তবু অপরিবর্তনীয় রইলেন তিনি। তিনি সেলাই করতেন, আমার পরিচর্যা করতেন, ভালোবাসতেন এবং আগের মতোই সবসময় আমার দিকে নজর রাখতেন। আর যদিও তিনি খুব কমই হাসতেন তবু কখনো আমাকে বকাবকি করতেন না। আমার পিতার মৃত্যুর পরও অবস্থা তেমনি অপরিবর্তিতও রইল। পরে তাঁর এই সেলাই কাজের উপরই আমাদের জীবিকা নির্ভর ছিল, এবং স্কুলে ভর্তি হবার আগ পর্যন্ত আমাদের চলছিল এমনি ভাবেই।

মোম শেষ হয়ে আসছিল, তাই আলোটা নিভু নিভু হয়ে এল। সে উঠে বুক-কেসের তলা থেকে একটা ছোট্ট টিন এনে কিছুটা গলা মোম ঢেলে দিল ল্যাম্পটায়।

—মোমের দাম এমাসে দোনা বেড়ে গেছে। সে বলল আস্তে আস্তে, মোমবাতির সলিতাটা একটু বাড়িয়ে দিতে দিতে। প্রতিদিন জীবন কঠিন হয়ে উঠছে। স্কুল থেকে পাস করে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত তিনি একটুও বদলাননি। পরে আমার একটা চাকরি হবার পর আমাদের জীবন নিরাপদ এবং সহজ হয়ে গেল। তবু আমার ধাই মা, অসুস্থ হয়ে যখন আর নড়তে পারতেন না এবং যখন সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন তখন পর্যন্ত তিনি অপরিবর্তিত রইলেন···

তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলিতে, সে আবার বলে যেতে লাগল। আমার মনে হয়, মোটামুটি তিনি খুব অসুখী ছিলেন না বলেই বেঁচেছিলেন অনেকদিন। কোনো কারণ ছিল না আমার শোক করবার। তাছাড়া, তাঁর জন্য বিলাপ করবার

আরও অনেক লোক কি ছিল না সে সময় ? এমন কি যারা অনবরত তাঁকে ঠকাবার আর লুটে খাবার চেষ্টা করেছে তারাই তো বেশী বিলাপ করেছে এবং শোকে আত্মহারা হয়েছে তাঁর জন্যে।

সে একটু হাসল কথাটা বলে। আবার বলতে লাগল ঃ

যাইহোক, সেসময় তাঁর জীবনের সবটুকু ছবি আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠেছিল. যে জীবন নিজের জন্যে একটা বিরাট নিঃসঙ্গতা সৃষ্টি করে তারই তিক্ততায় বিষিয়ে ছিল। আমি অনুভব করলাম, যেন এমনি জীবন আরও আছে অনেক। তাদের শোকে কাঁদতে ইচ্ছে হলো আমার, কিন্তু কি জানি, হয়তো আমি একটু বেশী ভাবপ্রবণ ছিলাম, তাই…এখন আপনার উপদেশ যেমন ঠিক এমনটি-ই আমি অনুভব করেছিলাম, সেকি তাঁর জন্যে। কিন্তু আসলে আমার মনের ভাবগুলি পুরোপুরি ভ্রান্ত ছিল। ব্যক্তিগত ভাবে আমার কথা বলতে গেলে, আমার বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি আমার মনোভাব ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছিল।

সে থামল, হাতের দুই আঙুলের ফাঁকে একটা সিগারেট ধরা. মাথাটা নিচু করে কেমন গভীর চিন্তায় যেন ডুবে গেল। প্রদীপের আলোটা আবার ঈষৎ কেঁপে উঠল।

—দেখুন ভাবতেও কেমন লাগে এবং জীবনটাও কেমন অর্থহীন লাগে যদি একটিও কেউ না থাকে মরণের পর অন্তত দু ফোঁটা চোখের জল ফেলবার জন্য। সে বলল, স্বগতোক্তির মতোই। কিছুক্ষণ থেমে তাকাল আমার দিকে। আপনি আমার জন্যে কিছু ব্যবস্থা করতে পারবেন না, তাই না ? কাউকে দিয়ে একটা কিছু পাওয়া অবশ্য প্রয়োজন আমার।

—আপনার আর কোনো বন্ধু নেই যার কাছে যেতে পারেন আপনি ? তখনো নিজের জন্যই কিছু করতে সক্ষম হইনি, অন্যের কথা দূরে থাক !

—আছে কয়েকজন, কিন্তু সবাই আমরা একই নৌকোর আরোহী।

আমি যখন তার বাড়ি ছেড়ে বাইরে এলাম তখন তাকিয়ে দেখলাম আকাশে পূর্ণশশী বিদ্যমান এবং নিশি তখন গভীর স্তব্ধ।

॥ ৪ ॥

শানিয়াঙ অঞ্চলে শিক্ষকতা বৃত্তি আদৌ নিরঙ্কুষ পুষ্পশয্যার মতো ছিল না মোটেই। দু মাস পড়িয়েছি, একটা সেণ্ট বেতন পাইনি, সিগারেটের খরচ কমাতে হলো শেষপর্যন্ত। কিন্তু স্কুলের কর্মীরা এমন কি যারা মাসে মাত্র পনরো ষোল ডলার বেতন পেত তারাও, অল্পেতেই সন্তুষ্ট ছিল। অপরিসীম কষ্টে জীবন কাটিয়ে লৌহকঠিন বর্ম ধারণ করেছিল তারা, যদিও শীর্ণ এবং নিষ্প্রাণ দেখতে, তবু ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত অম্লানবদনে তারা বিরামহীন কাজ করে যেত ; উর্দ্ধতন কেউ কাজে বাধা দিলেও সশ্রদ্ধ চিত্তে মেনে নিত।

কাজেই তারা সবাই সরল জীবন আর মহান চিন্তায় নিবিষ্ট থাকত। এমনি চিন্তা করতে করতে হঠাৎ কেমন করে যেন ওয়েই-র বিদায়কালিন কথা কয়টা মনে পড়ে গেল। তখন খুবই কষ্টে তার দিন কাটছিল, তার পুরনো বিশ্বনিন্দুকতা ভাবটা বাহ্যত কিছুটা পরিহার করে থাকলেও মাঝে মাঝেই তাকে ভীষণ বিহ্বল মনে হতো। যখন সে আমার বাড়িতে এল আমাকে বিদায় জানাতে, কিছুটা ইতস্তত করবার পর সে তোতলিয়ে বলল ঃ আমার জন্য কিছু ব্যবস্থা সম্ভব হবে কি সেখানে? নকলনবিশী কাজ করতেও আপত্তি নেই আমার। এই ধরুন মাসে কুড়ি থেকে ত্রিশ ডলার পেলেও আমার চলবে। আমি···আমাকে···

অবাক হয়ে গেলাম। ভাবিনি সে নিজেকে এতটা নিচে নামিয়ে আনবে, কাজেই কী জবাব দেব বুঝে পেলাম না।

—আমাকে—আমাকে—আরও কিছুদিন বাঁচতে হবে আমাকে···

—সেখানে গিয়ে নিশ্চয় খুঁজে দেখব। নিশ্চয়ই আমার যথাসাধ্য করব। তার মুখের কথা শেষ না হতেই আমি বললাম।

সেসময় আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম। ঐ কথাগুলি পরে প্রায়ই আমার কানে বাজত, মনে হতো যেন ওয়েই তখনো আমার সামনে দাঁড়িয়ে তোতলাতে তোতলাতে বলছে ঃ আরও কিছুদিন বাঁচতে হবে আমাকে। অনেকের কাছে তার কথা বললাম, অনেকের আগ্রহ জাগাতে চেষ্টা করলাম কিন্তু কোনো ফল হলো না। একদিকে আসন সংখ্যা যেমনি কম, তেমনি বেকার সংখ্যাও অপরিমিত। কাজেই এদের সবাই সাহায্য করতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করে দুঃখ প্রকাশ করতেন, আমিও অসমর্থতার ত্রুটিজনিত দুঃখ প্রকাশ করে তাকে চিঠি লিখতাম। বছরের শেষ দিকটায় অবস্থা খারাপ থেকে খারাপ হতে লাগল। স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক দ্বারা সম্পাদিত 'রিজন' নামক সাময়িক পত্রিকায় আমার বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু হলো। কোনো নামের উল্লেখ থাকত না বটে, কিন্তু বিশেষ চাতুর্যের সঙ্গে কটাক্ষ করে বলা হতো যে, আমি ঐ বিদ্যালয়ে গণ্ডগোল সৃষ্টিতে ইন্ধন জুগিয়ে যাচ্ছি, এবং ওয়েই-র নাম সুপারিশ করাকেও আমার সমর্থনে একটা গোষ্ঠী তৈরি করবার প্রচেষ্টা বলে ব্যাখ্যা করা হতো।

কাজেই আমাকে নীরব হতে হলো। ক্লাসে যাওয়া ছাড়া অন্য অধিকাংশ সময় নিজের ঘরে আবদ্ধ থাকতাম এবং কখনো ঘরের জানলা দিয়ে সিগারেটের ধুয়া নির্গত হতে দেখলেও আমার আশঙ্কা হতো পাছে ওরা মনে করে, ঘরে বসে আমি ষড়যন্ত্র করছি সঙ্কট সৃষ্টি করবার জন্য। সুতরাং ওয়েই-র জন্য বাস্তবিক আমি কিছুই করতে পারলাম না। শীতকালের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ অবস্থা গেল।

সারাদিন বরফ পড়ছিল, সন্ধ্যা পর্যন্ত বিরাম নেই। বাইরে চারদিক এমনি

নিস্তব্ধ যে নিস্তব্ধতার আওয়াজও বুঝি কানে বাজছিল। প্রদীপের অস্পষ্ট আলোতে চোখ বুজে বসেছিলাম। কোনো কাজ হাতে ছিল না। কল্পনা করছিলাম তুষার কণার অবিরাম বর্ষণে বয়ে চলেছে বরফের সীমাহীন প্রবাহ। নববর্ষ আগত প্রায়। বাড়িতে সবাই হয়তো ব্যস্ত হয়ে উঠছে এর মধ্যেই। নিজের শৈশবে আমি আবার ফিরে গেলাম, একপাল শিশুকে সঙ্গী করে বাড়ির পেছন আঙ্গিনায় তুষার মানব গড়ছিলাম। কয়লার কালো কালো টুকরো দিয়ে গড়া তুষার মানবের চোখ দুটো যেন হঠাৎ রূপ নিল ওয়েই-র দুটি চোখের মতো ঃ

—আরও কিছুদিন বাঁচতে হবে আমাকে।

শুনতে পেলাম আবার সেই একই কণ্ঠস্বর!

—কেন?

অসতর্ক ভাবে বলে ফেললাম। আমার এই মন্তব্য যে একেবারে বেমানান মুহূর্তের মধ্যেই উপলব্ধি করতে পারলাম।

সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেল ঘুমের ঘোর। আমি উঠে বসলাম, একটা সিগারেট ধরিয়ে জানলাটা খুললাম, দেখলাম তখনো বরফ পড়ছে আরো তুমুল বেগে। দরজায় টোকা দেওয়ার আওয়াজ শুনলাম। একটু পর দরজা খুলে বাড়ির ভৃত্য ভেতরে এল, তার পায়ের আওয়াজ থেকেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। একটা বিরাট খাম সে আমার হাতে দিল, লম্বায় প্রায় ছয় ইঞ্চির চেয়েও বেশি। ঠিকানাটা হিজিবিজি করে লেখা তবে খামের ওপর ওয়েই-র নাম দেখলাম। আমি স-ছেড়েছি পর এই তার প্রথম চিঠি। চিঠিপত্রের ব্যাপারে তার প্রকৃতি আমার জানা ছিল বলেই তার এই দীর্ঘকালিন নীরবতায় আমি একটুও বিস্মিত হইনি, শুধু মাঝে মাঝে মনে হতো সে কেমন আছে যদি জানতে পারতাম। কাজেই এই চিঠি পেয়ে একটু অবাক হলাম। চিঠিটা খুলে ফেললাম। খুব তাড়াহুড়োর ভেতর হিজিবিজি করে লেখা। চিঠির মর্ম এই ঃ

"—শেন ফেই,

কী বলে সম্বোধন করব আপনাকে? তাই ফাঁকা রেখে দিলাম, আপনার খুশি মতন ভরতি করে নেবেন। আমার কাছে একই কথা।

এ পর্যন্ত তিনখানা চিঠি পেয়েছি আপনার কাছ থেকে। জবাব দিইনি কেবল একটি কারণে ঃ ডাক টিকিট কিনবার পয়সাই ছিল না আমার। বোধহয় আপনার জানবার কৌতূহল আছে, আমার কী হলো। খুব সোজা কথায় বললে ঃ আমি ব্যর্থ হয়েছি। ভাবতাম আমি বুঝি আগেই ব্যর্থ হয়েছিলাম, কিন্তু তখন ভুল করেছিলাম; আজ আমি বলছি সত্যি আমি ব্যর্থ হয়েছি। আগে অন্তত কেউ একজন চাইত যে আরো কিছুদিন বেঁচে থাকি এবং আমি নিজেও চাইতাম, দেখলাম এ অসম্ভব। এখন, প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তবু বেঁচে থাকতে হবে আমাকে—

আমি কি বেঁচে থাকব ?

যে চাইত আমি বেঁচে থাকি সেইতো আর নিজেই বেঁচে নেই। ফাঁকে পড়ে শত্রুর হাতে সে নিহত হয়েছে। কে তাকে হত্যা করল ? কেউ জানেনা।

পরিবর্তন এত দ্রুত এল! গত ছয়মাস আমি সত্যিকার ভিক্ষুকে পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিলাম ; কথাটা সত্যি, সেই রকমই লাগত আমাকে। তবু, আমার একটা আদর্শ সম্মুখে ছিল ; সেই আদর্শের জন্যে আমি ভিক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলাম, তারই জন্যে শীতে কেঁপেছি, অনাহারে কাটিয়েছি, নিঃসঙ্গ হয়েছি, শত কষ্ট সহ্য করেছি। কিন্তু নিজেকে আমি ধ্বংস করতে চাইনি। কাজেই আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, একজন অন্তত চেয়েছিল আমি বেঁচে থাকি। তার চাওয়ার পেছনেও একটা অকাট্য যুক্তি ছিল। এখন আর কেউ নেই, একজনও নেই। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করি বাঁচবার উপযুক্ত আমি নই, কারও বাঁচবার অধিকার নেই! তথাপি যারা আমার মৃত্যু কামনা করে তাদের বিরুদ্ধে মনের কঠোর বিদ্বেষ প্রকাশ করবার জন্যও যে আমি বাঁচতে চাই, সে বিষয়ে আমি সচেতন ; কারণ আমি জানি এমন কেউ একজনও নেই যে আমাকে ভদ্রভাবে বেঁচে থাকতে দেখতে চায়। কাজেই আমি এও জানি আঘাত দিলেও কেউ আহত হবে না। তাই এদের আমি আঘাত দিতে চাই না। কিন্তু এখন তো কেউ নেই, একজনও নেই। কী আনন্দ! কী অপূর্ব! যা কিছু আমি আগে ঘৃণা করতাম বা বিরোধিতা করতাম তাই আমি করছি এখন! আগে যা কিছু বিশ্বাস করতাম, যা কিছু সমর্থন করতাম তার সব আজ পরিত্যাগ করেছি। আমি ব্যর্থ হয়েছি ঠিক কিন্তু আমি জয়ী হয়েছি।

আপনার কী মনে হয় আমি পাগল হয়েছি ? আপনার কি মনে হয় আমি একজন নায়ক হয়েছি, নাকি একজন মহৎ ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছি ? না, ঐসব কিছু নয়। খুব সহজ ব্যাপার, আমি জেনারেল তু-র একজন উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছি, তাই প্রতি মাসে আশি ডলার বেতন পাই আমি।

…শেন ফেই,

কী ভাবছেন আমার সম্বন্ধে ? আপনি ভেবে ঠিক করুন ; সবই এক আমার কাছে।

আমার পূর্বেকার বসবার ঘরটির কথা নিশ্চয় আপনার মনে আছে, যেখানে আমরা প্রথম এবং শেষ বারের মতো মিলিত হয়েছিলাম, কথাবার্তা বলেছিলাম। সেই ঘর এখনো আমি ব্যবহার করছি। নতুন অতিথিরা আসছেন, নতুন ধরনের ঘুষ পাচ্ছি, নতুন নতুন তোষামোদ,

চাকরিতে প্রমোশনের তদ্বির, নতুন ধরনের সম্ভাষণ আর নমস্কার, ধূম আর পানের ধুমধাম, কত রকমের ঔদ্ধত্য আর তিক্ততা, নতুন নিদ্রাহীনতা আর আর…রক্ত বমন…! গত চিঠিতে লিখেছিলেন আপনার শিক্ষকতার কাজে ঠিক মন বসছে না। উপদেষ্টার কাজ নেবেন? মুখে একবার কেবল বলুন, আমি করে দিতে পারব। অবশ্যি কাজ হবে একই রকমের। একই অতিথি, এক ঘেঁয়ে, তেমনি উৎকোচ আর তোষামোদ…

এখানে খুব বরফ পড়ছে। আপনি যেখানে আছেন সেখানকার কী অবস্থা। প্রায় মধ্যরাত্রি এখন, এই কিছুক্ষণ আগে কিছুটা রক্ত বমনের পর অনেকটা হালকা বোধ করছি। আমার মনে পড়ছে সেই হেমন্ত-কালে পর পর তিনখানা চিঠি এসেছে আপনার কাছ থেকে আশ্চর্য! আমার সম্বন্ধে এই খবর আপনাকে জানালাম, আশা করি আপনি আঘাত পাবেন না।

আমি হয়তো আর চিঠি লিখবনা, আমার অতীতের অভ্যাসগুলো তো আপনি জানেন! কবে ফিরছেন এখানে? যদি শীঘ্র আসেন, হয়তো দেখা হতে পারে। তবু, আমার ধারণা ভিন্ন পথ নিয়েছি আমরা ঃ আপনি বরং ভুলে যান আমাকে। আমার জন্য চাকরির চেষ্টা করছেন, সেজন্যে অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে। দয়া করে এইবার আমাকে ভুলে যান; আমি আছি ভালো!

—ওয়েই লিয়েন-সু।

১৪ই ডিসেম্বর।

যদিও এই চিঠি আমাকে আঘাত দেয়নি, প্রথম একবার তাড়াহুড়ো করে চিঠিটা পড়ে আবার পরে আর একবার মন দিয়ে পড়লাম, তবু যেমনি অস্বস্তি বোধ করেছিলাম তেমনি আশ্বস্তও হলাম। অন্তত তার জীবিকার পথ নিরাপদ হয়েছে. এখানে কিছুই আমি করতে পারিনি। তাকে লিখব মনে করেছিলাম, কিন্তু আমি অনুভব করলাম কিছুই তো তাকে লিখবার ছিল না।

আসলে, ধীরে ধীরে তাকে ভুলে গেলাম। মানস চোখে তার চেহারাটা আর মাঝে মাঝে ভেসেও উঠে না। যাহোক, তার কাছ থেকে চিঠিটা পাবার প্রায় দিন দশেক পর থেকেই 'স'-সাপ্তাহিক কাগজের একখানা করে আমার নামে আসতে লাগল। সাধারণত এ ধরনের পত্রিকা আমি পড়ি না, তবে এরা পাঠায় বলে মাঝে মাঝে চোখ বুলিয়ে যাই। পত্রিকাটা পেয়ে ওয়েই-র কথা আবার আমার মনে পড়ে গেল। কারণ এই পত্রিকায় প্রায়ই তার সম্বন্ধে কবিতা বা প্রবন্ধ থাকত, যেমন ধরুন—কোনো এক তুষার ঝড়ের রাতে পণ্ডিত ওয়েই-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার অথবা, "উপদেষ্টা ওয়েই-র বাড়ির পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিবেশে কবি সম্মেলন" ইত্যাদি। একবার "আলোচনার টেবিলে" শীর্ষক প্রবন্ধে এমন সব কাহিনীর অবতারণ করা হয়েছিল যেগুলি এককালে

বিদ্রূপের রসদ বলেই গণ্য হতো, কিন্তু এখন সেগুলিই" একজন ব্যক্তিকগ্রস্ত প্রতিভার কাহিনী" বলে স্বীকৃতি পাচ্ছে। "একজন অসাধারণ ব্যক্তির পক্ষেই এরকম অসাধারণ কর্ম সম্ভব" এই জাতীয় ইঙ্গিতও থাকত।

যদিও এইসব কারণে তার কথা মনে পড়ত, তবু তার সম্বন্ধে আমার মনোভাব ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে আসছিল। সবসময় তার একটা প্রভাব যেন আমাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে থাকত, যে জন্যে অনেক সময় আমি কেমন একটা অবোধ্য অসোয়াস্তি এবং অস্পষ্ট আশঙ্কা বোধ করতাম। হেমন্তকাল নাগাদ ঐ পত্রিকা আসা বন্ধ হয়ে গেল, আর শানিয়াং পত্রিকায় "গুজবে সত্যতা" শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হলো, যার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে, কোনো কোনো ভদ্রলোক সম্বন্ধে গুজব কাহিনী পরমাত্মার কানেও বুঝি পৌঁছেছে। যাদের আক্রমণ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে আমার নামও ছিল! আমাকে তাই একটু সাবধান হতে হলো, আমাকে সাবধান হতে হবে যেন আমার সিগারেটের ধুঁয়া অপরের নাকে না লাগে। এইসব সতর্ক ব্যবস্থা নিতেই এত সময় লাগত যে অন্য কিছুতেই আমি নজর দিতে পারতাম না, সুতরাং ওয়েই সম্বন্ধে ভাবতেও অবসর পেতাম না! আমি সত্যি সত্যি তাকে ভুলে গেলাম।

গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত আমি চাকরিটা রাখতে পারলাম না, মে মাসের শেষের দিকটায় আমাকে শানিয়াং ছাড়তে হলো।

॥ ৫ ॥

অর্দ্ধ বৎসরেরও বেশী সময় শানিয়াং, লিচেং আর তাইকুতে ঘোরা-ফেরা করেই অতীত হয়ে গেল, অথচ কোনো কাজের যোগাড় আমি করতে পারলাম না; সুতরাং 'স'-এ ফিরে যাওয়াই স্থির করলাম। বসন্তকালের গোড়ার দিকটায় একদিন বিকেলে আমি সেখানে পৌঁছলাম! দিনটা খুবই মেঘলা ছিল, সব কিছু যেন কেমন একটা ধুঁয়ায় ঢাকা। আমার পুরনো হস্টেলে ঘর খালি ছিল বলেই সেখানে উঠেছিলাম। আসার পথেই আমি ওয়েই-র কথা ভাবতে ভাবতে আসছিলাম; পৌঁছেই ঠিক করলাম খাওয়া-দাওয়া সেরেই তার খোঁজে বেরুব। দুই প্যাকেট বিখ্যাত ওয়েনসি কেক কিনে এদিক ওদিক ছোটো ছোটো স্যাঁত সেঁতে গলি পেরিয়ে অনেক সন্তর্পণে ঘুমন্ত কুকুরের পা না মাড়িয়ে আমি গিয়ে পৌঁছলাম তার দোরগোড়ায়। বাড়ির ভেতরটায় খুব আলো আলো লাগছিল। ভাবলাম উপদেষ্টা হবার পর থেকেই তার নিজের ঘরগুলোতে বেশি করে অবলো দিয়েছে, ভাবতে ভাবতে নিজের মনে মনে হাসলাম। যাহোক, উপরের দিকে তাকিয়ে নজরে পড়ল বাড়ির দরজায় এক ফালি সাদা কাগজ এঁটে দেওয়া আছে। (সাদা রঙ চীন দেশের শোকের চিহ্ন। বাড়ির দরজায় সাদা কাগজ সেঁটে দেওয়ার অর্থ

বাড়িতে কেউ মারা গিয়েছে) ভেতরে পা দিয়ে আমার মনে হলো হয়তো বাড়িওয়ালার ছেলেগুলির বুড়ি ঠাকুরমা মারা গিয়েছে। আমি সোজা ভেতরে চলে গেলাম।

দেখলাম আবছা আঙিনায় একটা কফিন। কয়েকজন সৈনিক বা ইউনিফরমধারী আর্দালি কফিনটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। বুড়ি ঠাকুরমার সঙ্গে কথা বলছিল ওরা। কয়েকটি জন-মজুর হাঁটাহাঁটি করছিল এখানে ওখানে। আমার হৃদপিণ্ডের গতি বাড়তে লাগল।

—আহ! আপনি এসেছেন? ঠাকুরমা ডুকরে উঠল—কেন আগে এলেন না?

—কে···কে মারা গেছে? এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, তবু জিজ্ঞাসা করলাম।

—উপদেষ্টা ওয়েই গত পরশু পরলোক গমন করেছেন। প্রহরীদের মধ্যে একজন বলল।

চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। বসবার ঘরে অনুজ্জ্বল আলো জ্বলছিল। বোধহয় মাত্র একখানা ল্যাম্প; সামনের ঘরটায় সাদা রঙের অন্ত্যেষ্টি কাজের পর্দা ঝুলানো, মহিলার নাতিনাতনীদের সবাই এসে জড়ো হয়েছে ঐ ঘরে।

—মৃতদেহ ঐ ঘরে আছে। এক পা এগিয়ে এসে সামনের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে বুড়ি বলল। মিঃ ওয়েই-র পদোন্নতি হওয়ার পর ঐ সামনের ঘরখানাও তাঁকে দিয়েছিলাম; ঐ ঘরেই তিনি আছেন।

অন্ত্যেষ্টি পর্দায় কিছু লেখা ছিল না। সামনে একটা লম্বা টেবিল, তার পাশেও আর একটা চৌকো টেবিল, ঐ টেবিল দুটিতে কিছু ডিস ছড়ানো। ঘরে ঢুকতেই সাদা লম্বা গাউন পরা দুটি লোক এসে বাধা দিল আমাকে। মড়া মাছের চোখের মতো তাদের দুজোড়া চোখ বিস্ময় বিমূঢ় সন্দেহের ভাব নিয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। ওয়েই-র সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি'দু কথায় বুঝিয়ে বললাম তাদের। বাড়িওয়ালীও এসে সায় দিলেন আমার কথায়। তাদের হাত আর চোখের দৃষ্টি তখনি নত হলো। এগিয়ে গিয়ে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যেতে দিল আমাকে।

শ্রদ্ধা জানাবার সঙ্গে সঙ্গে মেঝের উপর বসে কে যেন বিলাপ করে উঠল। তাকিয়ে দেখলাম একটি বছর দশ বয়সের ছেলে। তারও গায়ে সাদা জামা, একটা মাদুরের উপর হাঁটু গেড়ে বসেছিল। মাথায় চুল ছোটো করে ছাঁটা। পরে জানলাম সাদা পোশাক পরা ঐ লোক দুটির একজন ওয়েই-র তুতো-ভাই, সবচেয়ে নিকটতম আত্মীয়, আর অপরজন দূর সম্পর্কীয় ভাই-পো। ওয়েইকে দেখতে চাইলাম, কিন্তু আমাকে বিরত করতে দুজনেই আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। শেষপর্যন্ত তারা রাজী হলো এবং পর্দাটা সরিয়ে দিল।

এইবার আমি মৃত্যুর কোলে শায়িত ওয়েইকে দেখলাম। কিন্তু এইটাই আশ্চর্য যে, যদিও তার গায়ে কোঁচকানো সার্ট, সামনের দিকটায় এখানে ওখানে রক্তের

দাগ, আর মুখখানা ভীষণ জীর্ণ এবং শুকনো, তবু মুখের অভিব্যক্তি তেমনি অপরিবর্তিত। এমন প্রশান্ত নিদ্রায় সে নিদ্রিত ছিল, এমনি আবদ্ধ মুখ আর মুদ্রিত চোখ যে. আমার ইচ্ছে হলো তার নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখি হয়তো তার নিঃশ্বাস পড়ছে তখনো।

চারদিক সবকিছু যেন মৃত্যুর মতো স্তব্ধ, জীবন্ত আর মৃত সবাই। যখন আমি বেরিয়ে এলাম তার তুতো-ভাই আমার কাছে এসে দাঁড়াল কেবল এই কথাটা জানাতে যে, এমনি তরুণ বয়সে, যখন বিরাট ভবিষ্যত সমুখে, তার এই অকাল মৃত্যু তাদের ক্ষুদ্র পরিবারেই কেবল বিপর্যয় আনে নি, অসংখ্য বন্ধু বান্ধবের দুঃখের কারণ হয়েছে। ওয়েই-র এমনি অকাল মৃত্যুর জন্য সে যেন ক্ষমা চাইছিল সবার কাছে। এমনি বিনয়াবনত বাকপটুতা সত্যি খুবই বিরল গ্রামবাসীদের মধ্যে। যাহোক. এরপর সে আবার নীরব হয়ে গেল, আবার যেন মৃত্যুর স্তব্ধতা নেমে এল, জীবন্ত আর মৃত সবারই মাঝে।

নিরানন্দ বোধ করে, কিন্তু বিষণ্ণতায় নয়, আমি বাড়ির প্রাঙ্গনে বেরিয়ে এলাম বাড়িওয়ালী বৃদ্ধার সঙ্গে দু চারটি কথা বলতে। তিনি বললেন, অন্ত্যেষ্টি কাজ শুরু হবে এক্ষুণি। শবাচ্ছাদন এসে পেঁছিয়নি শুনলাম তাঁর কাছে। কফিন বন্ধন করবার সময় কাউকে কাউকে নাকি থাকতে নেই কাছে। বুড়ি বকবক করে চলেছে, বন্যার স্রোতের মতো কথা বেরিয়ে আসছে তাঁর মুখ দিয়ে। এক ঝোগে বলে যেতে লাগলো, ওয়েই-র অসুস্থতার কথা, তার জীবনের কত কি নানা ঘটনা. আবার কিছু কিছু সমালোচনার উক্তি।

—জানেন না বোধহয়, মিঃ ওয়েই-র যখন দিন ফিরে এল তখন তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ হয়ে গেলেন। সবসময় মাথা উঁচু করে চলতেন, মেজাজটাও সব সময় চড়ে থাকত। মানুষের সঙ্গে আগের মতো ব্যবহার করতেন না। উনি মাঝে মাঝে বেকুবের মতো কাজ করতেন, আর আমাকে ডাকতেন "মাদাম"। তারপরই কদিন বাদেই আবার আমাকে ডাকতে শুরু করলেন বুড়ি কুত্তি।' খাবার জন্য তাঁকে ঔষধের লতাপাতা কেউ পাঠালে সেগুলি না খেয়ে উঠানে ছুঁড়ে ফেলতেন আর চেঁচিয়ে বলতেন, 'তুমি খাও না, বুড়ি কুত্তি! তাঁর সুদিন ফিরে আসবার পর বহু লোক আসত তাঁর কাছে, তাই সামনের ঘরটাও তাঁকে ছেড়ে দিয়ে আমি পাশের অন্য একটা ঘরে চলে গিয়েছিলাম। আমরা তাঁকে ঠাট্টা করতাম, কিন্তু সত্যি তিনি ভিন্ন মানুষে পরিবর্তিত হয়ে গেলেন। যদি এক মাস আগেও আপনি আসতেন এখানকার মজা স্বচক্ষে দেখতে পেতেন। মদের হুল্লোড় চলত প্রায় প্রত্যেকদিন, কথাবার্তা আলাপ আলোচনা, হাসি তামাসা গান, কবিতা পাঠ আর এমনি আরও কত কী…!

—আমার নাতিরা ওদের বাপকে যত ভয় না করত, তিনি এদের তার চেয়ে বেশি ভয় করতেন, এদের কাছে কেমন ছোটো হয়ে যেতেন। কিন্তু কিছুদিন

আগে তাও বদলে গেল। ঠাট্টা তামাশা বেশ উপভোগ করতে লাগলেন। আমার নাতিরা তাঁর সঙ্গে খেলাধুলো করতে ছুটে আসত, যখনি ইচ্ছে হতো তাঁর ঘরে গিয়ে ভিড় জমাত। তিনিও নিত্য নূতন মজা করতেন তাদের নিয়ে। যেমন, তাদের জন্য কিছু জিনিস কিনে আনতে বললে কুকুরের ডাক ডাকিয়ে নিতেন তাদের দিয়ে। মাস দুই আগে আমার দ্বিতীয় নাতি এক জোড়া জুতো চাইল মিঃ ওয়েই-র কাছে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে কুকুরের ডাক ডাকতে হলো। সেই জুতো এখনো সে পরছে, ছেঁড়েনি।

সাদা পোশাক এক ব্যক্তি যখন বেরিয়ে এল ভেতর থেকে বুড়ি চুপ করল। আমি ওয়েই-র অসুস্থতার কথা জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু বিশেষ কিছু তিনি বলতে পারলেন না। বুড়ি শুনেছিলেন বেশ কিছুদিন ধরে নাকি তার দেহের ওজন খুবই কমে আসছিল কিন্তু তাকে সবসময় এমনি প্রফুল্ল লাগত যে, কেউ কিছু ধরতে পারেনি। প্রায় এক মাস আগে শোনা গেল যে তার কাশির সঙ্গে রক্ত উঠছে কিন্তু মনে হলো সে ডাক্তার দেখায়নি। ধীরে ধীরে সে শয্যায় আশ্রয় নিলো, এবং মৃত্যুর ঠিক তিন দিন আগে থেকেই যেন তার কথা বন্ধ হয়ে গেল। গ্রাম থেকে তার এক তুতো-ভাই ছুটে এল। কিছু অর্থ সম্বল আছে কিনা খোঁজ করতে, কোনো কথার জবাব তারা পেল না ওয়েই-র কাছ থেকে। তার তুতো-ভাই ধরে নিল সে ভান করছে। কিন্তু অনেকেই বলে থাকে ক্ষয় রোগে মৃত্যুর আগে নাকি বাকশক্তি নষ্ট হয়ে যায়…

—এক উদ্ভট মানুষ ছিলেন এই মিঃ ওয়েই। ফিস ফিস করে বললে বাড়ি-ওয়ালী বুড়ি।—কোনোদিন একটা কানাকড়ি জমান নি। কেবল জলের মতো খরচ করেছেন। ওঁর তুতো-ভাই কিন্তু এখনো সন্দেহ করছে আমরা বেশ কিছু বাগিয়ে নিয়েছি ওঁর কাছ থেকে। ভগবান জানেন, কিছুই আমরা পাইনি। তাঁর খামখেয়াল মতো তিনি খরচ করে গেছেন। আজকে কোনো কিছু কিনলেন আবার পরদিনই সেগুলো বিক্রি হয়ে গেল। কি জানি কিসব হলো, কোথায় যে গেল। যখন মারা গেলেন কিছুই আর রইল না, সব শেষ। নইলে এমনি দুঃখময় পরিস্থিতি কী হতো আজকে!

—বোকার মতো সব উড়িয়ে গেল, বুড়ি বলতে লাগল আমাকে: যা করা দরকার তা করবার ইচ্ছাই দেখালো না কখনো। এই বয়সে তার বিয়ে করা উচিত ছিল; আমি কত ভেবেছি, কতবার বলেছি তাকে। এমন কিছু কঠিন হতো না তার পক্ষে। আর যদি পছন্দ মতো কোনো পরিবার না পাওয়াই যেত, দু একটা উপপত্নী অন্তত সে রাখতে পারত। কিছু না হোক কম পক্ষে বাইরের ঠাঁট তো বজায় রাখতে হয় সবাইকে! কিন্তু যখনই আমি এই প্রস্তাব নিয়ে গেছি সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। বুড়ি কুত্তি পরের ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে মরছে কেবল, সে খালি বলত। জানেন, কখনো কোনো কিছুতে সে গুরুত্ব দেয়নি; কখনো কোনো ভালো কথায় কান দেয়নি।

যদি সে আমার কথা শুনত আজ ওপারে পাড়ি দিয়েও এমনি নিঃসঙ্গ থাকত না ; অন্তত কেউ না কেউ আপনার জন থাকত দু ফোঁটা চোখের জল ফেলতে।

একজন দোকান কর্মচারী এল, সঙ্গে কিছু কাপড়। মৃতের তিনজন আত্মীয় সেই নতুন কাপড়গুলি নিয়ে পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরেই পর্দা উঠল। নতুন কাপড় পরিয়ে দিয়েছে মৃতদেহকে। আমি দেখে অবাক হয়ে গেলাম যে, এক জোড়া সৈনিকের খাঁকি ট্রাউজার ও চকচকে সামরিক অলঙ্কারে ভূষিত জামা পরিয়ে সাজিয়েছে তাকে। ঐসব অলঙ্কার কোন্ পদাধিকারের চিহ্ন আমার জানা নেই এবং কেমন করে সে পেল তা আমি জানিনা। মৃতদেহ কফিনে রাখা হলো। বিশ্রীভাবে শায়িত রইল ওয়েই, একজোড়া ব্রাউন রঙের জুতো তার পায়ের কাছে রাখা, কোমরে কাগজের তরবারি এবং তার জীর্ণ ছাই রঙের মুখখানার পাশে সোনালী রিবন বাঁধা একখানা সামরিক টুপি।

কফিনের পাশে বসে ঐ তিনজন আত্মীয় বিলাপ করল কিছুক্ষণ, তারপর চোখের জল মুছে শান্ত হলো সবাই। যে ছেলেটির মাথার চুলে শন সুতো বাধা ছিল সে সরে গেল সেখান থেকে, যেমন গিয়েছিল বাড়িওয়ালী বুড়ির দ্বিতীয় নাতি। হয়তো এরা খারাপ নক্ষত্রে জন্মেছিল, তাই কফিনের কাছে থাকতে নেই এদের।

কফিনের ঢাকনা তুলছে দেখে আমি কয়েক পা এগিয়ে গেলাম, শেষবারের মতো ওয়েইকে দেখতে।

তার ঐ কিম্ভূতকিমাকার সামরিক পোশাকে সে শান্তভাবে শায়িত ছিল কফিনের ভেতর। মুখ বন্ধ আর দুই চোখ মুদ্রিত। কেমন একটা বিদ্রূপের ঝলক যেন লেগে আছে তার দুই ঠোঁটে, নিজের কুৎসিত মৃতদেহটাকে বুঝি সে বিদ্রূপ করছে।

কফিনের পেরেক আঁটবার সঙ্গে সঙ্গে আবার শুরু হলো বিলাপ। এ আমি সহ্য করতে পারলাম না বেশিক্ষণ, বাড়ির আঙিনায় বেরিয়ে এলাম ; তারপর ধীরে ধীরে কখন যেন আমি বাড়ির ফটকের বাইরে চলে এলাম। স্যাঁত-সেঁতে রাস্তাটা কেমন চিকচিক করছে। আমি আকাশের দিকে তাকালাম, মেঘগুলো টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, ফাঁকে ফাঁকে দেখলাম উঁকি দিচ্ছে হিমেল আলো ছড়ানো পূর্ণিমার চাঁদ।

আমি দ্রুত পায়ে চলতে লাগলাম। যেন একটা অপ্রতিরোধ্য বাধার প্রাচীর ডিঙোতে হবে আমাকে। কেমন যেন একটা বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে উঠছে, আমার কানের ভেতর। অনেক—অনেক—অনেকটা সময় কাটিয়ে যেন ভেঙে পড়ল সেই ঝড় কান ফাটিয়ে। কেমন একটা বিকট বিলম্বিত আর্তনাদ শুনতে পেলাম—গভীর নিশীথে উন্মুক্ত প্রান্তরের বুক থেকে ভেসে আসা আহত

নেকড়ের বুক ফাটা আর্তনাদের মতোই ফেটে পড়ল কেমন যেন এক ক্রোধ আর বেদনায় ভরা আর্ত চীৎকার।
এইবার আমার বুকটাও হালকা হয়ে গেল, স্যাঁতসেঁতে পাথুরে রাস্তার উপর দিয়ে চাঁদের ফুটফুটে জ্যোৎস্না কাটিয়ে ধীর পদক্ষেপে আমি চলতে লাগলাম।

The Misanthrope
October 17, 1925

ভুলে যাই

জু-চুন এর কথা ভেবে, এমন কি নিজের জন্যেও যদি পারি, আমার অনুতাপ আর মর্মবেদনার কাহিনী আজ আমি বলব মন খুলে। হোস্টেলের এক কোণে দারিদ্র্যের ছাপ দেওয়া এই ছোট্ট নোংরা ঘরখানা আজ কত নীরব কত শূন্য। সময় সত্যি কেমন করে বয়ে যায়! একটি বছর কেটে গেল আমি জু-চুনকে ভালোবেসেছিলাম, আর তার জন্যই এই শ্মশানের নীরবতা আর শূন্যতার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম। এবার ফিরে এসে, আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে এই ঘরখানাই খালি পেলাম। ভাঙা জানলাটা, তারই বাইরে আধমরা লোকাস্ট গাছ আর বুড়ো উইসটেরিয়া লতা ঘরের ভেতরে সেই চৌকো টেবিলটা, সবই আছে ঠিক তেমনি আগের মতোই। তেমনি আছে ঝুড়-ঝুড়ে দেয়ালের ধারে কাঠের তক্তপোষ। জু-চুন এর সঙ্গে থাকবার আগে যেমনি করতাম তেমনি একা আজ ঘুমুই এই বিছানায়। গত একটা বছর সম্পূর্ণ মুছে গেছে, যেন কোনো অস্তিত্ব ছিল না তার—যেন দারিদ্র্যের ছাপ-মারা এই ঘরখানা ছেড়ে আমি যাইনি কোনোদিন এ চিচাও স্ট্রীটে ছোট্ট একটা নীড় বাঁধবার আশায়।

শুধু এই নয় সব। এক বছর আগে এই নীরবতা আর শূন্যতা ছিল ভিন্ন রকমের—একে ঘিরে থাকত একটা প্রত্যাশা। আমি জু-চুন'এর প্রতীক্ষায় থাকতাম। দীর্ঘকালিন প্রতীক্ষার পর যখন ধৈর্যহারিয়ে ফেলতাম, বাইরে শান বাঁধানো চাতালের উপর হাই-হিলের ঠকঠক আওয়াজ আবার তড়িৎ সঞ্চারিত করত সর্বদেহে। তারপর আমি দেখতাম তার পাণ্ডুর গোল মুখখানায় মিষ্টি হাসির টোল খেয়ে যেত, আমার সামনে এলে দেখতাম তার সরু সরু দুখানা গোল হাত, ডুরে-কাটা সুতির ব্লাউজ আর কালো রঙের ঘাগরা। জানলার বাইরের ঐ আধমরা লোকাস্ট গাছের দুটো একটা কচি পাতা সে

হাতে করে আনত আমার জন্যে, কখনো আনত উইস্‌টেরিয়ার কেগুনে রঙ ফুলের গুচ্ছ।

এখন আছে শুধু সেই পুরনো নীরবতা আর শূন্যতা। জু-চুন আর ফিরে আসবে না—কখনো নয়, আর কোনোদিন নয়।

জু-চুনের অনুপস্থিতিতে আর কিছু নেই দারিদ্র্য জীর্ণ ঘরখানায়। একঘেয়েমি কাটাবার জন্য একখানা বই নিয়ে বসতাম, যেকোনো বই। বিজ্ঞানেরই হোক বা সাহিত্যেরই হোক, একই কথা আমার কাছে—পড়তাম আর পড়তাম। যতক্ষণ না মনে হতো যে এক ডজন পাতা উলটেছি অথচ একটি শব্দও আমার মাথায় ঢোকেনি কিন্তু আমার কান দুটি কত সজাগ থাকত, ফটকের বাইরে পায়ের আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেতাম, সেই সঙ্গে জু-চুনের পায়ের আওয়াজও থাকত। মনে হতো তার পদশব্দ ধীরে ধীরে বুঝি এগিয়ে আসবে কাছে আরও কাছে—পরক্ষণেই ক্ষীণ হয়ে জনতার পদধ্বনির মাঝে সেই ধ্বনিও হারিয়ে যেত। চাকর বেটার ছেলেটাকে আমার ভালো লাগত না, ওর কাপড়ের জুতোর আওয়াজ জু-চুন'এর পায়ের আওয়াজ থেকে ভিন্ন রকম লাগত। পাশের বাড়ির ঐ মেয়েলি পুরুষটিকে আমি সহ্য করতে পারতাম না। লোকটা মুখে মাখবার ক্রীম ব্যবহার করত, চামড়ার জুতো পরত, আর ওর পায়ের শব্দও অনেকটা জু-চুন'এর মতো লাগত। মনে হতো কেবলিঃ কে জানে, ওর রিকশটার কোনো গণ্ডগোল হয়নি তো? ও ট্রাম চাপা পড়েনি তো··· ?

টুপিটা হাতে নিয়ে বেরুবার উপক্রম করতাম তাকে দেখতে যাবার জন্যে, তখনই মনে পড়ত তার কাকা একদিন মুখের উপর অপমান করেছিল আমাকে।

হঠাৎ তার পায়ের শব্দ শুনতে পেতাম, কাছে ক্রমশঃ আরো কাছে। বাইরে বেরিয়ে তাকে ডেকে নিতে পৌঁছবার আগেই সে উইস্‌টেরিয়া কুঞ্জ ছাড়িয়ে আসত, মিষ্টি হাসির ঢেউ পড়ত তার মুখে। হয়তো তার কাকা কিছু বলেনি সেদিন। আমি শান্ত হতাম, দুজন দুজনার মুখের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থাকবার পর সেই এলোমেলো জীর্ণ ঘরখানা আমার কণ্ঠের আওয়াজে ভরে উঠত, যখন পরিবারের দৌরাত্ম্য, প্রচলিত প্রথাকে ভাঙবার প্রয়োজনীয়তা এবং স্ত্রী পুরুষের সাম্যের কথা বলতাম আমি, বলতাম ইবসেন, টেগোর আর শেলীর কথা···। সে কেবল মাথা নাড়ত, মুখ মিষ্টি হাসিতে ভরা থাকত, চোখে ফুটে উঠত শিশুর বিস্ময় দৃষ্টি। সংবাদপত্র থেকে কেটে নেওয়া শেলীর একখানা ছবি ঐ ঘরে দেওয়ালে টাঙানো ছিল। শেলীর চেহারার হুবহু ছবি কিন্তু ঐ একবার চকিত চোখে তাকাত, পরমুহূর্তেই সে কেবল সঙ্কোচে মাথা নত করত। এসব বিষয়ে জু-চুন'এর মন প্রাচীন চিন্তাধারা থেকে সরে আসেনি তখনো। পরে মনে হলো শেলীর ঐ ছবি পালটে একটা ইবসেন রাখলে ভালো হতো বুঝি। কিন্তু ও আর করা হয়নি। আজ সেই ছবিটাও অদৃশ্য হয়ে গেছে কোথায়!

—আমার নিয়ন্ত্রী আমি নিজে। আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার কারো অধিকার নেই।

কিছুক্ষণের চিন্তাশীল নীরবতার পর স্পষ্ট, দৃঢ় এবং গম্ভীর ভাবে ঐ কথাগুলি বলতে বলতে সে বেরিয়ে এল—আমরা তার কাকার কথা আলোচনা করছিলাম, তার কাকা তখন এখানে, আর তার বাবা নিজের বাড়িতে। ছয় মাস হয়ে গেল আমাদের পরিচয়। আমি কী সব মত পোষণ করি তাকে বলেছি। আমার জীবনে কী কী ঘটেছে, আমার চরিত্রের কী কী দোষ, সব কিছু বলেছি তাকে। এক রকম কিছুই আমি গোপন করিনি, সেও স্পষ্টভাবে বুঝেছে আমাকে। তার মুখের ঐ কটি কথা আমার অন্তরের গভীর পর্যন্ত নাড়া দিয়ে উঠল, এরপরও বেশ ক'দিন ধরে কানে লেগে রইল কথা কয়টা। জেনে বর্ণনাতীত আনন্দ পেলাম যে, হতাশাবাদীরা যতটা বলে থাকে মোটেই ততটা অপদার্থ নয় চীন দেশের মেয়েরা, ভেবে আরও আনন্দ পেলাম যে অদূর ভবিষ্যতে তারা স্বীয় গৌরবে ভাস্বর হয়ে উঠবে এও আমরা দেখব।

যখনই তাকে পথে তুলে দিয়ে আসতাম, সব সময় বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে চলতাম। মাছের দাঁড়ার মতো দাড়িওয়ালা বুড়োর মুখটা সবসময় বাড়ির জানলার নোংরা শার্সির সঙ্গে সাপটে থাকত। এমন কি, তার নাকের ডগাটাও চ্যাপ্টা হয়ে যেত। বাইরের আঙিনায় যখন পৌঁছতাম ফেস্-ক্রীম মাখা ঐ লোকটার মুখটা কাচের খোলা জানলায় স্পষ্ট দেখতে পেতাম। কিন্তু সগর্বে পা চালিয়ে, ডানে বামে নজর না দিয়ে, জু-চুন এদের দিকে তাকা'ত না। আমিও সগর্বে পা ফেলে নিজের ঘরে ফিরে আসতাম।

আমার নিয়ন্ত্রী আমি নিজে। আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার কোনো অধিকার নেই এদের কারো। এই কথায় দৃঢ় হয়েছে তার মন। আমাদের দুজনের মধ্যে তাকেই মনে হলো স্পষ্টবাদী এবং দৃঢ়চিত্ত। আধ-কৌটো ফেস্-ক্রীম আর চ্যাপ্টা নাকের ডগায় কোন পরোয়া করে সে?

আমার এখন স্পষ্ট মনে নেই ঠিক কেমন করে আমার আন্তরিক ভালোবাসা তার কাছে প্রকাশ করেছিলাম। কেবল এখনই নয়—ঠিক পর মুহূর্তেই আমার মনের ছাপ কেমন অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রাত্রে যখন চিন্তা করতে বসলাম তখন আমি যা বলেছিলাম তার দুটো একটা টুকরো টুকরো কথাই কেবল মনে পড়ল। তারপর দু'এক মাস যখন দুজনে এক সঙ্গে বাস করলাম তখন এই টুকরো কথাগুলিও কোনো চিহ্ন না রেখে স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল। কেবল মনে রইল ঘটনার একপক্ষকাল আগে থেকেই কী ভেবেছিলাম, কেমন করে প্রস্তাব করব, কী কথা বলব, যদি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে কী বলব তার উত্তরে, এই সব কত কী! কিন্তু সময় যখন এল কিছুই কাজে লাগেনি। মনের চাঞ্চল্যের মধ্যে মুভিতে যেমন করে থাকে তেমনি একটা কিছু অজান্তেই বুঝি করে বসলাম! আজ সেসব কথা ভাবতেও সরমে মরে

যাই, অথচ এই ব্যাপারটাই শুধু স্পষ্ট মনে আছে আমার। এমন কি আজও অন্ধকার ঘরে ছোট্ট একটা প্রদীপের আলোর মতোই এটা আলো জুগিয়ে যায় আমাকে। অশ্রু সজল চোখে আমি তার একটা হাত চেপে ধরেছিলাম, এক হাঁটু গেড়ে তার পায়ের কাছে বসে পড়েছিলাম...

জু-চুনএর উপর কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেদিন এমন কি তাও আমি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করিনি। শুধু এইটুকু জানি যে সে আমাকে গ্রহণ করেছিল। তবু, আমার মনে পড়ে বুঝি তার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল প্রথমে, তারপর ধীরে ধীরে রঙিন হয়ে উঠেছিল—আগে যা দেখেছি বা পরেও যা দেখেছি তার চেয়েও অনেক বেশী রঙিন। তার শিশুসুলভ সরল চোখ দুটিতে একই সঙ্গে বিষাদ আর আনন্দের জ্যোতি, তারই সঙ্গে মিশেছিল কেমন এক আশঙ্কা ভীতি, যদিও সে আমার দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। মনের অমনি বিভ্রান্তির ভেতর সে বুঝি পালিয়ে যেতে চাইছিল ঐ জানলা পথে। তারপর আমি বুঝতে পারলাম সে আমাকে গ্রহণ করেছে, যদিও আমি বলতে পারবনা কী কথা সে বলেছিল, নাকি সে বলেনি কিছু।

সে কিন্তু মনে রেখেছিল সবকিছু। এক লাগোয়া আমি কী বলে গিয়েছিলাম তার প্রতিটা অক্ষর আবৃত্তি করতে পারত, বুঝি সে মুখস্থ করেছিল। আমার প্রতিটা কাজ সে খুঁটিনাটি বর্ণনা করতে পারত, জীবন্ত করে তুলতে পারত প্রতিটা কথা যেন পর্দার বুকে ভেসে ওঠা ছায়াছবির মতোই। এমন কি আমার দুর্বল মুহূর্তের সেই দৃশ্যটা, যেটাকে নাকি আমি ভুলতে চেয়েছি। রাতে চারদিক যখন নিস্তব্ধ, আমরা পর্যালোচনা করতে বসতাম। আমাকে প্রশ্ন করত, আমাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করত, তখন যেসব কথা বলেছিলাম সেগুলো পুনরাবৃত্তি করবার জন্য আমাকে হুকুম করত কিন্তু আমার কথার অনেক শূণ্যস্থান তাকে পুরণ করতে হতো, অনেক ভুল সে সংশোধন করত, যেন আমি একজন চতুর্থ গ্রেডের ছাত্র।

ক্রমে ক্রমে এইসব পর্যালোচনা বৈঠকও এক এক করে কমে এল। কিন্তু যখনই তাকে মহাশূন্যের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে হাসতে দেখতাম, চোখে সেই মধুর দৃষ্টি আর মিস্টি হাসি টোল খেয়ে যেত মুখ জুড়ে। বুঝতে পারতাম মানসপটে পুনরাবৃত্তি চলছে সেই পুরনো দৃশ্যের, আমি ভয় পেতাম বুঝি মুভির পর্যায় চলছে আমার সেই হাস্যকর দৃশ্যের পুনরাভিনয় যদিও আমি জানতাম, সে ঐ দৃশ্য দেখত, সবসময় দেখবার জন্য জিদ করত।

কিন্তু তার চোখে হাস্যকর লাগত না। আমি হাস্যকর এমনকি ঘৃণ্য মনে করলেও, সে কিছুতেই মনে করত না। আমি জানতাম, এর কারণ সে সত্যি আমাকে ভালোবাসত, মনের সকল আবেগ দিয়ে ভালোবাসত। গত বৎসর বসন্তের শেষ দিকটা আমাদের কেটেছিল সবচেয়ে সুখে আর

ব্যস্ততায়। আমি শান্ত ছিলাম তখন, যদিও আমার দেহের মতোই মনের একটা দিকও ছিল তেমনি সক্রিয়। এরকম হতো যখন আমরা দুজনে একসঙ্গে বাইরে বেরতাম। অনেক সময় আমরা পার্কে গিয়ে বসতাম, কিন্তু বেশী সময় কাটত বাড়ি খুঁজতে বেরিয়ে। পথ চলতে গিয়ে সন্ধানী দৃষ্টি, বিদ্রূপাত্মক মুচকি হাসি, কুৎসিত ঘৃণ্য কটাক্ষ সম্বন্ধে সবসময় সচেতন থাকতাম। কেননা সতর্ক না থাকলে এগুলো কেমন শির শির করত আমার শিরায় শিরায়। প্রতি ক্ষণে নিজের মনের সবটুকু আত্মাভিমান আর বিরোধিতা একসঙ্গে জড় করতাম শক্তি বৃদ্ধির জন্য। সে কিন্তু নির্ভয়ে পথ চলত খুব শান্তভাবে যেন কেউ তার চোখে পড়েনি।

একটা বাড়ি পাওয়া মোটেই সহজ ব্যাপার ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানা অজুহাতে আমরা প্রত্যাখ্যাত হতাম, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুপযোগী বলে আমরাই ফিরে আসতাম। গোড়ার দিকটায় আমরা খুব সতর্কতা নিতাম—তবু সবসময় এতটা সতর্ক হতাম না, কেননা অধিকাংশ বাড়িগুলিতেই আমাদের পক্ষে থাকা সম্ভব ছিল না। পরে অবশ্য অনেক কিছু আমাদের মেনে নিতে হলো। প্রায় কুড়িটা বাড়ি দেখবার পর একটা বাড়ি ঠিক করলাম। চিচাও স্ট্রীটের একটা ছোট্ট বাড়িতে উত্তর মুখো দুখানা ঘর। বাড়ির মালিক একজন ক্ষুদে সরকারি কর্মচারী। কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান মানুষটি, মাঝের এবং পাশের কখানা ঘর তিনি নিজে ব্যবহার করতেন। তাঁর স্ত্রী কয়েক মাস বয়সের একটি শিশু এবং একটি গ্রাম্য ঝি, এই তাঁর ছোট্ট সংসার। শিশুর কান্না যখন থাকে না, বাড়িটা ভীষণ শান্ত নীরব লাগে।

যদিও খুব সাধারণ, তবু এই দুচারখানা ফার্নিচার কিনতেই যে কয়টা মুদ্রা যোগাড় করেছিলাম তা শেষ হয়ে গেল ঃ জু-চুন তার হাতের আঙটি আর কানের রিং-দুটোও বেচে দিল। তাকে বাধা দিয়েছিলাম, কিন্তু জিদ ধরল, কাজেই আমি আর জোর করলাম না। আমি জানতাম এই নীড় বাঁধতে গিয়ে সেও যদি অংশীদার না হয় সে সোয়াস্তি পাবে না।

সে তার কাকার সঙ্গে বিরোধ করেছে—ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তিনি তাকে পরিত্যাগ করেছেন। আমারও বন্ধু বিচ্ছেদ হয়েছে ; তারা মনে করত আমাকে সৎ পরামর্শ দিচ্ছে, অথচ আসলে হয় তারা আমাকে ভয় করত অথবা ঈর্ষা করত। তবু, এসব সত্ত্বেও আমরা শান্তিতে ছিলাম। যদিও অফিস থেকে ফিরতে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসত, রিকসাওয়ালাও সব সময় তার গাড়ি জোড়ে টানত না, তবু একটা সময় নিশ্চিত ছিল যখন আমরা আবার দুজনে মিলতে পারতাম। প্রথমে একজন অন্য জনের দিকে নীরবে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকতাম কিছুক্ষণ, ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলতাম তারপর ; আবার সেই নীরবতা কিছু যেন দেখতাম না, কিছু যেন ভাববার

থাকত না, ধীরে ধীরে তার দেহ আর অন্তরকে আমি বই পড়ার মতো স্পর্শ উপলব্ধি করতে পারতাম। মাত্র তিনটি সপ্তাহের মধ্যেই তার অনেককিছু জেনে নিয়েছিলাম। যে বাধা অজানা ছিল, তাও উৎরে গেলাম, কিন্তু পরে আবিষ্কার করলাম সত্যিকার বাধা ছিল কিছুটা।

যতই দিন শেষ হচ্ছে জু-চুন প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে লাগল। সে ফুল পছন্দ করত না। মেলায় গিয়ে দুই পট ফুল কিনে এনেছিলাম, কিন্তু জলের অভাবে তিন চারদিনের মধ্যেই সেগুলি শুকিয়ে মরে গেল। সবকিছুতে নজর দেবার সময়ও ছিল না আমার। সে জন্তু জানোয়ার ভালোবাসত। বাড়িওয়ালার স্ত্রীকে দেখেই বোধহয় এক মাসের কম সময়ের মধ্যেই বাড়ির বাসিন্দার সংখ্যা বেড়ে গেল। বাড়িওয়ালার এক ডজন মুরগীর ছানার সঙ্গে আমাদের চারটিও গিয়ে জুটল বাড়ির আঙিনা পেরিয়ে। যার যারটা কিন্তু তারা চিনে নিতে পারত। তারপর এল একটা কুকুর। এটাও মেলা থেকে কেনা। কুকুরটার একটা নাম ছিল বোধহয় আমার ধারণা, তবু জু-চুন একটা নতুন নাম রাখল। নাম হলো আহসুই। আমিও আহসুই বলে ডাকতাম, যদিও নামটা আমার পছন্দ হয়নি।

ভালোবাসা কখনও বাসি হবে না, ভালোবাসা বাড়বে। নতুন করে সৃষ্টি করবে এই হলো চিরন্তন সত্য। জু-চুনকে এ কথা বলেছি, সে স্বীকার করেছে।

কত শান্তির, কত সুখের ছিল সেই সন্ধ্যাগুলি।

শান্তি সুখ এক সূত্রে গাঁথা হবে, তবেই হবে চিরস্থায়ী। যখন হস্টেলে থাকতাম, উভয়ের ভেতর কিছু মতবৈষম্য দেখা দিত। ভুল বুঝাবুঝি হতো কিন্তু চিচাও স্ট্রীটে যাবার পর সব বৈষম্য দূর হয়ে গেল। প্রদীপের আলোতে দুজন মুখোমুখি বসে অতীতের সুখ-স্মৃতি আলোচনা করতাম, বৈষম্যের পর নতুন জীবন সমন্বয়ের আনন্দ-স্বাদ উপভোগ করতাম। জু-চুন কেমন গোলগাল হয়ে উঠল। গালে গোলাপী আভা। কিন্তু তার ব্যস্ততা বেড়ে গেল। সাংঘাতিক কাজের পর দুটো কথা বলবার সময় সে পেত না, বই পড়া, বাইরে বেরুনো দূরে থাক।

একটা ব্যাপারে আমি খুব চঞ্চল। সন্ধ্যা বেলায় বাড়ি ফিরে লক্ষ করতাম সে কেমন বিষণ্ণ! এতে আরো কষ্ট হতো। কী একটা যেন লুকোতে চাইত। এমন কি জোর করে হাসতে চেষ্টা করত। সৌভাগ্যক্রমে আমি আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম বাড়িওয়ালীর সঙ্গে গোপন মনোমালিন্যই এর কারণ। আর এর গোড়ায় ছিল মুরগির ছানা। কিন্তু সে আমায় বলবে না কেন? সবারই তো একটা নিজের ঘর বলতে কিছু চাই, এতো সেই ঘর নয়।

আমারও নিজের একটা কার্যসূচী ছিল। সপ্তাহের ছয়দিন বাড়ি থেকে অফিস, অফিস থেকে বাড়ি। অফিসে নিজর টেবিলে বসে নানান চিঠি দলিল

পত্র নকল করতাম। বাড়ি ফিরে জু-চ্যুনকে সঙ্গ দিতাম, কখনো উনান ধরাতে কখনো ভাত রাঁধতে বা রুটি করতে। যখন আমি রান্না করতে শিখেছিলাম, তখনই এরকম করতাম।

তবু হোস্টেলে যা খেতাম তার চেয়ে ভালো রান্নার ব্যাপারে জু-চ্যুনের তেমন আগ্রহ না থাকলেও যখন করত মনপ্রাণ দিয়ে করত। এ বিষয়ে তার উদ্বেগে আমিও উদ্বিগ্ন হতাম। এই ভাবেই আনন্দ এবং তিক্ততা সমান ভাবে আমরা উপভোগ করতাম। সারাদিন একাজে নিজেকে সে এতই জড়িয়ে রাখত যে তার ছোটো ছোটো চুলগুলি ঘামে মাথায় সাপটে যেত। হাতের তেলো খুব রুক্ষ হয়ে উঠত।

তারপর ছিল আহসুই আর মুরগিগুলিকে দানাপানি দেওয়া! আর কাউকে দিতে হতো না। এসব কাজ সে দিতেও চাইত না।

তাকে ভয় দেখালাম, এত খাটলে বাড়িতে খাওয়া আমি বন্ধ করে দেব। একটি কথাও না বলে সে কেবল তাকিয়ে থাকত আমার দিকে; আমিও আর বেশী কিছু বলতে পারতাম না। তবু দিনের পর দিন চলতে লাগল তার এমনি পরিশ্রম।

যে ভয় আমি করছিলাম সেই বজ্রাঘাত একদিন এল শেষপর্যন্ত। "দু ক্বাড়" উৎসবের আগের দিন সন্ধ্যায়, আমি চুপচাপ বসেছিলাম। জু-চ্যুন, খাবার ডিসগুলি ধুচ্ছিল। সেসময় বাড়ির বাইরে দরজায় টোকার আওয়াজ শুনতে পেলাম। দরজা খুলে দেখলাম আমার অফিসের একজন পিওন, স্টেনসিল করা একটা কাগজ দিল আমার হাতে। আমি কতকটা ধরে নিয়েছিলাম, তবু নিশ্চিত হবার জন্য প্রদীপের আলোর কাছে নিয়ে দেখলাম কাগজটিতে লেখা আছে ঃ

কমিশনারের আদেশ অনুসারে,
শিহ চুয়ান-শেঙ কার্য হইতে বরখাস্ত হইল।
সচিবালয়।
৯ই অক্টোবর।

হোস্টেলে থাকাকালিনই আমি আন্দাজ করতে পেরেছিলাম ঐ ফেস-ক্রীম ভদ্রলোকটি কমিশনারের ছেলের জুয়োখেলার বন্ধু। নানা গুজব রটিয়ে একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি করবার সুযোগ খুঁজছিল সে। আমি অবাক হয়েছিলাম, আরো আগে কেন ঘটেনি এই দুর্ঘটনা। তবে আসলে এটাকে আমি আঘাত বলে নিই নি, কারণ এ কাজ ছেড়ে অন্য কোথাও কেরানির কাজ অথবা শিক্ষকতার কাজ নিতে আমি এর মধ্যেই মনস্থ করে নিয়েছিলাম অথবা কাজটা একটু কঠিন হলেও কিছু অনুবাদের কাজও করতে পারব ঠিক করেছিলাম। স্বাধীনতার বন্ধু পত্রিকা সম্পাদকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, দু এক মাস আগে থেকেই তার সঙ্গে পত্রালাপ করছিলাম। তা সত্বেও, আমার বুক ধড়-ফড়

করতে লাগল। আমি বিশেষ করে মর্মাহত হলাম এই জন্যে যে, জু-চুনের মনে সাহস থাকলেও দেখলাম তার মুখও কেমন ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। কিছুদিন যাবত সে একটু দুর্বল হয়ে পড়ছিল লক্ষ করছিলাম।

—কী আর হয়েছে এতে? সে বলল ঃ আবার নতুন করে শুরু করব আমরা, কেমন না? কিন্তু…

সে কথা শেষ করেনি, কে যেন তার কণ্ঠ চেপে ধরল। প্রদীপের আলোটা কেমন অস্বাভাবিক কাঁপল। সত্যি মানুষ কত হাস্যাস্পদ জন্তু। এত ক্ষুদ্র ব্যাপারে এত সহজে মানসিক বিপর্যয় আসে তাদের। প্রথম দুজনেই পরস্পরের দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ, পরে কী করব তারই আলোচনা শুরু করলাম। ঠিক করলাম যা কিছু সম্বল হাতে আছে তাই দিয়ে কোনো রকমে চালিয়ে যাব, কেরানি অথবা শিক্ষকের পদের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেব. তারপর আমার বর্তমান আর্থিক অবস্থার কথা জানিয়ে আমার একটা অনুবাদ বই প্রকাশনার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করে 'স্বাধীনতার বন্ধু' পত্রিকার সম্পাদককে চিঠি লিখব।

—যেমনি বলা তেমনি করা। চলো নতুন করে শুরু করি আমরা।

তক্ষুণি আমি টেবিলের ধারে গেলাম, তেলের বোতলটা এবং ভিনিগারের পাত্রটা একটু ঠেলে দিলাম একপাশে, আর জু-চুন নিয়ে এল নিস্প্রভ প্রদীপটা প্রথমে বিজ্ঞাপনের খসড়া তৈরি করে ফেললাম, তারপর অনুবাদ করবার জন্য কয়েকখানা বই ঠিক করে নিলাম। বাড়ি বদল করবার পর বইপত্রগুলোতে আর হাত দিইনি, এক আস্তর ধুলো জমে আছে বইগুলোর উপর। সবশেষে চিঠিটা লিখলাম।

বেশ কিছুক্ষণ চিঠিটায় কী লিখব তাই নিয়েই ইতস্তত করছিলাম। লেখা বন্ধ করে একটু ভেবে নেবার জন্য একবার মুখ তুলে তাকিয়ে প্রদীপের অস্পষ্ট আলোতে লক্ষ্য করলাম জু-চুনের মতো মেয়ের ভেতরও এমনি পরিবর্তন আনতে পারে। কিছুদিন ধরেই সে যে কিছুটা দুর্বল হয়ে পরছিল তা আমি লক্ষ্য করছিলাম—হঠাৎ আজকেই নয়। আমি আরও হতাশ হয়ে পড়লাম। একটা শান্তিময় জীবনের ছবি হঠাৎ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল—হস্টেলের সেই নোংরা ঘরখানার শান্তির পরিবেশের কথা মনের পর্দায় ফুটে উঠল, সেই দৃশ্যটা মন ভরে দেখতে গিয়েই হঠাৎ আবার প্রদীপের অস্পষ্ট আলোয় ফিরে এলাম।

অনেক সময় কাটিয়ে চিঠিটা লেখা শেষ হলো। খুব লম্বা হয়ে গেল, লেখা শেষ করে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে আমারও মনে হলো যেন ইদানিং আমিও বুঝি দুর্বল হয়েছি অনেকটা। ঠিক করলাম পরদিনই বিজ্ঞাপনটা পাঠিয়ে দেব এবং চিঠিটাও ডাকে দেব। তারপর সমবেত প্রচেষ্টায় উভয়েই আমরা আবার নীরবে নিজেদের শক্ত করে নিলাম, যেন আমরা নিজেদের

সহিষ্ণুতা আর শক্তিমত্তায় সম্পূর্ণ সচেতন, যেন এই নতুন করে শুরু করবার ভেতর থেকেই জাগছে নতুন আশা। আমরা দেখছি তারই আলো।

আসলে বাইরে থেকে আসা এই আঘাত আমাদের মনে আবার নতুন করে প্রেরণা আর শক্তি জাগিয়ে দিল। অফিসে আমি পিঞ্জরাবদ্ধ বনের পাখীর মতো বাস করতাম—শুধু বেঁচে থাকবার জন্য ব্যাধের হাতে ছিটিয়ে দেওয়া দুটো দানাতেই সন্তুষ্ট সেই বন্দী পাখী। সে বাঁচবে, কিন্তু তারপর যতই দিন যাবে পাখী হারিয়ে ফেলবে তার উড়বার শক্তি মুক্তি দিলেও আর উড়বে না সে, ডানা নড়বে না। যে করেই হোক সেই খাঁচা থেকে আমি বেরিয়ে এসেছি, এইবার সময় বয়ে যাবার আগেই যতক্ষণ ডানার শক্তি থাকবে আমি আবার উড়ে যাব মুক্ত আকাশের বুকে।

ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপনের ফল সঙ্গে সঙ্গেই আশা করিনি আমরা। তাছাড়া, অনুবাদ করাও খুব সহজ কাজ নয়। একটা কিছু পড়লেন, ভেবে দেখলেন বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু অনুবাদ করতে বসেই দেখলেন অসংখ্য অসুবিধে, তারপর কাজের গতিও হয় খুব মন্থর। তবু যথাসাধ্য করব আমি মনস্থ করলাম। একপক্ষের চেয়েও কম সময়ের মধ্যে দেখলাম একটা অভিধানের প্রায় প্রতিটা পাতার কোণ মলিন হয়ে উঠেছে আমার আঙুলের ছাপ লেগে। তা থেকেই প্রমাণ, কত মনোযোগ দিয়েছিলাম আমার কাজে। 'স্বাধীনতার বন্ধু' পত্রিকার সম্পাদক আমাকে জানালেন ভালো পাণ্ডুলিপি পেলে নিশ্চয় তিনি আগ্রাহ্য করবেন না।

দুর্ভাগ্য, বাড়িতে এমন কোনো ঘর ছিল না যেখানে নিরিবিলিতে কাজ করা যেত! জু-চুন আগের মতো তেমন শান্ত বা সুবিবেচক আর যেন রইল না। আমাদের ঘরটা থালা বাটিতে এমন ভাবে ছড়িয়ে থাকত, ধূমায় এমন ঢাকা থাকত যে অসম্ভব ছিল সেখানে বসে কোনো কাজ করা। অবশ্য এর জন্যে নিজেকেই আমি দোষী করছি—পড়ার ঘর রাখবার ব্যবস্থা না করবার দায়িত্ব তো আমারই। তার উপর সমস্যা ছিল ঐ আহসুই আর মুরগির ছানা। মুরগির ছানা মুরগিতে পরিণত হয়েছে এতদিনে, আর দিনে দিনে দুই পরিবারের কলহের সূত্র হয়েছে বেশি করে।

তারপর আবার ঐ দৈনিক খাওয়ার ব্যবস্থা করা। জু-চুনের সব পরিশ্রম যেত ঐ এক দিকেই। মানুষ আহার করে উপার্জন করে আহার জোগাতে; কিন্তু আহসুই আর মুরগিগুলিকে কেবল খাওয়াতেই হতো। এতদিনে যা কিছু শিখেছিল সবই যেন সে ভুলে গেল। বুঝতো না যখনই খেতে ডাকত, আমার চিন্তার সূত্রে বাধা পড়ত। যদিও ডাক শুনে গিয়ে উঠে বসতাম তবু সময় সময় অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ পেত আমার চোখেমুখে, কিন্তু এ সে লক্ষ্যই করত না, সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ভাবে নিজের কাজ করে যেত।

পাঁচটি সপ্তাহ লাগল এটা বুঝতে যে খাওয়ার সময় দিয়ে বেঁধে দেওয়া নয়

আমার কাজের সময়কে। যখন সে বুঝতে পারল, সে বিরক্ত হলো, কিন্তু কোনো কিছু বলল না। তারপর থেকে আমার কাজের গতিও বাড়তে লাগল, আর শীঘ্রই আমি প্রায় পঞ্চাশ হাজারের উপর শব্দ অনুবাদ করে ফেললাম। পাণ্ডুলিপি কিছুটা পরিমার্জিত করা, তারপর আরো দুটো ছোট ছোট লেখার সঙ্গে স্বাধীনতার বন্ধু পত্রিকায় পাঠিয়ে দেওয়া' এই কাজ ঐ খাওয়ার ব্যাপারটা তখনও একটা ভীষণ মাথা ব্যথা হয়ে রইল। ঠাণ্ডা থাকুক আপত্তি নেই কিন্তু আদপেই পরিমাণে পর্যন্ত থাকত না। খাবার ইচ্ছেটা আগের চেয়েও যেন কমে গিয়েছিল। যদিও তখন সারাদিন বাড়িতে বসে মাথাকে খাটিয়ে যেতাম, তবুও যেন যথেষ্ট পরিমাণ ভাত জুটত না। আহসুইকে দিয়ে দিত, এমন কি অনেক সময় আমার নিজের ভাগ্যে না জুটলেও যতটুকু মাংস আসত সবই ওকে দিয়ে দিত। সে বলত আহসুই ভীষণ রোগা হয়ে গেছে, দেখলে সত্যি কষ্ট হতো, বাড়িওয়ালীও দেখে যা তা বলত। হাসির পাত্র হওয়া কোনোমতেই সে সহ্য করতে পারত না।

সুতরাং আমি দেখতাম আমার খাদ্যের অবশিষ্টাংশ পেত মুরগিগুলি। অনেকদিন কাটবার পর আমি এটা বুঝতে পারলাম। তবে আমি এইটুকু সচেতন ছিলাম যে হাক্সলির কথায় ধরনীর কোণে একটুকু ঠাঁই আমার জন্যে ছিল কোথাও ঐ কুকুর আর মুরগির মাঝখানে।

তারপর অনেক যুক্তি আর তর্কের পর সে বুঝতে পারল, একটা একটা করে মুরগি খাবার টেবিলে আনতে লাগল, আমরা এবং আহসুই মিলে দিন দশেক বেশ চালিয়ে দিলাম। খুবই রোগা হয়ে গিয়েছিল মুরগিগুলি, কেননা দুচার মুঠো দানা ছাড়া আর কিছু জুটত না ওদের। এরপর আবার শান্তি ফিরে এল। তবে জু-চুন আগের চেয়েও অনেকটা দমে গিয়েছিল, এত বিষন্ন মনে হতো এগুলি না থাকার দরুন যে কেমন যেন মনমরা হয়ে গেল। মানুষ কত সহজে বদলায়!

আহসুইকেও ছাড়তে হলোশেষ পর্যন্ত! কোথা থেকে কোনো কিছু পাওয়ার আশা ছেড়ে দিলাম। আর অনেকদিন জু-চুনের ভাণ্ডারেও কোনো কিছু রইল না কুকুরটাকে দেওয়ার মতো। তাছাড়া শীতও প্রায় দ্রুতগতিতে এসে পড়ছিল, গরম করবার জন্য একটা চুল্লির কী ব্যবস্থা করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। ইদানিং কুকুরটার ক্ষুধার নিবৃত্তি করা যে কত কঠিন হয়ে পড়ছিল সে সম্বন্ধে আমরা খুবই সচেতন ছিলাম। সুতরাং কুকুরকেও যেতে হলো। যদি গলায় একটা চাকতি ঝুলিয়ে ওকে বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে যেতাম, হয়তো কয়েকটা তামার মুদ্রা পেতাম। কিন্তু দুজনের কারও পক্ষেই এই রকম করা সম্ভব ছিল না।

শেষপর্যন্ত একটা কাপড় দিয়ে ওর মুখটা ঢেকে আমি-ই ওকে একদিন পশ্চিমে ফটকের বাইরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলাম। আমার পেছন পেছন ছুটে

আসছিল দেখে পথের ধারে একটা ছোট্ট অগভীর গর্তে ওকে ঠেলে ফেলে দিয়ে আমি পালিয়ে এলাম।

ফিরে এসে দেখলাম বাড়িতে শান্তি বিরাজ করছে কিন্তু জু-চুনের মুখে ঘন বিষাদের ছায়া দেখে চমকে উঠলাম। এতটা বিষণ্ণ আগে আমি তাকে দেখেনি কখনো। অবশ্যি এটা যে আহসুইর জন্য বুঝতে পারলাম। কিন্তু এতটা মনে নেওয়া কেন? ওটাকে গর্তে ফেলে দিয়ে এসেছি, এই কথাটা তাকে বলিনি।

সেই রাত্রে কেমন একটা হিমেল ভাব আমি লক্ষ করলাম তার চোখে মুখে।

—আচ্ছা…! আমি কথা না বলে পারলাম নাঃ কী হয়েছে আজকে তোমার?

—কেন? এমন কি সে আমার মুখের দিকেও তাকাল না।

—তোমাকে কেমন দেখাচ্ছে…

কিছু না। কিছু না তো।

আমি ধরে নিলাম সে নিশ্চয় আমাকে মমতাহীন মনে করছে। যখন একা ছিলাম তখন বেশ কাটত আমার আত্মীর স্বজন, পরিবার, পরিজনের সঙ্গে নির্বিরোধে মিলতে পারতাম। কিন্তু এই বাড়িতে উঠে আসবার পর থেকে সব পুরনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দিতে হলো। তবু বর্তমান পরিস্থিতি থেকে যদি মুক্ত হতে পারতাম হয়তো অনেক পথ খুঁজে পেতাম। এখন একমাত্র তার জন্যই সকল বাধা আর বিরোধের সঙ্গে মানিয়েই চলতে হবে আমাকে– তার মধ্যে-আহসুইকে ফেলে দিয়ে আসা একটা ব্যাপার কিন্তু এই কথাটুকু বুঝবার জন্যও বুঝি জু-চুনের সব অনুভূতি অসাড় হয়ে গিয়েছিল।

যখন একটা সুযোগ বুঝে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করলাম সে মাথা নাড়ল, বুঝি উপলব্ধি করেছে ব্যাপারটা। কিন্তু পরে তার ব্যবহার থেকে এইটাই ধরে নিলাম যে, হয় সে বুঝতে পারেনি অথবা আমার কথা বিশ্বাস করেনি।

শীতের হিমেল স্পর্শ আর জু-চুনের নিরাবরণ শীতল দৃষ্টি বাড়িতে সোয়াস্তি থাকা অসম্ভব করে তুলল। কিন্তু কোথায় আমি যেতে পারতাম? তার ঐ শীতল দৃষ্টি এড়াতে পার্কে বা রাস্তায় গিয়ে কাটাতে পারতাম, কিন্তু বাইরের কনকনে হাওয়া শিস দিয়ে যেত আমার শিরার ভেতরে। অবশেষে স্বর্গের আশ্রয় পেলাম লাইব্রেরীতে গিয়ে।

প্রবেশ মূল্য লাগত না, পাঠাগারের ভেতর দুটো চুল্লি ছিল। চুল্লিতে মিটমিটে আগুন সত্বেও, আছে এই উপলব্ধিটুকুই আমার শরীরকে উত্তপ্ত রাখত। পড়বার মতো উপযুক্ত এমন কোনো বই ছিল না সেখানে; পুরনো বইগুলি একদম সেকেলে, আর নতুন বই ছিলই না বলতে।

কিন্তু আমি সেখানে পড়বার জন্য যেতাম না। আরও জনা কয়েক লোক থাকত দেখতাম। কোনো কোনো দিন দশ বারো জনও। সবারই পরণে দেখতাম, আমার মতোই হালকা পোশাক। আমরা সবাই পড়ার ভান করতাম। কেবল বাইরের ঠাণ্ডা থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য বসে থাকতাম। আমার পক্ষে কণায় কণায় সুবিধে হলো। পথ চলতে পরিচিত লোক দেখলেই হয়তো বিদ্রূপ কটাক্ষ হানবে আপনার দিকে কিন্তু সেরকম উপদ্রব ছিলনা এখানে। কারণ আমার যারা পরিচিত তারা হয়তো গিয়ে জুটেছে অন্য কোথাও, হয়তো বা নিজের বাড়ির চুল্লির ধারে।

যদিও আমার পড়বার মতো বই সেখানে ছিল না তবু চিন্তা করবার সুযোগ পেতাম সেখানে বসে। ঐখানে একাকী বসে যখন অতীতের কথা চিন্তা করতাম তখন অনুভব করতাম প্রেমের জন্য—অন্ধ প্রেম বলতে পারেন—গত ছয়টি মাস জীবনের অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকেও আমি অবহেলা করেছি। প্রথম এবং সবচেয়ে জরুরী আমার জীবিকা। মানুষের জীবনে জীবিকার ব্যবস্থা আসবে আগে, তারপর প্রেমের স্থান। যাদের জীবনে সংগ্রাম করে চলতে হয়, বেরিয়ে আসবার পথও খুঁজে নিতে হয় তাদের। আর কেমন করে ডানা নাড়তে হয় তখনো আমি ভুলিনি, যদিও দুর্বল হয়েছি আগের চেয়েও…

ঐ পাঠাগারের ঘরটা, পাঠরত মানুষগুলি, সব যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল আমার চোখের সামনে থেকে। আমি যেন দেখছিলাম, দুরন্ত সমুদ্রের বুকে ভাসমান জেলেরা, পরিখার ভেতরে অপেক্ষমান সৈনিক, নিজ নিজ গাড়ির ভেতরে আশ্রিত সম্মানিত পুরুষেরা, শেয়ার বাজারে ফাটকাবাজরা পাহাড়ে জঙ্গলে ভ্রাম্যমান নায়ক, শিক্ষায়তনে বক্তৃতারত শিক্ষক, নিশাচর, অন্ধকারে আত্মগোপনকারী—তস্করের দল!—তখন জু-চুন এসব থেকে দূরে। আহ্-সুইর জন্যে অসন্তুষ্টি আর রান্নার কাজে নিবিষ্টতায় মনের সব সাহস হারিয়ে ফেলেছিল সে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এটাই যে কোনোমতে দুর্বল লাগেনি তাকে।

ঠাণ্ডা বাড়ছিল। চুল্লিতে কয়েক মুঠো কয়লা যা অবশিষ্ট ছিল তাও অবশেষে নিঃশেষ হয়ে গেল। তখন লাইব্রেরী বন্ধ হবার সময়। আমাকে আবার ফিরে যেতে হলো চিচাও স্ট্রীটের বাড়িতে। তার হিম শীতল দৃষ্টির সামনে। ইদানিং তার মনের উত্তাপ কিছু কিছু অনুভব করতাম কিন্তু এতে আমি বেশি করে চঞ্চল হয়ে পড়তাম। একদিন সন্ধ্যাবেলার কথা মনে আছে। হাসিমুখে হস্টেলের একদিনের একটা ঘটনার কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ দেখলাম তার চোখে শিশুসুলভ দৃষ্টি জলজল করে উঠল। যা নাকি অনেকদিন দেখিনি। কিন্তু তার চোখেও সবসময় একটা আতঙ্কের ভাব প্রকাশ পেত। কিছুদিন যাবৎ তার প্রতি আমার প্রাণহীন শীতল

ব্যবহারের ব্যাপারটাই বেশি করে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল মনে হলো। কোনো কোনো সময় তাকে উৎসাহিত করবার জন্য জোর করে কথা বলতাম হাসতাম কিন্তু আমার কথা বা নিষ্প্রাণ হাসিবিদ্রূপের মতো কানে বাজছিল। সেগুলি সহ্য করা আমার নিজেরই যেন অসম্ভব লাগছিল।
জু-চুন নিজেও হয়তো উপলব্ধি করতে পেরেছিল। কেননা এরপর থেকেই দেখলাম সে তার ঐ কাষ্ঠ কঠিন নীরবতা পরিহার করেছিল এবং গোপন করবার চেষ্টা করলেও মনের উদ্বেগ প্রকাশ হয়ে পড়ত। আমার প্রতি আগের চেয়ে বেশী কোমলতা দেখাতে লাগল।
স্পষ্টভাবে তাকে বলবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সাহস পাচ্ছিলাম না। যখনই কথা বলব বলে নিশ্চিত হতাম তক্ষুনি তার চোখের ঐ শিশুসুলভ দৃষ্টি, কিছুক্ষণের জন্যও অন্তত, জোর করে হাসি ফুটিয়ে তুলত। কিন্তু ঐ হাসি আমার কাছে বিদ্রূপ বলে আমি আমার স্থৈর্য হারিয়ে ফেলতাম।
এরপর থেকে সে তার পুরনো প্রশ্নের অবতারণা এবং নতুন নতুন পরীক্ষা শুরু করল, যার ফলে তার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করতে গিয়ে আমিও ভণ্ডামির আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম। আমার অন্তর ভণ্ডামিতে কলঙ্কিত হয়ে উঠল। এমনি মিথ্যায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিল আমার। মনের বিষন্নতার ভেতর অনেক সময় আমি অনুভব করতাম যে খাঁটি সত্য কথা বলতে সত্যিকারের সাহস প্রয়োজন। কারণ যার বুকে সাহস নেই ভণ্ডামিতে তার মন ভরপুর। সে নতুন পথ, সত্যের পথ খুঁজে পাবে না কখনও। তার চেয়ে বড়ো কথা তার অস্তিত্বই মিথ্যা হয়ে যাবে।

এইবার জু-চুন আবার ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে লাগল। একদিন সকাল বেলার ঘটনা। সেদিন সকালে ভীষণ-ঠাণ্ডা, অথবা হয়তো এমনি আমার মনে হচ্ছিল। ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধে আমি গোপনে নিজের মনে মনে হাসছিলাম। তার সমস্ত আইডিয়া, বুদ্ধি, নির্ভিকতা, যা কিছু সে আয়ত্ব করেছিল সবই নিস্ফলে গেল। অথচ সে কিন্তু তা জানত না। পড়াশুনো অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছিল। সেও এটা বুঝতে পারেনি যে জীবনের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য জীবিকার্জন আর এটাও উপলব্ধি করতে পারেনি যে এই কর্তব্য সাধনে মানুষ হয় হাতে হাত ধরে চলবে নয়তো একাই সমুখে এগিয়ে যাবে। সে পারত কেবল কারও আঁচল ধরে ঝুলে থাকতে, ফলে সংগ্রামীর সংগ্রাম ব্যর্থ হতো, আর উভয়ের জন্য ধবংসের পথ অনিবার্য হয়ে উঠত।
আমি উপলব্ধি করতে পারলাম বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াই এখন আমাদের একমাত্র আশা ভরসা। বিচ্ছেদই এখন তার মুক্তির একমাত্র পথ। হঠাৎ তার মৃত্যু কামনা আমার মনে এলো। কিন্তু তক্ষুনি লজ্জিত বোধ করে নিজেকে ধিক্কার দিলাম। সুখের বিষয় তখন সকাল। তাকে কথাটা বলবার জন্য

সারাদিন যথেষ্ঠ সময় ছিল হাতে। আমরা আবার নতুন করে শুরু করব, কি করব না, তা নির্ভর করছিল এরই উপর।

ইচ্ছে করেই অতীতের প্রসঙ্গ টেনে আনলাম। সাহিত্যের কথা তুললাম। তারপর বিদেশী লেখক ও তাঁদের রচনার কথা—ইবসেনের 'ডলস হাউস' এবং 'দি লেডি ফ্রম দি সি।' বলিষ্ঠ মনের জন্য নোরাকে প্রশংসা করলাম··· গত বছর হস্টেলের ঐ নোংরা ঘরে অনেকবার বলেছি ঐসব কথা কিন্তু আজকে সেসব অর্থহীন শূন্য বলে লাগল। কথাগুলো যখন আমার মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল সঙ্গে সঙ্গে ভাবছিলাম যেন কোন এক অদৃশ্য দুরন্ত শিশু তোতা-পাখির বুলির মতো কথাগুলো বলছে আমার পেছন থেকে।

সে শুনলো আমার কথাগুলো, মাথা নেড়ে মেনে নিল কিন্তু নীরব রইল। যা বলবার ছিল আচমকা তা শেষ করে ফেললাম। কোন এক শূণ্যতায় আমার কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল।

আরও কিছুক্ষণ নীরবতার পর সে বলল ঃ হ্যাঁ ঠিক, কিন্তু···চুয়ান-শেঙ, আমি বুঝতে পারছি অনেক বদলে গেছ তুমি। তাই কি সত্যি? বলো!

একটা চরম আঘাত, কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম। আমার মত ও প্রস্তাব তাকে বুঝিয়ে দিলাম ঃ আবার নতুন করে শুরু করব, নতুন অধ্যায়ের নতুন পাতা উলটাব, একসঙ্গে ধ্বংসের পথে নেমে যাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করব।

বিষয়টাকে ভালোভাবে উপলব্ধি করবার জন্য বিশেষ দৃঢ়তারই সঙ্গে আমি বললাম ঃ তাছাড়া, কোনো দ্বিধা সঙ্কোচ করবার নেই তোমার কেবল সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া। তুমি সত্যি কথা বলতে বলছ আমাকে। ঠিক, কোনো মতেই আর ভণ্ডামি করা উচিত নয় আমাদের। তাহলে সত্যি কথা হলো, আমি তোমাকে আর ভালোবাসি না। এ তোমার জন্যে ভালোই হলো বলব। মনে কোনো দুঃখ, কোনো দ্বিধা না রেখে খুব সহজে তোমার কাজ করতে পারবে।···

আমি কিছুটা নাটুকেপনা প্রত্যাশা করছিলাম কিন্তু এরপর যা হল তা শুধু নির্বাক নিস্তব্ধতা। তার মুখটা ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল, যেন মৃতের মুখ। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই স্বাভাবিক রঙ আবার ফিরে এল। শিশুর চোখের দৃষ্টির মতো দৃষ্টি ফুটে উঠল তার দু চোখে। চারদিকে তাকিয়ে দেখল। ক্ষিদে পেলে শিশু যেমন তার মাকে খুঁজে বেড়ায় তেমনি আবার তাকাল শূণ্যে। আতঙ্কের ...সঙ্গে আমার দৃষ্টিকে সে এড়িয়ে গেল।

দৃশ্যটা আমার সহ্যের অতীত। সুখের কথা তখনো সন্ধ্যা ঘোর হয়নি। আমি কনকনে শীতের হাওয়া অগ্রাহ্য করে লাইব্রেরীর দিকে যাব বলে ছুটে বেরিয়ে গেলাম।

সেখানে এক প্রস্থ 'স্বাধীনতার বন্ধু' কাগজ চোখে পড়ল। আমার সব কয়টা

ছোটো নিবন্ধ ছেপেছে। আমাকে অবাক করে দিল, যেন এক নতুন জীবন ফিরে পেলাম আমি। অনেক পথ খোলা আছে সামনে। চিন্তা করলাম, এমন করে আর চলতে পারে না।

যে সকল বন্ধুদের সঙ্গে অনেকদিন কোন সম্পর্ক ছিল না সেইসব পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আবার দেখাসাক্ষাৎ শুরু করলাম। তবে তাদের কাছেও দু একবারের বেশি যেতাম না। তাদের ঘরে তারা থাকলেও, স্বভাবতই সেখানে গিয়ে আমার মজ্জা পর্যন্ত কেমন ঠাণ্ডা হয়ে উঠত। সন্ধ্যাবেলায় বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা একটা ঘরে গাদাগাদি করে পড়ে থাকতাম।

একটা বরফের মতো ঠাণ্ডা সুঁচ আমার কলিজা ভেদ করে যেত। কেমন একটা অসাড় ভাগ্যহীনতার জ্বালা আমি অনবরত অনুভব করতাম। আমার সম্মুখে তো অনেক পথ উন্মুক্ত। চিন্তা করতাম, কেমন করে ডানা নাড়তে হয় সে তো ভুলিনি এখনও। হঠাৎ আবার তাঁর মৃত্যু কামনা মনে জাগল কিন্তু পরমুহূর্তেই লজ্জায় অভিভূত হয়ে তিরস্কার করলাম নিজেকে।

লাইব্রেরীতে বসে কোনো কোনো দিন এক একটা নতুন পথের ইঙ্গিত আমার চোখের সামনে চমক দিয়ে যেত। আমি কল্পনা করতাম যে, কঠিন বাস্তবকে সে মানুষের সঙ্গে মোকাবিলা করেছে এবং এই হিমশীতল গৃহ সে নির্ভয়ে পরিত্যাগ করেছে। ঘর ছেড়ে চলে গেছে বটে, কিন্তু কোন দ্বেষ রাখেনি আমার বিরুদ্ধে। ভাবতে ভাবতে মহাশূন্যে ভাসমান মেঘগুলির মতো হালকা মনে করতাম নিজেকে। মনে হতো উন্মুক্ত নীল আকাশ মাথার উপর, নিচে সুউচ্চ পর্বতমালা, বিরাট সমুদ্র, বড়ো বড়ো ইমারত, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, যুদ্ধক্ষেত্র, মোটর গাড়ি, রাজপথের ছড়াছড়ি, ধনীর প্রাসাদ, উচ্ছল মানুষের ভিড়ে উপচে পড়া হাট বাজার, ঘন অন্ধকার আরো কত কী......

আরো কি মনে মনে অনুভব করতাম, ঐ নতুন জীবন যেন ঐ কাছে অতি কাছে ঘিরে আছে আমাকে।

পিকিংএর কনকনে ঠাণ্ডার দিনগুলি কোনোরকমে কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু আমাদের অবস্থা কি ফড়িঙের মতো ; দুষ্টু ছেলের হাতে পড়েছি, সুতোয় বেঁধে খেলাচ্ছে, নাড়ছে, আরও কত কি করছে। যদিও মুক্তি পেয়ে বেঁচে এসেছি কিন্তু ধরাশায়ী আমরা, মৃত্যুর ক্ষণ প্রহর গুণছি।

তিনখানা চিঠি লিখবার পর জবাব পেলাম 'স্বাধীনতার বন্ধু' পত্রিকার সম্পাদকের কাছ থেকে। খামে দুখানা 'বুক টোকেন' ছিল, একখানা কুড়ি সেন্টের আর অপরখানা ত্রিশ সেন্টের। ওগুলি পেতে নয় সেন্ট ডাক টিকিট খরচ হলো আমার, সারাদিন না খেয়ে কাটালাম, সবই নিরর্থক।

যাহোক, অবশেষে এইটুকু আমি অনুভব করতে পারলাম যে, আমি ততটুকুই পেয়েছি যতটুকু আমি প্রত্যাশা করেছিলাম।

শীতের পর বসন্তের আবির্ভাব। হাওয়া আর তত ঠাণ্ডা নয়। বাইরে ঘুরে ঘুরেই আমি অনেকটা সময় কাটিয়ে দিতাম, সন্ধ্যা ঘন হয়ে না আসা পর্যন্ত প্রায়ই বাড়ি ফিরতাম না। এক অন্ধকার সন্ধ্যায়, অন্যদিনকার মতো সেদিনও অবসন্ন দেহ মন নিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। অন্য দিনকার মতোই বাড়ির ফটকের কাছে পৌঁছে মন এমন বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। শেষে অবশ্য নিজের ঘরে পৌঁছলাম। ভেতরটা তখন অন্ধকার। আলো জ্বালাবার জন্য দিয়াশলাইটা খুঁজছিলাম, ঘরের ভেতরটা ভীষণ শূন্য এবং শান্ত মনে হল।

হতভম্ব হয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম। বাড়িওয়ালার স্ত্রী জানালা দিয়ে ডাকল আমাকে: জু-চুনের বাবা এসেছিলেন আজকে, তিনি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন।

এ আমি প্রত্যাশা করিনি। মনে হলো পশ্চাৎ থেকে কে আমাকে মাথায় আঘাত করছে, হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

—জু-চুন চলে গেছে? আমি শেষপর্যন্ত জিজ্ঞাসা করতে সক্ষম হলাম।

—হ্যাঁ।

—সে…সে কিছু বলে গেছে?

—না। আপনি বাড়ি ফিরলে আপনাকে জানাতে বলে গেছেন শুধু।

আমি বিশ্বাস করতে পারিনি: তবু ঘরখানা ভীষণ শূন্য এবং শান্ত। সারা ঘরময় জু-চুনকে খুঁজছিলাম কিন্তু আমি কেবল দেখলাম রঙচটা ফার্নিচারগুলি ঘরের এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। এ থেকেই স্পষ্ট কেউ লুকিয়ে নেই এখানে। হঠাৎ আমার খেয়াল হলো হয়তো একটা চিঠি রেখে গেছে, নয়তো দু একটা কথা অন্তত টুকে রেখে গেছে কোথাও কিন্তু না, কিছুই না। কেবল কিছুটা নুন, শুকনো সবজি একটু ময়দা আর অর্দ্ধেকটা বাঁধাকপি এক সঙ্গে রাখা ছিল এক কোণে, তারই পাশে ডজন খানেক তাম্রমুদ্রা। এইটুকুই কেবল আমাদের সংসারের সম্পদ, অতি যত্নে সে গুছিয়ে রেখে গেছে আমার জন্যে। যেন বলে গেছে, যদিও লিখে রেখে যায়নি, এই নিয়েই চালিয়ে নিতে আরও কিছুদিন।

চারদিককার সবকিছু মিশে যেন গলা টিপে ধরছিল আমাকে, সহ্য করতে না পেরে ছুটে বেরিয়ে গেলাম বাইরের আঙিনায় যেখানে চারদিক ঘন অন্ধকারে ঢাকা। ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোতে মাঝের ঘরের জানলার কাচ চিক চিক করছিল, দেখলাম ভেতরে তারা খেলা করছিল শিশুদের নিয়ে। আমার হৃদয় শান্ত হয়ে এল, এই যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবার একটা পথের ইঙ্গিত আমি দেখতে পেলাম: দেখলাম সুউচ্চ পাহাড় পর্বত, বিশাল দিগন্তবিস্তারী জলাভূমি, প্রশস্ত রাজপথ, আলোকমালায় উদ্ভাসিত ভোজসভা, কত পরিখা, গভীর অন্ধকারে ঢাকা যেন ঘোর অমানিশা, একটা

ধারালো ছুরির ফলা যেন দুর্বার গতিতে ঢুকে গেল, তারপর নিঃশব্দ পদক্ষেপ...

পা এলিয়ে দিলাম, পথেথ রচের কথা মনে এল, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম।

চোখ বুঁজে শুয়ে থেকে ভবিষ্যতের একটা ছবি আমি এঁকে নিলাম কিন্তু অর্দ্ধ রজনী অতিবাহিত হবার আগেই সেই ছবি কোথায় মিলিয়ে গেল। ঘরের অন্ধকারে হঠাৎ যেন কতগুলি দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিসপত্রের একটা স্তূপ দেখতে পেলাম, তারপর জু-চুনের ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে মুখখানা ভেসে উঠল, শিশুর মতো সরল চোখের দৃষ্টি নিয়ে সে যেন মিনতি করছিল আমাকে। কিন্তু নিজের সম্বিত যখন ফিরে পেলাম, দেখলাম সে মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেছে।

যাহোক তবু আমার হৃদয় ভারাক্রান্তই রইল। তাকে চুপ করে ঐ কঠিন সত্য কথাটা না বলে আরো কিছুদিন আমি অপেক্ষা করতে পারলুম না কেন? তার কাছে শুধু রইল তার পিতার অদম্য কঠোরতা। ছেলেমেয়েদের কাছে তিনি মহাজনের মতোই হৃদয়হীন আর দর্শকদের হিমেল দৃষ্টি। এ ছাড়া আর ছিল একমাত্র শূন্যতা। এই শূন্যতার বোঝা বয়ে চলা কী ভয়ঙ্কর! তেমনি কত কঠিন। ঐ কঠোরতা আর হিমেল দৃষ্টির মাঝে জীবনের প্রতিটা মুহূর্তকে চালিয়ে নেওয়া। তারপর জীবনের আলো যেদিন নিভবে সেদিন সমাধির উপর হয়তো থাকবে না একটি প্রস্তর ফলক।

জু-চুনের কাছে ঐ নির্মম সত্য প্রকাশ করা উচিত হয়নি আমার। পরস্পরকে আমরা ভালোবেসেছিলাম। আমি তাকে মিথ্যা কথা বলতে পারতাম। সত্য যদি সম্পদই হয়, জু-চুনের কাছে এমনি শূন্যতার বোঝা হয়ে এল কেন? অবশ্য মিথ্যা ও শূন্যতায় ভরা, তবু এর বোঝা এমনি পিষে ফেলত না তাকে।

ভেবেছিলাম জু-চুনকে সত্য কথা বললে সে হয়তো বুক ফুলিয়ে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব না রেখে আপন পথে এগিয়ে যেতে পারবে, যেমনি সে পারত আমাদের পরিচয়ের শুরুতে। কিন্তু আমি ভুল করেছিলাম। সে তখন দুঃসাহসী ছিল তার প্রেমের গৌরবে।

ভণ্ডামির ভারি বোঝা ঘাড়ে বইবার সাহস আমার ছিল না, তাই আমি সত্যের বোঝা চাপিয়ে দিলাম তার উপর। সে আমাকে ভালোবেসেছিল, এই ভারি বোঝা তাই বইতে হলো তাকে কঠোর প্রাণহীন দৃষ্টির মাঝে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

আমি তার মৃত্যু কামনা করেছিলাম...। বুঝেছিলাম আমি কত দুর্বল! সবলের হাতে আঘাতই ছিল আমার উপযুক্ত পাওনা। তারা সত্যবাদী হোক বা ভালই হোক কিছু যায় আসে না। তবু প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সে কিন্তু কামনা

করে এসেছিল আমার দীর্ঘজীবন···

চিচাও স্ট্রীট ছেড়ে দেবার ইচ্ছে হলো। বড়ো বেশী শূন্য, বড়ো বেশী নিঃসঙ্গ লাগছিল বাড়িটা। ভাবলাম, একবার বেরিয়ে যেতে পারলে মনে হবে যেন জু-চুন তখনো আছে আমার পাশে। হয়তো সে শহরেই আছে ফিরে আসতে পারে যে কোনো সময়ে। আমি যখন হস্টেলে থাকতাম তখন যেমন করত।

তবু আমার সবগুলি চিঠি অনুত্তরিত রয়ে গেল, যেমনি রইল একটা কিছু কাজের জন্য বন্ধুদের কাছে আমার সকল আবেদন। এরপর আমাদের পরিবারের এক পুরনো বন্ধুর কাছে যাওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর রইল না। তিনি আমার কাকার সহপাঠী ছিলেন। বেশ সম্মানিত সিনিয়র ডাক্তার, বহু বছর পিকিং ছিলেন এবং তাঁর একটা বিরাট বড়ো পরিচিত গণ্ডি ছিল।

বাড়ির দারোয়ান মসৃণ দৃষ্টিতে কটমট করে তাকাল আমার দিকে। কারণ ছিল বটে। আমার জামা কাপড় সেদিন ভীষণ নোংরা। বেশ কষ্ট করেই ভেতরে ঢুকতে পারলাম। আমার কাকার বন্ধু আমাকে চিনতে পারলেন। কিন্তু খুবই হৃদয়হীন ব্যবহার করলেন। তিনি আমাদের সব কথাই জানতেন।

—ও বাড়িতে তোমার আর থাকা চলে না, এটা ঠিকই। কোথাও একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ করবার পর তিনি নিস্প্রাণ ভাবেই আমাকে বললেন ঃ কিন্তু তুমি যাবেই বা কোথায়? খুবই কঠিন অবস্থা। ঐ···কী বলে···তোমার···তোমার ঐ যে বন্ধু ছিল···কী যেন নাম?—

হ্যাঁ, মনে পড়ছে, জু-চুন—তুমি নিশ্চয় জানো, জু-চুন আর বেঁচে নেই—

আমি কেমন হয়ে গেলাম!

—মারা গেছে? আপনি জানেন? অকস্মাৎ আমি বলে উঠলাম।

কৃত্রিম হাসি হাসলেন তিনি:

—জানি বইকি, নিশ্চয় জানি। আমার চাকর ওয়াঙ, ওদের ঐ একই গ্রাম থেকে আসে।

—কিন্তু, কিন্তু, কী হয়েছিল তার?

—তা জানিনা। তবে মারা গেছে এটা সত্যি।

আমি ভুলে গেছি কেমন করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। আমি জানতাম তিনি মিথ্যে কথা বলবেন না। জু-চুন আর আমার পাশে ফিরে আসবে না, যেমন সে এসেছিল গতবার। যদিও অনমনীয়তা এবং নিস্প্রাণ দৃষ্টির মাঝেও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই শূন্যতার বোঝাই বইতে চেয়েছিল, তবু এ তার পক্ষে সহ্যের অতীত ছিল। ভাগ্যের বিধান ছিল মৃত্যুর পূর্বে সে জেনে যাবে আমার মুখ থেকে

উচ্চারিত কঠোর সত্যের কথা—আমি ভালোবাসি না তাকে।

তাই তো, আমি তো আর থাকতে পারি না ওখানে! কিন্তু কোথায়ই বা যেতে পারতাম?

চারদিকে মহাশূন্যতা আর মৃত্যুর নিস্তব্ধতা। প্রেমহীন মৃত্যু হয়েছে যাদের সেই প্রত্যেকটি মানুষের চোখের সামনে যে সীমাহীন অন্ধকার তাই যেন আমি দেখতে পেলাম। যেন তাদের জীবন সংগ্রামের ভিত। আর হতাশার ক্রন্দন ধ্বনিও আমি শুনতে পাচ্ছিলাম।

আমি অভূতপূর্ব একটা কিছুর অপেক্ষায় ছিলাম, কোন এক অজানা আর অপ্রত্যাশিতের। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে গেল সেই একই মৃত্যুর নিস্তব্ধতায়।

আগের চেয়েও অনেক কম সময় বাড়ি থেকে বের হতাম। গৃহের ঐ মহাশূন্যতায় কাটিয়ে দিতাম কখনো বসে কখনো শুয়ে, তারই মাঝে ঐ মত্যুর নিস্তব্ধতা কুঁড়ে কুঁড়ে খেত আমার আত্মাকে। ঐ নিস্তব্ধতা নিজেই যেন কখনো ভয় পেয়ে যেত, পশ্চাদপসরণ করে আসত। ঐ সমস্ত সময়ে যেন কোন এক অজানা আর অপ্রত্যাশিত অভূতপূর্ব আশার আলো ঝলক দিয়ে উঠত।

এক মেঘে ঢাকা প্রভাতে, মেঘের আড়াল থেকে তখনো বেরিয়ে আসেনি সূর্যের আলো, হাওয়ার গতিও যেন ছিল শ্রান্ত! ছোটো ছোটো পায়ের পদধ্বনি আর জোরে নিঃশ্বাস ফেলবার আওয়াজে আমি অকস্মাৎ চোখ খুলে তাকালাম। সারা ঘরময় চোখ বুলিয়ে দেখলাম কিন্তু যখনই নিচের দিকে চোখ পড়ল, দেখলাম একটা ছোট্ট প্রাণী শুড় শুড় করে চলেছে এদিক ওদিক—জীর্ণ শীর্ণ, সারা গায়ে ধুলো-কাদা মাখা, অর্দ্ধমৃত, জীবনের শেষ সীমায়...

স্থির ভাবে লক্ষ্য করেই আমার হৃদপিণ্ডের স্পন্দন যেন একটি বারের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। আমি লাফিয়ে উঠলাম।

আহ-সুই! সে আবার ফিরে এসেছে।

চিচাও স্ট্রীট আমি ছেড়ে এসেছিলাম আমার বাড়িওয়ালা এবং তার পরিচারিকার বিরাগ দৃষ্টির জন্য নয়, ছেড়ে এসেছিলাম একমাত্র আহ-সুই-র জন্যই। কিন্তু আমি কোথায় যেতাম? স্বভাবতই আমি উপলব্ধি করতে পাচ্ছিলাম যে, অনেক পথ উন্মুক্ত আছে আমার জন্যে, অনেক সময় মনে হতো যেন সেই পথই প্রসারিত হয়ে আছে সামনে। যদিও আমি জানতাম না প্রথম পদক্ষেপ কোন পথে।

অনেক চিন্তার পর স্থির সিদ্ধান্তে এলাম, ঐ হস্টেলেই একমাত্র স্থান যেখানে আমি যেতে পারি। সেই পুরণো-নোংরা ঘরখানি তখনো তেমনি ছিল। সেই

একই কাঠের খাটিয়া, আধমড়া লকাস্ট গাছটা আর উইস্‌টেরিয়া লতাকুঞ্জ। কিন্তু যা আমাকে সুখ দিয়েছিল, প্রাণ দিয়েছিল, ভালোবাসা দিয়েছিল, আশা দিয়েছিল, তাই শুধু নিরুদিষ্ট। কিছু নেই, কেবলি শূন্যতা, শূন্য অস্তিত্ব আমি পেয়েছি সত্যের বিনিময়ে।

অনেক পথ উন্মুক্ত আমার সমুখে, যে কোন একটা বেছেই নিতে হবে আমাকে; কেননা এখনো বেঁচে আছি আমি। যদিও জানিনা প্রথম পদক্ষেপ নেব কেমন করে! এক এক সময় মনে হয় আমার সমুখে উন্মুক্ত পথই যেন একটা বিরাট ধূসর বর্ণ সাপের মতো, কিলবিল করছে, তীরের গতিতে ছুটে আসছে আমার দিকে। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, অপেক্ষা করি, লক্ষ্য করি ও আসছে, কিন্তু ও যেন অকস্মাৎ কোথায় বিলিন হয়ে যায় গাঢ় অন্ধকারে।

বসন্তের প্রথম দিকটায় রাতগুলো যেন কাটে না। নিষ্প্রাণভাবে আমি বসে আছি অনেকক্ষণ, হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল—আজ সকালে রাস্তায় দেখছিলাম একটা শবদেহের মিছিল, সেইটা। কাগজের মূর্তি, কাগজের ঘোড়া, এসব ছিল মিছিলের সামনে, আর পেছনে কান্নার সুর যেন বাজছিল গুঞ্জনধ্বনির মতো! আমি বুঝতে পারি কত চতুর এরা—কত সহজ এই কথাটা অনুধাবন করতে পারা।

তারপর জু-চুনের শবযাত্রার ছবিটাও ভেসে উঠল মনের পর্দায়। শূন্যতার বিরাট বোঝার ভার সে একাই বইল, প্রশস্ত ধূসর পথে চলতে চলতে দুধার থেকে বিক্ষিপ্ত প্রাণহীন দৃষ্টি আর ধিক্কার ধ্বনির মাঝখান দিয়ে।

ভূতপ্রেত বলে যদি সত্যি কিছু থাকত, সত্যি যদি নরক বলে কিছু থাকত, তাহলে নরকের বায়ুর গর্জন যতই দুর্বার হোক, আমি ছুটে যেতাম জু-চুনকে খুঁজে বের করতে, তাকে বলতে আমার অনুতাপ আর বেদনার কথা, আর চেয়ে নিতে ক্ষমা তার কাছে। নইলে নরকের ঐ বিষাক্ত বায়ু আমাকে ঘিরে ফেলবে, আমার অনুতাপ ও বেদনাকে ভীষণভাবে গিলে ফেলবে।

ঐ ঘূর্ণিঝড় আর আগুনের লকলকে শিখার ভেতর আমি জু-চুনকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে নেব, তার কাছে ক্ষমা চাইব, তাকে সুখী করতে চেষ্টা করব—

যাহোক, নতুন জীবনের চেয়েও এ জীবন শূন্যতর। সেই বসন্তকালের তেমনি দীর্ঘতর রাতগুলি। আমি তো বেঁচে আছি এখনো: তাই আবার নতুন করে শুরু করতেই হবে আমাকে। প্রথম কাজ, হৃদয়ের অনুতাপ আর বিষাদকে ব্যক্ত করা, জু-চুনের জন্য—আমার জন্যেও।

আমার কেবল কান্না সম্বল। কিন্তু জু-চুনের জন্য আমার কান্নার সুর যেন কানে লাগে সঙ্গীতের গুঞ্জনের মতো, কোন বিস্মৃতির অতল গভীরে সে ডুবে যায়।

আমি ভুলতে চাই। আমার নিজের জন্যও, যে বিস্মৃতির অতল গভীরে আমি জুন-চুনকে ডুবিয়ে দিয়েছি সেই স্মৃতিকে আর আমি স্মরণ করতে চাই না।

আবার আমি নতুন জীবন শুরু করব। সত্যকে আমার বিক্ষত হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে রাখব, নীরবে এগিয়ে যাব, বিস্মৃতি আর মিথ্যা হবে আমার পথপ্রদর্শক—

Regret for the Past
October 21, 1925

বিবাহ বিচ্ছেদ

—আরে, মু খুড়ো যে। নতুন বছরের শুভেচ্ছা নিও!

—তারপর—তোমরা কেমন আছ পা-সান? নতুন বছরে সবাই তোমরা সুখী হও এই কামনা করছি।

—তুমিও শুভেচ্ছা নিও, আই-কু। তুমিও আছ দেখছি···

—খুব ভালো হলো আজই দেখা সবার সঙ্গে, তাই না মু ঠাকুর্দা?

ম্যাগনোলিয়া ব্রিজ জেটি থেকে চুয়াঙ সু-সান ও তার মেয়ে আই-কুকে নৌকোর ভেতর নামতে দেখেই চারদিকে একটা গুঞ্জন উঠল। আরোহীদের কেউ কেউ হাত জোর করে অভিবাদন জানিয়ে কেবিনের বেঞ্চিতে দুটি আসন ছেড়ে দিল তাদের জন্যে। সবাইকে শুভেচ্ছা, প্রীতি নমস্কার জানিয়ে চুয়াঙ সু-সান বসল একটি আসনে। তার লম্বা পাইপটা হেলান দিয়ে রাখল নৌকোর এক ধারে। আই-কু বসল তার বাম দিকে, ঠিক পা-সানের মুখোমুখি, ভিএর আকৃতিতে পা দুটো সটান লম্বা ছড়িয়ে।

—শহরে যাওয়া হচ্ছে বুঝি ঠাকুর্দা? কাঁকড়া মাছের খোলসের মতো লাল রঙের মুখওয়ালা লোকটি বলল।

—শহরে যাচ্ছি না। কেমন একটু নিরুৎসাহের ভাব মু-এর কণ্ঠস্বরে। তার গাঢ় লাল রঙের মুখখানার উপর বলিরেখাগুলির জন্যেই আর কোনো ভাবের প্রকাশ ছিল না সেখানে: আমরা পাঙ গ্রামে যাচ্ছি।

আরোহীদের সবাই তখন চুপ করেছে।

—আবার সেই আই-কুর ব্যাপার বোধহয়, তাই না ? পা-সান জিজ্ঞাসা করল।

—তাই···এই ব্যাপারটা সামলাতেই প্রাণটা যাবে আমার। কম না, তিনটে বছর ধরে চলছে। আমরা আমাদের কালে কতবার ঝগড়া করেছি, আবার সেই ঝগড়া মিটিয়েও ফেলেছি। হয়েই থাকে এমনি হামেশা। অথচ দেখ না, এদের এ ব্যাপারটার একটা ফয়সালাই হয় না—

—মিঃ ওয়েইর বাড়িতেও আবার যাবেন তো ?

—তাই যাব। সালিসীর কাজ তিনি করেছেন আরও করাব। তবে তাঁর দেওয়া শর্তগুলি মানতে পারিনি সবসময়। অবশ্য কিছু এসে যায়নি ওতে। তাঁদের পরিবারের সবাই নাকি আজকে নববর্ষ উপলক্ষে একত্রিত হচ্ছে শুনলাম। এমন কি শহর থেকে সপ্তম মাস্টারও নাকি আসবে——

—ওরে বাপরে ! আবার সেই সপ্তম মাস্টার ! পা-সান তার চোখ দুটি বড় বড় করে তাকাল। সেও আসছে তাহলে ?—তা—তা—আসলে সেবার কিন্তু ওদের রান্নাবাড়িটা ভেঙে দিয়ে আমরা ঠিক শোধ নিয়েছিলাম, তাই না ? তবে আই-কুর কিন্তু আর ওবাড়িতে যাওয়া ঠিক হবে না। সে আবার তার চোখ নামিয়ে নিল।

—আমি আর যাচ্ছি না ওবাড়িতে। কেমন একটা বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে আই-কু তাকাল পা-সানের দিকে। তাদের একটু শিক্ষা দেব, তাই করছি এসব। একবার ভেবে দেখ না ! ঐ ক্ষুদে জানোয়ারটা ঐ বিধবা মেয়েমানুষটার সঙ্গে আসনাই নিয়ে মেতে ঠিক করে নিয়েছে তার নাকি আর প্রয়োজন নেই আমাকে দিয়ে ! কিন্তু ব্যাপারটা কি এতই সহজ মনে করো ? 'বুড়ো জানোয়ার' ছেলের সঙ্গে সাট করে আমাকে তাড়াবার ফন্দী করেছে ! যেন এতই সহজ সবকিছু ! আর তোমাদের ঐ 'সপ্তম মাস্টারই' বা কী ? ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে তাস খেলে বলেই কি আমাদের হয়ে দুটো কথাও বলতে পারে না ? মিঃ ওয়েইর মতো সে কি একটা গর্দভ যে কেবল বলবে সম্পর্ক ছেড়ে দাও। এ কয়টা বছর কী করে আমি কাটিয়েছি সবই বলব তাকে। দেখতে চাই কাকে সে নির্দোষ বলে !

পা-সান বুঝতে পারল, সে চুপ করে রইল।

নৌকোর ভেতরটা তখন খুবই শান্ত, কোনো শব্দ নেই। কেবল বাইরে জলের ছল-ছলাৎ আওয়াজ। চুয়াঙ সু-সান তার পাইপটা তুলে নিয়ে তামাক ভরতি করল।

তার ঠিক উলটো দিকে, পা-সানের পাশে বসা একটি মোটা মতন লোক, ট্যাক খুঁজে চকমকি পাথর বের করে চুয়াঙ সু-সানের পাইপ ধরিয়ে দিল।

—ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ। মাথা নাড়তে নাড়তে চুয়াঙ সু-সান বলল।

—যদিও আজকেই আমাদের প্রথম জানাশোনা হলো। শ্রদ্ধার সঙ্গে মোটা মতন

লোকটি বলল ঃ তবু আপনার কথা আমি শুনেছি অনেকের মুখে। হ্যাঁ তাই তো, সমুদ্রের ধার ধরে ঐ আঠারোটা গ্রামের মানুষদের কে না জানে মু খুড়োর নাম। কিছুদিন ধরে আমরাও শুনছি যে শি-দের ঐ ছেলেটা একটা বিধবার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক পাতিয়েছে। গত বছর আপনার ছয়টি ছেলে মিলে যখন ওদের রান্না-বাড়ি ভেঙ্গে নাবিয়েছিল তখন কে না তাদের সমর্থন করেছিল...সব দরজা আপনার কাছে খোলা, অনেক মানুষ আপনার পক্ষে... ওদের জন্য ভয় কিসের আপনার—

আমাদের এই খুড়ো মানুষটি সত্যি একজন বিচক্ষণ লোক। আই-কু বলল ঃ অবশ্যি উনি কে আমি জানি না।

—আমার নাম ওয়াঙ তে-কিউয়েই। মোটা লোকটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল।

—আমাকে সহজে হঠাতে পারবে না, সহজে ভবি ভুলবে না। সপ্তম মাস্টারই হোক আর 'অস্টম মাস্টারই হোক। যতদিন ওদের পরিবার শেষ না হয়ে যায়, প্রতিটা মানুষ মরে ভূত না হয়, ততদিন আমি রেহাই দেব না ওদের। মিঃ ওয়েই চার চার বার আমাকে আপস করতে বলেছেন। ঐ আপসনামার টাকার অঙ্কে কবারই বাবার মাথা ঘুরে গিয়েছে, তবুও। আই-কু বলল।

চুয়াঙ সু-সান মাথা নাড়ল।

—আচ্ছা, ঠাকুর্দা মু, সেবার গত বছর ঐ শি পরিবার মিঃ ওয়েইকে একটা ভোজ খাওয়ায়নি? ক্যাঁকড়া মুখো প্রশ্ন করল।

—কিছু আসে যায় না। ওয়াঙ তে-কিউয়েই বলল ঃ তাই বলে একটা ভোজ খেয়েই একটা মানুষ একেবারে অন্ধ হয়ে যাবে? তাই যদি হয়, একটা বিদেশী-খানা খাওয়ালে কী হবে বলো দেখি? কিন্তু যারা পণ্ডিত মানুষ, সত্যের সঙ্গে যাদের পরিচয় তারা সব সময়ই থাকবে ন্যায়ের পক্ষে। এই ধরুন, একজনকে সবাই মিলে যদি পীড়ন করে তার পক্ষে দাঁড়াবে সবাই, নয় কি? পাওয়ার কোনো প্রত্যাশা নাই বা থাকল তারা পরোয়া করবে না। আমাদের এই ছোট্ট গ্রামের অধিবাসী মিঃ ইয়াঙ এই সেদিন গত বছরের শেষ দিকে পিকিং থেকে ফিরেছেন। তিনি ঠিক আমাদের মতো নন, বাইরের দুনিয়ার অনেক কিছু দেখেছেন। তিনি বলছিলেন সেখানকার কোন এক মাদাম কুয়াঙ নাকি—

—ওয়াঙ জেটি। নৌকো নঙর করতে করতে হাঁক দিয়ে বলল নৌকোর মাঝি ঃ ওয়াঙ জেটিতে নামবার আছে কেউ?

—এই যে আমি আছি। মোটা লোকটি তার পাইপটা হাতে তুলে নিয়ে এক রকম ছিটকে কেবিনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। নৌকো পাড়ে ভিড়তে না ভিড়তেই লাফিয়ে নেমে পড়ল।

—মাপ করবেন সবাই, আমি এবার আসছি বলেই নৌকোর আরোহীদের দিকে ফিরে সে নমস্কার করল।

আবার সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে নৌকো এগিয়ে চলল। মাঝে মাঝে কেবল জলের ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ। পা-সান তখন ঝিমুতে শুরু করেছে। ক্রমে ক্রমে ঘুমের ঘোরে তার মুখ হাঁ হয়ে আসছে। সামনের কেবিনের দুই বুড়ি বুদ্ধের স্তব গাইছে আর হাতের মালা জপছে। আই-কুর দিকে তাকিয়েই অর্থসূচক দৃষ্টি বিনিময় করল দুজনে।

মাথার উপরে নৌকোর চাঁদোয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আই-কু। বুঝি ভাবছিল ঐ বুড়ো জানোয়ারের পরিবারকে সে কেমন করে ধ্বংস করবে! বাপ বেটার বাঁচবার কোনো পথ সে রাখবে না। মিঃ ওয়েইকে সে ভয় করে না। দুবার তাকে দেখেছে। কিছু নয় একটা হোঁতকা, নিজেদের গাঁয়ে এমনি লোক সে অনেক দেখেছে।

চুয়াঙ মু-সানের মুখের পাইপের তামাক তখন ফুরিয়ে এসেছে কিন্তু তার টানবার বিরাম নেই। সে জানতো ওয়াঙ জেটির পরই পাং আসবে। গ্রামের প্রবেশ মুখে মণ্ডপটি দেখা যায়। সে অনেকবার এসেছে এখানে। মিঃ ওয়েইর চেয়ে অনেক বেশী। তার মনে আছে একদিন কেমন করে তার মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এসেছিল, মনে আছে তার স্বামী আর শ্বশুরের অত্যাচারের কাহিনীর কথা। অতীতের ঘটনাগুলি এক এক করে চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। দুষ্ট লোককে শাস্তি দেবার কথা মনে করলেই তার ঠোঁটের কোণে হঠাৎ হাসি ফুটে উঠত কিন্তু এবার তা হলো না। সপ্তম মাস্টারের মেদবহুল দেহটা তার চিন্তাস্রোতের মাঝখানে এসে বাধা দিল আবার যেন সব কেমন এলোমোলা করে দিল।

বিরামহীন নিস্তব্ধতার ভেতর দিয়ে নৌকো বয়ে চলল। কেবল বুদ্ধের স্তবধ্বণি ধীরে ধীরে বাড়ছিল উচ্চ গ্রামে। সবাই যেন আই-কু আর তার পিতার মতো গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল।

—এই যে, মু খুড়ো! আমরা পাং গ্রামে এসে গেছি।

মাঝির ডাকে জেগে উঠে তাকিয়ে দেখল সামনে গ্রামের প্রবেশ পথের সেই মণ্ডপ।

চুয়াঙ লাফিয়ে তীরে নামল, পেছনে নেমে এল আই-কু। মণ্ডপ ছাড়িয়ে তারা দুজনেই মিঃ ওয়েই-র বাড়ির পথে এগিয়ে চলল। দক্ষিণ দিকে চলতে চলতে গোটা ত্রিশেক বাড়ি পেরিয়ে একটা বাঁকের মোড় ঘুরে পৌঁছল তাদের গন্তব্য স্থলে।

কালো বার্নিশ করা ফটকের ভেতর দিয়ে এগিয়ে ফটকের সিংহদ্বারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বেশ কিছু লোক, নৌকোর মাঝি, চাষি মজুর সার বেঁধে বসে সেখানে দুটো টেবিলের ধারে। আই-কু সাহস পেল না ওদের দিকে তাকাতে তবু একবার কেবল চোখ বুলিয়ে নিল। বুড়ো জানোয়ার বা ক্ষুদে জানোয়ার কেউ ছিল না সেখানে। তারাও বসল গিয়ে এক ধারে।

নতুন বছরের কেক আর এক পাত্র সুরা এনে দিল একটি ভৃত্য। কেন দিল কিছুই বুঝল না। আই-কু যেন আরো বেশী আসোয়াস্তি বোধ করতে লাগল। সে কেবলি ভাবছিল—ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে তারাতাস খেলে বলে কি আমাদের হয়ে দুটো কথাও বলতে পারবে না। যারা পণ্ডিত মানুষ নিশ্চয় তারা ন্যায় বিচার চায়। সপ্তম মাস্টারকে সব কথা আমি খুলে বলব, সেই পনরো বছর বয়সে বিয়ে হওয়ার দিন থেকে।

সুপটা শেষ করেই বুঝল এইবার সময় হয়েছে। কিছুক্ষনের ভেতরই একটি মজুর এসে ডেকে নিয়ে গেল তাকে আর তার বাবাকে। একটা বড়ো হল ঘর পেরিয়ে তারা অভ্যর্থনা করবার ঘরে গিয়ে হাজির হলো।

ঘরটা আসবাবপত্রে এমনি ঠাসা যে ঘরের ভেতর কী আছে বোঝাই মুশকিল। অনেক অতিথিকে উপস্থিত দেখল। তাদের লাল আর নীল সার্টিনের জ্যাকেট চিক্‌চিক্‌ করছিল চারদিকে। সবার মাঝখানে বসে আছে একটি লোক। দেখেই সে ধরে নিল নিশ্চয় লোকটি সপ্তম মাস্টার। যদিও মাথাটা গোল, মুখটাও তেমনি। মিঃ ওয়েইর আর অন্যান্যের চেয়েও দেখতে বড়সর। তার গোল মুখে সরু চেরা চেরা দুটো চোখ, একগোছা খাড়া খাড়া কালো গোঁফ, মাথায় টাক সত্ত্বেও মাথা এবং মুখখানা বেশ রক্তিমাভ, চিকচিকে। ক্ষনিকের জন্য আই-কু একটু হকচকিয়ে গেল। ধরে নিল নিশ্চয় লোকটা গায়ে চর্বি মেখেছে।

—এটা একরকম পাথর। প্রাচীন কালে কবরের ভেতর মৃতদেহের সঙ্গে এই পাথরের টুকরো দেওয়া হতো। (প্রচলিত বিশ্বাস, এই পাথরের টুকরো কবরের ভেতর থাকলে মৃতদেহ সহজে পচে না)

সপ্তম মাস্টার কথাটা বলতে বলতে এক টুকরো কালো রঙের পাথর তুলে ধরল তারপর সেটা তার নাকের ডগায় ঘষতে লাগল।

—এটা অবশ্য খুব হালে খুঁড়ে পাওয়া গেছে। সে বলতে লাগল: তবু রাখবার মতো বস্তু: পাথরটা হানদের সময়কালিন। (হান রাজত্বকাল ২০৬ খৃঃ পূর্ব থেকে ২২০ খৃঃ অব্দ)। ঐ দেখ পাথরটার গায়ে পারদের দাগ পর্যন্ত এখনো বর্তমান। (কবরের ভেতর যেসব পাথরের টুকরো রাখা হতো সেগুলোকে অনেক সময় পারদে ডুবিয়ে নেওয়া হতো।

দেখতে দেখতে অনেকগুলো মাথা এসে ঘিরে ধরল ঐ পাথরের টুকরোটাকে মিঃ ওয়েইর মাথাও ছিল অবশ্য। ঐ বাড়ির কয়টি ছেলেও উপস্থিত ছিল। আই-কু ওদের লক্ষ্য করেনি। কারণ ওরা ঐ সপ্তম মাস্টারের ভেলকিবাজিতে এমনি বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল যে শুকনো ছারপোকার মতো মিইয়ে গেছে সবাই।

কীসব বলেছে তার বিন্দু বিসর্গ আই-কু বোঝে নি। ঐসব পারদের দাগেও তার কোনো আগ্রহ ছিল না। এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করবার সাহসও ছিল না। তার

বদলে এই অবসরে চারদিক দেখে নেবার সুযোগ নিল। তার পেছন দিকে ঠিক দরজার ধারটায় দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল বাপ বেটা দুজনেই। এক পলক তাকিয়ে দেখল। ছয়মাস আগেও যা দেখেছিল, তার চেয়েও যেন বয়স বেড়ে গেছে দুজনেরই!
ঐ পাথরের টুকরোর কাছ থেকে সবাই সরে এল ধীরে ধীরে। মিঃ ওয়েই পাথরের টুকরোটা হাতে নিয়ে বসল একটা আসনে। চুয়াঙ মু-সানকে প্রশ্ন করল ঃ শুধু তোমরা দুজনেই এসেছ?
—কেবল আমরা দুজনেই।
—তোমার ছেলেরা কেউ আসেনি কেন?
—সময় ছিল না।
—নববর্ষের দিনে তোমাদের টেনে এনে কষ্ট দিতাম না শুধু এই ব্যাপারটা না থাকলে…তোমরা নিজেরাও নিশ্চয় এ নিয়ে হাঁফিয়ে উঠেছ। দু বছরের চেয়েও বেশি হয়ে গেল, তাই না? শত্রুতা জিইয়ে না রেখে শেষ করে দেওয়াই ভালো আমার মতে। আই-কুর সঙ্গে তার স্বামীর যেহেতু বনিবনা হচ্ছিল না, শ্বশুর শাশুড়ীও যখন আই-কুকে পছন্দ করছিল না—তোমাদের এর আগে যে পরামর্শ দিয়েছিলাম সেইটাই বরঞ্চ মেনে নাও। বিবাহ-বিচ্ছেদ করে ফেল। তোমাদের রাজী করাতে এর চেয়ে বেশী ক্ষমতা নেই আমার। তবে এই সপ্তম মাস্টার ন্যায় বিচারের পক্ষপাতী এটা তোমরা জানো বোধহয়। আমার মতই তারও মত। তবে তার মতে উভয়পক্ষকেই ছাড়তে হবে কিছুটা। সে ঐ শি'দের বলেছে মিটমাটের জন্য আরো দশ ডলার বাড়িয়ে মোট নব্বুই ডলার করতে—
— …
—নব্বুই ডলার! সম্রাটের দরবারে নিয়ে গেলেও এত সহজ শর্ত কিছুতেই পাবে না। একমাত্র এই সপ্তম মাস্টার ছাড়া আর কারো সাধ্য নেই এত সুন্দর প্রস্তাব দেবার!
সপ্তম মাস্টার তার চেরা চেরা চোখ দুটি একবার বিস্ফারিত করল চুয়াঙ মু-সান'এর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে।
আই-কু বুঝতে পারল পরিস্থিতি খুবই ঘোরালো হয়ে উঠেছে। বিস্ময়ে ভাবল এই দেশ জুড়ে সবাই তার বাবাকে শ্রদ্ধা করে। নিজের জন্যে একটি কথাও বলবে না। সে ভাবল, এই পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। সপ্তম মাস্টারের সব কয়টি কথা না বুঝলেও উপলব্ধি করতে পারল। যতটা ভয় সে কল্পনা করেছিল ততটা ভীত হবার কিছুই ছিল না তার কথায়।
—সপ্তম মাস্টার একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। কোনটা সত্য তিনি জানেন। বেশ জোর দিয়েই একান্ত সাহসের সঙ্গে আই-কু বলল ঃ আমাদের মতো গেঁয়ো লোক মোটেই না। আমার উপর যা অবিচার হয়েছে সে কথা শুনবার মতো

কেউ ছিল না। এইবার আমি সব কথা খুলে বলতে চাই। বিয়ের পর থেকেই আদর্শ স্ত্রীর মতন দিন কাটাবার চেষ্টা করেছি। যখনই ঘর থেকে বেরিয়েছি বা ঢুকেছি মাথা নুইয়ে। কখনও স্ত্রীর কর্তব্য পালনে পিছপাও হইনি। কিন্তু ওরা সবসময় আমার দোষ ধরতে শুরু করল। বাড়ির প্রতিটা লোক মরিয়া হয়ে উঠল। সেবার বেজিতে একটা মুরগি মেরে ফেলেছিল। খোপের দরজা বন্ধ করিনি বলে সব দোষ চাপাল কেন আমার ঘাড়ে? একটা নেড়িকুত্তা মুরগির খাবার খেতে দরজা ঠেলে খুলে ফেলেছিল কিন্তু ঐ ক্ষুদে জানোয়ার সাদা কালোর তফাৎ মানবে না। আমার গালে চড় মেরেছিল সেদিন—

সপ্তম মাস্টার তাকিয়ে রইল তার দিকে।

—আমি বুঝেছিলাম একটা কিছু কারণ ছিল। আই-কু বলে যেতে লাগল: সপ্তম মাস্টার এটা নিশ্চয় বুঝতে পারবেন কারণ তিনি পণ্ডিত লোক। সব কিছু জানেন। ঐ মাগী ওকে জাদু করেছিল। আমাকে তাড়িয়ে দেবে ঠিক করল। যথারীতি ধর্মীয় মতেই তো আমাদের বিয়ে হয়েছিল যৌতুকপত্র কোনো কিছুই বাদ যায়নি এরপর আমাকে ঠেলে ফেলে দেওয়া কি এতই সহজ? আমি তাদের দেখাতে চাই, প্রয়োজন হলে কোর্টে যেতেও প্রস্তুত। জেলা আদালতে যদি না হয়, আরো উপরে যাব…

সপ্তম মাস্টার সব জানে। মুখ তুলে মিঃ ওয়েই বলল: দেখ আই-কু, তুমি যদি এমনি জেদ ধরেই থাক, তোমার উপকার হবে না। তুমি একটুও বদলাওনি দেখছি। দেখ না, তোমার বাবা কত বুদ্ধিমান! তুমি তোমার ভাইরা ঠিক তার মতো হওনি কেন, এটা দুঃখের বিষয়। ধরো, ব্যাপারটা তুমি উপরালার কাছে নিয়ে গেলে কিন্তু এই সপ্তম মাস্টারের সঙ্গে তারা পরামর্শ করবেনা তুমি ভেবেছ? তখন প্রকাশ্যভাবে বিচার হবে, কাউকে দরদ দেখাবে না—তাই যদি হয়—

—প্রয়োজন হলে নিজের জীবন দিতেও আমি প্রস্তুত। দুটো পরিবার ধ্বংস হয়ে গেলেও।

—এতটা মরিয়া হতে হবে না তোমাকে, ধীর এবং শান্ত ভাবে সপ্তম মাস্টার বলল: এখনো তোমার অল্প বয়স। শান্তি রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। শান্তিই সম্পদ আনে। কথাটা সত্যি কিনা? আরো পুরোপুরি দশটা ডলার যোগ করতে বলেছি। খুব উদারতা বলতে পার। তোমার শ্বশুর শাশুড়ী যদি বলে, চলে যাও, তাহলে চলে তোমাকে যেতেই হবে। উপর আদালতের কথা বলো না; সাংহাই যাও পিকিং যাও বা বিদেশেই যাও সব একরকম। আমাকে যদি বিশ্বাস না হয়, ও'কে জিজ্ঞাসা করো। পিকিং-এর এক বিদেশী স্কুলে লেখাপড়া করেছে। তাই না? সে জিজ্ঞাসা করলো এই বাড়ির ছুঁচলো চোয়ালওয়ালা একটি ছেলের দিকে তাকিয়ে।

ছুঁচলো চোয়ালওয়ালা ছেলেটি তাড়াতাড়ি সোজা দাঁড়িয়ে বেশ নিচু গলায়

তেমনি সম্মানের সঙ্গে জবাব দিল : নিশ্চয় !

আই-কুর মনে হলো, সে যেন কোণঠাসা হয়ে গেছে। তার পিতা কোনো কথা বলতে চাইল না। ভাইদের কেউ আসতে সাহস পেল না। মিঃ ওয়েই সবসময়ই বিপক্ষে। আর সপ্তম মাস্টারও তার কাজে এল না। এমন কি ছুঁচলো চোয়াল ছেলেটিও তার যোগ্য কথাই বলল। কিছুটা বিভ্রান্ত হলেও শেষ চেষ্টা করবেই সে।

—কী? এমন কি এই সপ্তম মাস্টারও—তার চোখে বিস্ময়, হতাশা। তাই আমি জানি, আমাদের মতো এই গেঁয়ো লোকেরাও তেমনি মূর্খ। মানুষের সঙ্গে কেমন করে চলতে হবে তাও আমার বাবা বোঝে না, বুদ্ধিসুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলেছে। বুড়ো জানোয়ার-ক্ষুদে জানোয়ারকে সবকিছু সে ছেড়ে দিয়েছে। যে ব্যবস্থাই হোক নিশ্চিত তারা মেনে নেবে, যত খারাপই হোক না ক্ষুদে জানোয়ার নীরবে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ, হঠাৎ সে বলে উঠল : সপ্তম মাস্টার, একবার দেখুন একে। সপ্তম মাস্টারের সামনে দাঁড়িয়ে এমন কথা বলতেও সাহস পায়! একটা মুহূর্তও শান্তিতে থাকতে দেয়নি আমাদের। আমার বাবাকে ও বলে বুড়ো জানোয়ার আর আমাকে ডাকে ক্ষুদে জানোয়ার। আবার কখনো বলে বেজন্মা।

—কোন্ শয়তান তোমাকে বেজন্মা বলেছে বল দেখি? রাগে গড়গড় করতে করতে ঘুরে দাঁড়াল আই-কু। আবার ফিরে তাকাল সপ্তম মাস্টারের দিকে। সবার সামনে আরো দু একটি কথা বলবার আছে আমার। সবসময় ওরা অভদ্র ব্যবহার করেছে আমার সঙ্গে। সবসময় কুত্তি নোংরা মেয়েমানুষ এইসব গালাগাল দিয়েছে। ঐ বেশ্যা মেয়েমানুষটাকে নিয়ে থাকবার পর থেকে আমার বাপ ঠাকুর্দার নামে গাল দিতেও ছাড়েনি। এইবার তাহলে বিচার করুন সপ্তম মাস্টার…

হঠাৎ সে চমকে উঠল। কথাগুলো ঠোঁটের ডগায় এসেও থেমে গেল। হঠাৎ সে লক্ষ্য করল, সপ্তম মাস্টারের চোখ দুটি কেমন যেন পাক খেয়ে গেল! তার গোলগাল মুখখানা তুলে তাকাল। খড়ের আঁটির মতো একগুচ্ছ গোঁফ দিয়ে আবৃত মুখের ভেতর থেকে হঠাৎ আওয়াজ বেরিয়ে এল : এদিকে এসো…

আই-কুর বুকের স্পন্দন বুঝি একটি বারের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল! আবার দুপদাপ করতে লাগল। যুদ্ধে পরাজিত, ভাগ্য বিরম্বিত। একটি বারের ভ্রান্ত পদক্ষেপের জন্য বুঝি গভীর জলে পড়ে গেল। সে বুঝলে-এর জন্য দায়ী নিজে।

নীল গাউন এবং কালো জ্যাকেট পরা এক.ি লোক ভেতরে এল। দুটি হাত দু পাশে ঝুলিয়ে, ঠিক একটি বংশদণ্ডের মতো সোজা দাঁড়াল সপ্তম মাস্টারের সামনে।

ঘরের ভেতরটা নিস্তব্ধ। একটুও আওয়াজ নেই কোথাও। সপ্তম মাস্টার

ঠোঁট নাড়ছিলো কিন্তু কেউ শুনতে পেল না সে কী বলছিল। কেবল ভৃত্যটি শুনতে পেল। তার ঐ শক্তিশালী আদেশের ধাক্কাটা যেন ভৃত্যটির মজ্জায় ঢুকে গিয়েছিল। বার দুই তার দেহটা যেন কেমন আড়মোড়া খেয়ে গেল, জবাব দিল ঃ বহুত আচ্ছা, হুজুর।

কয়েক পা পিছিয়ে গেল। ঘুরে দাঁড়াল। তার পর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আই-কু জানতো একটা অপ্রত্যাশিত সম্পূর্ণ অজানা কিছু ঘটবে নিশ্চিত। যাকে প্রতিরোধ করবার মতো শক্তি তার নেই। এইবার সে বুঝতে পারল, এই সপ্তম মাস্টারের ক্ষমতা কতটুকু। এতদিন সে ভুল করেছে, হঠকারিতা করেছে। অকারণ কর্কশ ব্যবহার করেছে। অনুতপ্ত বোধ করল এইবার। বলতে বাধ্য হলো ঃ আমি সব সময়ই সপ্তম মাস্টারের সিদ্ধান্ত মানতে রাজী ছিলাম—

পাখির আওয়াজের মতো কোনো ক্ষীণ শব্দও ছিল না ঘরের ভেতর। সব নিস্তব্ধ। নরম তার কণ্ঠস্বর তবু বজ্রপাতের মতোই সেই কণ্ঠস্বর মনে হলো মিঃ ওয়েইর কাছে।

লাফিয়ে সম্মতিসূচক সুরে বলে উঠল সে ঃ বেশ। সপ্তম মাস্টার সত্যিকারের ন্যায় বিচারক, আর আই-কুকেও সত্যি সত্যি সুবিবেচক বলব। এ অবস্থায় মু-সান, এতে তোমার কোনো আপত্তি থাকতে পারে না নিশ্চয়। কারণ তোমার মেয়ে নিজে সম্মতি দিয়েছে। তোমাকে ওদের বিয়ের দলিলটা সঙ্গে আনতে বলেছিলাম, সেটা এনেছ বোধহয়। তাহলে উভয় পক্ষ যার যারটা দাখিল করুক।

আই-কু দেখল, তার বাবা কী হাতড়াচ্ছে! বংশদণ্ডের মতো সটান সেই ভৃত্যটি আবার ঘরে এল। কালো, ঠিক কচ্ছপের মতো কী একটা বস্তু দিল সপ্তম মাস্টারের হাতে। আই-কু ভয় পেয়ে গেল। একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে। সে তার বাবার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখল একটা নীল রঙের কাপড়ের বাণ্ডিল খুলে তার ভেতর থেকে একটি একটি করে রূপোর ডলার বের করছিল।

সপ্তম মাস্টার কচ্ছপের মাথাটা খুলে ভেতর থেকে কী একটা পদার্থ ঢেলে নিল হাতের তেলোয়। তারপর বস্তুটা আবার ফিরিয়ে দিল ভৃত্যটির হাতে। দুটো আঙুলের টিপে করে পদার্থটি নিল বাম হাতের তেলো থেকে। তারপর ঢুকিয়ে দিল দুই নাকের গর্তে। নাকের ডগা আর উপরের ঠোঁট রঞ্জিত হয়ে উঠল উজ্জ্বল হলুদ রঙে। তার নাক সুরসুরিয়ে উঠল এইবার বুঝি উঠবে হাঁচি।

চুয়াঙ মু-সান এক এক করে গুণছিল রূপার ডলারগুলি। যেগুলো গোণা হয়নি, তারই ভেতর থেকে কয়টি মুদ্রা হাতে নিয়ে মিঃ ওয়েই সেগুলো দিল ঐ বুড়ো জানোয়ারের হাতে। তারপর নীল সবুজ রঙের দলিল পালটা

পাল্টি করে ফিরিয়ে দিল যারটা তার হাতে। রেখে দাও। সে বলল। সংখ্যাটা ঠিক আছে কিনা ভালো করে দেখে নাও, মু-সান। এটা খেলার ব্যাপার নয় জানবে। এইগুলো সব রুপোর—

—হ্যাঁ—চ্চো—।

এটা সপ্তম মাস্টারের হাঁচি আই-কু বুঝতে পারল, তবু তার দিকে না তাকিয়ে পারল না। তার মুখ হাঁ হয়েছিল। নাকটা কেবলি থরথরিয়ে কাঁপছিল। দুই আঙুলের টিপের মধ্যে কিন্তু তখনো ধরা ছিল সেই হলুদ রঙের পদার্থটা, প্রাচীনকালে সমাধির মধ্যে যেগুলি রাখা থাকত। তার নাকটাকে সেই বস্তু দিয়ে কেবলি রগড়াচ্ছিল সে।

বেশ কষ্টের সঙ্গেই চুয়াঙ মু-সান টাকাগুলি গোণা শেষ করল। উভয় পক্ষই লাল সবুজ দলিল সরিয়ে রাখল। আবার যেন সবাই শান্ত হলো, স্ব স্ব অবস্থায় ফিরে এল। পূর্ণ শান্তি বিরাজিত হলো।

বেশ! ব্যাপারটা সন্তোষজনক ভাবেই মিটল শেষপর্যন্ত। মিঃ ওয়েই বলল। সবাই যেতে প্রস্তুত দেখে সে এইবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল: যাক্, আর কিছু করবার নেই। এই জটিলগ্রন্থী ছেদনের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি সবাইকে। এখন তাহলে সবাই উঠছেন, কেমন? কিন্তু আমার বাড়িতে নতুন বছরের পান-ভোজে সামিল হতে আপত্তি আছে কি আপনাদের? এরকম সুযোগ আর ঘটে কই বলুন?

—নিশ্চয় সামিল হব সবাই। আই-কু বলল। তবে এবার নয়, সামনের বছর।

—ধন্যবাদ, মিঃ ওয়েই। এক্ষুণি সম্ভব হবে না। আরো কাজ আছে আমাদের——চুয়াঙ মু সান, বুড়ো জানোয়ার, ক্ষুদে জানোয়ার, সবাই উঠল এক এক করে।

—কী, এক ফোঁটাও চলবে না, যাবার আগে আই-কুর দিকে তাকাল মিঃ ওয়েই।

—সত্যি সম্ভব নয় আজকে। মিঃ ওয়েই, অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।

The Divorco
Navember 6, 1925

(১)

বুদ্ধিমান পশুরা মানুষের মন বোঝে এটা সত্যি। মনিব বাড়ির কাছে এলেই অশ্ব তার গতি মন্থর করে, ঘাড় নিচু করে দিয়ে ধান ভানার তালে তাল মিলিয়ে দুলকি চালে এগিয়ে যায়।

একটা সান্ধ্য কুয়াশার আবরণ বিরাট বাড়িটাকে ঘিরে আছে, আর ঘন কালো ধোঁয়া বেড়িয়ে আসছে প্রতিবেশী বাড়িগুলির চিমনি দিয়ে। তখন নৈশ ভোজের সময়। অশ্বক্ষুরের আওয়াজ শুনে বাড়ির ভৃত্যগণ বেরিয়ে এল, দুহাত দুপাশে ঝুলিয়ে দিয়ে সটান হয়ে দাঁড়াল গেটের কাছে। অবসন্ন দেহে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে য়ি (Yi)* অবতরণ করতেই হাতের বলগা আর চাবুক নেবার জন্য তারা এগিয়ে গেল। গৃহদ্বারে প্রবেশপথ অতিক্রম করতে করতে সে তাকিয়ে দেখল কটিবন্ধে বিলম্বিত পূর্ণ নিষঙ্গ সদ্য আনা শরগুচ্ছ আর চর্মপেটিকায় তিনটি নিহত বায়স ও একটি মর্দিত চটক পাখি, তার অন্তর কেমন নির্জীব হয়ে গেল। কিন্তু সে এগিয়ে গেল, বুকের সঞ্চিত সাহসে ভর করে, তূণাবদ্ধ শরের ঝঙ্কার দিতে দিতে।

অন্দর আঙিণায় প্রবেশ করেই সে দেখল বর্তুলাকার গবাক্ষপথে তাকিয়ে আছে চ্যাঙ-নগো (Chang-ngo)।** সে বুঝতে পারল তার সংগৃহীত নিহত বায়সগুলি চ্যাঙ-নগোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিশ্চিত এড়ায়নি, আতঙ্কে কম্পিত হয়ে অকস্মাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ল কিন্তু পরমুহূর্তেই তাকে এগিয়ে যেতে হলো অন্দরের দিকে।

অন্দর মহলের পরিচারিকাবৃন্দ তাকে অভ্যর্থনার জন্য বাইরে এল। শরাসন আর নিষঙ্গ বন্ধনমুক্ত করে শিকার রাখবার চর্মপেটিকা সহ তারা চলে গেল। সে লক্ষ্য করল কেমন এক কৃত্রিম হাসি তাদের মুখে। হস্ত আর মুখমণ্ডল প্রক্ষালণ করে সে অন্দর মহলে প্রবেশ করল, ডাকল ঃ শ্রীমতী—

বর্তুলাকার গবাক্ষপথে তখন চ্যাঙ-নগো সূর্যাস্ত অবলোকন করছিল। মন্থরগতিতে সে ঘুরে দাঁড়াল, তার প্রীতিসম্ভাষণের কোনো প্রত্যুত্তর না দিয়ে উদাসীন দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে।

---

*য়ি (Yi) অথবা হউ য়ি (Hou yi) চীনদেশীয় উপকথার একজন শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ।

**প্রাচীন চীনদেশীয় পুরাণ মতে চ্যাঙ-নগো (Chang-ngo) একজন দেবী। তিনি য়ি'র পত্নী বলে গণ্যা। তিনি অমরত্ব প্রাপ্তির জন্য একপ্রকার ভেষজ মাদক দ্রব্য সেবন করে দেবীত্ব অর্জন করতে চাঁদের দেশে গিয়েছিলেন।

এমনি হিমশীতল আচরণে সে অভ্যস্থ ছিল কিছুদিন থেকে, অন্তত এক বছর। কিন্তু যথারীতি সে এগিয়ে গেল ভেতরে, বিপরীত দিকে অবস্থিত অতি প্রাচীন কাষ্ঠপালঙ্কের উপর বিস্তৃত শতজীর্ণ ব্যাঘ্র-চর্মের উপর উপবেশন করল। মস্তকে কেশ কণ্ডূয়ন করতে করতে বিড়বিড় করে বলল: আজকেও আমার ভাগ্যবিপর্যয়। কেবল বায়স, আর কিছু না—

—হু-ম্!

সূক্ষ্ম ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত করে চ্যাঙ-নগো আসন পরিত্যাগ করে লাফিয়ে উঠল, বেরিয়ে গেল ঘর থেকে অনুচ্চ স্বরে বলতে বলতে: আবার সেই কাকের চাটনি দিয়ে সেমই (Noodle-বাবড়ি জাতীয় এক রকম চৈনিক খাবার)। আবার সেই কাকের চাটনি দিয়ে সেমই! বলতে পার, আমি ছাড়া কে আর এই কাকের চাটনি আর সেমই খেতে চায় বছরের পর বছর? কী দুর্ভাগ্য তোমাকে বিয়ে করেছি! বছর ঘুরে কেবল কাকের চাটনি, সেমই খাচ্ছি!

শ্রীমতী ! য়ি আসন পরিত্যাগ করে দণ্ডায়মান হয়ে চলল তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ: শোন, তত খারাপ নয় আজকের দিনটা। বিনম্র কণ্ঠে বলল সে। একটা চটক পক্ষীও পেয়েছি আজকে, ওটাও দেবোখন তোমাকে⋯নুহ-সিন (Nu-hsin)! পরিচারিকাকে আহ্বান করল—চটক পক্ষীটা নিয়ে এস এখানে, দেখাও তোমার মনিবানীকে।

মৃগয়ালব্ধ বিহঙ্গ কয়টিকে তখন রন্ধনশালায় নিয়ে গিয়েছিল। নুহ-সিন ছুটে গেল চটক পক্ষীটি নিয়ে আসতে, দুই হস্ত প্রসারিত করে সে দেখাল চ্যাঙ-নগোকে।

—এইটা! হাত দিয়ে স্পর্শ করবার জন্য চোখে বিতৃষ্ণার দৃষ্টি নিয়ে চ্যাঙ-নগো এগিয়ে গেল আরও কাছে। কী বিশ্রী! তির্যক ভঙ্গীমায় বলল সে। পিষে ওটাকে একেবারে মণ্ড বানিয়ে ফেলেছ? মাংস আর আছে কৈ!

—জানি। পরাজয় মেনে নিয়ে স্বীকার করে য়ি। আমার সরাসন কত শক্তিশালী তাতো তুমি জান, আর শরমুখ কত প্রশস্ত!

—ক্ষুদ্রায়তন শর তুমি পারনা ব্যবহার করতে?

—আমার নেই। বিপুলাকার বরাহ আর ময়াল সর্পকে বিদ্ধ করতে গিয়ে⋯

—এটা কি বিপুলাকার বরাহ না বিশালকায় ময়াল সর্প?

চ্যাঙ-নগো ফিরে তাকাল নুহ-সিনের দিকে, আদেশ দিল তাকে:

—যাও, সুরুয়া রন্ধন কর গিয়ে।

তারপর প্রত্যাবর্তন করল স্ব কক্ষে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় য়ি দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে রইল সেই নির্জন ঘরে, রন্ধনশালায় জ্বালানী কাঠের ফট্ ফট্ আওয়াজ শুনছিল কান পেতে। দূরে দৃশ্যমান একটা ছোট পাহাড়ের টিলার মতো একটা বিপুলাকার শূকরের বিরাট বপু তার স্মৃতিপটে জ্বলজ্বল করে উঠল। সেদিন ঐ শূকরের উপর

শরনিক্ষেপ না করে যদি অদ্য কাল পর্যন্ত বিরত থাকত দীর্ঘ অর্দ্ধ বৎসরের জন্য মাংসের রসদ সংগৃহীত হতো, এখনি দৈনন্দিন খাদ্য অন্বেষণের তাগিদ থেকে রেহাই পেত। আর সেই বিশাল ময়াল সাপটি! কত সুস্বাদু সুরুয়া রন্ধিত হতো!

নু-য়ি (Nu Yi) প্রদীপ প্রজ্বলিত করে দিয়ে গেল। প্রদীপের ক্ষীণ রশ্মিতে সম্মুখের দেওয়ালে রক্ষিত চীনা সিঁদুর বর্ণে রঞ্জিত ধনুর্বাণ, ঘন কৃষ্ণবর্ণ শর ও চাপ, আড়ধনু, তরবারি আর ছুরিকাগুলি মিট মিট করে জ্বলছে। একবার দৃষ্টিপাত করে য়ি মস্তক অবনত করল। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। নুহ-সিন নৈশ-ভোজ-দ্রব্য নিয়ে এসেছে ততক্ষণে। খাবার মেজের মধ্যবর্তি স্থলে সাজিয়ে রাখল। বামদিকে ভর্তি পাঁচটি সেমইয়ের পাত্র? একপাত্র সুরুয়া, আর মেজের মধ্যস্থলে এক গামলা বায়স চাটনি।

ভোজন করতে করতে সেদিনকার ভোজ্যবস্তু যে প্রকৃতই সুস্বাদু আর সুখাদ্য নয় এটা স্বীকার করতে য়ি বাধ্য হলো। চোরা দৃষ্টিতে একবার সে তাকাল, চ্যাঙ-নগোর দিকে। বায়স চাটনির দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত না করে সে সেমই সুরুয়ার ভিজিয়ে নিয়ে খেতে লাগল। প্রায় অর্দ্ধ পাত্র নিঃশেষ হয়ে গেল এমনি করে। তার মুখাবয়ব বড়ো শীর্ণ বড়ো পাণ্ডুর মনে হলো য়ি-র চোখে—কি জানি কোনো অসুখ করেনি তো তার?

সেদিন তখন নিশার দ্বিতীয় যাম। কিছুটা খোস মেজাজেই জলপান করবার নিমিত্ত বিনা বাক্যে শয্যার এক কোণে উঠে বসেছিল চ্যাঙ-নগো। তারই অনতিদূরে ব্যাঘ্রচর্মের খসে-পড়া পশমগুলির উপর মৃদুচাপ দিতে দিতে অন্য একটা কাষ্ঠপালঙ্কে উপবিষ্ট ছিল য়ি।

—এই শোন! বিরোধ নিবারক কণ্ঠে বলল য়ি। মনে আছে? আমাদের বিয়ের অনেক পূর্বে, পশ্চিম পাহাড়ে গিয়ে আমি এই তিলককাটা চিতা বাঘটি শিকার করেছিলাম। অপূর্ব সুন্দর ছিল দেখতে, একটা চকচকে সোনার তাল।

এই সঙ্গে অতীতে তারা কীভাবে দিন অতিবাহিত করত তারই কথা স্মৃতিপটে উদয় হতে লাগল। ঋক্ষ মাংসের কেবল থাবা অংশ তারা গ্রহণ করত, উঁটের ককুদ ছাড়া আর কিছু ভক্ষণ করত না। বাকি মাংস গৃহের পরি-চারিকা এবং অন্যান্য পোষ্যবর্গের ভেতর বিতরণ করে দেওয়া হতো! বড় শিকার মাংস নিঃশেষিত হওয়ার পরই কেবল তারা বরাহমাংস, খরগোস আর কুক্কুট জাতীয় মাংস গ্রহণ করত। সে এতই দক্ষ তীরন্দাজ বলে খ্যাত ছিল যে, যথেচ্ছা পরিমাণ শিকার করতে সে সক্ষম ছিল।

একটা নিঃশ্বাস নির্গত হয়ে গেল তার বুক চিড়ে।

—আমি একটা পাকা হাত নিঃসন্দেহে। সে বলল। দেখছ না সারাটা অঞ্চল শিকার শূন্য হয়ে গেছে। কে জানত বলোত এই বায়সগুলি ছাড়া

আর কিছু থাকবে না !

কেমন একটা বিমর্ষ হাসির রেশ খেলে গেলো চ্যাঙ-নগোর মুখে।

—অন্যদিনের চেয়েও আজকে আমার বরাত ভালো বলব। য়ি-এর উৎসাহ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অন্তত একটা চটক পাখি পেয়েছি। জানো এর জন্যে আরও ত্রিশ, লি, দূরে যেতে হয়েছিল আজকে।

—আরও কিছু দূর যেতে পার না ?

—পারি শ্রীমতী ! আমিও চিন্তা করছি তাই। কালকে আরো ভোরে শয্যাত্যাগ করব মনস্থ করেছি। যদি তোমার নিদ্রা অগ্রে ভঙ্গ হয় আমাকে জাগ্রত করে দিও, শ্রীমতী। ক্ষুদ্র হরিণ অথবা শশক পাই কিনা দেখবার জন্য আরও পঞ্চাশ লি দূরে গমন করব স্থির করেছি—

অনায়াসলব্ধ হবে না যদিও। স্মরণ আছে তোমার, যেদিন ঐ বিরাটকায় বরাহ আর বিশাল ময়াল সর্পটি শরবিদ্ধ করেছিলাম, সেদিন আরো অনেক শিকার ছিল সেখানে ? তোমার মাতার গৃহদ্বার সম্মুখ দিয়ে কৃষ্ণবর্ণ ঋক্ষগণ অনুগমন করে ; এগুলোকে শরবিদ্ধ করতে বহুবার তিনি আমাকে আদেশ করতেন—

—সত্যি ? চ্যাঙ নগোর স্মৃতিপট থেকে বুঝি এগুলো নিশ্চিহ্ন হয়েছে ?

—কে জানত সব অদৃশ্য হয়ে যাবে এমনি করে ? একবার কল্পনা করো, কেমন করে নির্বাহিত হবে আমাদের দিন—আমি জানিনা। আমি ঠিক আছি। পুরোহিতের কাছ থেকে আমি অমৃত রসায়ন প্রাপ্ত হয়েছি, তাই পান করে আমি পারব স্বর্গে উড়ে যেতে। কিন্তু প্রথমে আমাকে চিন্তা করতে হবে তোমার কথা—সেইজন্য আগামীকল্য আরও কিছু দূরে যাব সঙ্কল্প নিয়েছি—

—হুস্ !

চ্যাঙ-নগো জলপান শেষ করল। ধীরে ধীরে শয্যা গ্রহণ করে চক্ষু মুদ্রিত করল।

ক্ষীণ প্রদীপ্ত প্রদীপের ততোধিক ক্ষীণ আলোর রশ্মিতে চ্যাঙ-নগোর অপসৃয়মাণ মুখসজ্জা চিকমিক করছিল। মুখমণ্ডলের প্রসাধন রেণু অপসৃত হয়ে গেছে অনেকাংশে। ঘনকৃষ্ণ বর্তুলাকার ছোপ ভেসে উঠেছে চক্ষুকোটরে। ভ্রূযুগলের একটি যেন কৃষ্ণতর। তবু তার মুখগহ্বর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার মতো টকটকে লাল। যদিও হাসির আভাস নেই মুখে তবু অস্পষ্ট টোল পড়েছে এখানে ওখানে তার গণ্ডদেশে।

—ওফ্ ! না-না ! একে আমি কেবল সেমই আর বায়স চাটনি খাইয়ে রাখছি কেমন করে ! এ হয় না !

লজ্জায় কুকড়ে য়ি-র আকর্ণ রঞ্জিত হয়ে উঠল।

নিশার অবসান হলো। নতুন দিনের আলো উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল। বিদ্যুতের ঝলকে য়ি তার চক্ষু উন্মিলিত করল। কক্ষের পশ্চিম দেয়ালের উপর তির্যকভাবে বিচ্ছুরিত সূর্যরশ্মি দেখে সে বুঝতে পারল ভোর হয়ে গেছে আনকক্ষণ। চ্যাঙ-নগোর দিকে দৃষ্টিপাত করল, তখনো গভীর নিদ্রায় বিভোর সর্বাঙ্গ শয্যার উপর আলুলায়িত। ঝটিতি খুবই নিঃশব্দে সে তার বস্ত্র পরিধান করে নিল। ব্যাঘ্রচর্মাসন থেকে অবতরণ করে লঘুপদে গৃহের বৃহত্তম কক্ষের দিকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। মুখ প্রক্ষালণ করতে করতে অশ্বে জিন্ পরাবার জন্য ওয়াঙ-সেঙ্ক (Wang Sheng) আদেশ দিতে নু-কেঙকে (Nukeng) নির্দেশ দিল।

এমনি ব্যস্ততার জন্যে বহু কাজের তাড়নায় অনেকদিন থেকেই সে প্রাতরাশ বর্জন করেছে। তার শিকারের পেটিকার ভেতরে পাঁচটি তাপে পাক্কত পিষ্টকখণ্ড, কটি সবুজকন্দ, আর এক পুলিন্দা শুকনো লঙ্কা রেখে সেটাকে ধনুর্বাণ-সহ নু-য়ি তার কটিবন্ধে দৃঢ়ভাবে গ্রন্থীবদ্ধ করে দিল। কটি-বন্ধনী দৃঢ়ভাবে অাঁটতে অাঁটতে হালকা পদক্ষেপে সে বেরিয়ে এল কক্ষ থেকে, অর্দ্ধপথে দেখা নু-কেঙকে বলতে বলতে ঃ

—মৃগয়ার অন্বেষণে আমি আজকে আরও দূরে যাব মনস্থ করেছি। প্রত্যা-বর্তন করতে হয়তো বিলম্ব হতে পারে। তোমাদের মনিবানী যখন প্রাতরাশ সমাপন করবেন, যখন দেখবে তিনি আনন্দোচ্ছল তাঁকে আমার ত্রুটি স্বীকার জানিও, নৈশভোজনে আমার উপস্থিতির প্রতীক্ষায় থাকতে তাঁকে বলো। ভুলে যেওনা কিন্তু—আমার ত্রুটি স্বীকারের কথা—

দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হলো সে ঘর থেকে। অশ্বজিনে উল্লম্ফন আরোহণ করে পথের দুই পার্শ্বে সারিবদ্ধ দণ্ডায়মান ভৃত্য ও পোষ্যবর্গের মাঝখান দিয়ে তড়িত বেগে অশ্ব প্রধাবিত করে নিমেষের মধ্যে ঐ গ্রাম ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সম্মুখে প্রসারিত কাওলিয়াঙ (kaoliung) গুল্মের বিস্তীর্ণমাঠ, যার উপর দিয়ে কত—দিনের পর দিন সে পথ অতিক্রম করেছে। এগুলি এবার সে এড়িয়ে গেল। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় সে জেনেছে কিছু মেলেনা এখানে। দুই কশাঘাতের পর দ্রুততম বেগে তার অশ্ব সম্মুখের পথে ধাবিত হলো, অবিরাম গতিতে ষষ্ঠ 'লি' দূরত্ব অতিক্রম করে গেল। আরও সমুখে এক ঘন অরণ্য, পরিশ্রান্ত অশ্বের শ্রম অপনয়নের জন্য সে গতি মন্থর করল। আরও দশ লি অতিক্রমণের পর তারা অরণ্যের প্রবেশ-পথে এসে পৌছল। কিন্তু সেখানে কেবলমাত্র বোলতা, প্রজাপতি, পিপীলিকা, পঙ্গপাল ব্যতিরেকে আর কিছুই নজরে এল না—পশু বা পাখির চিহ্নমাত্র নেই। এই অনাবিষ্কৃত অঞ্চল প্রথম দর্শনেই আশার সঞ্চার হয়েছিল।

শৃগাল বা শশক মৃগয়া হয়তো বা সম্ভব, কিন্তু সে অনুধাবন করতে পারল এও এক অলস স্বপ্ন। অরণ্যের অভ্যন্তর থেকে বহির্গমন করে সে দেখল সম্মুখে সবুজ 'কাওলিয়াঙ'-এর আরও একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তর। আর দূরে তারই ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে দুটো একটা মাটির ঘর। সুগন্ধ মলয়ানিল প্রবহমান, সূর্যের কিরণ ঈষদুষ্ণ, চটকপক্ষী আর বায়স কণ্ঠশব্দেরও কোনো চিহ্ন নেই।
—জাহান্নামে যাও! মনের আবেগ লাঘব করতে গর্জে উঠল সে। আরো কিছুদূর অগ্রসর হবার পর আনন্দে হৃদ্‌পিণ্ড নেচে উঠল। দূরে একটা মাটির ঘরের বহিরাঙ্গনে সে দেখল একটা কুক্কুট দাঁড়িয়ে। প্রতি পদক্ষেপে খুঁটে খুঁটে খেতে দেখে বিরাটকায় কপোতসদৃশ মনে হলো পাখীটাকে। সে তার শরাসন তুলে নিল। একটা তীর যোজনা করে যথাশক্তি নিক্ষেপ করল লক্ষ্যের দিকে। নিক্ষিপ্ত শর উল্কাবেগে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে প্রধাবিত হলো। বিনা দ্বিধায়, কারণ লক্ষ্যভ্রষ্ট সে হয়নি কোনদিন, মৃগয়া উদ্ধারের সঙ্কল্পে নিক্ষিপ্ত শরের পশ্চাৎ দ্রুতবেগে ধাবমান হলো। কিন্তু সমীপবর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক বৃদ্ধা তড়িৎ গতিতে ছুটে আসছিল তার দিকে। শরবিদ্ধ কপোতকে তুলে নিয়েছিল তার হাতে। সে চিৎকার করছিল ঃ কে গো তুমি? কেন তুমি আমার অণ্ডপ্রসবিনী কৃষ্ণা কুক্কুটিকে হত্যা করলে? আর কিছু পেলে না তুমি?...
য়ি-র বুকের স্পন্দন বুঝি স্তব্ধ হয়ে এল ক্ষণিকের জন্য। সে অকস্মাৎ অশ্বের গতি নিবৃত্ত করল।
—কী বললে? তোমার কুক্কুটী? সে প্রতিধ্বনিত করল। আমি ভেবে-ছিলাম এটা বনা কুক্কুটী।
—তুমি কি অন্ধ? চত্তারিংশতম বর্ষ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই?
—তা ঠিক। পঞ্চচত্তারিংশতম বর্ষ বয়স ছিল গত বৎসর।
—বৃদ্ধ গর্দভের চেয়ে গর্দভ বুঝি আর কিছু হয় না, লোকে বলে! একটা জলজ্যান্ত পোষা কুক্কুটীকে বলে কিনা বুনো কুক্কুটী। তা তুমি কে বট বাছা?
—আমার নাম য়ি। বলতে বলতে সে লক্ষ্য করে দেখল তার নিক্ষিপ্ত বাণ কুক্কুটীর বক্ষ বিদীর্ণ করে জীবনের তাৎক্ষণিক অবসান ঘটিয়েছে। অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করতে করতে তার নামের উচ্চারিত শব্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান তার শ্রান্ত কণ্ঠের স্বরও বুঝি মিলিয়ে গেল।
—য়ি! কই, এ নাম তো শুনিনি কখনো? বৃদ্ধা উঁকি দিয়ে দেখল তার মুখের দিকে।
—এমন লোকও আছে যারা আমাকে জানে। সেই মহান নৃপতি ইয়াও-এর সময়ে আমি বন্য বরাহ আর বৃহৎ সর্প শরবিদ্ধ করতাম...
—হুম্‌! তুমি মিথ্যেবাদী। ও তো লর্ড ফেঙ মেঙ (Lord Feng Meng)*

*য়ি'র একজন শিষ্য, এবং একজন বিখ্যাত তীরন্দাজ। এখানে কাও চাঙ-হুঙ

বা অন্য কেউ। তুমি হয়তো তাদের সঙ্গে ছিলে। কিন্তু নিজে করেছ এ বাহাদুরী নিচ্ছ কেমন করে? লজ্জা করে না?

—তুমি কিছু জানো না। ঐ ফেঙ মেঙ লোকটা আমার পশ্চাৎ নিয়ে চাটুবৃত্তি অবলম্বন করছে আজ কয়েক বৎসর ধরে। আমরা একসঙ্গে কাজ করিনি কখনো। ঐ বন্য বরাহ আর বৃহৎ সর্প মৃগয়ায় কোনো হাত ছিল না তার।

—তুমি মিথ্যেবাদী। সবাই তো বলছে ও ছিল সে সময়। মাসে চার পাঁচবার আমি শুনে থাকি এ কথাগুলো।

—বেশ, মেনে নিলাম। এবার এসো, কাজের কথা হোক এখন। এই কুক্কুটীর ব্যাপারে কী করতে চাও?

—তোমাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আমার সবচেয়ে সেরা পাখি ছিল ওটা। প্রতিদিন একটা করে ডিম দিত। দুটো নিড়ানি আর তিনটা টকু' চাই এর বিনিময়ে।

—আমার দিকে তাকিয়ে দেখ, আমি কৃষকও নই কাটানিও নয়। নিড়ানি আর টকু' আমি পাব কোথায়? মুদ্রাও নেই, মাত্র তাপে পক্কিত পাঁচটি পিষ্টক আছে আমার কাছে, সেগুলো সাদা ময়দায় তৈরি। তোমার ঐ কপোতের বিনিময়ে এই পাঁচ খণ্ড পিষ্টকের সঙ্গে পাঁচটি সবৃন্ত কন্দ আর এক পুলিন্দা পক্ক লঙ্কা দেব তোমাকে। বলো, স্বীকৃত?

চর্মপেটিকার ভেতর থেকে একহাতে পিষ্টক খণ্ড নিয়ে আর এক হাতে তুলে নিল পাখিটাকে।

সাদা আটার পিষ্টকে বৃদ্ধার অরুচি ছিল না, কিন্তু সে চাইল পনেরটি। কিছুক্ষণ দর-কষাকষির পর রফা হলো দশটিতে। বাকি পাঁচটি আগামী-কল্য দ্বিপ্রহরে পেঁাছে দেবে, অঙ্গিকারাবদ্ধ হলো য়ি, তার তীরগুলি জামিন রাখল। তারপর শান্তমনে মৃত কুক্কুটীকে চর্মপেটিকায় তুলে নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করল। অশ্ব ধাবিত হলো গৃহাভিমুখে। যদিও ক্ষুধায় কাতর তবু সে তৃপ্ত, আনন্দিত। পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, তারা পাখির সুরুয়ার স্বাদ পায়নি।

অরণ্যের অভ্যন্তর থেকে নির্গমন করতে করতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। গৃহে প্রত্যাবর্তনের ব্যগ্রতায় সে তার হস্তধৃত কশা সতেজে আস্ফালন করল। তার অশ্বও তখন অবসন্ন। অতি পরিচিত কাওলিয়াঙ প্রান্তরে এসে পেঁাছুতে সূর্য অস্তোন্মুখ। অতিদূরে কার একটা ছায়ামূর্তির আভাস সে পেল, সেই মুহূর্তেই

নামে একজন তরুণ লেখকের প্রতি বিদ্রূপ কটাক্ষ করা হয়েছে—ইনি লু সুনের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে গুরুর বিরুদ্ধ সমালোচনায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত করেছিলেন। ফেঙ-মেঙ কর্তৃক য়ি'কে আক্রমণের গল্প লু-সুনকে কাও-এর আক্রমণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বায়ুস্তর ভেদ করে একটা বাণ তড়িত বেগে ছুটে এল তার দিকে।

বলগা-আকর্ষণে অশ্বের দুলকি গতি নিয়ন্ত্রিত না করেই য়ি তার শরাশনে শর যোজনা করল, তড়িত বেগে ধাবিত হলো সেই নিক্ষিপ্ত শর। ঝিং! দুই তীরের ফলার এক তীব্র সংঘর্ষ, আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ল চারদিকে, দুটি ফলা একসঙ্গে উর্দ্ধাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়ে একটা ত্রিকোণের সৃষ্টি করে অবতীর্ণ হলো ভূমিতে। দুটো মানুষ মুখোমুখি হয়েই আবার সেই তীর ক্ষেপণ, মধ্যাকাশে আবার তেমনি শর-সংঘর্ষ। এমনি সংঘর্ষ ঘটল একবার নয়, দুই বার নয়, নয় বার ; য়ির তূনীর তখন শূণ্য। সে দেখল তার মুখোমুখি বিপক্ষে দণ্ডায়মান ফেঙ মেঙ, তার কণ্ঠদেশ লক্ষ্য করে তীর যোজনায় উন্মুখ, তার মুখে সানন্দ বিদ্রূপের হাসি।

—তাই তাই! ভাবল য়ি।—আমার ধারণা ছিল ফেঙ মেঙ সমুদ্র তীরে মৎস্য শিকারে গেছে। এমনি নোংরা কাজে ব্যাপৃত ছিল তাতো বুঝি নি! এইবার বুঝতে পারছি ঐ বুড়ি কেন বলছিল এইসব কথা···

তার শত্রুর শরাসন পূর্ণচন্দ্রের আকৃতি ধারণ করে যে শর নিক্ষেপিত করেছিল সেই শর বায়ুস্তর ভেদ করে তড়িত বেগে প্রধাবিত হলো য়ি'র কণ্ঠদেশ লক্ষ্য করে। হয়তো লক্ষ্য নির্ভুল ছিল না ; তীর বিদ্ধ হলো তার মুখের উপর। অশ্বপৃষ্ঠ থেকে স্খলিত হয়ে কেমন অসাড় দেহে সে গড়িয়ে পড়ল ভূমিতে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তার অশ্ব।

য়ি-কে মৃত মনে করে ফেঙ মেঙ নিঃশব্দ চরণে ধীরগতিতে প্রস্থানোদ্যত হলো। যেন বিজয়ের আনন্দসুধা পানে পরিতৃপ্ত হাসি হাসতে হাসতে সে স্থিরদৃষ্টিতে একবার তাকাল শবদেহের মুখের দিকে।

তার স্থির নিবদ্ধ বিলম্বিত দৃষ্টির সমুখে কিছুক্ষণের মধ্যেই য়ি চক্ষু উন্মেলিত করল এবং উঠে বসল।

—আমার নিকট থেকে শতাধিক প্রশিক্ষণ নিয়েও দেখছি কিছুই তুমি আয়ত্ত করতে পারনি। নিক্ষিপ্ত শর মুখগহ্বর থেকে উদগীরণ করে য়ি অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল। নিক্ষিপ্ত শর আমি গলাধঃকরণ করতে পারি তুমি জানতে না? অত্যন্ত দুঃখের কথা। জেনে রেখো, এইসব ছলচাতুরীতে কোনো ফসল তুমি তুলতে পারবে না। গুরুর কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্র দিয়েই গুরুকে বধ করা যায় না। নিজস্ব কিছু উদ্ভাবন করতে হবে তোমাকে।

—আপনার নিজের মূল্যে মূল্য ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম আপনাকে। বিজয়ী মন্তব্য করল অস্পষ্ট কণ্ঠে।

—তুমি কেবল প্রবচন উদ্ধৃতি দিচ্ছ, ফেঙ মেঙ। য়ি বলল ঃ ঐসব বৃদ্ধাদের তুমি প্রতারিত করতে পার, কিন্তু আমাকে প্রবঞ্চিত করতে পারবে না, আমার উপর কিছু চাপাতে পারবে না। মৃগয়ার পথে আমি জীবন অতিবাহিত করে এসেছি, দস্যুবৃত্তির পথে নামি নি তোমর মতো···

চর্ম মঞ্জুষার ভেতর নিহত কুকুটী পিষ্ট হয়ে যায়নি দেখে সে আশ্বস্ত হলো, পুনরায় অশ্বারূঢ় হয়ে ধাবিত হলো।
—জাহন্নামে যাও… ! একটা বর্ষিত অভিশাপ ছুটে গেল তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ।
—ভাবতেও কেমন লাগে, এত অধোগতি হয়েছে…বয়সে এত তরুণ, আর তারই মুখে অভিশাপের বুলি ! অবাক হবার কিছু নেই, বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি প্রতারিত হয়েছিল কেন।
অতি দুঃখে মস্তক আন্দোলিত করে য়ি আবার আপন পথে অগ্রসর হতে লাগল।

॥ ৩ ॥

ফাওলিয়াঙ প্রান্তরের শেষ প্রান্তে উপনীত হবার আগেই নিশার অন্ধকার নেমে এল। সারা ঘন নীল আকাশ জুরে নক্ষত্র প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল, আর পশ্চিম আকাশে সান্ধ্য তারকা সেদিন এক অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিমান। প্রান্তরের মাঝে মাঝে আলবাল পথ ধরে অশ্ব তার পথ করে নিল। অবসন্ন দেহে প্রতিটা পদক্ষেপ যেন স্তিমিত মন্থর। দিকচক্রবাল রেখায় চাঁদের রুপালি আলো বিচ্ছুরিত হতে শুরু করেছে ততক্ষণে।
—জাহান্নামে যাক্‌গে। তার পাকস্থলীর ভেতর গুরুগুরু আওয়াজ শুরু হয়েছে। য়ি ধৈর্য হারিয়ে ফেলল। জীবনধারণের জন্য যত কঠিন চেষ্টা করি, ততই যেন সব কষ্টকর হয়ে উঠে আমার জন্যে। তালগোল পাকিয়ে যায়।
সে তার অশ্বকে ত্বরান্বিত করল, কিন্তু পশ্চাৎদেশ একবার আন্দোলিত করে অবসাদক্লিস্ট অশ্ব তেমনি শ্লথগতিতে দুলকি চালে অগ্রসর হতে লাগল।
—এত বিলম্ব হয়ে গেল ! চ্যাঙ নগো নিশ্চিত রুষ্ট হবে। সে ভাবতে লাগল। ক্রোধে না ফেটে পড়ে ! তবু রক্ষে এই কুক্কুটী আছে তাকে খুশী করতে। তাকে বলব, শ্রীমতী, আমি দুইশত লি দূরে গিয়েছিলাম, তবেই এটা পেয়েছি তোমার জন্যে। না, এটা ঠিক হবে না, একটু দাম্ভিক শোনাবে কথাটা। খুবই আনন্দের কথা, সে দেখল সম্মুখে আলো জ্বলছে, মনের উদ্বিগ্নতা দূর হয়ে গেল। বিনা ইঙ্গিতেই শুরু হলো অশ্বের স্বচ্ছন্দ ধাবন। একটা গোলাকৃতি তুষার-শুভ্র চাঁদের আলো তার সম্মুখের সবটা পথকে প্লাবিত করে দিয়েছে। হিমশীতল বায়ু তার তপ্ত গণ্ডদেশে স্নেহ স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে গেল। বৃহৎ মৃগয়ার পর গৃহপ্রত্যাবর্তনেও বুঝি এমনি তৃপ্তি পায়নি কোনোদিন।
অশ্ব স্বেচ্ছায় একটা আবর্জনা স্তূপের সন্নিকেটে এসে দাঁড়াল। প্রথম নজরেই কেমন একটা গণ্ডগোলের আভাস পেল য়ি। গৃহাভ্যন্তরে চতুর্দিকে সব যেন এলোমেলো, কেমন বিশৃঙ্খল। একমাত্র চাও ফু (Chao Fu) তাকে অভ্যর্থনা করতে গৃহাভ্যন্তর থেকে বহির্গত হয়ে এল।
—কী ব্যাপার? ওয়াঙ সেঙ (Wang sheng) কোথায় ? সে প্রশ্ন করল।

—মনিবানীর অন্বেষণে ইয়াওদের বাড়িতে গেছে।

—কী ? তোমাদের মনিবানী ইয়াওদের বাড়ি গেছে ? হতবুদ্ধিতে অশ্ব থেকে অবতরণ করতেই যেন সে অসমর্থ হলো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। চাও অশ্বের বলগা এবং কশা ধরে নিল নিজ হাতে। য়ি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে গৃহদ্বার অতিক্রম করল। ক্ষণিক চিন্তার পর ঘুরে দাঁড়াল।

—অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে কোনো সরাইখানায় যাননি তুমি ঠিক জানো ? সে বলল।

—আজ্ঞে না। আমি তিনটি সরাইখানাতেই খোঁজ করেছি। তিনি সেখানে যাননি।

চিন্তার ভারে অবনত শিরে য়ি গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। চারজন অন্দরমহলের পরিচারিকা অস্থির চিত্তে বৃহৎ কক্ষের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল। বিস্ময়ে হতবাক য়ি চিৎকার করে বলে উঠল : কী ? তোমরা সবাই এখানে ? তোমাদের মনিবানী ইয়াওদের গৃহে কখনও তো একা যান না।

তারা নির্বাক তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপর তার ধনু, তূনীর আর কুক্‌কুটী সহ চর্ম মঞ্জুষা গ্রহণ করল তার কাছ থেকে। একটা মুহূর্তের জন্য কেমন এক আতঙ্কিত শিহরণ সে অনুভব করল তার সূক্ষ্মতম ধমনীগুলিতে। কল্পনা করো, ক্রোধের বশে চ্যাঙ নগো আত্মহত্যা করেছে ?

চাও ফুকে ডেকে আনতে নু বেঙকে নির্দেশ দিল। গৃহের পশ্চাৎভাগে অবস্থিত পুষ্করিনী এবং বৃক্ষরাশী তল্লাশ করতে বলল।

নিজের কক্ষে প্রবেশ করে সে বুঝতে পারল তার সকল অনুমান মিথ্যা। কক্ষের ভেতরে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া বিশৃঙ্খল সবগুলো সিন্দুক পেটিকা উন্মুক্ত, শয্যার পশ্চাৎভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বুঝতে পারল জহরত পেটিকাও নিরুদ্দেশ। অনুভব করল যেন কেউ শীতল জলে তার সর্বাঙ্গ সিঞ্চিত করে দিয়েছে। স্বর্ণ বা হীরা জহরতের কোনও মূল্য ছিল না তার কাছে। কিন্তু পুরোহিতের নিকট থেকে প্রাপ্ত অমৃত রসায়নও যে ছিল ঐ পেটিকায় : দু চার বার কক্ষের অভ্যন্তরে পরিক্রমা করবার পর সে দেখল ওয়াঙ সেঙ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।

—হুজুর, আজ্ঞে ! আমাদের মনিবানী ইয়াওদের গৃহে যান নি। তাঁরা আজকে মাহ-জং খেলছেন না।

য়ি একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইল, কোনও বাক্যস্ফুরিত হলো না।— ওয়াঙ সেঙ প্রত্যাগমন করল।

—হুজুর, আমায় ডেকেছেন ? ভেতরে প্রবেশ করতে করতে বলল চাও ফু। য়ি মাথা নেড়ে প্রস্থান করতে ইংগিত করল।

কক্ষ পরিক্রমা এমনি চলতে লাগল কিছুক্ষণের জন্যে, তারপর বৃহৎ কক্ষে

প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করল। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল সম্মুখের দেওয়ালে বিদ্যমাণ চীনা সিঁদুর বর্ণে, রঞ্জিত ধনুর্বাণ, ঘন কৃষ্ণবর্ণ শর ও চাপ, আড়ধনু, তরবারি আর ছুরি। কিছুক্ষণ চিন্তার পর অনতিদূরে অপেক্ষমাণ পরিচারিকাদের নীরস কণ্ঠে ডেকে বলল : কোন সময় তোমাদের মনিবানী নিখোঁজ হলেন ?

—যখন প্রদীপ জ্বালিয়ে ঘরে এসেছিলাম তখনই দেখতে পাইনি। নু-সিন বলল। কিন্তু তাকে বাইরে যেতেও কেউ দেখেনি।

—ঐ পেটিকায় যে রসায়ন ছিল তা নিতে দেখেছ তাকে ?

—না, হুজুর। কিন্তু বিকেলের দিকে তিনি পানীয় জল চেয়েছিলেন আমার কাছে।

আতঙ্কে অভিভূত য়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। তার সন্দেহ ঘনীভূত হলো, সে আজ পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ, একা !

—আকাশের দিকে কিছু উড়ে যেতে দেখেছ ? সে প্রশ্ন করল।

—ওহ্ ! নু-সিনের হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটা কথা। আমি যখন প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে এসেছিলাম, দেখলাম একটা কৃষ্ণবর্ণের ছায়া উড়ে গেল এই পথ দিয়ে। স্বপ্নেও ভাবিনি আমাদের মনিবানী। তার সারাটা মুখমণ্ডল পাণ্ডুর হয়ে গেল।

—তাহলে তাই, আর কোনও সন্দেহ নেই। দুই জানুর উপর ভর দিয়ে সে লাফিয়ে উঠল। বহির্গমনে উদ্যত হয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল, বলল নু-সিনকে : ছায়াটা কোন দিকে গেল ?

নু-সিন অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখিয়ে দিল। সে দিকে তাকিয়ে সে শুধু দেখতে পেল আকাশের গায় সেই গোলাকৃতি তুষার-শুভ্র চাঁদ, আর তারই গায় চাঁদের মণ্ডপ আর অস্পষ্ট বৃক্ষ ছায়া। সেই শৈশবকালে চাঁদের দেশের মনোরম নৈসর্গিক চিত্রের কত সুন্দর গল্প ঠাকুরমা বলতেন ; সেইসব রূপকথার বিবরণের অস্পষ্ট স্মৃতি এখনও ভাসছে মনের পটে। নীলকান্তমনি সদৃশ নীল সমুদ্রের ভাসমান চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার সর্বাঙ্গ যেন অসাড় হয়ে এল।

একটা প্রচণ্ড রোষ তাকে পেয়ে বসল। এমনি তীব্র ক্রোধের উত্তেজনায় প্রাণী হত্যা করবার একটা প্রবৃত্তির জন্ম হলো তার ভেতরে। মস্তক থেকে উদগত দুই চক্ষু নিয়ে সে গর্জন করে উঠল উপস্থিত পরিচারিকাদের লক্ষ্য করে :

—আমার সেই শরাসন নিয়ে এস। যা দিয়ে আমি একদিন সূর্যকে শরবিদ্ধ করেছিলাম ! আর তিনটি শর !

নুয়ি এবং নু-ফেঙ প্রকাণ্ড গাণ্ডিব সদৃশ শরাসন নামিয়ে আনল বৃহৎ কক্ষের মাঝখানে। তিনটি তীর সহ শরাসন তুলে দিল তার হাতে।

এক হস্তে গাণ্ডিবতুল্য কোদণ্ড ধারণ করে অপর হস্তে পরপর শর যোজন

করল তারই জ্যায়ে। তারপর কোদণ্ডে টঙ্কার দিল চন্দ্রকে লক্ষ্য করে! দণ্ডায়মাণ পর্বতের মতো অটল, দুই চক্ষু দিয়ে বিচ্ছুরিত বিদ্যুতের চমক, আকাশে উড্ডীয়মাণ ঘনকৃষ্ণ পাবক শিখার মতো বিলম্বিত শ্মশ্রু আর কেশরাশি, সব নিয়ে একটি মুহূর্তের জন্য আবার তাকে মনে হলো যুগ যুগ অতীতে সূর্যকে যে শরবিদ্ধ করেছিল সেই মহানায়কের মতোই।
ক্ষেপণের একটা তীক্ষ্ণ শব্দ, মাত্র একটি। তিনটি শর জ্যাযুক্ত হলো একের পর এক, এমনি দ্রুত গতিতে যা দৃষ্টিতে অদৃশ্য শ্রুতিতে অশ্রুত। নিক্ষিপ্ত শরবিদ্ধ করতে পারত চন্দ্রপৃষ্ঠের একই নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে, কারণ কোন পরিমাণ ব্যবধান না রেখেই নিক্ষিপ্ত হয়েছিল একের পর একটি শর। কিন্তু লক্ষ্য স্থির নিশ্চিত হবার মানসে প্রতিটা ক্ষেপণে ছিল এমনি ভিন্ন গতি নির্দেশ যেন প্রক্ষিপ্ত শর বিদ্ধ হয় এক একটা ভিন্ন বিন্দুতে, যেন তিনটি ক্ষত সৃষ্টি করে চন্দ্রপৃষ্ঠে।
পরিচারিকাবৃন্দ আর্তনাদ করে উঠল। তারা দেখল আকাশের চাঁদটা বুঝি কম্পিত হয়ে উঠল, মনে হলো বুঝি আকাশচ্যুত হয়ে পড়বে মুহূর্তেই—কিন্তু না, চাঁদ স্থির অচঞ্চল রইল তখনও, প্রশান্ত আরও উজ্জ্বলতর, আবার তেমনি অক্ষত।
মস্তক পশ্চাৎদিকে আন্দোলিত করে য়ি একটা অভিশাপ বাণী নিক্ষেপ করল আকাশের দিকে। সে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল, প্রতীক্ষায় রইল। কিন্তু চাঁদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই! য়ি সম্মুখে ত্রিপদ অগ্রসর হলো, সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ ত্রিপদ পশ্চাৎ অপসৃত হলো। সে তিন পা পশ্চাৎ অপসরণ করল, আর চাঁদ সম পদক্ষেপে আগুয়ান হলো।
পরস্পরের দিকে তারা নীরবে তাকিয়ে রইল।
উদাস অবসন্ন মনে য়ি তার ধনুকবৃত্তে কক্ষের দ্বারদেশে হেলান দিয়ে রেখে কক্ষের ভেতরে প্রবেশ করল। পরিচারিকাবৃন্দ অনুসরণ করল তাকে।
আসন গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।
—এইবার থেকে তোমাদের মনিবানী চির আনন্দ উপভোগ করবেন। য়ি বলল। কিন্তু আমাকে নিঃসঙ্গ রেখে তিনি একা ঐ চাঁদের দেশে গমন করতে পারলেন কেমন করে? আমি কি খুবই বৃদ্ধ হয়েছি? এই তো মাত্র মাসেক আগে তিনি বলছিলেন, তুমি বৃদ্ধ হওনি, কথাটা চিন্তা করাও মানসিক বিকার।
—এ হতে পারে না। নু-য়ি বলল। সবাই এখনও আপনাকে একজন বীর যোদ্ধা বলেই জানে হুজুর!
—কখনও মনে হয় আপনি একজন শিল্পী। নু-সিন বলল।
—সব অর্থহীন। বলল য়ি। আসল কথা ঐ সেমই আর বায়স চাটনি

অখাদ্য অসহ্য হয়ে উঠছিল তাঁর কাছে। ওগুলো খেতে পারেনি বলে দোষ দেব কেমন করে তাঁকে...

—ঐ ব্যাঘ্রচর্মের একটা দিক অব্যবহার্য হয়ে উঠেছে। পায়ের দিকটায় কিছুটা কেটে নিয়ে আমি ওটাকে মেরামত করে দেব। বলতে বলতে নু-সিন অন্দরে যেতে উদ্যত হলো।

—দাঁড়াও। বলল য়ি, কী একটা ভাবল। এর জন্য ত্বরান্বিত করবার প্রয়োজন নেই। আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত। যাও, লঙ্কা চূর্ণ দিয়ে এক পাত্র কুকুটী মাংস রন্ধন করে নিয়ে এস এক্ষুণি। এরপর আমি নিদ্রা যাব। আগামী কল্য আর এক পাত্র অমৃত রসায়ণ দিতে বলব ঐ পুরোহিতকে, যাতে আমিও তাঁকে অনুসরণ করতে পারি। আর আমার অশ্বকে আরও চার পাত্র সিমের দানা দিতে ওয়াঙ সেঙ আর নু-ফেঙকে বলো।

The Flight to the Moon
December 1926

॥ অস্ত্রসজ্জা ॥

(১)

মেই চিয়েন চিহ্ (Mei Chien Chih) মায়ের পাশে সবে শুয়েছে। অমনি চাটু ঢাকবার কাঠের ঢাকনাটা ইঁদুরে কাটবার খুট্‌খুট্ আওয়াজ! অসহ্য ঠেকে আওয়াজটা। তাড়া খেয়ে ক্ষণিকের বিরতি, কিন্তু সব বিফল, আবার সেই মনের আনন্দে কচ্‌মচ্ কচ্‌মচ্। জোরে আওয়াজ করে তাড়া করতে সাহস পায় না, মায়ের ঘুম ভাঙবে, সারাদিনের খাটুনির পর বালিশে মাথা ছুঁয়েই ঘুমে বিভোর।

অনেকক্ষণ পর চারদিক নিস্তব্ধ। ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে একটা আচমকা আওয়াজ শুনে চমকে উঠে। হঠাৎ কানে এল মাটির হাঁড়িতে নখের আঁচড়ের খর্‌খর্ শব্দ।

—বেশ হয়েছে। এবার ডুবে মরো! সে ভাবল মনের উল্লাসে। উঠে বসল নিঃশব্দে।

বিছানা থেকে নেমে চাঁদের আলোতে পথ খুঁজে সে গেল ঘরের দোর পর্যন্ত আগুনের শলাকা হাতড়ে নিয়ে এক টুকরো পাইনের ডাল জ্বালিয়ে জলের পাত্রটায় খুঁজে দেখল। ঠিক, একটা কেঁদো ইঁদুর পাত্রের ভেতরে। জল একদম তলায়, উঠে আসতে পারছে না। কেবল চারদিক ঘুরে সাঁতরাতে

সাঁতরাতে হাঁড়ির গায় আঁচড় কাটছে।

—আক্কেল হয়েছে। সে উল্লসিত হয়ে উঠল।

এগুলোই তাহলে চেয়ার টেবিল আঁচড়ে কামড়ে প্রতি রাত্তিরে তার ঘুম নষ্ট করছে। মজা দেখবার জন্য হাতের মশালটাকে মাটির দেওয়ালের একটা ফুটোতে বসিয়ে দিল। জন্তুটার খুদে খুদে ডেলা ডেলা চোখ, দেখলেই যেন কেমন গা গুলিয়ে ওঠে। একটা শুকনো নলখাগড়া কুড়িয়ে নিয়ে জলের তলায় ডুবিয়ে দিল ইঁদুরটাকে। কিছুক্ষণ বাদে নলটা তুলে নিতেই জলের উপর ভেসে ওঠে ইঁদুরটা। আবার চারদিকে সাঁতরে সাঁতরে আঁচড়াতে থাকে হাঁড়িটার গায়ে। কিন্তু এবার যেন একটু নির্জীব। চোখ দুটো জলের তলায়, ভেসে আছে কেবল ছুঁচলো নাকের টুকটুকে লাল ডগাটা, প্রাণপণে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

লাল নেকো মানুষদের সে পছন্দ করত না। তবু আজকে এই খুদে প্রাণীটার টুকটুকে লাল নাকের ডগাটা দেখতে কেমন যেন করুণ। হাতের নলটা দিয়ে পেটের দিকটায় আবার চেপে ধরল ইঁদুরটাকে। নলটা জাপটে ধরে একটু দম নিয়ে প্রাণীটা উঠতে চাইল উপরের দিকে। ইঁদুরটার কেঁদো শরীর, ছপছপে ভেজা কালো লোম, স্ফীত উদর, আর কেঁচোর মতো দেখতে একটা ছোট্ট লেজ দেখেই আবার তার গা-টা কেমন ঘিন ঘিন করে উঠল। নলটায় সজোরে ঝাকুনি দিতেই চারদিকে জল ছিটিয়ে, হাঁড়ির ভেতর আবার পড়ে গেল ইঁদুরটা। জলে ডুবিয়ে দিতে বার বার আঘাত করতে লাগল খুদে প্রাণীটার মাথায়।

এক এক করে ছয়টা পাইন ডালের টুকরো পুড়ল। পরিশ্রান্ত ইঁদুরটা তখন হাঁড়ির মাঝখানটায় আধা ডুবন্ত ভাসছে, মাঝে মাঝে জলের উপর পুরোপুরি ভেসে উঠবার তার সেকি অক্লান্ত প্রচেষ্টা। আর একবার দয়া জাগল বালকের মনে। নলখাগড়ার টুকরোটা দুই টুকরো করে ঐ দিয়ে অতিকষ্টে তুলে আনল খুদে জীবটাকে। মেঝের উপর রাখল ওটাকে, একটুও নড়ে না! ঐ তো, একটু যেন নিঃশ্বাস পড়ে; বেশ কেটে গেল অনেকটা সময়, যেন এইবার নড়েচড়ে উঠে হাত-পাগুলো! উপুর হয়েছে! এইবার বুঝি উঠে পালাবে। এতক্ষণে সেই চিয়েন চিহ্ একটা ধাক্কা খেল। সহজাতবৃত্তির বলেই বুঝি তার বাম পা-টা একবার উপরে উঠে গিয়েই ধপাশ করে নিচে নেমে এল। একটা ক্ষীণ আর্তনাদ। মাটিতে বসে দেখল ইঁদুরের নাকের গর্তে দুই ফোঁটা রক্ত, বেচারা বোধহয় তখন আর বেঁচে নেই।

দুঃখ হলো, বুঝি অপরাধ করেছে, তাই অনুতপ্ত। বসে রইল, দৃষ্টি স্থির, বুঝি উত্থান শক্তিও নেই।

ততক্ষণে মায়ের ঘুম ভেঙেছে।

—হ্যাঁরে, তুই কী করছিস ওখানে? শুয়ে শুয়েই সে জিজ্ঞাসা করল।—একটা

ই'দুর...ঝপ করে লাফিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়াল মাকে জবাব দেবার জন্য।
—জানি ওটা ই'দুর। কিন্তু তুমি কী করছ? ওকে মেরে ফেলেছ নাকি রক্ষে করছ?
মুখে জবাব নেই। মশালটা নিভে গেছে। সেই অন্ধকারে সে নীরব নিশ্চল চাঁদের দিকে আলোয় দৃষ্টি নামিয়ে নিচ্ছে। মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।
—আজকের মাঝরাত্তির পেরুলেই তুমি ষোলয় পা দেবে, এখনও একই রকম আছ, কোনো কিছুতে নিষ্ঠা এল না। তুমি বদলাও না। তাইতে আমার ভয়—খালি ভাবি তোমার বাবার মৃত্যুর বদলা নেবার কেউ বুঝি রইল না আর।
পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় বসে মায়ের অপাদমস্তক যেন থরথরিয়ে কাঁপছে। মায়ের কণ্ঠের অনুচ্চস্বরে কেমন এক অশেষ মর্মবেদনা শিহরিত করে তোলে তাকে। পরমুহূর্তেই আবার একটা উত্তপ্ত রক্তস্রোত বইতে থাকে তার ধমনিতে ঃ বাবার মৃত্যুর বদলা? বদলা নিতে হবে? বিস্ময়ে হতবাক সে, এগিয়ে গেল কয়েক পা।
—হ্যাঁ, নিতে হবে। আর সে দায়িত্ব তোমার। অনেকদিন বলব বলব ভাবছিলাম কিন্তু যতদিন বয়সে ছোটো ছিলে বলিনি কিছু। দেখছি এখনো শিশুর মতো তোমার চাল চলন, তবু তুমি তো আর শিশু নও। কী করব ভেবে পাইনা। তোমার মতো এক বালক কি পারবে এক বয়স্ক পুরুষের কাজ করতে?
—আমি পারব। মা, তুমি বলো আমাকে। দেখো, আমি নিশ্চিত বদলাব।
—তা ঠিক। আমি কেবল বলে দিতে পারি তোমাকে। আর বদলানো সে তোমার উপর...বেশ এসো আমার কাছে, এসে বসো।
সে এগিয়ে গেল। মা বিছানায় উঠে বসেছে। ছায়ায় ছায়ায় ঘেরা দিকে সাদা চাঁদের জ্যোৎস্নায় জ্বলজ্বল করে জ্বলছে মায়ের চোখ।
—তাহলে বলছি শোনো। মা গম্ভীর কণ্ঠে বলতে লাগল ঃ অসি নির্মাণে অশেষ খ্যাতি ছিল তোমার পিতার, সকল দেশের সবার সেরা। অনাহারে মৃত্যু থেকে আত্মরক্ষার জন্য সব যন্ত্রপাতি বেচে দিয়েছিলাম, কিছুই তোমাকে দেখাতে পারছি না। কিন্তু সে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা অসি নির্মাতা। কুড়ি বছর আগের কথা। রাজার এক উপপত্নী একবার এক টুকরো লৌহ প্রসব করেছিলেন। লোকে বলল, একটা লৌহস্তম্ভ আলিঙ্গন করে গর্ভধারণ করবার এটা ফল। একটা নিখাদ খাঁটি, একেবারে স্বচ্ছ লৌহখণ্ড। এটাকে অমূল্য সম্পদ বুঝতে পেরে রাজা স্বীয় রাজত্ব রক্ষা, শত্রু নিপাত এবং আত্মরক্ষার জন্য এই লৌহখণ্ড দিয়ে তরবারি নির্মাণ করতে মনস্থ করলেন। দুর্ভাগ্যের কথা, তোমার পিতার উপরই এই কাজের ভার পড়ল, আর সেও তার দুহাত বাড়িয়ে সেই কাজের ভার নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। পুরো তিন বছর ধরে

দিন-রাত্তির কাজ করে ধাতুতে পান মিশিয়ে তাতালো সেই লোহাকে, নির্মিত হলো দুখানা তরবারি।
—সে কি ভয়াবহ দৃশ্য। যেদিন সে চুল্লীটাকে শেষ বারের মতো খুলেছিল, সাদা বাষ্পের ফোয়ারার একটা উত্তাল তরঙ্গ ছুটে গেল আকাশের দিকে, সারাটা পৃথিবী যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। ঐ সাদা বাষ্প সাদা মেঘে রূপান্তরিত হয়ে একটা চাঁদোয়া টাঙিয়ে দিল এখানটায়। ধীরে ধীরে ঐ সাদা মেঘ গাঢ় টকটকে লাল রঙে রঞ্জিত হয়ে পীচ ফুলের রঙ ছড়িয়ে দিল চারদিকে। দেখলাম পীচ-কালো চুল্লীর ভেতর পড়ে আছে দুটো লোহিত-তপ্ত তরবারি। তোমার পিতা একদিকে ফোঁটা ফোঁটা কুয়োর টলটলে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে, আর অপরদিকে তরবারির মুখ থেকে হিস্‌হিস্‌ আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে তরবারি গাঢ় নীলবর্ণ ধারণ করছে। এমনি করে সাতদিন সাতরাত্রি কেটে গেল, যখন দুটো তরবারি দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যদি তুমি তাকাতে দেখতে তরবারি দুটো তখনো আছে চুল্লীর ভেতরে, গাঢ় নীল রঙ আর ঘরের আনাচে জ্বলন্ত জমাট বাঁধা তুষার তন্তুর মতো টলটলে স্বচ্ছ। তোমার পিতার চোখ দুটি আনন্দে ঝলমল করে উঠল। তরবারি দুটি দুই হাতে তুলে হাত বুলিয়ে কত আদর! কিন্তু পরমুহূর্তেই বিষাদ রেখা ফুটে উঠল কপালে এবং মুখের আনাচে কানাচে। দুটি পেটিকায় দুটি তরবারি রাখল। তরবারি নির্মাণের কথা সবাই জানতে পেরেছে এটা উপলব্ধি করতে শেষ কদিনের অশুভ লক্ষণগুলি লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে। সে আমাকে বলেছিল।—একটা তরবারি রাজাকে উপহার দিতে আগামী কাল আমি রাজসভায় যাব। কিন্তু যেদিন আমি তরবারি রাজার হাতে তুলে দেব সেই দিনটি হবে আমার জীবনের শেষ দিন। আমি নিশ্চিত আর দেখা হবে না আমাদের।
ভয়ে, তার কথার মর্ম উপলব্ধি করতে না পেরে, কী উত্তর দেব বুঝে উঠতে পারলাম না। আমি কেবল বললাম : কিন্তু কী চমৎকার কাজ তুমি করেছ!
—না, তুমি বুঝছনা! রাজা যেমন সন্দিগ্ধ তেমন হিংস্র। আজ আমি দুখানা অসি নির্মাণ করেছি, যা অতুলনীয়! তার শত্রুপক্ষের জন্য আমি যাতে কোনোদিন আর সমকক্ষ তরবারি নির্মাণ করতে না পারি সেইজন্য রাজা আমাকে হত্যা করবে।
—আমি অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলাম।
শোক করো না, সে বলল : কোনো উপায় নেই। চোখের জলে ভাগ্যের লিখন মুছে না। আমি প্রস্তুত হয়ে আছি এর জন্যে। একখানা অসিকোষ আমার জানুর উপর রাখতে রাখতে তার দুই চোখে বিদ্যুত বিচ্ছুরিত হতে দেখলাম। এখানা পুরুষ তরবারি। সে আমাকে বলল, তোমার কাছে রাখো। আগামীকাল আমি স্ত্রী তরবারিটি নিয়ে যাব রাজার কাছে। যদি

আমি ফিরে না আসি বুঝবে আমার মৃত্যু হয়েছে। চার পাঁচ মাসের মধ্যেই তো তোমার সময় হবে, তাই না? আমার জন্য শোক করো না। নির্ভয়ে আমাদের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে রেখে জন্মের পর মানুষ করে তুলো। যেদিন সে বড়ো হবে সেদিন এই তরবারিটা দিও তাকে। বলো, আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সে যেন রাজাকে হত্যা করে এই তরবারির আঘাতে।

—বাবা সেদিন ফিরে এসেছিলেন?

—আসেনি। বালকের মা বলল ধীর কণ্ঠে। অনেক খুঁজেছি, কিন্তু সবই বিফল। তারপর একদিন একজন খবর নিয়ে এল, প্রথম যার রক্তে তোমার পিতার হাতে তৈরি তরবারি রঞ্জিত হয়েছিল সে রক্ত তোমার পিতার। তার প্রেতাত্মা রাজপুরীতে আবির্ভূত হবে এই ভয়ে সন্মুখ ফটকে তার দেহ এবং পেছনের ফটকে ছিন্ন মুণ্ডু তারা সমাধিস্থ করেছিল।

মেই চিয়েন চিহ'র মনেহতে লাগল, সে প্রজ্বলিত অগ্নির উপর উপবিষ্ট। তার প্রতিটা কেশাগ্র দিয়ে যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ছে চারদিকে। সে দৃঢ়বদ্ধমুষ্টি অন্ধকারে ছুঁড়ে দিল, আঙ্গুলের প্রতিটা গাঁট মড়মড়িয়ে উঠল।

বালকের মা উঠে দাঁড়িয়ে বিছানার মাথার দিক থেকে একটা কাঠফলক সরিয়ে ফেলল। মশাল জ্বালিয়ে দরজার পেছন থেকে ছোট্ট হাত-কোদাল একটা এনে দিল ছেলের হাতে। বলল : মাটি খোঁড়!

বালকের হৃদপিণ্ডে দ্রুত কম্পন! বুঝি গুঁড়িয়ে যাবে! তবু গর্ত খুঁড়ে চলেছে একটু একটু করে। পাঁচ ফুট গভীর তলা থেকে কোদালে উঠছে পিতাভ মৃত্তিকা, তারপর রঙ বদলায়, পচা কাঠের রঙ।

—দাঁড়াও! একটু সাবধানে! মা চেঁচিয়ে উঠল।

গর্তের পাশে সটান শুয়ে পড়ে ধীরে ধীরে পচা কাঠগুলি তুলতে তুলতে হঠাৎ যেন আঙ্গুলের ডগায় কিসের এক তুহিন স্পর্শ লাগে। সেই ঝকঝকে তরবারি! তরবারির হাতল খুঁজে নিয়ে মুঠোয় আবদ্ধ করে তুলে আনল উপরে।

জানলার বাইরের আকাশে চাঁদ আর নক্ষত্রপুঞ্জ, ভেতরে পাইপের মশালের আলো, সব যেন অকস্মাৎ নিষ্প্রভ হয়ে গেল। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল ইস্পাতের গাঢ় নীল রঙের একটা জ্যোতি। ইস্পাতের নীলাভ আলোতে তরবারিটা দ্রবীভূত হয়ে দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বালক তাকিয়ে দেখল তার সন্মুখে একটা তিন ফুট দীর্ঘ ইস্পাতের ফলা, খুব ধারালো নয়—পেঁয়াজ কন্দের মতো গোলাকৃতি ধার।

—এখন আর মন কোমল করলে চলবে না। মা বলল : পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে তুলে নাও এই তরবারি।

—আমি আর কোমল নই, মা! এই তরবারি নিয়েই আমি প্রতিশোধ নেব।

—তাই হোক। নীল কোট পরো, চামড়ার ফিতে দিয়ে পিঠের সঙ্গে তরবারি

বেঁধে নাও। এক রঙ হলে বুঝবে না কেউ। তোমার কোট এরমধ্যেই আমি ঠিককরে রেখেছি। বিছানার পশ্চাৎ ভাগে একটা এলোমেলো পেটিকা দেখিয়ে মা বলল : তুমি কালকেই রওনা হয়ে যাবে। আমার জন্যে ভেবো না।
মেই চিয়েন চিহ মায়ের দেওয়া নতুন কোটটা পরখ করে দেখল, ঠিক ফিট করেছে। তরবারিটা কোটটা দিয়ে জড়িয়ে মাথার কাছে রাখল। শান্তমনে আবার শুয়ে পড়ল। সে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করে তার মন আর কোমল নয় যেন তার মনে কোনো ভাবনা নেই—সে সঙ্কল্প করল, এইবার সে ঘুমিয়ে পড়বে, প্রতিদিনের মতো ভোরে জাগবে তারপর পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বেরিয়ে পড়বে মারাত্মক শত্রুর অন্বেষণে।
কিন্তু সে ঘুমোতে পারে না! এ পাশ ও পাশ করে, কখন যে ভোর হবে, সে উঠে বসবে, সেই প্রতীক্ষায়। সে কেবল শুনতে পায় মায়ের দীর্ঘ হতাশার দীর্ঘনিঃশ্বাস। এইবার শুনতে পায় ভোরের প্রথম কুক্কুট ধ্বনি, নতুন দিনের প্রভাত হয়েছে।
সে আজ ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করল।

॥ ২ ॥

তখনো ভোর হয়নি, তার চোখের পাতা ভারি হয়ে উঠেছে, এইবার মেই চিয়েন চিহ বাড়ি ছেড়ে বেড়িয়ে গেল, একবারও পেছন ফিরে তাকাল না। তার পরিধানে নীল কোট, তরবারিটা পিঠে বেঁধে নিয়ে সে দ্রুতবেগে দীর্ঘ পদক্ষেপে শহরের দিকে এগিয়ে চলল। পূবের আকাশে তখনো আলোর রেখা ফোটেনি। ফার গাছের পাতার ডগায় টলমলে শিশিরবিন্দুর ভেতর রাতের বাষ্প তখনও লুকিয়ে। সে যখন বনের শেষ প্রান্তে পৌঁছল, ধীরে ধীরে ভোরের আভায় মিলিয়ে যাওয়া রাতের আলোয় তখনো চিক্‌মিক করছে শিশির বিন্দুগুলি। দূরে ঘন বাদামী খাঁজ-কাঁটা নগর প্রাচীরের ক্ষীণ অস্পষ্ট পরিলেখ এইমাত্র তার নজরে এল।
সবজি বিক্রেতাদের ভিড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে সে নগরে প্রবেশ করল। কর্মব্যস্ততায় জেগে উঠেছে নগরের পথ ঘাট। এখানে ওখানে আলস্যভরে দাঁড়িয়ে আছে মানুষের ছোট ছোট দল। রাস্তার ধারে বাড়ির দরজার ফাঁকে ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে উঁকি ঝুকি দেয় মেয়েরা। চোখের পাতা ভারি, ঘুমের রেশ তখনো তাদের চোখে মুখে, মাথায় চিরুণী পড়েনি, মুখের রঙ ফিকে পানসে, বুজের ছোঁয়া লাগেনি তখনো।
মেই চিয়েন চিহ আঁচ করতে পারল, একটা কিছু ঘটবে আজকে, তাই বুঝি সবারই কেমন উৎসুক অধৈর্য প্রতীক্ষা।
কিছু পথ অগ্রসর হতেই একটা ছেলে ছুটে গেল তার গা ঘেসে, পিঠে-বাঁধা তরবারিতে খোঁচা খেত প্রায়। তার সমস্ত শরীর কেমন ঘামে ভিজে শীতল

হয়ে গেল। রাজপ্রাসাদের প্রায় কাছাকাছি এসে উত্তরমুখো ঘুরতেই সে দেখল মানুষের একটা ভিড় গলা বাড়িয়ে উৎসুক নেত্রে কী যেন দেখছে রাস্তার দিকে। জনতার ভেতর থেকে শোনা যায় নারী আর শিশুর চিৎকার। তার পিঠে-বাঁধা অদৃশ্য তরবারি কাউকে আঘাত করে এই ভয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে সাহস পেল না সে। কিন্তু নতুন আগন্তুকের চাপ যেন ক্রমশ বাড়ছে তার পেছন দিক থেকে। তাকে পথ ছাড়তে হলো, তার সম্মুখে নজরে রইল মানুষের পেছন দিক আর তাদের প্রলম্বিত কণ্ঠদেশ।

অকস্মাৎ তার সমুখের সবগুলো মানুষ একে একে নতজানু হয়ে বসে পড়ল মাটিতে। দূরে দেখা গেল দুজন অশ্বারোহী পাশাপাশি ছুটে আসছে এদিকে। তাদের পেছনে একদল সৈনিক, কারো হাতে বেটন, কারো হাতে বর্শা, তরবারি, কেহ নিয়েছে তীরধনু আর নিশান—পীত বর্ণের ধুলোর মেঘ উড়িয়ে ছুটে আসছে তারা। তাদের পেছনে চার ঘোড়ায় টানা একটি বিরাট শকটে ছিল বাদ্যকরের দল, কেউ বা ঢোল আর ঘণ্টাবাদক আর কারো মুখে বিকটাকৃতি বাঁশী। তার পিছনে বিচিত্র পোশাক পরিধানে শকটারোহী সভাসদবৃন্দ, বৃদ্ধ, বেঁটে খাটো মোটা মানুষ, সবারই মুখ ঘামে চকমক করছে। সর্ব পেছনে এক অশ্বারোহী, একদল ভৃত্য, তাদেরও হাতে তরবারি, বর্শা আর পরশু। নতজানু হয়ে মাটিতে বসে থাকা মানুষগুলি তখন সটান শুয়ে পড়ল। মেই চিয়েন চিহ দেখল হলুদ রঙের চাঁদোয়া খাটানো একটা বিরাট শকট ছুটে আসছে এদিকে। তার মাঝখানে বসে একজন মোটা সবল লোক, তার পরণে উজ্জ্বল রঙবেরঙের পোষাক, ধুসর বর্ণের একজোড়া গোঁফ আর ছোট্ট একটা মাথা। বালকের পিঠে বাঁধা তরবারিটির মতো একটি তরবারি ঝুলছে ঐ লোকটির কটিবন্ধে।

মেই চিয়েন চি'র সারা শরীর আপনা থেকেই কেমন একটা শিহরণ খেলে গেল, পরমুহূর্তেই আবার একটা জ্বলন্ত উত্তাপের অনুভূতি। পিঠের সঙ্গে বেঁধে রাখা তরবারির হাতলটা এক মুস্টিতে ধরে মাটিতে নতজানু হয়ে পড়ে থাকা জনতার দুটি মানুষের ফাঁক দিয়ে পথ করে সে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

চার পাঁচ পা এগোয়নি তখনো, কে যেন তাকে ল্যাং মারল পেছন থেকে; একজন শুকনো মুখ যুবকের উপর সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তরবারির খোঁচা লেগেছে কিনা দেখতে দেখতে সভয়ে উঠে দাঁড়াবার চেস্টা করতেই কয়েক ঘা ঘুষি এসে পড়ল তার পাঁজরায়। সে প্রতিবাদ করল না, শুধু তাকাল রাস্তার দিকে। কিন্তু হলুদ চাঁদোয়া লাগানো শকট ততক্ষণ অন্তর্ধাণ হয়ে গেছে। এমনকি অশ্বারোহী ভৃত্যের দলও এগিয়ে গেছে অনেকটা।

রাস্তার দুপাশের সমবেত জনতা একে একে উঠে দাঁড়িয়েছে। বিশুষ্ক মুখ যুবকটি গলাবন্ধনি চেপে ধরে যেতে দিল না মেই চিয়েন চিহকে। মেই

চিয়েন চিহ তার অগ্রগুচ্ছ থেতলে দিয়েছে বলে নিজের জীবন দিয়ে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তাকে। রাস্তার কুঁড়ে মানুষের দল ভিড় করে উঁকি ঝুঁকি মারছে, কোনো কথা নেই তাদের মুখে, দু একটা বিদ্রূপ আর অভিশাপ বাণী হয়তো আসে কারো কারো কাছ থেকে। এ ধরণের প্রতিপক্ষকে বালক মেই চিয়েন চিহ উপহাস করতে পারল না, ওদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করতে পারল না। বিরক্তিকর হলেও সে রেহাই পেল না। এক পাত্র ভুট্টা রান্না করতে যত সময় লাগে তত সময় কেটে গেল ততক্ষণে। ধৈর্য হারিয়ে সে জলে উঠছিল। বিশেষ আগ্রহশীল দর্শকেরা তবু স্থান ত্যাগ করল না।

ভিড় ঠেলে, একটা কৃষ্ণকায় মানুষ বেরিয়ে এল, ঠিক একটা লোহার রেঁদার মতো সরু কৃশকায় দেখতে, মুখ ভরতি কালো দাঁড়ি, চোখ দুটিও মিশ-কালো। কোনো কথা না বলে এক ঝলক নিষ্প্রাণ হাসি হাসল মেই চিয়েন চিহর মুখের দিকে তাকিয়ে। বিশুষ্কমুখ যুবকটির চোয়ালে আঙুলের নখ দিয়ে চুসকি মারতে একটা হাত উঁচিয়ে সে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল তার চোখের দিকে। নিমেষের জন্য যুবকটিও তাকাল তেমনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

তারপর বালকের কণ্ঠবন্ধনী মুঠিমুক্ত করে সে আপন মনে চলে গেল নিজের পথে। চলে গেল কালো মতন লোকটিও, হতাশ দর্শকেরাও ছড়িয়ে গেল এদিক ওদিক। কেউ বা মেই চিয়ে চিহর কাছে জানতে এল, তার নাম, কী তার ঠিকানা। তার কোন রোগ আছে কী? কিন্তু সে এড়িয়ে গেল সবাইকে।

কারো গায়ে তরবারির আঘাত লাগবার সম্ভাবনার কথা চিন্তা করতে করতে নগরের কোলাহল এড়িয়ে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করল মেই চিয়েন চিহ। প্রতিশোধ নিতে, রাজার প্রত্যাবর্তনের আশায় সে বরং দক্ষিণ ফটকে অপেক্ষা করবে। উন্মুক্ত নির্জন স্থানটি হবে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ। রাজার পর্বত ভ্রমণের কথাই আলোচনা চলছিল সারা শহরময়। কত অনুচর লোক লশকর। কত জাঁকজমক! রাজদর্শনে কত সম্মান। কত মর্যাদা আর বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে সবাই! সবার কাছে একটা আদর্শ! এক ঝাঁক মৌমাছির গুঞ্জনের মতো তাদের গুঞ্জনও ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

কিন্তু দক্ষিণ ফটকের কাছে সব শান্ত হয়ে এসেছিল তখন।

শহর ছেড়ে বেরিয়ে এসে ভাঁপে রা[illegible] করা দু টুকরো রুটি খেতে একটা বড় তুত গাছের তলায় গিয়ে বসল মেই চিয়েন চিহ। খেতে খেতে মায়ের কথা মনে পড়তেই কিসের একটা ডেলা মতন যেন আটকে গেল তার কণ্ঠ-নালিতে, পরমুহূর্তেই আবার কেটে গেল সেই ভাবটা। চারদিক ধীরে ধীরে শান্ত নিস্তব্ধ হয়ে আসছিল, সে তার নিজের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ

স্পষ্ট শুনতে পারছিল।

গোধূলি সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গে বড়ো অশান্ত চঞ্চল মনে হচ্ছিল নিজেকে। সম্মুখে সুদূরে দৃষ্টি প্রসারিত করল, কিন্তু রাজার আসবার কোনো চিহ্নও দেখতে পেল না। গ্রামের সবজি বিক্রেতা মানুষগুলি শূন্য ঝুড়ি মাথায় নিয়ে একে একে ফিরছিল নিজ নিজ ঘরে।

এমনি সবাই যখন ফিরে গেল, কালো মানুষটি ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল শহরের ভেতর থেকে।

—মেই চিয়েন চিহ, পালাও! রাজা খুঁজছে তোমাকে! পেচকের ডাকের মতো কর্কশ লাগল তার কণ্ঠস্বর।

মেই চিয়েন চিহ'র আপাদমস্তক থরথর করে কেঁপে উঠল। সম্মোহিত হয়ে যেন উড়ন্ত পাখির মতো সে ছুটতে লাগল কালো মানুষটির পেছন পেছন।

অবশেষে দম নেবার জন্য থমকে দাঁড়িয়ে সে বুঝতে পারল তারা পৌঁছে গেছে ফার-অরণ্যের প্রান্তদেশে। উদীয়মান চাঁদের রূপালী রশ্মি দেখা যায় অনেক দূরে; আর সম্মুখে কেবল দেখতে পায় জোনাকির মিটিমিটি আলোর মত ঐ কালো মানুষটির দুটি চোখ।

—আমাকে চিনলে কেমন করে?...হতবুদ্ধি সন্ত্রাসে শুধালো বালকটি।

—আমি বরাবর তোমাকে চিনি। লোকটি হাসল: আমি জানি তোমার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পুরুষ তরবারিটি পিঠে বেঁধে বয়ে বেড়াচ্ছ তুমি। আর তুমি ব্যর্থ হবে এও আমি জানি। শুধু তাই নয়, আমি জানি কেউ আজকে রাজার কাছে খবর দিয়েছে তোমার বিরুদ্ধে। তোমার শত্রু পূর্ব তোরণ দিয়ে নগরে প্রবেশ করেছে। তোমাকে গ্রেপ্তার করবার হুকুম হয়েছে।

হতাশায় মুহ্যমান হতে লাগল মেই চিয়েন চিহ।

—তাই বুঝি মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিল। বিড় বিড় করে বলল সে।

—কিন্তু তিনিও জানেন না সবটুকু। তিনি জানেন না তোমার হয়ে প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছি আমি।

—তুমি? আমার হয়ে প্রতিশোধ নেবে তুমি? ন্যায়ের অবতার?

—থামো, ঐ উপাধি দিয়ে অপমান করো না আমাকে।

—কেন, তাহলে কি এক বিধবা আর এক অনাথ ছেলের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে?

—যেসব কথা কলঙ্ক মলিন তা বলো না আমাকে, বাছা। দৃঢ়কণ্ঠে বলল কালো মানুষটি। ন্যায়, সহানুভূতি এই সব শব্দগুলি একদিন ছিল পবিত্র অমলিন, কিন্তু আজ এসবই শয়তানের মূলধন। আমার অন্তকরণে স্থান নেই এসবের। আমি কেবল তোমার হয়ে প্রতিশোধ নিতে চাই।

—বেশ। কিন্তু কেমন করে নেবে?
—আমি তোমার কাছে মাত্র দুটো বস্তু চাই। দুটি জ্বলন্ত চক্ষুর গভীর কন্দর থেকে যেন তার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল। দুটো বস্তু কী জান? প্রথম তোমার তরবারি, আর দ্বিতীয় তোমার শির!
মেই চিয়েন চিহর কাছে অদ্ভুত লাগল এই প্রার্থনা। কিন্তু একটু ইতস্ততঃ করলেও ভয় সে পেল না। কিছুক্ষণের জন্য সে নির্বাক রইল।
—ভয় পেয়ো না যে কৌশল করে আমি তোমার শির আর সম্পদ দুইই কেড়ে নিচ্ছি। অন্ধকারের ভেতর থেকে ঐ এক অপ্রসন্ন স্বর ভেসে আসতে লাগল।—সম্পূর্ণ তোমার উপর নির্ভর। যদি বিশ্বাস করো আমাকে, আমি যাব: যদি না করো, যাব না।
—কিন্তু আমার হয়ে প্রতিশোধ তুমি নেবে কেন? আমার পিতার সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল?
—শুরু থেকেই আমি জানি তাকে, যেমন জানি তোমাকে। কিন্তু ওর জন্য নয়। তুমি বুঝবে না, চতুর বালক! প্রতিশোধ নিতে আমি কত পারদর্শী। তোমার যা আমারও তাই, তোমার পিতা যাতে সংশ্লিষ্ট আমিও তাতে বিজড়িত। অন্তরে আমার অন্যের দেওয়া কত আঘাত সয়েছি, তাই আজ ঘৃণা এসেছে নিজের উপর।
অন্ধকারের কণ্ঠস্বর নীরব হয়ে গেল। পিঠে আবদ্ধ নীলতরবারি বের করবার জন্য মেই চিয়েন চিহ তার দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করল, একই গতিতে গ্রীবার পশ্চাৎদেশ পর্যন্ত আন্দোলিত করল তরবারিকে। ছিন্নমস্তক তার পায়ের তলায় সবুজ শেওলার উপর লুটিয়ে পড়বার পরই কালো মানুষটার হাতে সে তুলে দিল তরবারিটা।
—আহা!
কৃষ্ণকায় মানুষটি একহাতে তরবারি গ্রহণ করল অপর হাতের মুঠোয় কেশগুচ্ছ ধারণ করে তুলে নিল মেই চিয়েন চিহর ছিন্ন মস্তক। তার তখনো উষ্ণ প্রাণহীন ওষ্ঠে দুবার চুম্বন করে একটা হিমেল কর্কশ অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল। তার সেই অট্টহাস্য ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘুরে বেড়াল ফার অরন্যানির ফাঁকে ফাঁকে। সঙ্গে সঙ্গে দূরে গভীর অরণ্যে আলেয়ার আলোর মতো কতকগুলি চোখের অগ্নিচ্ছটা ঝিলিক দিয়ে উঠল; পরমমুহূর্তেই এত কাছে যে, কানে এল ক্ষুধিত নেকড়ের ভারি নিঃশ্বাসের আওয়াজ। এক কামড়ে মেই চিয়েন চিহর নীলবর্ণ কোটটা ছিন্নভিন্ন করে ফেলল; পরমুহূর্তেই নিঃশেষ হয়ে গেল তার দেহটা, লেহন করে নিশ্চিহ্ন করে দিল শেষ রক্তবিন্দু। আর শোনা গেল কেবল হাড়গুলো কড়মড় করে ভাঙবার মৃদুশব্দ।
দলের গোদা বিরাটকায় একটা নেকড়ে ছুটে গেল কৃষ্ণকায় মানুষটির দিকে। কিন্তু তার হাতের ঐ নীল তরবারির এক আস্ফালনে নেকড়ের মুণ্ড লুটিয়ে

পড়ল তার পায়ের তলায় সবুজ শেওলার উপর। দলের অন্য নেকড়েগুলি এক এক কামড়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল এর গায়ের চামড়া, নিমেষের মধ্যে দেহটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, এক ফোঁটা রক্তের চিহ্নও থাকলনা। হাড়গুলো চিবিয়ে খাবার কড়মড় মৃদু শব্দই রইল সেখানে তখন একমাত্র শুনবার মতো আওয়াজ।

সেই চিরেন চিহুর কাটা মুণ্ডটা জড়িয়ে নিতে কালো মানুষটা শতছিন্ন নীল কোটটা কুড়িয়ে নিল মাটি থেকে। ঐটা আর নীল তরবারিটা পিঠের উপর বেঁধে নিয়ে বোঁ করে ঘুরে গেল, ঘন অন্ধকার ভেদ করে রাজধানীর দিকে সবেগে ধাবিত হলো।

পিঠ বাঁকিয়ে, জিভ লকলকিয়ে, হাঁফাতে হাঁফাতে নেকড়েগুলো তখনো নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে। কৃষ্ণকায় মানুষটাকে ছুটতে দেখে সবুজ চোখে বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে এরা তাকিয়ে রইল সেদিকে।

কালো মানুষটা ছুটতে লাগল অন্ধকারের ভেতর দিয়ে, রাজধানীর দিকে, কর্কশ কণ্ঠে গাইতে গাইতে ঃ

গাও হে, গাও হে !
সে একা যে ভালোবাসত তার তরবারিকে
মৃত্যুকে নিল সে তার পুরষ্কার।
তারা কতশত যারা চলে একা,
তারা একা নয় আর, যারা ভালোবাসে তরবারিকে !
শত্রুর বদলে শত্রু হা ! শিরের বদলা শির !
তারা দুজনেই মৃত্যুরে নিল বরি আপন হাতে।

॥ ৩ ॥

রাজার এবারকার পর্বতভ্রমণ উপভোগ্য হয়নি। পথিপার্শ্বে অপেক্ষমাণ আততায়ীর গোপন সংবাদ পেয়ে তিনি আরো বেশি মুহ্যমান হয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। খোশমেজাজে কাটেনি তাঁর সেই রাত্তিরটা। তিনি অভিযোগ করলেন এমনকি তাঁর পরম উপপত্নীর মাথার চুল নাকি আগের দিনের মতো তেমন কালো আর চকচকে ছিল না সেই রাত্রে ! তবু সৌভাগ্য, বিড়ালছানার মতো রাজকীয় জানুর উপর সারারাত বসে নানা ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে রাজকীয় ভুরু কুঞ্চন দূরীকরনে সে সমর্থ হয়েছিল।

কিন্তু পরদিন দ্বিপ্রহরের পর শয্যাত্যাগ করে উঠেই আবার রাজার মেজাজ বিগড়ে গেল। দ্বিপ্রাহরিক আহার সমাধা হতে না হতেই তিনি একেবারে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে উঠলেন।

—আমি বড়ো ক্লান্ত। একটা বিরাট হাই তুলে চিৎকার করে উঠলেন।

রাজরানী থেকে শুরু করে সভার বিদূষক পর্যন্ত সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

বৃদ্ধ মন্ত্রীদের নৈতিক বক্তৃতো আর সভার কেঁদো বামনদের ভাঁড়ামি ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে অনেকদিন ; দড়ির উপর দিয়ে হাঁটা, বাঁশের ডগায় চড়া, ভোজবাজি, ডিগবাজি খাওয়া, তরবারি গিলে খাওয়া, মুখ দিয়ে আগুনের হলকা নির্গত করা, প্রভৃতি সব রকম অদ্ভুত আশ্চর্য কৌশল সবই যেন কেমন নীরস লাগে তাঁর কাছে। মাঝে মাঝে অদম্য ক্রোধে ফেটে পড়তে লাগলেন ; সেসব মুহূর্তে বিনা কারণে অথবা ন্যূনতম কারণে মানুষ হত্যার জন্য কোষমুক্ত তরবারি আস্ফালন করতেন।

দুইজন খোজা রাজপ্রাসাদের কর্মস্থল থেকে পালিয়ে এই সবে ফিরে এসেছিল রাজসভার চারদিক বিষাদাচ্ছন্ন দেখে বুঝতে পারল অচিরে আবার একটা অঘটন সুনিশ্চিত। একজন ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অপরটি, যার মনে আত্মবিশ্বাস ছিল, কোনোরকমে তাড়াহুড়ো না করে রাজসকাশে উপস্থিত হয়েই সাষ্টাঙ্গে রাজাকে অভিবাদন জানালে, তারপর ঘোষণা করল ঃ

—মহারাজ, এই অনুগত ভৃত্যের বিনিত নিবেদন ; এমন একজন দক্ষ লোকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে যে মহারাজকে মহা আনন্দ দিতে পারবে।

—কী ? তিনি প্রশ্ন করলেন। বেশি কথায় অভ্যস্ত ছিলেন না তিনি।—সে একজন রোগা-পাতলা কালো মতন মানুষ, দেখতে ঠিক একজন ভিক্ষুকের মতো। তার গায়ে নীলবর্ণের পোশাক, একটা নীলবর্ণের গোল মতন পুঁটলি পিঠের সঙ্গে বাধা, বিটকেল ছন্দহীন করিবার দুই এক কলি গান গায়। জিজ্ঞেস করলেই বলে সে এমন এক কৌশল জানে যা কেউ দেখাতে পারেনি কোনোদিন, পৃথিবীতে নাকি অদ্বিতীয়, আর সম্পূর্ণ নুতন জিনিষ। দেখলে সংসারের সমস্ত উদ্বেগ দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে, শান্তি ফিরে আসবে। কিন্তু যখন প্রদর্শন করতে বললাম স্বীকৃত হলো না। সে বলল প্রদর্শণ করতে তার প্রয়োজন একটি সোনার ড্রাগন, (প্রাচীন কালে চীনদেশীয় সম্রাটগণ নিজ নিজ মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য অনেকসময় নিজেদের ড্রাগন বলতেন। চীনদেশীয় উপকথায় ড্রাগনকে দেবতুল্য মনে করা হতো।) আর একটি সোনার বৃহৎ কটাহ…

—স্বর্ণ ড্রাগন ? সে তো আমি। সোনার বৃহৎ কটাহ ? সেও তো আছে আমার !

—আপনার ভৃত্যও ভাবছিল তাই…

—তাকে সভায় নিয়ে এসো। রাজা আদেশ করলেন।

রাজকণ্ঠ তখনও মিলিয়ে যায় নি, চারজন প্রহরী খোজা সহ অবিলম্বে অতি দ্রুত বেরিয়ে গেল। রাজধানী থেকে শুরু করে রাজসভার বিদূষকগণ সবাই খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। মনে আশার উদয় হলো, হয়তো এই জাদুকর সকল উদ্বেগ দূর করতে পারবে, পৃথিবীতে আবার শান্তি ফিরে আসবে ?

আর যদি প্রদর্শনী ব্যর্থ হয়, রাজরোষের জন্য থাকবে ঐ রোগা পাতলা, কালো, ভিক্ষুকের মতো মানুষটা। লোকটিকে নিয়ে আসা পর্যন্ত যদি তারা অপেক্ষা করতে পারে নিশ্চিত সবার মঙ্গল হবে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। ছয়জন অগ্রগামী লোক ছুটে এল স্বর্ণসিংহাসনের দিকে। প্রথমে খোজা পথ প্রদর্শক, পেছন সারিতে চারজন প্রহরী, তাদের মধ্য সারিতে ছিল একজন কৃষ্ণকায় মানুষ। আরো কাছে এলে তারা দেখল তার গায় নীল কোট, কালো দাড়ি, তেমনি কালো চোখের ভুরু এবং মাথার চুল। সে এতই রোগা যে চোয়ালের হাড় বেরিয়ে এসেছে, চোখদুটি কোটরে। যখন রাজাকে অভিবাদন জানাবার জন্য সে নতজানু হয়ে বসল, সবাই দেখল তার পিঠে একটা গোলমত ছোট পুটলি, লালরঙের কাজকরা নীলবর্ণ কাপড় দিয়ে মোড়া।

—বেশ, এইবার বলো। অধৈর্য রাজা হাঁক দিয়ে উঠলেন। কৃষ্ণকায় মানুষটার অতি মামুলি সাজসরঞ্জাম তাঁর কাছে খুব উপযোগী মনে হলো না।

—মহারাজের এই বিনীত ক্ষুদ্র প্রজার নাম হুয়েন-চিহ্-আও-চে, কৃষ্ণকায় মানুষটা বলল, ওয়েন ওয়েন গ্রামে জন্ম। কোনো পৈত্রিক ব্যবসা ছিল না, কিন্তু বয়স হলে একজন সাধুর সংস্পর্শে এসেছিলাম। তিনি একটি বালকের কাটামুণ্ড নিয়ে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া প্রদর্শন করবার কৌশল আমাকে শিখিয়েছিলেন। তবে এই কৌশল আমি একক প্রদর্শন করতে পারি না। স্বর্ণ ড্রাগনের সামনে প্রদর্শন করতে হয়, জ্বলন্ত কাঠকয়লার উনানে বসানো পরিষ্কার জল ভরতি একটা সোনার বৃহৎ কড়াই আমার প্রয়োজন। বালকের মুণ্ড ঐ জলে ডুবিয়ে দেবার পর জল যখন টগ্‌বগ্‌ করে ফুটবে তখন মাথাটা একবার উঠবে আবার পড়বে, আর এমনি নানা মুদ্রায় প্রদর্শন করবে। মধুর কণ্ঠে হাসবে গান গাইবে। যে একবার এই গান শুনবে একবার ঐ নাচ দেখবে তার সমস্ত অশান্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে। পৃথিবীর সব মানুষ যখন ঐ ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া দেখবে পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসবে।

—বেশ, তাই প্রদর্শন করো। রাজা সোচ্চারে আদেশ করলেন।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। একটা ষাঁড় গোটা সেদ্ধ করা যায় এমনি প্রকাণ্ড একটা সোনার কটাহ সভাগৃহের বাইরে স্থাপন করা হলো। পরিষ্কার জল ভরতি করে কাঠকয়লার আগুণ ধরিয়ে দিল। কালো মানুষটা দাঁড়িয়ে ছিল পাশে। কাঠকয়লার আগুণ গনগনে লাল হয়ে উঠলে পিঠ থেকে নামিয়ে পুঁটলিটা খুলল সবার সামনে। দুই হাত দিয়ে একটা বালকের ছিন্নমুণ্ড তুলে ধরল, বালকটির অতি সুন্দর এক জোরা ভুরু, দুটি বড়ো বড়ো চোখ, ধবধবে সাদা দুপাটি দাঁত আর টুকটুকে লাল দুটি ঠোঁট। একটা স্মিত হাসি ছড়িয়ে ছিল সারা মুখে। তার মাথায় জটপাকানো চুলগুলি ধোঁয়ার মতো ধূসর। কালো মানুষটি ঐ ছিন্ন মস্তক আরো উঁচু করে ধরল,

উপস্থিত জনমণ্ডলির সবার দর্শনার্থে চারদিক ঘুরে ঘুরে মস্তকটি প্রদর্শণ করাল। মুখ দিয়ে বিড়বিড় করে কী অবোধ্য বুলি আওড়াতে আওড়াতে ফুটন্ত কটাহের উপর মাথাটা তুলে ধরল। তারপর ঝপ করে ফেলে দিল ফুটন্ত জলের মধ্যে। জলের ফেনা ছিটকে উঠল পাঁচ ফুট উঁচু পর্যন্ত। তারপর সব নিথর। অনেকক্ষণ আর কোনো ঘটনা ঘটল না। রাজা ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। রাজরানী, রাজার উপপত্নী, মন্ত্রী, খোজা সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল; এমন কি কেঁদো বামন কয়টিও নানারকম অঙ্গভঙ্গী করতে শুরু করল। এদের অঙ্গভঙ্গী দেখে রাজার মনে সন্দেহ জাগল। তবে কি ওরা সবাই বোকা ঠাউরেছে তাঁকে। তার মতো নৃপতিকে প্রতারণা করবার দুঃসাহস আছে যারসেই হাবাগবা মানুষটাকে কটাহের ফুটন্ত জলে নিক্ষেপ করে ফুটিয়ে মারবার আদেশ দিতে তিনি প্রহরীদের দিকে ফিরে তাকালেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে জল টক্‌বগ্‌ করে উঠতেই একটা জ্বলন্ত অগ্নিশিখা রক্তিম আভা ছড়িয়ে দিল কালো মানুষটির সর্বাঙ্গে। গলিত লৌহের নিষ্প্রভ লাল রঙের মতোই যেন। রাজা চারদিকে দৃষ্টিপাত করলেন। কুৎকায় মানুষটি তার দুই হাত আকাশের দিকে প্রসারিত করে মহাশূন্যের অভ্যন্তরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল তারপর নৃত্য শুরু করল কর্কশ কণ্ঠে গাইতে গাইতে ঃ

গাও হে প্রেমের জন্যে, প্রেমের জন্যে হেই হো!
আহ প্রেম! আহ রক্ত! কে নয় এমন?
অন্ধকারে দিশেহারা মানুষ, রাজা অট্টহাসি হাসে,
দশ সহস্র শির মৃত্যুর কাছে হয়েছে অবনত।
আমার কাজে লাগে কেবল একটি শির,
একটি মানুষের শিরের জন্যে ঝরুক রক্ত!
রক্ত ঝরুক।
গাও হে, গাও হো।

তলদেশ থেকে শিখর দেশ পর্যন্ত কখনো জোয়ারের জলের মতো ফেপে উঠে আবার কখনো বা ঘুর্ণীবায়ুর মতো পাক খেতে খেতে সঙ্গীতের তালে তালে ঐ কটাহের ফুটন্ত জলরাশি ফেনোকৃতি ছোট্ট পর্বতাশিখরের আকারে ফেনায়িত হয়ে উঠতে লাগল। মাথাটা কখনো বা জলের সঙ্গে উঠছে, নামছে, কখনো চারদিকে ঘুরপাক খেয়ে জলের উপর ভাসছে, আবার কখনো বা দ্রুত ডিগবাজি খেয়ে এদিক থেকে ওদিক ঘুরছে। কেমন একটা আনন্দের স্মিত হাসির আভা তার মুখে সবাই যেন দেখতে পেল। তারপর আবার অকস্মাৎ ছিন্নমুণ্ড স্রোতের বিরুদ্ধ গতিতে সাঁতার কাটতে শুরু করল, কখনো বৃত্তাকারে, কখনো এদিক ওদিক বিনুনি কেটে, কখনো চারদিকে জল ছিটিয়ে সভাকক্ষে উষ্ণ জল ছড়িয়ে। একটি বামন কুকুরের মতো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে

উঠল তক্ষুনি। তপ্ত জলের ছেঁকা খেয়ে যন্ত্রণার আর্তনাদ সে চাপতে পারল না।

কৃষ্ণকায় মানুষটি তার সঙ্গীত থামাল। ছিন্নমুণ্ড জলের মধ্যস্থলে এসে স্তব্ধ হয়ে রইল। কেমন একটা গম্ভীর ভাব মুখের উপর ছড়িয়ে কয়েক সেকেণ্ড বাদে মাথাটা আবার ধীরগতিতে জলের উপর ওঠা-নামা শুরু করল। ওঠা নামা বন্ধ করে গতি বাড়িয়ে উপর থেকে নিচে সাঁতার কাটতে লাগল। খুব দ্রুত নয়, ধীর মন্থর গতিতে স্বাভাবিক মাধুর্য রেখে। তিনবার মস্তকটি বৃত্তাকারে কটাহকে প্রদক্ষিণ করল। কখনো ডুব দিল আবার কখনো ভেসে উঠল। এর চক্ষু দুটি বিস্ফারিত, কপিশ কালো চোখের মণি দুইটি তেমনি উজ্জ্বল ছিন্নমুণ্ড গেয়ে উঠল ঃ

সম্রাটের শাসন ছড়ানো দূরে দূরান্তে,
সর্বত্র শত্রুরে সে করে পরাজিত।
পৃথিবীর হবে লয়, কিন্তু তার শক্তি কভু নয়,
সকল দীপ্তি নিয়ে তাই আমি আসি হেতা।
উজ্জ্বল রশ্মিতে ঝলমল অসি—ভুলো না আমায়
একটা রাজকীয় দৃশ্য, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার।
ফিরে এসো, উজ্জ্বল নীল আলো জ্বলে যেথা।

ছিন্নমস্তকটি হঠাৎ জলের ঠিক উপরিভাগে এসে থেমে গেল। কয়েকটা ডিগবাজি দিয়ে আবার উপর-নিচ উঠা নামা শুরু করল, সম্মোহন দৃষ্টিতে একবার তাকাল ডানদিকে আবার বামে, তারপর আবার গাইতে লাগল ঃ

প্রেমের জন্যে আমরা জানি, হেই হো।
আমি কাটি একটি শির, কেবল একটি শির, হেই হো।
চাই আমি শুধু একটি শির, বেশি নয় একটিও,
সে নেয় কত শত শত।

শেষ কলি গান গেয়েই আবার জলে ডুবে গেল ছিন্নমস্তক। ভেসে উঠল না, সঙ্গীত অস্পষ্ট হয়ে এল। সঙ্গীত আরো স্তিমিত হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফেনায়িত জল ভাঁটার টানের মতো ধীরে ধীরে থিতিয়ে আসতে লাগল। যতক্ষণ না জল কড়াইয়ের কাণার তলায় নেমে গেল। দূর থেকে কিছুই আর দেখা গেল না।

—তাহলে? অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে অধৈর্য্য রাজা জানতে চাইলেন।

—মহারাজ; এক হাঁটুর উপর ভর রেখে নতজানু হলো কালো মানুষটি। ছিন্নমস্তক কটাহের তলদেশে গিয়ে এক বিস্ময়কর অলৌকিক নৃত্য করছে। আরো সন্নিকটে না এলে আপনি দেখতে পাবেন না। আমি একে তুলেও আনতে পারব না। কারণ কটাহের তলদেশে গিয়ে অলৌকিক নৃত্য করাই

এর রীতি।

রাজা উঠে দাঁড়ালেন। কয়েকধাপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে নেমে এসে ফুটন্ত কটাহের কাছে গেলেন। উত্তাপ গ্রাহ্য না করে নৃত্য দেখবার জন্য তিনি কটাহের উপর আনত হলেন। কটাহের জল তখন আয়নার মতো স্বচ্ছ। নিশ্চল ছিন্নমস্তক উপর দিকে তাকিয়ে রাজার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। ওর মুখের উপর রাজার দৃষ্টি পড়তেই একটা মনোরম স্মিত হাসি ফুটে উঠল ছিন্নমস্তকের মুখে। এই স্মিত হাসি দেখে রাজা অনুভব করলেন এই মুখ, স্মিতহাসি তাঁর পরিচিত। কে হতে পারে? যখন তিনি ভাবছিলেন কৃষ্ণকায় মানুষটি তার পিঠের উপর থেকে নীলবর্ণ তরবারিটি উন্মোচন করল। বিদ্যুতগতিতে রাজার গ্রীবার পশ্চাৎদেশ লক্ষ্য করে তরবারি আন্দোলিত হলো। রাজার ছিন্নমস্তক ঝপাং করে কটাহের জলে ছিটকে পড়ল।

যখন দুই শত্রুর সাক্ষাৎ হয় প্রথম দৃষ্টিতেই তারা চিনতে পারে পরস্পরকে। বিশেষ করে যদি সে সাক্ষাৎ মুখোমুখি, কাছাকাছি হয়। যখন রাজার ছিন্নমস্তক কটাহের জল স্পর্শ করল, মেই চিয়েন চিহ'র ছিন্নমুণ্ড উপরে উঠে এল। উঠেই বর্বরের মতো কামড়ে ধরল রাজার কান। দুই ছিন্নমস্তক একদিকে আমৃত্যু রণে উন্মত্ত হয়ে উঠল। অপরদিকে তখন কটাহের জল টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে, অজস্র সফেন বুদ্‌বুদ্‌ ছড়িয়ে পড়ছে জলের উপর। কুড়ি দফা লড়াইয়ের পর রাজার ছিন্নমস্তক পাঁচ স্থানে আঘাত পেল। আর মেই চিয়েন চিহ পেল সাত স্থানে। চতুর রাজা কৌশলে শত্রুর পশ্চাৎ দিকে চলে গেলেন। শত্রুর অসতর্ক মুহূর্তে তিনি কামড়ে ধরলেন মেই চিয়েন চিহর ঘাড়ে, সে আর মুখ ঘুরাতে পারল না। রাজা সজোরে দাঁত বসিয়ে দিলেন। রেশম পোকা তুঁত পাতা আঁকড়ে ধরে যেমন করে, ওকে নড়তে দিলেন না। বালকের যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদের শব্দ কটাহের বাইরে থেকেও কানে এল।

রাজরানী থেকে শুরু করে রাজসভার বিদূষক পর্যন্ত, ভয়ে যারা অসাড় হয়ে গিয়েছিল, এই শব্দ শুনে সবার দেহে আবার প্রাণ সঞ্চারিত হলো। তারা অনুভব করল যেন অন্ধকার সূর্যকে গিলে ফেলছে। যদিও ভয়ে আর বিস্ময়ে তারা কাঁপছিল, তবু একটা গোপন আনন্দ ছিল তাদের অনুভূতিতে। গোল গোল চোখ করে ঔৎসুক্য নিয়ে প্রতীক্ষায় ছিল সবাই।

হতচকিত কৃষ্ণকায় মানুষটির কিন্তু রঙ বদলাল না। অদৃশ্য তরবারিটা হাতে নিয়ে গাছের শুকনো ডালের মতো বিনা আয়াসে সে তার হস্ত উত্তোলন করল! নিজেকে প্রসারিত করে দি , যেন কটাহের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখবে। অকস্মাৎ তার হাতটা ঠেঁকে গেল, হাতের নীল তরবারিটা নিচে নেমে এল, সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের মস্তক ছিন্ন হয়ে টুপ করে পড়ল কটাহের ভেতরে, সাদা সাদা ফেনা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

কালো মানুষটির ছিন্নমুণ্ড জল স্পর্শ করেই তেড়ে গেল রাজার মস্তক লক্ষ্য

করে, সজোরে কামড়ে দিয়ে প্রায় কেটে দিল রাজার নাসিকা। রাজা যাতনায় আর্তনাদ করে উঠলেন, এই সঙ্গে নিজেকে মুক্ত করবার সুযোগ নিল মেই চিয়েন চিহ্‌। চোয়ালের চাপে মেই চিয়েন চিহ্‌'র ঘাড়টা সাপটে রাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় ঘুরতে থাকে রাজমস্তক। দুজনের পরস্পর টানাটানিতে রাজা আর পারলেন না মুখ বন্ধ করে রাখতে। দুজনে মিলে হিংস্রভাবে চেপে ধরল রাজাকে, ক্ষুধায় কাতর কুক্কুটী যেমন করে থাকে খাবার দানা পেলে। শনাক্তের অতীত হিংস্রভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল রাজার ছিন্নমস্তক। প্রথমে কটাহের ভেতর সবেগে ছুটোপাটি করলেন; গোঙাতে গোঙাতে ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে গেলেন; শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সব নীরব হলো সর্বশেষে।

কৃষ্ণকায় মানুষটি আর মেই চিয়েন চিহ্‌ এইবার বিরত হলো। তারা রাজার ছিন্নমস্তক পরিত্যাগ করল. শত্রু ভান করছে কিনা দেখবার জন্য দুজনে আবার একবার সাঁতারে ঘুরল কটাহের চারদিকে। রাজার মৃত্যু হয়েছে নিশ্চিত জেনে দৃষ্টি বিনিময় হলো পরস্পরের মধ্যে, উভয়ের মুখে স্মিত হাসি। তারপর চোখ মুদ্রিত করে, আকাশের দিকে মুখ রেখে, তারা দুজনই তলিয়ে গেল কটাহের জলের তলায়।

॥ ৪ ॥

ধুঁয়ো উড়ে গেল, চুল্লির আগুন নিভে গেল। একটুও মৃদু আন্দোলন রইল না জলের উপর। একটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতায় উঁচু নিচু সবার ভেতর আবার চেতনা ফিরে এল। কেউ একজন চিৎকার করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের তাড়নায় কণ্ঠ মিলিয়ে সবাই চিৎকার করে উঠল একযোগে। কেউ স্বর্ণ কটাহের কাছে গেল, অন্যরাও তার পিছু নিল। যারা পেছনে দাঁড়াল তারা কেবল সম্মুখবর্তীর পেছন থেকে ঘাড়ের ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখল।

উত্তাপে তখনো গালে সেঁকা লাগছে। জলের উপরিভাগ তখনো আরশির মতো মসৃণ, একটা তৈলের আস্তর ছড়িয়ে আছে, একটা জনসমুদ্রের প্রতিচ্ছবি তারই উপর ভাসছে; রাজরানী উপপত্নীবৃন্দ, প্রতিহারীগণ, প্রাক্তন এবং প্রাচীন মন্ত্রীবৃন্দ, বামন যুগল, খোজা…

—হায় ভগবান! মহারাজের ছিন্নমস্তক এখনো আছে এখানে। ওহ্‌। কী ভয়ঙ্কর! রাজার ষষ্ঠ উপপত্নী অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড ফোঁফড়ানো কান্নার দমকে ফেটে পড়ল।

রাজরানী থেকে শুরু করে রাজসভার বিদূষকবৃন্দ পর্যন্ত সবাই একটা আতঙ্কে অধীর। কিংকর্তব্য বিমূঢ় তারা, বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে ভীষণ উদ্বেগের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তখন সবার সেরা বুদ্ধিমান প্রাচীন সভাষদ একজন একাই এগিয়ে গেলেন, কটাহ স্পর্শ করবার জন্য একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন।

তিনি পিছিয়ে এলেন, চট্ করে হাতটা সরিয়ে নিলেন, তারপর সিটি বাজাবার মতো করে দুটো আঙুল মুখে পুড়ে দিলেন।

নিজেদের পুনঃসংযত করে রাজার ছিন্নমস্তক উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবনের জন্য আলোচনা করতে তারা আবার সবাই রাজপ্রাসাদের বাইরে জমায়েত হলো। তিনপাত্র ভুট্টা রান্না করতে যত সময় লাগে ততসময় তারা লাগিয়ে দিল আলোচনা করতে। সিদ্ধান্ত হলো ঃ বড় পাকশাল থেকে একটা তারের সেচনি খুঁজে আন, রাজকীয় ছিন্নমস্তক পুনরুদ্ধার করতে প্রহরীদের আদেশ দাও।

যথাশীঘ্র যন্ত্রপাতি এনে হাজির করা হলো; তারের সেচনি, ছাঁকনি, সোনার থালা আর ঝাড়ন ইত্যাদি কটাহের পাশে এনে রাখল। ততক্ষণ প্রহরীগণও আস্তিন গুটিয়ে প্রস্তুত। রাজকীয় দেহাবশেষ তুলে আনার জন্য কারো হাতে তারের সেচনি, কারো হাতে ছাকনি। সেচনির ঠোকাঠুকি আর কটাহের তলদেশ পর্যন্ত ঘর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে কটাহের জলে ঘূর্ণীপাক সৃষ্টি হতে লাগল। কিছুক্ষণ পর একজন প্রহরী গম্ভীর মুখে দুই হাত দিয়ে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে একটা সেচনি উত্তোলন করল। মুক্তোর টুকরোর মতো বিন্দু বিন্দু জল ঝরছিল ঐ পাত্র থেকে। ঐ পাত্রে ছিল একটি মানুষের মাথার খুল। সবাই যখন বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল সে তখন ঐ করোটি একটি সোনার থালায় নামিয়ে রাখল।

—হায় ভগবান! আমাদের মহারাজ! রাজরানী, উপপত্নীগণ, মন্ত্রীগণ এমন কি খোজাগণও কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। তাদের কান্না থামল অল্পক্ষণের মধ্যেই। সেই সময় অন্য এক প্রহরী তুলে আনল আর একটি মাথার খুলি, ঠিক একই রকম, রাজার খুলির মতো।

একদিকে সাশ্রুনয়নে দাঁড়িয়ে তারা দেখছে, অপরদিকে ঘর্মাক্ত কলেবরে চলছে প্রহরীদের দ্বারা উদ্ধারকর্ম। কালো আর সাদা চুলের জটপাকানো এক গোছা চুল তারই সঙ্গে কালো আর সাদা গোঁফের কিছু অংশও তারা তুলে আনল। তারপর উঠল আরো একটি করোটি। তারপর আর তিনটা চুলের কাঁটা। জলীয় পদার্থ ছাড়া আর কিছু যখন রইল না তখন তারা কাজ বন্ধ করল। তিনটি স্বর্ণ থালায় সেগুলো ভাগ করে রাখল ঃ একটায় রাখল করোটি, একটায় থকল চুল, আর তৃতীয়টিতে রাখল চুলের কাঁটা।

—মহারাজের তো একটা মাথা ছিল। কোনটা তাঁর? রাজার নবম উপপত্নী জানতে চাইল।

—তাই তো… ..উৎকণ্ঠিতে মন্ত্রীদের ৫ জন তাকালেন অন্য জনের দিকে।

—চামড়া আর মাংসগুলি যদি সেদ্ধ না হতো তাহলেই তো বলা যেত। বামনদের একজন মন্তব্য করল।

খুব সতর্কতার সঙ্গে করোটিগুলি পরীক্ষা করতে বসল, কিন্তু দেখল আকৃতি আর রঙ তিনটারই এক। এমন কি কোনটা বালকের তাও তারা পারল না

ঠিক করতে। রাণী বললেন : রাজকুমার থাকাকালিন পড়ে গিয়ে রাজা কপালের ডানদিকে একটা আঘাত পেয়েছিলেন, মাথার খুলিতে এর দাগ থাকতে পারে। ঠিক কথা। বামনদের একজন খুঁজে পেল একটি করোটিতে এরকম একটা দাগ। আনন্দের সোর পড়ে গেল কিন্তু পরমুহূর্তেই অন্য একটি ঈষৎ পীতাভ করোটির কপালের ডানদিকে ঠিক এরকম একটা দাগ খুঁজে বার করল অন্য আর একটি বামন।

—আমি জানি! আনন্দে বলে উঠল রাজার তৃতীয় উপপত্নী : আমাদের মহারাজের নাক খুব উঁচু ছিল।

খোজারা খুঁজতে লাগল। যদিও একটা করোটিতে নাসিকা কিঞ্চিৎ বেশি উঁচু মনে হলো, তবু তিনটি মিলে তেমন কিছু পার্থক্য নজরে এল না। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ঐ করোটিতে দাগটা ছিল না কপালের ডানদিকে।

—তাছাড়া, মন্ত্রীগণ খোজাদের লক্ষ্য করে বললেন, মহারাজার মাথার পেছন দিকটা কি উঁচু মতন ছিল?

—মহারাজের মাথার পশ্চাৎ দিক কখনো লক্ষ্য করিনি তো? রাজরাণী আর উপপত্নীরা নিজ নিজ স্মৃতির ভাণ্ডার অন্বেষণ করতে লাগলেন। কেউ বললেন, উঁচু, কেউ বললেন, সমতল। খোজাদের মধ্যে যে রাজার কেশবিন্যাস করে, তাকে প্রশ্ন করলে সেও নিরুত্তর।

কোনটি রাজার ছিন্নমুণ্ডের করোটি স্থির করবার জন্য সেই সন্ধ্যায় রাজকুমার এবং মন্ত্রীদের একটা সভা বসল। কিন্তু নিস্ফল চেষ্টা। আর এক নতুন সমস্যা চুল আর গোঁফ নিয়ে। রাজার গোঁফ সাদা নিঃসন্দেহ কিন্তু ধূসর হয়ে যাওয়ার দরুণ কোনটি কার করোটি সিদ্ধান্ত করা কঠিন বোধ হলো। অর্দ্ধরাত পর্যন্ত আলোচনার পর নবম উপপত্নীর আপত্তিক্রমে কয়েকটা লাল চুলের সমস্যার একটা সমাধান হলো। রাজার গোঁফে কয়েকটা বাদামী চুল ছিল সে বিষয়ে সে নিশ্চিত ; কিন্তু তাহলেও একটিও লাল চুল ছিল না সে সিদ্ধান্ত কি করে সম্ভব? আবার আলোচনায় বসবে ঠিক হলো। কোনো সমাধানে আসা হলো না।

পরদিন ভোর পর্যন্ত কোনো সমাধান খুঁজে পেল না। আধা ঘুমে হাঁই তুলতে তুলতে আলোচনা অব্যাহত রইল। ভোরের মোরগ দু দু বার ডেকে গেল যখন তারা একটা নিশ্চিত নিরাপদ সমাধানে আসতে পারল। সিদ্ধান্ত হলো, সোনার কফিনে করে রাজার শবদেহের সঙ্গে তিনটি করোটিকেই সমাধিস্থ করতে হবে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হলো এক সপ্তাহ পরে। সারাটা নগর উত্তেজনায় উদ্বেল হয়ে উঠল। রাজধানীর নাগরিক এবং বহু বিদেশাগত দর্শক রাজকীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে দলে দলে যোগদান করল। দিনের আলো ছড়িয়ে পড়তেই পথে ঘাটে লোকে লোকারণ্য, ছেলে, পুরুষ, নারী শিশু সবাই।

মাঝে মাঝে টেবিলের উপর উৎসবের নৈবেদ্য সাজানো। দ্বিপ্রহরের আগেই অশ্বারোহী প্রহরী পথে জনতার ভিড় হটিয়ে দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে এল একটা শোভাযাত্রা। হাতে নিশান ব্যাটন, বাদ্য, ধনুক, পরশু, এমনি আরো কত কি; তার পিছনে ছিল চারটি শকট বোঝাই বাদ্যকরের দল। অসমতল পথে উঠানামা করতে করতে এগিয়ে আসছিল হলুদ বর্ণের একটা চন্দ্রাতপ। রাজার শবদেহ আর তিনটি মাথা সহ সোনার শবাধার বাহিত শবযান চোখে পড়ছিল।

জনতা নতজানু হয়ে অপেক্ষমান। তারি ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় নৈবেদ্য-সাজানো সারিবদ্ধ টেবিলগুলি। মৃত রাজার আত্মার সঙ্গে সঙ্গে রাজহত্যাকারী দুজনের প্রেতাত্মাও উৎসর্গিত অঞ্জলি পাবে এই কথা ভেবে জাগ্রত ক্রোধ সংবরণ করছিল কিছুকিছু রাজভক্ত প্রজা। কিন্তু কোনো উপায় ছিল না তাদের।

তারপর এল রাজরানী আর রাজার উপপত্নীদের বাহিত শকট। জনতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সেদিকে, তারাও দেখলেন জনতাকে। ক্রন্দন থামল না। তারপর এল শোকের ছায়ায় সমাচ্ছন্ন মন্ত্রীবর্গ, খোজা বাহিনী আর বামন যুগল। কিন্তু জনতার মধ্যে কেউ মনোযোগ দিল না, তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করল না। পদমর্যাদার সকল চিহ্ন মুছে গিয়ে শ্রেণীহীন জনতার মাঝে তারাও লীন হয়ে গেল।

Forging the Sword
October 1926

আহ কিউ-এর বিশুদ্ধ কাহিনী

১

ভূমিকা

আহ কিউ-এর জীবনচরিত রচনা করব অনেকদিন থেকে এই ইচ্ছে পোষণ করতাম। কিন্তু এই বাসনার পেছনে কেমন একটা দ্বিধা যেন উঁকি-ঝুঁকি দিত যা থেকে আমি বুঝতে পারতাম নিজে যাঁরা যশ অর্জন করেছেন তাঁদের একজন নই আমি; কারণ চিরায়ত ব্যক্তি সত্তার কীর্তিগাথা লিপিবদ্ধ করতে প্রয়োজন এমনি এক অমর লেখনী যা একদিকে শাশ্বত ব্যক্তিসত্তাকে পরিচয় করিয়ে দেবে অনাগত বংশধরদের কাছে, আবার অপরদিকে তেমনি

ব্যক্তিসত্তা পরিচিত করবে অমর লেখনীকে। যতদিন না মনে হয় সে এক বিচিত্র বিস্ময়, কে জানে কে দেবে কাকে পরিচয়। কিন্তু তবুও, কোন এক দৈত্য-দানোর প্রভাবেই বুঝি বা ফিরে ফিরে আসত আহ কিউ-এর কথা লিখবার বাসনা।

তথাপি যখন কলম তুলে নিলাম, বুঝতে পারলাম এই অনতি-শাশ্বত রচনায় সেকি দুরতিক্রম বাধা! প্রথম প্রশ্ন মনে এল, কী হবে এর শিরোনাম। কনফিউসিয়স বলেছেন, যদি নামাকরণ নির্ভুল না হয়, বক্তব্যে সত্যের ঝঙ্কার কানে বাজবে না। বিনা দ্বিধায় মানতে হবে এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে। জীবনী বহু রকমের আছে: বিধিবদ্ধ নিয়মমাফিক জীবনী, আত্মজীবনী অননুমত জীবনী, সাধু জীবনী, অনুপূরক জীবনী, পারিবারিক ইতিহাস, নক্সা কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এর কোনোটাই আমার কাজে লাগেনি। নিয়মমাফিক বিধিবদ্ধ জীবনী? এই রচনাকে স্পষ্টত প্রামাণ্য ইতিহাসের কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সমপর্যায়ে ফেলা যাবে না। আত্মজীবনী? কিন্তু এটা পরিষ্কার আমি আহ কিউ নই। যদি আমার রচনাকে অননুমত জীবনী আখ্যা দিই তাহলে এর প্রামাণিক জীবনী কোনটা? উপকথা বলা অসম্ভব, কারণ আহ কিউ রূপকথার মানুষ ছিল না। অনুপূরক জীবনী বলব? কিন্তু আহ কিউ-এর একটি আদর্শ জীবনী রচনা করবার জন্য জাতীয় ঐতিহাসিক সংস্থাকে (National Historical Institute) তো কেউ আদেশ দেয়নি! এটা সত্যি যে যদিও ইংরেজী ইতিহাসে জুয়াড়ির জীবনকথার কোনো উল্লেখ নেই, তবু বিখ্যাত লেখক কোনান ডয়াল "রডনে স্টোন" (Rodney Stone) গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। (চীনাভাষায় এই উপন্যাসটির নামকরণ হয়েছিল Supplementary Biographies of Gamblers জুয়াড়ির অনুপূরক জীবনী) কিন্তু একজন বিশিষ্ট লেখকের বেলায় যা মেনে নেওয়া যায়, আমার নিজের বেলায় তা নয়। তারপর ধরা যাক পারিবারিক ইতিহাস কিন্তু আমি জানিনা আহ কিউ আর আমি একই পরিবারভুক্ত কিংবা নয়, অথবা তার পুত্র কিংবা পৌত্রগণ কেউ তো আমাকে এ কাজে নিযুক্ত করেনি। যদি আমি একে বলি "নক্সা", তাহলে প্রতিবাদ উঠবে যে আহ কিউ মানুষটার পূর্ণ বিবরণ নেই এটা সত্যি নয়। একটি ছোট্ট কথায় বলতে গেলে এই রচনা একটি সত্যকার জীবনী কিন্তু যেহেতু আমি ফেরিওয়ালার আর কুলিমজুরের ভাষায় অমার্জিত ভঙ্গীতে লিখে থাকি, এত বড়ো গালভরা একটা শিরোনামের কথা ভাবতেও পারিনা। সুতরাং "ত্রিধর্ম আর নব গোষ্ঠী" (Three Cults and Nine Schools (ত্রি ধর্ম হচ্ছে—কনফিউসিয় ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং তাওধর্ম। নব গোষ্ঠীর মধ্যে আছে কনফিউসিয়, তাও এবং আরো অন্যান্য। যেসমস্ত ঔপন্যাসিক এদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না তাঁরা গণ্যমান্য বলে বিবেচিত হতেন না।) অন্তর্ভুক্ত নয় এমনি ঔপন্যাসিকদের কয়টি

বাধাবুলি বেছে নিই। অবান্তর কথা অনেক হয়েছে, এবার ফিরে যাই বিশুদ্ধ কাহিনীতে। এই ছত্রের শেষ দু'টি কথাই হবে আমার রচনার শিরোনামা কিন্তু সুপ্রাচীন গ্রন্থ True story of Calligraphy-র (ক্যালিগ্রাফির বিশুদ্ধ কাহিনী "চীও রাজবংশীয় ফেঙ য়ু" Feng Wu রচিত একটি গ্রন্থ, ১৬৭৪-১৭১১) কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও করবার নেই কিছু।

যে দ্বিতীয় বাধার সম্মুখীন হয়েছিলাম সেটা ছিল এমনি ভাবনা যে, এ ধরনের জীবনী রচনা শুরু হওয়া উচিত এই ভাবে, অমুক যার অপর নাম অমুক, তমুক গ্রামের বাসিন্দা ছিল কিন্তু আহ কিউ এর কী পদবী আমি জানিনা। একবার মনে হয়েছিল তার নাম চাও (Chao) কিন্তু পরদিনই ব্যাপারটা আমার কেমন গুলিয়ে গেল। এটা ঘটেছিল, যেদিন মিঃ চাও-এর ছেলের পরীক্ষা পাশের খবর কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে প্রচার করেছিল, তারপর। আহ কিউ তখন সবেমাত্র দুই পাত্র হলুদ মদ গিলেছে। বাজনা বাদ্যির আওয়াজ শুনেই শুরু করল তিড়িং তিড়িং নাচ। এ তারও গৌরব, সেও যে চাও বংশের একজন। ঠিক হিসেব করলে কেবল তিন পুরুষের ব্যবধান। সে সময় কয়জন পথচারীও অবাক হয়ে দেখছিল আহ কিউকে। পরদিন চৌকিদার এসে আহ কিউকে ডেকে নিয়ে গেল মিঃ চাও-এর বাড়িতে। তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠলো রাগে। তিনি গর্জন করে উঠলেন: আহ কিউ, হতভাগা শয়তান কোথাকার! তুমি নাকি বলেছ, তুমি যে বংশের আমিও সেই বংশের লোক?

আহ কিউ কোনো জবাব দিল না।

যতই সে তাঁর মুখের দিকে তাকাতে লাগল ততই মিঃ চাও-এর রাগ বাড়তে লাগল। ভয় দেখিয়ে কয়েক পা সমুখে এগিয়ে তিনি বললেন: এইসব বাজে কথা বলতে তোমার সাহস হলো কেমন করে? তুমি আমার আত্মীয় হবে কোন্ সুবাদে? তোমার পদবী কি চাও?

এবারও আহ কিউ কোনো জবাব দিল না। পশ্চাৎ অপসরনের কথাই সে ভাবছিল, যখন মিঃ চাও আচমকা তার কাছে গিয়ে ঠাস্ করে এক চড় বসিয়ে দিলেন তার গালে।

—তোমার পদবী চাও? এত সৌভাগ্য তোমার আছে মনে করো? এই পদবীর উপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে কোনো কথাই আহ কিউ আর বলল না। বাম গণ্ডে হাত বুলোতে বুলোতে চৌকিদারের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। বাইরে এসে আবার হাজার গালাগাল শুনল চৌকিদারের মুখে, দুশো ঘা খেয়েও ধন্যবাদ দিল তাকে। যারা শুনেছে তারাই বলল আহ কিউ একটা গর্দভ শুধু এমনি মার খায় কেউ?

তার পদবী চাও হলেও, মনে হয় নয়গ্রামে একজন চাও ছিল জেনেও অমনি গলা ফাটিয়ে বড়াই করবার কী ছিল তার ? এরপর আর আহ্ কিউ-এর পিতৃপুরুষের কথা কেউ উল্লেখ করেনি, তাই আমি নিজেও এযাবত জানিনা তার সত্যিকার পদবী কী ছিল।

এই জীবন চরিত রচনায় তিন নম্বর অসুবিধে ছিল এই যে, আহ কিউ-এর ব্যক্তিগত নামের বানানই বা কী এবং কেমন করে তা লেখা উচিত, কিছুই আমি জানতাম না। তার জীবদ্দশায় সবাই তাকে আহ কিউয়েই (Ah Quei) বলে ডাকত, কিন্তু তার মৃত্যুর পর কেউ আর এই নাম উচ্চারণ করত না ; কারণ "বংশ ফলক বা রেশমে লিখে রাখবার" (এই শব্দ সমষ্টি খৃষ্ট জন্মের তিন শতাব্দীপূর্বে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রাচীন চীন দেশে বাঁশ এবং রেশম লিখনবস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হতো) মতো মানুষদের কেউ একজন সে ছিল না। যদি তার নামকে বাঁচিয়ে রাখবার কোনো প্রশ্ন আসে তবে এই বর্তমান রচনাই হবে তার প্রথম প্রচেষ্টা। সুতরাং গোড়াতেই আমাকে এই বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রশ্নটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছি ; আহ কিউয়েই-কোনটা, দারুচিনি অর্থে 'কিউয়েই' না আভিজাত্য অর্থে কিউয়েই ? যদি তার অপর নাম হতো মুন প্যাভিলিয়ন অথবা চান্দ্রোৎসব মাসে সে তার জন্মদিন পালন করত, তাহলে 'কিউয়েই' অর্থ নিশ্চয় বলতাম দারুচিনি। (চান্দ্রোৎসব মাসেই দারুচিনি গাছে ফুল ফোটে। চীনা কিংবদন্তী অনুসারে চাঁদের বুকে ছায়াকেই ধরা হয় দারুচিনি গাছ।)

কিন্তু যেহেতু তার অন্য কোনো নাম ছিল না, থাকলেও কেউ জানত না এবং যেহেতু শ্রদ্ধাগীতি শুনবার আশায় জন্মদিনে কোনো অতিথি আমন্ত্রণ করত না, তাই আহ কিউয়েই (অর্থে দারুচিনি) লেখা স্বেচ্ছাচার। আবার আহ কিউ (সাফল্য বা সফলতা) নামে যদি তার কোনো জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা থাকত তাহলে তাকে নিশ্চয়ই আহ কিউয়েই (আভিজাত্য) বলা যেত। কিন্তু সে নিঃসঙ্গ। সে একা সুতরাং কোনো যুক্তি নেই আহ কিউয়েই বলবার। অন্যসব, কিউয়েই ধ্বনি যুক্ত কোনো অসাধারণ বর্ণ আরও অপ্রযোজ্য। সেই জেলার পরীক্ষায় সফলকাম পরীক্ষার্থী মিঃ চাও-এর পুত্রকেও আমি এ প্রশ্ন করেছি। কিন্তু তার মতো একজন বিদ্বান ব্যক্তিও ব্যর্থ হয়েছিল।

তার মতে জাতীয় সংস্কৃতিকে জাহান্নামে পাঠাবার অভিপ্রায়ে পশ্চিমী বর্ণমালা প্রবর্তন সমর্থন করে চেন তু-সিউ (Chen Tu hsiu ১৮৮০-১৯৪২, রচনা কালে তিনি পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। নিউ ইয়ুথ মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। পরে তিনি চাইনিজ কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে দলত্যাগী হয়েছিলেন।)

New Youth পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন বলেই নামটি কোথাও খুঁজে

পাওয়া যায় নি। শেষ চেষ্টা হিসেবে আমাদের জেলার অধিবাসী কোনো একজন লোককে আহ কিউ-এর মামলায় আইনমত দলিলপত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম আটমাস পর এক চিঠিতে জানালেন যে, ঐসকল নথিপত্রে আহ কিউয়েই নামের কোনো উল্লেখ নেই। এটা সত্যি কিনা এবং আমার বন্ধু আদৌ কিছু করেছেন কিনা, সে সম্বন্ধে যদিও আমি অনিশ্চিত ছিলাম, তবু এই উপায়ে নামটির হদিশ করতে ব্যর্থ হয়ে অন্য কোনো পথের কথা ভাবনায় এল না। যেহেতু আমার আশঙ্কা যে ভাষার ধ্বনি-বিজ্ঞানের নতুন নিয়মাবলী সর্বসাধারণ্যে এখনও প্রচলিত হয়নি, সুতরাং পশ্চিমী বর্ণমালা অনুযায়ী ইংরেজী বানান প্রণালীতে আহ কিউয়েই বানান সংক্ষেপে আহ কিউ লেখা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এর অর্থ নিউ ইয়ুথ পত্রিকাকে অন্ধভাবে মেনে নেওয়া। এই জন্যে খুবই লজ্জিত নিজের কাছেই। কিন্তু যেহেতু মিঃ চাও-এর পুত্রের মতো বিদ্বান ব্যক্তিও যেখানে আমার সমস্যা সমাধানে সমর্থ হলো না, তখন আর কী আমার করবার আছে? আমার চতুর্থ প্রতিবন্ধক ছিল আহ কিউ-এর জন্মস্থান প্রসঙ্গে। যদি তার পদবী চাও বলেই ধরে নেওয়া যায় তাহলে এখনও বলবৎ প্রাচীন প্রথা অনুসারে অধিবাসীদের জেলাওয়ারী ভাগ করলে শতেক পদবী পুস্তকের (The hundred Surname একটি অতি প্রাচীন স্কুল পাঠ্য প্রথম ভাগ। পদবীগুলি ছড়ার আকারে লিপিবদ্ধ আছে।) টীকাভাষ্যগুলিতে চোখ বুলিয়ে দেখা যায়, আর ওতে আছে, কানসু (Kansu) প্রদেশের অন্তর্গত তিয়েনশুই-এর (Tienshui) অধিবাসী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই পদবীও সমালোচনার যোগ্য। সুতরাং আহ কিউ-এর জন্মস্থানের কথাও অনিশ্চিত থাবল। যদিও সে অধিকাংশ সময়ে ওয়েইচুয়াঙ-এ (Weichuaug) বসবাস করত, তবু কখনও অন্যত্রও যেত। সুতরাং ওয়েইচুয়াঙ এর অধিবাসী বলাও ভুল হবে। বাস্তবপক্ষে এর অর্থ হবে ইতিহাসকে বিকৃত করা।

তবে আমার কেবল একটিমাত্র সান্ত্বনা যে, আহ বর্ণটি সম্পূর্ণ নির্ভুল। এই বর্ণটি নিশ্চিত কোনো ভ্রান্ত উপমার ফলপ্রসূত নয়, আর যেকোনো পণ্ডিত সুলভ সমালোচনা প্রতিরোধেও সক্ষম। অন্য সমস্যাগুলি সম্পর্কে বলতে গেলে, আমার মতো অবিদ্বানের পক্ষে সে সমস্যা সমাধান অসম্ভব; আমি কেবল এই আশাই করতে পারি যে, যাঁর ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর আসক্তি আছে, সেই ডঃ হু সিহ-এর (Dr. Hu Shih) শিষ্যরাই হয়তো একদিন ভবিষ্যতে এর উপর অ...ও আলোকপাত করতে পারবে। আমার ভয় হয়, ততদিনে হয়তো আমার রচনা এই আহ কিউ-এর বিশুদ্ধ কাহিনী বিস্মৃতির গহ্বরে হারিয়ে যাবে। এই আমার রচনার ভূমিকা।

২

আহ্‌ কিউ-এর বিজয় কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

আহ্‌ কিউ-এর পদবীর অনিশ্চয়তা, নিজ নামের অনিশ্চয়তা এবং জন্মস্থানের অনিশ্চয়তা ছাড়াও এমন কি তার "শিক্ষা দীক্ষার পরিবেশ" সম্বন্ধেও কিছু অনিশ্চয়তা ছিল। এর কারণ ওয়েই চুয়াঙ-এর অধিবাসীরা তাকে কেবল খাটিয়ে নিত অথবা তাকে নিয়ে হাসিতামাশা করত। অথচ তার শিক্ষা-দীক্ষার পরিবেশ-এর কথা কিছুমাত্র ও ভাবত না। আহ্‌ কিউ নিজে এ ব্যাপারে নীরব থাকত। কারও সঙ্গে ঝগড়া বাধলেই কেবল তার দিকে সে তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করত আর বলত: দিন আমারও ছিল এক সময়। নিজেদের কি ভাবো তোমরা?

আহ্‌ কিউ-এর কোনো পরিবার পরিজন ছিল না। ওয়েই চুয়াঙ গ্রামের মন্দির-চাতালে একটা কুঁড়ে ঘরে শুয়ে থাকত। কোনো বাধা-ধরা কাজ করত না, এ-ও-তা টুকটাক কাজ করত; কখনও গম কাটতে যেত, ধান ভাঙবার কাজ থাকলে তাও করত, নৌকোর লগি ঠেলতে হলে লগি ঠেলত। বেশি দিনের কাজ হলে অস্থায়ী নিয়োগকর্তার বাড়িতেই রাত কাটাত কিন্তু কাজ শেষ হওয়া মাত্রই বাড়ি ছেড়ে যেত। তাই কাজের প্রয়োজন হলেই আহ্‌ কিউ-এর কথা সবার মনে পড়ত, কিন্তু তারা যা স্মরণ করত সেটা তার শ্রমের কথা, তার শিক্ষা দীক্ষার পরিবেশের কথা নয়, কাজ শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আহ্‌ কিউ-এর কথাই ভুলে যেত। তার শিক্ষা দীক্ষা পরিবেশ-এর কথা না-ই বললাম। একবার কিন্তু এক বৃদ্ধ বলেছিল, কত কাজের মানুষ এই আহ্‌ কিউ! সে সময় কোমর পর্যন্ত বিবস্ত্র আর তেমনি উদাসীন কৃশকায় আহ্‌ কিউ সম্মুখেই দাঁড়িয়ে ছিল। কথাটা সত্যি সত্যি না পরিহাস ব্যঙ্গ মিশ্রিত ছিল। উপস্থিত অন্যমানুষেরা বুঝতে পারেনি, কিন্তু আহ্‌ কিউ খুব খুশি হয়েছিল মন্তব্যটা শুনে।

আহ্‌ কিউ কিন্তু খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করত নিজের সম্বন্ধে। ওয়েই চুয়াঙ বাসিন্দাদের ছোটো চোখে দেখত, এমন কি ঐ তরুণ পণ্ডিত দুইজনকে কানাকড়ি আমল দিত না কারণ সব তরুণদেরই তো সরকারি পরীক্ষায় বসতে হতো, বিশেষত্ব কিছু ছিল না, তার মতে। মিঃ চাও এবং মিঃ চিয়েনকে গ্রামের মানুষেরা খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখত শুধু তাঁরা বিত্তশালী বলে নয়, তাঁরা দুই জন তরুণ শিক্ষার্থীদের পিতা সেই জন্য। কিন্তু আহ্‌ কিউ কোনো বিশেষ সম্মান দেখাত না এদের। সে ভাবত, আমার ছেলেরাই বা কম যাবে কিসে? উপরন্তু, অনেক কয়বার শহরে যাতায়াতের পর আহ্‌ কিউ-এর আত্মাভিমান বৃদ্ধি পেলেও শহরবাসীদের প্রতি একটা স্বভাব জাত ঘৃণা পোষণ করত। তিন ফুট বাই তিন ইঞ্চি মাপের কাঠের তকতা দিয়ে তৈরি একটা বেঞ্চকে

ওয়াইচুয়াঙের মানুষেরা বলত লংবেঙ। আহ কিউও বলত লংবেঙ। কিন্তু শহুরে মানুষের ভাষায় 'সাদা বেঞ্চ', তার মতে এটা একদম ভুল! একেবারে বাজে। আবার বড় মাছের মাথা তেলে ভাজতে গিয়ে ওয়েই চুয়াঙ গ্রামবাসীরা রসুনের পাতা আধইঞ্চি মতো টুকরো টুকরো করে মিলিয়ে দেয়, আর শহরের লোকেরা দেয় একেবারে কুঁচি কুঁচি করে। সে ভাবত, এও ঠিক নয়। বিশ্রী লাগে। ওয়েইচুয়াঙ গ্রামের মানুষেরা একেবারে অনভিজ্ঞ গেঁয়ো, শহরে গিয়ে মাছ ভাজতে দেখেনি।

যে আহ কিউ-এর অবস্থা একদিন খুবই সচ্ছল ছিল, বিষয়ী এবং সু-কর্মী বলে পরিচিত, সেই আহ কিউ হয়তো কয়েকটি হতভাগা শারীরিক ত্রুটি না থাকলেও একজন প্রায় খাঁটি মানুষ বলে গণ্য হতে পারত। সবচেয়ে বিরক্তকর লাগল, যখন অনেকদিন আগে কবে মনে নেই, মাথার কোনো অংশে কয়েকটা দাদের মতো দেখতে চকচকে ক্ষতচিহ্ন চোখে পড়ল। নিজের মাথায় হলেও আদৌ সম্মানজনক মনে হতো না এগুলোকে। যেজন্য দাদ অথবা সমার্থবাচক কোনো শব্দ মুখে আনতে বিরত থাকত। এরপর কিন্তু এথেকে আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল : উজ্জ্বল এবং আলো এ দুটি নিষিদ্ধ শব্দ হয়ে গেল, আবার এর আরও পরে এমন কি ল্যাম্প এবং মোমবাতি শব্দ দুটিও তার কাছে ট্যাবু হলো। এই নিষেধ লঙ্ঘিত হলে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যে ভাবেই হোক, আহ কিউ ক্রোধে আত্মহারা হয়ে যেত। সঙ্গে সঙ্গে দাদের ক্ষতগুলি টকটকে লাল রঙ ধারণ করত। নিষেধ অমান্যকারী অপরাধীকে সে উপেক্ষা করত, সেই ব্যক্তি মুখের উপর সরস জবাব দিতে অপারগ হলে তার উপর কেবল অভিশাপ বর্ষণ করত। আর দুর্বল প্রতিপক্ষ হলে তাকে, ঘা কতক দিয়ে ফেলত। অথচ খুব অদ্ভুত যে, এই সমস্ত লড়াইয়ে আহ কিউ পরাস্ত হতো। শেষপর্যন্ত নূতন কৌশল অবলম্বন করত। চোখে একটা প্রচণ্ড জ্বালার দিপ্তী ফুটে উঠতেই নিজেকে গুটিয়ে নিত।

তার চোখ-মুখের অমনি প্রচণ্ড চকমকি দেখে ওয়েইচুয়াঙ গ্রামের কুঁড়ে মানুষগুলো তাকে পেয়ে বসত, তাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপে আরও মেতে উঠত। তাকে দেখে তারা চমকে উঠেছে এমনি ভান করত, বলত : ঐদেখো! আলো জ্বলছে!...

সাধারণতঃ আহ কিন্তু কিন্তু টোপ গিলত। সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রচণ্ড ভাবে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাত এদের দিকে।

—আরে দেখ না, মোমবাতি...মোমবাতি...

তারা ভড়কাত না, উত্যক্ত করে তুলতো আহ কিউকে! আসহায় আহ কিউ'র উপযুক্ত প্রত্যুত্তরের জন্য মাথা ঘামানো ছাড়া আর কিছু থাকতনা করবার।

—অপোগণ্ড, মূর্খ সব…বিড় বিড় করত আহ্ কিউ।

এমনি সন্ধিক্ষণে তার মনে হতো মাথার ক্ষতচিহ্নগুলি দাদ জনিত ক্ষত চিহ্ন নয় শুধু, এগুলো আরও মহৎ, আরও সম্মানজনক। যাইহোক, আমরা আগেই বলেছি আহ্ কিউ একজন বিষণ্ণ লোক : সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারত সে নিজেই ট্যাবু ভঙ্গছে, সংযত করে নিত নিজেকে।

যদি এতেও ঐ নিষ্কর্মা মানুষগুলো তাঁর পিছু লাগা থেকে বিরত না হতো, তবু আহ্ কিউকে খুঁচিয়ে যেত, তখনই আবার শুরু হতো দুই পক্ষে লড়াই। তারপর যখন প্রতিপক্ষ স্পষ্ট করে বুঝতে পারত যে আহ্ কিউ পরাস্ত হয়েছে, তার বাদামী চুলের বেনী টেনে দেওয়া হয়েছে, তার মাথা চার পাঁচবার দেওয়ালে ঠোকা হয়েছে, কেবল তখনই নিশ্চিত জয়লাভ বুঝে চলে যেত গ্রামের ঐসব নিষ্কর্মা বাউণ্ডুলে মানুষগুলি। এক সেকেণ্ড মতো সময় সেইখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত আহ্ কিউ, দাঁড়িয়ে ভাবত : বুঝি নিজের ছেলের হাতেই মার খেলাম! কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে আজকের দুনিয়াটা…

কথাটা ভাবতেই জয়ের আনন্দে তার মন ভরে উঠত, সন্তুষ্ট চিত্তে সেও চলে যেত নিজের পথে।

যাকিছু তার মনে আসত পরমুহূর্তে নিশ্চিত সবাইকে তাই বলে বেড়াত। সেই জন্য আহ্ কিউকে নিয়ে যারা ঠাট্টা তামাশা করত তারা বুঝত মানসিক জয়লাভের জন্য এই একমাত্র অস্ত্র ছিল তার হাতে। কাজেই এরপর যে কেউ তার বাদামী রঙের চুলের বেনী ধরে টানত বা মুচড়ে দিত, সেই ব্যক্তি আগে থেকেই তার কথা বলবার সুযোগ বন্ধ করে দিতে বলত : আহ্ কিউ, ছেলে তার বাপকে মেরেছে এবার কিন্তু তা নয়, এ হচ্ছে মানুষ মারছে পশুকে। একবার কথাটা তুমিও বলো আমরা শুনি, মানুষ মারছে পশুকে।

তারপর আহ্ কিউও তার চুলের বেনী হাতের মুঠোয় নিয়ে মাথাটা একদিকে কাত করে বলত : মানুষ? না, একটা পোকা…তাই না? আমি একটা পোকা, হলো? রেহাই দেবে এবার?

কিন্তু একটা তুচ্ছ কীট বলে মেনে নিয়েও তারা রেহাই দিত না তাকে। যতক্ষণ না কিছু পেত হাতের কাছে তাই দিয়ে বার বার ঠুকতো তার মাথায়। তারপর তারা জয়ের আনন্দে খুশী হয়ে ঘরে ফিরত। নিশ্চিন্ত হতো এই ভেবে এইবার আহ্ কিউ খতম হয়েছে। কিন্তু দশ সেকেণ্ড না কাটতেই আহ্ কিউও উঠে দাঁড়াত, নিশ্চিন্ত হতো এই আনন্দে যে সেও জয়লাভ করেছে। ভাবত সে তো, একজন সেরা আত্মনিন্দুক, আর এই বাক্যাংশ থেকে আত্ম-নিন্দুক কথা বাদ দিলে থাকবে কেবল সেরা। সরকারি পরীক্ষার সবচেয়ে সফল পরীক্ষাগুলিকেও সেরা বলা হবে না? তোমরা নিজেকে কী মনে করো তাহলে?

এইরকম নানা কৌশল খাটিয়ে নিজেকে শত্রু পক্ষের সমকক্ষ মনে করে নিয়ে

আহ কিউ খুশী মনে চলতে চলতে মদের দোকানে ঢুকত, দুই এক পাত্র গিলত, আবার সবার সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করত, হাসি মস্করা করত, আবার ঝগড়া করত, আবার নিজেকে বিজয়ী মনে করে বেরিয়ে আসত। তারপর হৃষ্টচিত্তে গ্রামের মন্দির চাতালে ফিরে যেত। বালিশে মাথা রাখবার সঙ্গে সঙ্গে বিভোর ঘুমে ডুবে যেত। হাতে পয়সা থাকলে জুয়া খেলত। কয়েকজন লোক মাটিতে গোল হয়ে ঘিরে বসত, আহ কিউ বসত সবার মাঝখানে। ঘামে তার সারা মুখ রাঙা হয়ে উঠত। সবার চেয়ে উঁচু গলায় সে হাঁক দিত : সবুজ ড্রাগনের উপর চারশ !

হেই, দান খোল।

হাঁক দিল আড্ডার মালিক। তারও মুখ ঘামে সপ্‌সপে। ঘুঁটির বাক্স খুলল। সুরালা গলায় বলল :

—স্বর্গের দুয়ারে···কর্নারে কিছু নেই···পপুলারিটির প্যাসেজ···কোনো বাজি নেই। আহ কিউ'র বাজি হেরে গেল। সরিয়ে নাও।

—প্যাসেজে আবার বাজি রইল···একশ···একশ পঞ্চাশ···এমনি সুরের সঙ্গে সঙ্গে আহ কিউ-এর টাকা ঢুকতে লাগল অপরের থলিতে একের পর এক। তারপর সে বাধ্য হলো ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসতে। বাইরে দাঁড়িয়ে নির্বিকার আগ্রহে তাকিয়ে থাকত যতক্ষণ না আড্ডা ভেঙে যেত। অনিচ্ছার সঙ্গে ফিরে আসতো গ্রামের মন্দির চাতালে। পরদিন সে আবার কাজে বেরুতো, চোখেমুখে তখনও স্ফিতি।

যাহোক, 'দুর্ভাগ্য কোনো সময় ছদ্মবেশী আশীর্বাদ' এই প্রবাদ বাক্যের সত্যতা প্রমাণিত হলো একদিন আহ কিউ-এর জীবনে। যেদিন দুর্ভাগ্যবশত সে জয়লাভ করলেও পরিণামে কেবল গ্লানির বোঝাই বইতে হলো।

ওয়েইচুয়াঙ গ্রামের কোনো একটা উৎসব দিনের সন্ধ্যাবেলার ঘটনা। প্রথানুযায়ী একটা যাত্রার পালা অভিনীত হবার কথা। আসরের ঠিক কাছাকাছি, প্রথানুযায়ী অনেক কয়টা জুয়ার টেবিলও সাজানো। জুয়ার আড্ডার বাজিধারকের গলার আওয়াজ ছাড়া আর কিছু যার কানে ঢুকে না, সেই আহ কিউও তিন মাইল দূরত্বের ব্যবধানে হলেও যাত্রার ঢাক ঢোলকের আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেল। সে সেদিন একের পর এক বাজি জিতল, তার কাছে তাম্রমুদ্রা রৌপ্য মুদ্রায় আর রৌপ্যমুদ্রা ডলারে পরিবর্তিত হতে লাগল। একে একে ডলারের পাহাড় জমে গেল। উত্তেজিত অবস্থায় সে হাঁক দিল বাজি রাখলাম 'স্বর্গদ্বারে' দুই ডলার .

কিন্তু সে বুঝতে পারলনা—কে এবং কিসের জন্য মারামারি শুরু হয়েছিল। হঠাৎ কেমন গালাগাল ঘুষোঘুষি আর অনবরত লাথি সব মিলিয়ে কেমন একটা বিভ্রান্তিকর আওয়াজ তার মস্তিষ্কের ভেতরটায় তালগোল পাকিয়ে দিল। অতি কষ্টে সে উঠে দাঁড়াবার আগেই সবগুলো জুয়ার টেবিল চোখের পলকে

কোথায় উবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জুয়ারি দলেরও কোনো হদিশ রইল না।
শরীরের কোনো কোনো অংশে তার ব্যথা বোধ হতে লাগল, হয়তো বা লাথি ঘুষি আর প্রহারের জন্য—কেবল তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে কতকগুলি লোক। কোথায় কী একটা ভুল হয়েছে বুঝি, অনুভব করল সে। হাঁটতে হাঁটতে ফিরে গেল মন্দির চাতালে। হৈর্য ফিরে পেয়ে বুঝতে পারল তার সবগুলি ডলারও উধাও হয়েছে। উৎসব মেলার জুয়ার টেবিলের মালিকদের কেউই ওয়েইচুয়াঙ গ্রামের মানুষ নয়, কোথায় সে খুঁজবে ?
কেমন ধবধবে সাদা চিকমিকি রূপার একটা স্তূপ! সবগুলিই ছিল তার··· কিন্তু কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল সেগুলো! তার ছেলেরাই হয়তো ছিনিয়ে নিয়েছে, কিন্তু একথা ভেবেও সে শান্তি পেল না। নিজেকে কীটের চেয়ে অধম মনে করেও সে শান্তি পেল না। পরাজয়ের তিক্ততা এই প্রথম সে অনুভব করল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে পরাজয়কে জয়ে পরিণত করে নিল। ডান হাত তুলে পর পর দুবার চটাশ চটাশ চড় মারল নিজের গালে, চিকচিক করে উঠল গালটা। এইবার যেন তার বুকের ভেতরটা হালকা হলো। কারণ মনে হতে লাগল, যে লোকটা চড় মেরেছে সে আর কেউ নয় নিজেই। যে চড় খেয়েছে সে বুঝি অন্য কেউ, তার মনে হলো বুঝি সে প্রহার করছে অন্য কাউকে—যদিও তার গালের উপর জ্বালা মেটেনি তখনও। সে জয়লাভ করেছে, মনে এই সন্তুষ্টি নিয়ে আহ কিউ শুয়ে পড়ল।
কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

৩

আহ কিউ-এর বিজয় কাহিনীর আরও বিবরণ

জয়ের স্বাদ অনেকবার পেয়েছিল, কিন্তু একমাত্র মিঃ চাও-এর হাতে চপেটাঘাত খাবার সৌভাগ্য অর্জনের পর থেকেই আহ কিউ প্রসিদ্ধি পেল।
সেদিন চৌকিদারকে দুইশত মুদ্রা নগদ দিয়ে ক্রোধের বশে মাটিতে শুয়ে পড়েছিল সে। ক্ষণেক বাদে বলছিল আপন মনে—দিন দিন কোন পথে যাচ্ছে দুনিয়াটা! ছেলেরা বাপের উপর হাত তুলছে···!
পরমুহূর্তে অধুনা যাকে পুত্র বলে মনে করছে সেই মিঃ চাও-এর প্রতিপত্তি আর মর্যাদার কথা ভাবতে ভাবতে তার কর্মশক্তি আবার ফিরে এল। উঠে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে শুঁড়িখানার দিকে চলত লাগল। মুখে একটা গানের কলি, "স্বামীর সমাধি পাশে ঐ তরুনী স্বামী-হীনা"। সেইক্ষণে সে মিঃ চাও-এর শ্রেষ্ঠত্বও উপলব্ধি করতে পারল।
কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার যে এই ঘটনার পর সচরাচর যা নয় তেমনি সম্মান আর শ্রদ্ধা সবাই দেখাতে লাগল আহ কিউকে। এর কারণ, আহ কিউ মনে করত সে মিঃ চাও-এর পিতা; কিন্তু আসলে তা নয়। সাধারণতঃ ওয়েইচুয়াঙ গ্রামে

যদি সপ্তম সন্তান অষ্টম সন্তানকে মারধোর করত, অথবা লি অমুক চেঙ তমুককে, তাহলে ব্যাপারটাকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হতো না। মার-ধোরের ব্যাপারে মিঃ চাও-এর মতো কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম জড়িত না থাকলে গ্রামবাসীরা প্রসঙ্গটাকে আলোচনার যোগ্য মনে করত না। কিন্তু একবার আলোচনার যোগ্য বিবেচিত হলে, যেহেতু প্রহারকর্তা একজন খ্যাতনামা লোক, যে প্রহৃত হতো সেও প্রহার কর্তার প্রতিফলিত যশের কিছুটা ভাগ পেত। সেও কিছুটা খ্যাতি অর্জন করত। তবে আহ কিউ-এর অপরাধই স্বতঃসিদ্ধ ভাবে ধরে নেওয়া হয়েছিল কারণ বিশ্বাস ছিল মিঃ চাও-এর পক্ষে কোনো অন্যায় সম্ভব নয়। কিন্তু যদি আহ কিউ-এরই অপরাধ, তবে কেমন একটা অস্বাভাবিক সম্মান দেখানো হতো কেন তাকে? এর ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। তবে আমরা এইমাত্র যুক্তি তর্কহীন পূর্বানুমান উপস্থাপিত করতে পারি যে, আহ কিউ কর্তৃক মিঃ চাও-এর পরিবার ভুক্তির দাবী এর কারণ। সুতরাং, যদিও তাকে তারা প্রহার করেছিল, তথাপি আহ কিউ-এর দাবীর পেছনে হয়তো বা কোনো সত্য ছিল বলেও তারা মনে মনে আশঙ্কা পোষণ করত। তাই তার সঙ্গে আরও কিছু সশ্রদ্ধ ব্যবহার করাই নিরাপদ বিবেচিত হয়েছিল অথবা বিকল্পে কনফিউসিয় মন্দিরে প্রদত্ত বলির প্রসাদ গোমাংস সংক্রান্ত ব্যপারটার মতো হতে পারে বোধহয়। যদিও গোমাংস বলিদত্ত শুয়োরের অথবা ছাগালের মাংসের সমপর্যায়ভুক্ত, সবই জীব-উদ্ভূত। তবু যেহেতু ধর্মগুরু মহাপুরুষ কনফিউসিয়স নিজে গোমাংস গ্রহণ করেছিলেন সেইজন্য পরবর্তীকালে তদীয় শিষ্য কনফিউসিয়বাদীরা এই মাংস স্পর্শ করতে সাহস পেত না।

এরপর বহুদিন আহ কিউ-এর রমরমা অবস্থা চলতে লাগল। বসন্তকালের কোনো একদিন, নেশায় বুদ হয়ে আহ কিউ তখন পথ চলছিল। যেতে যেতে দেখল উদোম-গায়ে গুংপোওয়াঙ একটা পাঁচিলের তলায় রোদে বসে উকুন মারছে। একে দেখে তার নিজের গা'টাও চুলকে উঠল। গুংপোওয়াঙ-এর সারা গায় পাঁচড়া সে গোঁফ রাখত বলে সবাই তাকে নাম দিয়েছিল দাদওয়ালা গুংপো ওয়াঙ। যদিও 'দাদ' শব্দটা উচ্চারণ করত না, তবু আহ কিউ ভীষণ ঘৃণা করত ঐ লোকটাকে। আহ কিউ মনে করত পাঁচড়া জিনিষটা এমন কিছু আপত্তিকর নয়, কিন্তু ঐ মুখভর্তি লোম অদ্ভুত লাগত, ঘৃণার উদ্রেক করত। আহ কিউ তার পাশে গিয়ে বসে পড়ল। অন্য কোনো বাউণ্ডুলে হলে আহ কিউ এমনি চট করে তার পাশে বসে পড়তে সাহস পেত না কিন্তু গুংপোওয়াঙের পাশে বসতে ভয়টাই বা কী? আসল কথা, সে যে তার পাশে বসতে চাইছে এটাই তো ওয়াঙ-এর সৌভাগ্য।

আহ কিউ তার শতছিন্ন জ্যাকেটটা গা থেকে খুলে উল্টেপাল্টে দেখল। কিন্তু হয়তো বা কদিন আগে ওটা কেচেছিল অথবা তার জেবড়া-জোবড়া

স্বভাবের জন্যই হোক. বহু খোঁজাখুঁজির পর মাত্র তিন চারটে উকুন পেল। অপরদিকে গুঁপো ওয়াঙ একটার পর একটা চটপট ধরছে আর মুখে পুরে ফটফট আওয়াজে দাঁত দিয়ে চিবুচ্ছে।

প্রথমে আহ্‌কিউ হতাশ হলো, তারপর বিরক্ত হলো। ঐ জঘন্য গুঁপো ওয়াঙটা এতগুলো ধরে ফেলল, অথচ সে পেল মোটে কয়েকটা—কি লজ্জার কথা! দু একটা বড়ো বড়ো উকুন ধরবার বাসনা হলেও একটাও সে পেল না। অনেক চেষ্টা আর কসরতের পর মাঝারি ধরণের পেল একটা। সঙ্গে সঙ্গে মুখে পুরে জানোয়ারের মতো চিবুতে লাগল ওটাকে; কিন্তু একটা ক্ষীণ থুথু আওয়াজ বেড়িয়ে এল, গুঁপো ওয়াঙের মুখের আওয়াজ থেকে আরও ক্ষীণ। আহ কিউ-এর গা'য়ের ক্ষতচিহ্নগুলি দগ্‌দগে লাল হয়ে উঠেছিল তখন। জ্যাকেটটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। থুকথুক করে থুথু ফেলতে ফেলতে বলতে লাগল ঃ লোমশ কেঁচো কোথাকার! কেঁচো···

—এই গেঁয়ো কুকুর, কাকে গাল দিচ্ছিস? বলে গুপো ওয়াঙ ঘৃণাভাবে মুখ তুলে তাকাল তার দিকে।

ইদানিং আপেক্ষিক সম্মানের মাত্রাটা একটু বেড়ে যাওয়ায় আহ কিউ-এর দেমাকের মাত্রা যদিও বৃদ্ধি পেয়েছিল, তবু মারপিটে ওস্তাদ কোনো লোফারের মুখোমুখি হলেই সে একদম চুপসে যেত। কিন্তু এই ক্ষণে কেমন একটা ঝগড়া করবার অস্বাভাবিক মনোবৃত্তি তাকে পেয়ে বসছিল। এই জঘন্য লোমশ মুখওয়ালা জানোয়ারটা কোন্ সাহসে তাকে অপমান করে।

—দেখি কোন্ বাপের ব্যাটার সাহস আছে! নিতম্বদেশে দুই হাত রেখে আহ কিউ উঠে দাঁড়াল।

- হাড়ে চুলকুনি ধরেছে তোর, না রে? উঠে দাঁড়িয়ে গায়ে কোট চাপাতে চাপাতে বলল গুঁপো ওয়াঙ।

এইবার বুঝি ওয়াঙ পালাবে, এই মনে করে হাতে ঘুষি বাগিয়ে দুই পা সামনে এগিয়ে গেল আহ কিউ কিন্তু হাতের ঘুষি নেমে আসবার আগেই গুঁপো ওয়াঙ ধরে ফেলল তাকে, এমন জোরে হিঁচকে টান দিল যে সঙ্গে সঙ্গে বোম্ করে ঘুরে গেল আহ কিউ-এর মাথাটা। তারপর গুঁপো ওয়াঙ তার বেনী ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে গেল দেওয়ালের কাছে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী মাথা ঠুকে দেবে।

—ভদ্রলোক মুখ চালায় হাত চালায় না। মাথাটা একদিকে হেলিয়ে বলল, আহ কিউ।

স্পষ্টই গুঁপো ওয়াঙ ভদ্রলোক ছিল না, কেন না আহ কিউ-এর কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে সে বার বার পাঁচবার তার মাথা দেওয়ালে ঠুকে দিয়ে এমন সজোরে ধাক্কা দিল যে আহ কিউ টলতে টলতে দুই গজ দূরে ছিটকে পড়ল। গুঁপো ওয়াঙ খুশী হয়ে চলে গেল সেখান থেকে।

আহ কিউ-এর যতটুকু মনে পড়ে জীবনে এই ছিল তার প্রথম অপমান। কারণ তার ঐ মুখ ভরতি কুৎসিৎ গোঁফ জোড়ার জন্য গুঁপো ওয়াঙকে সব সময় সে অবজ্ঞা করত। অথচ কোনোদিন নিজে অবজ্ঞা পায়নি কারও কাছে। মারধোর তো দূরের কথা। আর সেদিন তার সমস্ত প্রত্যাশাকে ব্যর্থ করে দিয়ে গুঁপো ওয়াঙ তাকে প্রহার করল। হয়তো বাজারের ভেতর সেদিন তারা যা বলাবলি করছিল তাই বুঝি ঠিক। সম্রাট সরকারি পরীক্ষা লোপ করে দিয়েছেন, সুতরাং যেসব ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের আর কোনো চাহিদা রইল না।

ফলে চাও পরিবারের সম্মান প্রতিপত্তি সব নষ্ট হয়ে গেল এই জন্যই কি সবাই তার সঙ্গে এমনি অবজ্ঞার ব্যবহার করছে?

অস্থির-সঙ্কল্প চিত্তে আহ কিউ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। দেখল দূরে আরও একজন শত্রু আসছে। আগন্তুক মিঃ চিয়েনের জ্যেষ্ঠ পুত্র, যাকে আহ কিউ পছন্দ করত না। বড়ো শহরে কোনো বিদেশী স্কুলে পড়াশুনো করে সে বোধহয় জাপান গিয়েছিল। ছয় সাত মাস পর যখন দেশে ফিরে এল সে তখন সোজা পায়ে হাটে। তার মাথার চুলের বেনী উধাও হয়ে গেছে। তার মা খুবই কান্নাকাটি করলেন। তার স্ত্রী চার পাঁচ বার কুঁয়োর জলে ঝাঁপ দিতে চাইল। তার মা সবাইকে বলে বেড়াতে লাগলেন, "নেশার ঘোরে ছিল, সেই সময় নাকি কোনো এক দুষ্ট লোক বেনীটা কেটে নিয়ে গেছে। ভালো চাকরি পেত কিন্তু এখন এই বেনী না গজালে কে তাকে চাকরি দেবে—অপেক্ষা করতেই হবে। আহ কিউ এ কাহিনী বিশ্বাস করেনি। সে তার নাম দিল "নকল বিদেশী শয়তান" আর "বিদেশীর ঘুষ-খেকো দেশের শত্রু"। তাকে দূরে আসতে দেখেই আহ কিউ গালিগালাজ শুরু করল।

আহ কিউ যেটাকে বেশি ঘৃণার চোখে দেখত এবং বরদাস্ত করতে পারত না সেটা ছিল আগন্তুকের মাথায় কৃত্রিম চুলের বেণী। যারা কৃত্রিম বেণী রাখে মানুষ বলে গণ্য করা যায় না তাদের। এই সে মনে করত। আর তার স্ত্রী যে আরও একবার কুঁয়োর জলে ঝাঁপ দিতে চায়নি, এই থেকে প্রমাণ সেও সাধ্বী স্ত্রী নয়।

সেই নকল বিদেশী সয়তান আসছিল তখন।

—টেকো···গাধা···কোথাকার···

এতকাল আহ কিউ খুব নিচু গলায় গালাগাল করত, গলার আওয়াজ শোনাই যেত না। কিন্তু আজ তার মেজাজটা ভালো ছিল না, মনের ভেতর চেপে রাখা বিষ উদ্গার করে দিতে বদ্ধপরিকর ছিল তাই অজান্তেই কথাগুলো বেরিয়ে গেল তার মুখ দিয়ে।

দুর্ভাগ্য ঐ টেঁকোর হতে একটা চকচকে বাদামী রঙের ছড়ি চোখে পড়ল তার, ঐরকম ছড়িকে আহ কিউ শ্মশান-যাত্রির হাতের লাঠি বলত। জোর কদমে

এসে সে ধরে ফেলল আই কিউকে। লাঠিটা নির্ঘাত এইবার তার পিঠে পড়বে এই আন্দাজ করেই শরীরটাকে শক্ত করে তক্ষুণি পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে পড়ল আই কিউ। সঙ্গে সঙ্গে এক ঘা লাঠি পড়বার নিশ্চিত আওয়াজ তার কানে গেল, মনে হলো লাঠির ঘাটা বুঝি পড়ল তারই মাথায়।

—আমি ওকে বলছিলাম। হাতের কাছে একটা ছেলেকে দেখিয়ে বলল আই কিউ।

তারপর পর পর আরও তিনবার লাঠির আঘাতের ফটাফট আওয়াজ ফট ফট ফটাস…। আই কিউ যতটুকু স্মরণ করতে পারল জীবনে এই দ্বিতীয়বার সে হতমান হলো। কিন্তু সৌভাগ্যবশত লাঠির আঘাত বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হলো বুঝি এইবার সব চুকে গেল। এমন কি অনেকটা আশ্বস্তবোধ করল। তাছাড়া পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্র পাওয়া 'ভুলবার ক্ষমতায়' সে উপকৃত হলো। ধীর পদক্ষেপে সে হাঁটতে লাগল। শুঁড়িখানার দোরগড়ায় এসে পোঁছুবার আগেই আবার বেশ প্রফুল্ল মনে হলো নিজেকে। সেই সময় দেখল, মঠের এক সন্ন্যাসিনী পায়ে হেঁটে আসছিল তার দিকে। সন্ন্যাসিনী দেখলেই শপথ করা আই কিউ-এর চিরকালের অভ্যাস; এমনি অপমানের পর এটা বাড়বে না তার কী? ঘটনার কথাটা মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল ভুলে যাওয়া রাগটা।

—আজকের সব দুর্ভাগ্যের মূল, নিশ্চিত তোমার মুখ দেখেছি তাই। সে মনে মনে ভাবল।

সন্ন্যাসিনীর কাছে গিয়ে সরবে থুথু ফেলল—থুক থুক কিন্তু সন্ন্যাসিনী তাকে আমল দিল না, মাথা নুয়ে তার নিজের পথে চলতে লাগল। আহ কিউ দ্রুত এগিয়ে গেল সন্ন্যাসিনীর দিকে, তার সদ্য-মুণ্ডিত মস্তকে হাত বুলোবার জন্য বাড়িয়ে দিল নিজের হাত। বলল বোকার মতো হাসতে হাসতে ঃ টেকো ওরে টেকো? শিগগীর পালাও, ঐযে তোমার ঠাকুর খুঁজছে তোমাকে—

—এই, কী হচ্ছে লজ্জায় রক্তিম হয়ে বলল সন্ন্যাসিনী। তারপর চলতে লাগল জোর পায়ে।

শুঁড়িখানার মানুষগুলি হেসে উঠল হো হো করে।

তার কৃতকর্মের এমনি প্রসংশা দেখে উল্লসিত বোধ করল আহ কিউ।

—সন্ন্যাসীরা যদি হাত বুলোতে পারে, আমি পারব না কেন? সন্ন্যাসিনীর গালে আর এক চিমটি কেটে বসল সে। আবার হো হো করে হেসে উঠল শুঁড়িখানার মানুষগুলি। আরও খুশী হলো আহ কিউ। যাদের সমর্থন পেয়েছে তাদের খুশী করতে ছেড়ে দেবার আগে আরও একবার চিমটি কাটল সন্ন্যাসিনীকে।

ততক্ষণে গুপো ওয়াঙ আর নকল বিদেশী শয়তান-এর কথা ভুলেই গিয়েছিল আহ কিউ। সে ভাবল বুঝি বা সারাদিনের অপমানের শোধ এতেই হয়েছে।

আরো অবাক, একটু আগে মার খাবার পরে যা হয়েছিল তার চেয়েও যেন বেশি হালকা, আরও বেশি উৎফুল্ল মনে হলো নিজেকে, বুঝি বা চলছিল সে খোলা আকাশে হাওয়ায় ভেসে ভেসে।

—আহ কিউ, তুমি কি আঁটকুড়ে হয়ে মরবে। দূরে শোনা গেল সন্ন্যাসিনীর ক্ষীণ চোখের জলে ভেজা কণ্ঠস্বর।

উচ্ছল অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল আহ কিউ।

হেসে উঠল শুঁড়িখানার মানুষগুলিও, তবে উচ্ছ্বসিত নয় তেমন।

৪

ভালোবাসার ট্রাজেডি

লোকে বলে প্রতিপক্ষ যেখানে ঈগলপাখী বা বাঘের মতো হিংস্র, জয় সেখানে পূর্ণ অনেক বিজয়ীর কাছে; কিন্তু বিজিত যদি মেষ অথবা মোরগ ছানার মতো ভীরু, জয়ের আনন্দ তখন শূন্যগর্ভ। আবার এমনও আছে. রণ প্রভঞ্জন তখন সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, শত্রু নিহত, পদানত, পরাজয়ের গ্লানিতে বিপর্যস্ত, তারা অনুভব করে কোনো শত্রু নেই, প্রতিপক্ষ নেই বা কোনো বন্ধু নেই—স্বয়ংপূর্ণ নিজেই, অদ্বিতীয়, নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত। তাদের এই পরম বিজয়কে তখন মনে হয় একটা বিয়োগান্ত নাটকের চরম পরিণতি। কিন্তু আমাদের নায়ক এতটা মেরুদণ্ডহীন ছিল না। সব সময় সে থাকত মহোল্লসিত। পৃথিবীর বাকি অংশের উপর চীনের নৈতিক আধিপত্যের এটাই প্রমাণ।

আহ কিউ-এর দিকে তাকিয়ে দেখুন, কত চিন্তা ভাবনাহীন. পরম উল্লাসে উচ্ছ্বসিত। বুঝি সে ডানা মেলেছে উড়বার জন্যে।

তার এই বিজয়োচ্ছ্বাস কোনো অস্বাভাবিক পরিণামহীন ছিল না যদিও। কারণ. মনে হলো সে বুঝি অনেক্ষণ হাওয়ায় উড়ছিল, হাওয়ায় উড়েই যেন সে গ্রামের মন্দির চাতালে ফিরে গেল। যেখানে গিয়ে বালিশে মাথা রাখলেই শুরু হতো বিকট নাসিকা গর্জন। কিন্তু এই সন্ধ্যায় কিছুতেই দু চোখের পাতা পড়ছিল না, তার ঘুম আসছিল না। সে কেবলি অনুভব করছিল তার বৃদ্ধা আর তর্জনী এই আঙ্গুল দুটি কেমন যেন অস্বাভাবিক রকম তুলতুলে নরম। ঐ সন্ন্যাসিনীর গাল থেকে কোনো মসৃণ নরম কিছু লেগেছিল কিনা। না কি আঙ্গুল দুটি ওর গালের ঘষায় মসৃণ হয়েছে, কিছুই বলতে পারে না সে।

আহ কিউ, তুমি কি আঁটকুড়ে হয়ে মরবে?

এই কথাগুলো আবার আহ কিউএর কানে বাজতে লাগল, সে ভাবল : খুব সত্যি, আমার বিয়ে করা উচিৎ। নইলে পুত্রহীন মৃত্যু হলে আত্মাকে তৃপ্ত করতে একপাত্র ভাত নিবেদন করবার কেউ তো থাকে না। আমার বিয়ে

করা উচিত।

প্রবাদ আছে, তিন রকম অসন্তানোচিত কাজ আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে হেয় হলো কোনো বংশধর না রেখে যাওয়া। (মনসিয়াস থেকে উদ্ধৃতি ৩৭২-২৮৯ খৃঃ পূঃ) আর জীবনের অন্যতম ট্র্যাজেডি হলো বংশধর বিহীন আত্মা অনাহারে থাকে। (প্রাচীন ধ্রুপদী রচনা Zuo Zbnan থেকে উদ্ধৃতি) তাহলেই দেখছি তার চিন্তাধারাও সাধু-সন্তদের মতবাদের অনুরূপ, কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় সে-ই আবার পরবর্তী সময়ে অস্বাভাবিক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

—মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষ সে ভাবতে লাগল। সন্ন্যাসীদের হাতের মুঠো মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষ সে আবার ভাবল।

আমরা জানব না অবশেষে সেই সন্ধ্যায় কখন আহ কিউ ঘুমিয়ে পড়ল। এরপর সে সবসময় মনে করত তার হাতের আঙ্গুল দুটি বুঝি তুলতুলে মসৃণ। সবসময় যেন চিন্তা-ভাবনা হীন। শুধু এক ভাবনা—মেয়েমানুষ মেয়েমানুষ।

এই থেকে আমরা বলতে পারি যে, মনুষ্য জীবনে নারী একটি ভয়াবহ অভিশাপ! চীনদেশের অধিকাংশ পুরুষ হয়তো সাধু সন্ত হতে পারত, যদি নারীর বিধ্বংসী সংস্পর্শে আসবার দুর্ভাগ্য তাদের না হতো: শাঙ (Shang) রাজ-বংশকে তা চি (Ta Chi) ধ্বংস করেছিল, পাও সজু (Pao Szu) দ্বারা চৌ (Chou) বংশ হেয় প্রতিপন্ন হয়েছিল। চীন (Chin) বংশের কথা বলতে গেলে, যদিও ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণ বর্তমান নেই, তাহলেও যদি আমরা ধরে নিই যে নারী কর্তৃক বংশের পতন হয়েছিল তবু হয়তো কিছু ভুল হবে না। আর এটাও সত্য ঘটনা যে, তুঙ চো (Tung Cho) তিয়াও চান (Tiao Chan) দ্বারাই নিহত হয়েছিল। তা চি খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দী, সাঙ রাজবংশের শেষ নৃপতির উপপত্নী ছিল। খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে পাও সজু পশ্চিম চৌ-বংশের শেষ নৃপতির উপপত্নী ছিল। খৃস্ট অব্দ তৃতীয় শতাব্দীর একজন শক্তিশালী মন্ত্রী তুঙ চোর উপপত্নী ছিল তিয়াও চান।

আহ কিউও গোড়াতে একজন অতি কঠোর নীতিবাদী পুরুষ ছিল যদিও আমরা জানি না কোনো উপযুক্ত গুরুর কাছে শিক্ষা পেয়েছিল কিনা। তবু "কঠোর যৌন-পৃথকী করণ প্রথাকে" সে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে চলত সবসময়, এবং ঐ সন্ন্যাসিনীও "নকল বিদেশী শয়তানদের" মতো বিধর্মীদের ধিক্কার দেবার ন্যায়পরাণয়তা থেকে কখনও বিচ্যুত হতো না। তার মত ছিল, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সন্ন্যাসিনীদের গোপন মেলামেশা স্বীকার্য। কিন্তু একজন নিঃসঙ্গ স্ত্রীলোক রাস্তায় এলে বদ পুরুষেরা নিশ্চিত আকৃষ্ট হবেই। স্ত্রীলোক এবং পুরুষের মধ্যে পরস্পর কথোপকথনের অর্থ হলো গোপন মিলনের ব্যবস্থা করা। এই ধরণের মানুষদের সায়েস্তা করবার জন্য সে তাদের দেখলেই

কটমট করে তাকাত, সবাইকে শুনিয়ে উঁচুগলায় কড়া-কড়া মন্তব্য করত, আর নির্জন স্থান হলে পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারত পেছন থেকে। কে জানত ত্রিশ বছরে পা দিয়ে যখন অবিচলিত থাকা (কনফিউসিয়স বলে ছিলেন ত্রিশ বছর বয়সে তিনি অবিচলিত থাকতেন পরবর্তীকালে তাই এই বাক্যাংশ ত্রিশ বৎসর বয়সের সমবাচ্য বলে ব্যবহৃত হতো।) উচিত তখন কেমন করে ঐ তুচ্ছ একটা সন্ন্যাসিনীকে দেখে তার মাথা ঘুরে যাবে? এই রকম হঠকারিতা শাস্ত্রীয় আইন মতে খুবই নিন্দনীয়। সেইজন্য স্ত্রীলোকেরা প্রকৃতই ঘৃণার যোগ্য। কারণ, যদি ঐ একটা তুচ্ছ সন্ন্যাসিনীর মুখে নবনীত ভাব না থাকত, আহ কিউ কিছুতেই মোহিত হতো না। অথবা সন্ন্যাসিনীর মুখ যদি ঘোমটার আড়ালে থাকত তাহলেও বোধহয় এরূপ ঘটত না। পাঁচ ছয় বছর আগে একদিন যাত্রার পালা শুনতে গিয়ে দর্শনার্থী একজন স্ত্রীলোকের পায়ে এমনি সে চিমটি কেটেছিল। কিন্তু সেবার স্ত্রীলোকটির পা ট্রাউজারের কাপড়ে ঢাকা ছিল বলে এরকম মাথা গুলনো হঠকারি ভাব তার মনে আসেনি। সন্ন্যাসিনীটিও ঘোমটায় মুখ ঢেকে আসেনি। এই বিধর্মীয় নিন্দার্হ তার এও একটা প্রমাণ।

মেয়েমানুষ...মেয়েমানুষ...কেবল এক চিন্তা আহ কিউর। দুষ্ট লোককে বশ করতে পারে এরকম স্ত্রীলোকের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে লাগল সে। কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে কখনও মুচকি হাসে নি তারা। যে-সকল স্ত্রীলোক কথা বলল তার সঙ্গে সে মন দিয়ে শুনল তাদের কথা, কিন্তু কেউ একজন গোপন অভিসারের ইঙ্গিত করেনি তাদের কথায়। আহ! স্ত্রী-লোকদের নিন্দাই তার এও আর একটা নজির ; তারা কেবল সাধ্বীপনায় ভান করে।

একদিন মিঃ চাও-এর বাড়িতে ধান ভানবার কাজে গিয়েছিল। রাতের খাওয়ার পর রান্নাশালে বসে তখন পাইপে ধূমপান করছিল। অন্য কোনো বাড়ি হলে রাতের খাওয়ার পর সে নিজের কুঁড়ে ঘরে ফিরে যেতে পারত, কিন্তু চাও-পরিবারে ডিনার একটু সকাল সকাল হতো। যদিও রাতের আহারের পর আলো না জ্বালিয়ে শুতে যাওয়াই এ বাড়ির রেওয়াজ, তবু মাঝে মাঝে এর ব্যাতিক্রম হতো। জেলার পরীক্ষা পাশ করবার আগে পরীক্ষার পড়া তৈরি করবার জন্য মিঃ চাও-এর পুত্র খাওয়ার পরও আলো জ্বালাতে পারত। আহ কিউ যখন এ বাড়িতে টুকিটাকি কাজ করত রাত্তিরে ধান ভানবার জন্য আলো জ্বালতে দেওয়া হতো। নিয়মের এইটুকু ব্যতিক্রমের জনাই বাকি কাজ শুরু করবার আগে তখনও আহ কিউ ধুমপান রত ছিল।

চাও পরিবারের একমাত্র চাকরাণী আমাহ বুও বাসন মাজার কাজ সেরে লম্বা বেঞ্চটায় বসে আহ কিউ-এর সঙ্গে খোসগল্প করতে এল সে সময়।

—বাড়ির কর্ত্রী আজ দুদিন কিছু খাচ্ছে না, জানো? কর্তা নাকি এক মেয়েমানুষ রাখছে...। বলল সে।

কিউর। তখন রাত্তির, তাই শেষপর্যন্ত দ্বিগুণ জরিমানা কবুল করে চৌকিদারকে দিতে হলো চারশত মুদ্রা। কিন্তু তখন কিছুই ছিল না তার হাতে। মাথার ফেল্ট-টুপিটা জামিন রেখে এই পাঁচটি শর্ত পালনে রাজী হল আহ কিউ ঃ

১। পরদিন সকালবেলা আহ কিউ এক পাউণ্ড ওজনের এক জোড়া লাল মোমবাতি আর এক বাণ্ডিল ধূপকাঠি নিয়ে যাবে চাও-দের বাড়ি, তার দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে।

২। প্রেতাত্মা বশ করবার জন্য চাও পরিবার যে তাও-ধর্মী পুরোহিত নিযুক্ত করেছিলেন তার ব্যয় আহ কিউকে বহন করতে হবে।

৩। আহ কিউ আর কোনো দিন চাও-দের বাড়ির দোরগড়া মারাবে না।

৪। যদি আমাহ বু-র কোনো কিছু বিপত্তি ঘটে তার জন্য দায়ী হবে আহ কিউ।

৫। তার মজুরি নিতে অথবা সার্ট ফিরিয়ে আনতে আহ কিউ আর ওমুখো যাবে না।

নিরুপায় আহ কিউ, সব কিছুতে সে রাজী হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার হাতে নগদ মুদ্রা কিছুই ছিল না। তবু সুখের কথা, তখন বসন্তকাল কাজেই তার গদিওয়ালা লেপটা দুই হাজার মুদ্রায় বন্ধক রেখে তাই দিয়ে শর্তরক্ষা করল সে। উদম গায়ে কাউ-টাউ (চীনা প্রথায় ভূমিস্পর্শ করে প্রণাম করা) করে মুক্ত হবার পর মাত্র কয়েকটি মুদ্রা রইল তার হাতে। কিন্তু ঐ মুদ্রায় চৌকিদারের কাছে জামানত রাখা ফেল্ট-টুপিটা খালাস না করে সে শুঁড়িখানায় ঢুকল ঐ নিয়ে।

আসলে চাওদের বাড়িতে ঐ মোমবাতি কিন্তু জ্বালান হলো না, ধূপকাঠি পোড়ানও হলো না, তুলে রাখা হলো বাড়ির কর্ত্রীর বুদ্ধপূজায় লাগবে বলে। শত ছিন্ন সার্টটা দিয়ে তরুনী কর্ত্রীর চান্দ্রমাসের আটই তারিখে জাত শিশুর জন্যে কাঁথা তৈরী হলো। আর বাকি যা থাকল আমাহ বু তার জুতোর শুকতলায় দিল।

৫
জীবিকার সমস্যা

কাউ-টাউ শেষ করেছে, চাও বাড়ির সবগুলি শর্ত পালন করাও হয়ে গেছে। এইবার আহ কিউ যথারীতি ফিরে গেল তার মন্দির চাতালের আস্তানায়। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। তার কেবল মনে হতে লাগল কোথায় যেন কী একটা অনভিপ্রেত কিছু ঘটে গেছে। অনেক ভাবনা চিন্তার পর সে সিদ্ধান্তে এল যে, তার গায়ে কিছু নেই এটাই তার অস্বস্তির কারণ। তখনও তার একটা ছেঁড়া জ্যাকেট আছে সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। সেটাই গায়ে

চাপিয়ে সে শুয়ে পড়ল। যখন সে আবার চোখ খুলল দেখতে পেল পশ্চিম দেওয়ালের উপর দিয়ে সূর্যের আলো তখনও চিকচিক করছে। স উঠে বসল বলতে বলতে, চলোয় যাক্ ! শোয়া থেকে উঠে পড়ে রাস্তায় এদিক ওদিক যথারীতি ঘুরে বেড়াল কিছুক্ষণ, আবার তার মনে হতে লাগল আরও একটা কি যেন গোলমাল আছে কোথাও। কিন্তু উদোম গায়ের কায়িক কষ্টের সঙ্গে তুলনা করতে পারছে না একে। আপাত মনে হলো সেদিন থেকেই ওয়েইচুয়াঙ গ্রামের স্ত্রীলোকেরা সংকোচে এড়িয়ে যেতে লাগল আহ কিউকে। তাকে আসতে দেখলে বাড়ির ভেতর আত্মগোপন করত সবাই। বাস্তবিক পক্ষে এমন কি মিসেস ত্সাউ-এর মতো পঞ্চাশ বৎসর বয়স্কা মহিলাও হতবাক হয়ে ছুটে পালাতেন সবার সঙ্গে, এগারো বছর বয়সের মেয়েকেও ডেকে নিয়ে যেতেন বাড়ির ভেতরে। খুবই অদ্ভুত লাগল আহ কিউর সব কাছে। কুত্তিগুলো, মনে মনে ভাবল আহ কিউ, সব যেন কচি খুকীর মতো মরছে সরমে।—

অনেকদিন পর, যাহোক, আবার সে গভীর ভাবে অনুভব করতে পারল বুঝি একটা ভুল বা অন্যায় হয়েছে কোথাও। প্রথমত, শুঁড়িখানায় ধার দিল না : দ্বিতীয়, মন্দিরের বৃদ্ধ মোহান্ত অযাচিত বিরূপ মন্তব্য করল তার সম্বন্ধে, যেন তার ইচ্ছে আহ কিউ আর না আসে মন্দির চাতালে, তৃতীয়, অনেকদিন ঠিক কতদিন তার হিসাব নেই, কেউ তাকে কাজেই ডাকেনি। শুঁড়িখানায় ধার না পেলেও সে চালিয়ে যেতে পারত, বৃদ্ধ মোহান্ত তাকে আসতে নিষেধ করলেও আহ কিউ কান দিত না, কিন্তু কেউ যদি তাকে কাজে না ডাকে তাহলে অনাহার। এ যে এক অভিশপ্ত পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়েছে সে। আর বেশী দিন সহ্য করতে না পেরে আহ কিউ নিয়মিত যাদের বাড়িতে কাজ করত সেখানে গেল কী ব্যাপার জানবার জন্যে—কেবল মিঃ চাও-এর বাড়িতে চৌকাঠ মারান তার কাছে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সবার কাছেই এক অদ্ভুত আপ্যায়ণ পেল সেসব বাড়িতে। সব বাড়িতেই একজন পুরুষ মানুষ বেরিয়ে আসত, যেন ভিখারী এসেছে। এমনি ভাব নিয়ে তাড়া করত বাইরে এসেই, হাঁক দিয়ে বলত আহ কিউকে ঃ কিছু নেই ! কিছু নেই। হবে না। পালাও চলে যাও।

ক্রমশ সবকিছু যেন আহ কিউএর কাছে বিস্ময়কর হয়ে উঠছিল।

—এতকাল সবসময় আমাকে প্রয়োজন হতো এদের। আহ কিউ ভাবল। আর আজকে এমন কী হলো যে কোনো কাজ নেই তাদের হাতে ! কেমন যেন সন্দেহ লাগছে !

সতর্কভাবে খোঁজ নিয়ে জানল যুবক ডি-কে এখন সবাই তারা কাজে ডাকে। ঐ যুবক ডি মনিষটা রোগা-পটকা খুবই অভাবী। আহ কিউ মানুষটাকে গৌপো ওয়াঙ-এর চেয়ে খাটো মনে করত। সে ভেবে অবাক হয়ে যায়

কে ভাবতে পারত এরই মতো একটা অকাট মানুষ তারই রুজি-রোজগারে ভাগ বসাবে ? আহ কিউ-এর মনের ভেতর চাপা ঘৃণাটা যেন আরও সতেজ হয়ে উঠলো এবার।

ক্রোধের উত্তেজনায় ধূমায়িত হয়ে পথ চলতে চলতে হঠাৎ সে দুহাত তুলে গেয়ে উঠল, লোহার গদায় পিষব তোকে...(শাহশিও অঞ্চলের খুব প্রচলিত অপেরা পালা বাঘ ও ড্রাগনের লড়াই-এর একটি ছত্র I will thrash you with a steel maee সুঙ বংশের প্রথম সম্রাট চাও কুয়াঙ-য়িন এর সঙ্গে আর একজন সেনানায়কের লড়াইয়ের বিবরণ আছে এই পালাতে।)

কয়েকদিন পর সত্যি সত্যি সেদিন মিঃ চিয়েনএর বাড়ির সামনে যুবক ডি-র সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল আহ কিউ-এর। যখন দুই শত্রু মুখোমুখি হয় তাদের চোখে আগুন জ্বলে। আহ কিউ তার কাছে গেল যুবক ডি চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

—হতচ্ছাড়া গর্দভ। হিস হিস আওয়াজ করল আহ কিউ, তার চোখে তীক্ষ্ণ অগ্নিদৃষ্টি আর ধূমায়মাণ মুখ গহ্বর।

—আমি কীটের অধম... কেমন, হবে এতে ? খুশী...? বলল যুবক ডি।

এই আত বিনয়ে আরো বিগড়ে গেল আহ কিউ।

কিন্তু তার হাতে তো আর লোহার গদা ছিল না সুতরাং সে ছুটে গিয়ে হাত বাড়িয়ে হাতের মুঠোয় চেপে ধরল যুবক ডি-র চুলের বেনীটা। আর এদিকে যুবক ডিও এক হাতে নিজের বেণী বাঁচাতে গিয়ে আহ কিউর মাথার বেণী ধরতে চেষ্টা করল অপর হাত দিয়ে। অপর হাতে নিজের বেণী রক্ষা করতে তৎপর হলো আহ কিউ। যুবক ডি-র ব্যাপারে এতকাল কোনো গুরুত্ব দিত না সে, প্রয়োজন মনে করত না। কিন্তু নিজেও কয়দিনের অনাহারের তাড়নায় প্রতিপক্ষের মতো দুর্বল হয়ে পড়েছিল বলেই উভয়কে সমপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হলো আজকে। চারটি হাত মুঠোয় আবদ্ধ রেখেছে দুটি মাথা। দুটি মানুষ নুয়ে পড়েছে কটিদেশ পর্যন্ত। নীল রামধনুর মতো তারই একটা প্রতিচ্ছায়া পড়েছে চিয়েন পরিবারের সাদা পাঁচিলের গায়ে।

—খুব হয়েছে। খুব হয়েছে এবার থাক। মিটিয়ে দিতে এগিয়ে গেল পথচারী কেউ কেউ।

—খুব ভালো, সাবাশ! চেঁচিয়ে উঠল আরও অন্য কেউ, ঠিক বুঝা গেল না ঝগড়া মিটিয়ে দিতে না বাড়িয়ে দিতে।

কিন্তু তারা দুজন কান দিল না কারও কথায়। যদি আহ কিউ এগুলো তিন পা, তক্ষুনি যুবক ডি পিছিয়ে গেল আরও তিন পা, সুতরাং তারা দাঁড়িয়ে রইল সমদূরত্বে যে যেখানে ছিল সেখানে। আবার যুবক ডি পা বাড়াল তিন পা, সঙ্গে সঙ্গে আহ কিউ পিছিয়ে গেল তেমনি তিন পা, আবার দাঁড়িয়ে

রইল তেমনি স্বস্ব স্থানে। প্রায় আধঘণ্টা পর—ওয়েইচুয়াঙ গ্রামে কোনো পেটা ঘড়ি ছিল না। সময় বলা কঠিন। কুড়ি মিনিটও হতে পারে হয়তো—যখন হাত গরম হয়ে উঠল, দর দর ধারায় ঘাম পড়তে লাগল গাল বেয়ে, আহ কিউ ছেড়ে দিল তার দুই হাতের মুঠো। সঙ্গে সঙ্গে খুলে পড়ল যুবক ডি-র দুটি হাতও। যুগপৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দুজনেই। তারপর জনতার ভিড় ঠেলে দুজনেই বেরিয়ে এল একই সঙ্গে।

—দেখো, মজা দেখাব আর একদিন। হতচ্ছাড়া বাঁদর! ঘাড় উঁচিয়ে বলল আহ কিউ।

—জাহান্নামে যাও না তুমি! আমিও ছাড়ব না কি! দেখে নিও…প্রত্যুত্তরে হাঁক দিয়ে উঠল যুবক ডি।

আপাতত এই মহারণের সমাপ্তি হলো। না জয় না পরাজয়। কিন্তু বুঝা গেল না দর্শকেরা খুশী হলো কি না, কেউ মন্তব্য করল না।

কিন্তু এর পরও কেউ কাজে ডাকল না আহ কিউকে।

সে এক কবোষ্ণ দিনে, গ্রীষ্মের বার্তামুখর সুগন্ধি ঝির ঝির হাওয়া বইলেও কেমন এক শীতের হিমেল ছোঁয়ার অনুভূতি আহ কিউ-র সর্বাঙ্গে। সে সহ্য করতে পারল একে। একমাত্র ভাবনা তখন তার শূন্য উদর। তুলোর লেপ, ফেল্টটুপি আর সার্ট সব অদৃশ্য হয়ে গেছে কবেই। তুলোর জ্যাকেটটাও সে বেচে দিল এরপর। একমাত্র রইল তার পরণে ট্রাউজার, কিন্তু এটা সে পারবে না খুলতে। আরও বাকি ছিল একটা শতছিন্ন তাপ্পিআঁটা জ্যাকেট। কোনো কাজে লাগবে না ওটা অমনি বিলিয়ে দিলেও। জুতোর সুকতলাও হবে না এতে। আশা ছিল হয়তো কোনোদিন কুড়িয়ে পাবে রাস্তায় পড়ে থাকা দু একটা মুদ্রা কিন্তু তাতেও সফল হয়নি তখনও। তার ঐ ভেঙ্গে পড়া কুঁড়ে ঘরটার ভেতরও বুঝি বা একদিন খুঁজে পাবে কিছু অর্থ! ঘরের ভেতরটায় খুঁজেছে সে আঁতি-পাঁতি করে, কিন্তু সব শূন্য, কেবলই শূন্য। সে সিদ্ধান্ত করল এইবার সে বেরুবে খাদ্যের অন্বেষণে।

খাদ্যের অন্বেষণে পথ চলতে চলতে চোখে পড়ল সেই অতিপরিচিত শুঁড়িখানা আরও পরিচিত ধোঁয়া-ওঠা গরম রুটি। সে এগিয়ে গেল দোকানের সামনে দিয়ে, দঁড়াল না একটি মুহূর্তের জন্যও। লালায়িত হলো না বিন্দুমাত্রও। সে চাইছিল না এসব কিন্তু কী যে সে চাইছিল জানে না নিজেই।

ওয়েইচুয়াঙ অতি ক্ষুদ্র পল্লী। ক্ষণিকের মধ্যেই পেছনে ফেলে এল সেই গ্রামকে। গ্রামের বাইরে চারদিকে বিস্তীর্ণ ধান ক্ষেত, যেদিকে তাকায় কেবল চোখে পড়ে ধান গাছের কচি কচি শীষের সবুজিমা। এখানে ওখানে ছড়িয়ে কালো কালো চলমান বস্তু—মাঠে কর্মরত কৃষকের। পল্লীজীবনের সব আশা সব আনন্দে বঞ্চিত আহ কিউ। এগিয়ে যায় সমুখে সব কিছু পেছনে

ফেলে, কারণ নিজের প্রবৃত্তির অনুভূতি থেকে সে জানে তার খাদ্য অন্বেষণের উদ্দেশ্য থেকে এরা দূরে অনেক দূরে। সর্বশেষে সে এসে হাজির হলো প্রশান্ত আত্মোন্নতী কনভেন্টের পাঁচিলের ধারে।

কনভেন্টের চারদিকেও ধান ক্ষেত, বিস্তীর্ণ কাঁচা সবুজের মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে কনভেন্টের ধবল রঙের প্রাচীরগুলি, আর পেছনে নিচু মাটির পাঁচিলের ওধারে সবজি বাগান। এদিক ওদিক চারদিক তাকিয়ে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে আহ কিউ। কাউকে কোথাও না দেখে একট গুল্মলতা ধরে গুঁড়ি মেরে উঠল নিচু দেওয়ালের উপরে! মাটির দেওয়াল ভেঙ্গে পড়ছিল। ভয়ে কাঁপতে লাগল সে। একটা তুত গাছের ডাল ধরে লাফিয়ে পড়ল ওধারে। ওধারে শাক-সবজির বুনো সমারোহ, কিন্তু হলুদ মদ ধূমেল রুটি বা অন্য কিছু খাদ্যবস্তু, কিছুর চিহ্ন নেই সেখানে। পশ্চিম দিকের পাঁচিলের ধারে এক ঝাড় বাঁশ, কচি কচি কুঁড়িগুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু দুঃখ এই রান্নাকরা ভোজ্যবস্তু নয় এগুলো। রেপ-দানা শষ্যের চাষ আছে। অনেকদিন হলো দানা বেরিয়ে গেছে। সরষে গাছেও ফুল আসছে। ছোটো ছোটো বাঁধাকপিগুলি বাঁধানো। বেশ আটো-সাটো দেখতে।

ফেল করা ছাত্রের মতোই আহ কিউ ক্ষুব্ধ বোধ করল নিজের মনে। সবজি বাগানের ফটকের দিকে ধীর পায়ে এগুতে এগুতে হঠাৎ মনের খুশীতে চমক দিয়ে উঠল। ঐ একটু সামনে দেখল এক চাপড়া শালগম। হাঁটু ভেঙ্গে টেনে টেনে তুলল কয়েকটা। হঠাৎ চোখে পড়ল ফটকের ওধারে ছোট একটা কার মাথা না! পরমুহূর্তেই মাথাটা আবার উধাও। নিশ্চয় ঐ ক্ষুদে সন্ন্যাসিনী। যদিও এইসব মঠবাসীদের প্রতি চিরকালের অবজ্ঞা ছিল আহ কিউর মনে, তবু সে মানত বিচক্ষণতা শৌর্যের শ্রেষ্ঠাঙ্গ। চারটে শালগম তুলে ফেলল তাড়াহুড়ো করে। পাতাগুলি ছিঁড়ে ফেলে জড়িয়ে নিল তার জ্যাকেটে। ততক্ষণে একজন বৃদ্ধা মঠবাসিনী বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন।

—প্রভু বুদ্ধ আমাদের রক্ষা করুন। আহ কিউ, তুমি! শালগম চুরি করতে তুমি পাঁচিল টপকে...হায় ঈশ্বর! কী বিশ্রী সব। ওফ। প্রভু বুদ্ধ আমাদের রক্ষে করুন।

—কখন আপনাদের পাঁচিল টপকালাম আর শালগম চুরি করলাম? জবাব দিল আহ কিউ চলতে চলতে, মঠবাসিনীর উপর চোখ রেখে।

এই তো এক্ষুনি—ঐ তো, করনি তুমি? তার জ্যাকেটের ভাঁজের দিকে দেখিয়ে বললেন বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী।

—এগুলো আপনাদের? জিজ্ঞেস করুন, এরা বলবে এরা আপনাদের? বলুন, জিজ্ঞেস করুন।

মুখের কথা অসমাপ্ত রেখেই যত দ্রুত সম্ভব পালাতে লাগল আহ কিউ।

তার পেছনে তাড়া করে গেল মঠের একটা জোয়ান কালো কুকুর! কুকুরটা ছিল সামনের ফটকে। কে জানে কী করে এল পেছনের সবজি বাগানে! খুঁজতে খুঁজতে কালো কুকুরটা তাড়া করল আহ কিউকে। কামড়ে দিত আহ কিউকে, কিন্তু একটা শালগম হাত থেকে পড়ে যেতেই হঠাৎ কুকুরটা চমকে দাঁড়িয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে। সেই অবসরে তুত গাছের একটা ডাল ধরে, আহ কিউ উঠে গেল পাঁচিলের উপরে। মাটির দেওয়াল টপকে শালগম আর সবকিছু নিয়ে লাফিয়ে পড়ল মঠের পাঁচিলের বাইরে। কুকুরটা তখনও চেঁচিয়ে যাচ্ছে। তুত-গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বুদ্ধের স্তোত্র উচ্চারিত হচ্ছে বৃদ্ধা মঠবাসিনীর মুখে।

কুকুরটা আবার কখন বাইরে বেরিয়ে আসবে এই ভয়ে মাটিতে ছড়ানো শালগমগুলো কুড়িয়ে নিয়ে, দুচারটে ঢিল হাতে তুলে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। কিন্তু আর এল না কালো কুকুরটা। হাতের ঢিল কয়টা ফেলে দিল ছুঁড়ে, শালগম কামড় দিতে দিতে পথ চলতে লাগল আহ কিউ। পথ চলতে চলতে ভাবতে লাগল আপন মনেঃ আর কোনো আশা নেই এখানে। শহরে গিয়ে দেখি না একবারটি…

তিনটা শালগম শেষ হতে না হতেই সে মনস্থির করে ফেলল। এইবার সে শহরে যাবে।

৬

পুনঃ প্রতিষ্ঠা থেকে পতন

সে বছর চান্দ্রোৎসবের আগ পর্যন্ত ওয়েইচুয়াঙের মানুষেরা কেউ দেখেনি আহ কিউকে। তাই সবাই বিস্মিত হলো তার ফিরে আসবার খবর পেয়ে, অবাক হয়ে সবাই ভাবল কোথায় সে ছিল এতদিন। এর আগে যে কয়েক বার সে শহরে যেত, মনের খুশীতে আগে থেকেই সবাইকে জানিয়ে যেত এবার তা করেনি। তাই যাবার সময় কেউ দেখেনি তাকে। হয়তো বলেছিল গ্রামের মন্দির চাতালের বুড়ো মহান্তকে। কিন্তু ওয়েইচুয়াঙের রীতি, মিঃ চাও, মিঃ চিকো অথবা জেলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র শহরে গেলেই কেবল সংবাদের গুরুত্ব দেওয়া হতো। এমন কি নকল বিদেশী শয়তান বাইরে গেলেও কেউ আলোচনা করত না। আহ কিউকে নিয়ে তো নয়ই। এ থেকেই পরিষ্কার বুড়ো মহান্ত কেন খবরটা জানায়নি সবাইকে সুতরাং জানবার আর কোনো পথ ছিল না গ্রামের মানুষদের।

আহ কিউ-এর প্রত্যাবর্তন ব্যাপারটা আগের চেয়ে অন্যরকম ছিল এবার, সত্যি তাক লাগাবার কারণ ছিল অনেক। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছিল, ঘুমে ঢুলু ঢুলু পিট-পিটে চোখ নিয়ে আহ কিউ গিয়ে দাঁড়াল শুঁড়িখানার দরজায়। দুপা এগিয়ে গেল কাউন্টারের কাছে। ট্যাঁকে গোঁজা কয়েকটি

রুপো আর তামার মুদ্রা বের করে ছুঁড়ে দিল কাউণ্টারে।
—এই যে, নগদ পয়সা দিলাম। সে বলল ঃ দাও এক পাত্তর। তার গায়ে একটা নতুন ডোরাকাটা জ্যাকেট। বেশ বুঝা যায় একটা বড় রকমের টাকার থলি ঝুলছিল কোমরে। বেশ ভারি। কোমরের বেল্টটাও যেন ভারে ঝুলে পড়েছিল। কাউকে অস্বাভাবিক কিছু মনে হলেই যথারীতি সম্মান দেখানো হতো, ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা হতো না, এইটাই ছিল ওয়েইচুয়াঙের রীতি। এ ব্যক্তি আহ কিউ। যদিও তারা ভালোভাবেই বুঝতে পারল তবু শত ছিন্ন কোট পরিহিত অতীতের আহ কিউ থেকে নিশ্চিত এক ভিন্ন ব্যক্তি আজকের এই আহ কিউ। গুণীজ্ঞানীরা বলে থাকেন, পণ্ডিত ব্যক্তি তিন দিন বাইরে থাকলে নতুন দৃষ্টিতে দেখবে তাকে। সুতরাং কেমন একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধামিশ্রিত সন্দেহ প্রকাশ পেল শুঁড়িখানার বেয়ারা, মালিক, খরিদ্দার পথচারী, সবার মধ্যে। একটু মাথা ঝুঁকে নমস্কার জানিয়ে শুরু করল শুঁড়িখানার মালিক, বলল ঃ হ্যালো, আহ কিউ যে! তাহলে ফিরে এলে!
—হ্যাঁ, ফিরে এলাম।
—বেশ টাকা করেছ শুনছি…তা…কোথায়?
—শহরে গিয়েছিলাম।
পরদিনই এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সারা ওয়েইচুয়াঙ জুড়ে। সঙ্গে সঙ্গে পয়সাওয়ালা আর ডোরাকাটা নতুন জ্যাকেট পরা আহ কিউ-এর সব খবর খুঁচিয়ে বার করবার গ্রামবাসীদের সেকি আগ্রহ, সেকি কৌতূহল! শুঁড়িখানায়, চায়ের দোকানে, গ্রামের মন্দির চাতালের আনাচে কানাচে। ফলে সবাই তাকে দেখতে লাগল এক নতুন শ্রদ্ধার চোখে।
আহ কিউ গল্প করল, একজন প্রাদেশিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ভদ্রলোকের বাড়িতে গৃহ ভৃত্যের কাজ করত সে। বিস্মিত হলেও তার কাহিনীর এই অংশটুকু বিশ্বাস করল সবাই। লোকটির নাম পাই। এই লোকটি একমাত্র প্রাদেশিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছিল এই শহর থেকে, তাই তার পদবী উল্লেখ করবার প্রয়োজন হতো না। সফলকাম প্রাদেশিক পরীক্ষার্থীর প্রসঙ্গ উঠলে তাকেই বুঝাত। কেবল ওয়েইচুয়াঙএই নয়, ত্রিশ মাইল আশে পাশে এই নামেই তার পরিচয় ছিল। যেন সব মানুষ তাকে কল্পনা করত মিঃ প্রাদেশিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র নামে। এমনি বিশিষ্ট লোকের বাড়িতে কাজ করে কিছু আমল পাওয়ার দাবি স্বাভাবিক আহ কিউ-র পক্ষে কিন্তু তবু আর কাজ করবে না এ বাড়িতে, সে বলল। ঐ লোকটাও রাম ঘুঘু। তার মতো কাহিনীর এই অংশে হাঁফ ছাড়ল সবাই। খুশীও হলো কিছুটা। বুঝল ও বাড়িতে কাজ করবার যুগ্যি নয় আহ কিউ—তবে বেচারা করবে কী এও এক ভাবনা!
আহ কিউ-এর ফিরে আসবার আর একটা কারণ শহরের মানুষদের পছন্দ

হয়নি তার, সে বলল। ঐ শহরের লোকেরা লম্বা বেঞ্চকে বলে খাড়া বেঞ্চ। পেঁয়াজ পাতা কুঁচিয়ে দেয় মাছ ভাজায়। আর একটা বদ অভ্যাস সে হালে আবিষ্কার করেছে নাকি, কোনো ছন্দ থাকেনা মেয়েদের হাঁটবার সময়। কিন্তু ভাল দিকও ছিল শহরের যেমন, ওয়েইচুয়াঙের মানুষেরা খেলতে গিয়ে বত্রিশটা বাঁশের ঠেকাবার লাঠি নেয়, কেবল "নকল বিদেশী শয়তান" দাঁড়াতে পারে সহরের বালখিল্যদের সামনে—"নরকের নৃপতির সামনে খুদে শয়তানের" মতো.ই। লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, যারা শুনল আহ কিউর কাহিনীর এই অংশ।

ফাঁসি দেওয়া দেখেছ তোমরা? আহ কিউ জিজ্ঞাসা করল। আহ। দেখবার মতো···বিপ্লবীদের যখন ফাঁসি দেয়, দেখবার মতো—আহ! কি সুন্দর—!

বলতে বলতে মুখটা ঘুরাতেই এক ঝলক থুথু ছিটকে পড়ল চাও সজু চেন-এর মুখের উপর—বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে ছিল সে। গল্পের এই অংশ শুনে শিউরে উঠল শ্রোতারা। তারপর একবার চারদিকে তাকিয়ে হঠাৎ আহ কিউ তার ডান হাতটা তুলল মাথার উপর। ঝপ করে নামিয়ে দিল হাতটা গুঁপো ওয়াঙ-এর ঘাড়ে, গলা বাড়িয়ে একমনে সে তখন শুনছিল আহ কিউ এর কাহিনী।

—খতম! চেঁচিয়ে উঠল আহ কিউ।

চমকে উঠল গুঁপো ওয়াঙ তাড়িতের বেগে চকমকি পাথরের ফুলকির মতো মাথাটা সরিয়ে নিল। কেমন একটা তৃপ্তিকর আশঙ্কায় থরথরিয়ে উঠল উপস্থিত দর্শকেরা। এরপর বেশ কয়দিন হতবুদ্ধি অবস্থায় ঘুরে বেড়াল গুঁপোওয়াঙ! আহ কিউএর কাছে যেতে সে সাহস পেত না, অন্যরাও নয়। যাহোক, ওয়েইচুয়াঙ গাঁয়ের মানুষদের চোখে পদমর্যাদায় আহ কিউ তখন মিঃ চাওএর চেয়ে উঁচুতে উঠে গেল কিনা বলতে পারি না তবে কোনো রকম অযথার্থতার আশঙ্কা না করেও অন্তত সমতুল্য হয়ে গেল এটা বলতে পারি দৃঢ়তার সঙ্গে।

কারণ বেশী বিলম্বে নয়, অকস্মাৎ আহ কিউ-এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল ওয়েইচুয়াঙের অন্দর মহলেও। যদিও ওয়েইচুয়াঙ গ্রামে কেউকেটা বলতে চাও আর চিয়েন এই দুটি পরিবার আর বাকি দশভাগের নয় ভাগ দরিদ্র জনসাধারণ। তবু অন্দরমহল অন্দরমহলই, সব এক। তারপর যেভাবে আহ কিউএর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সেও আলৌকিক কিছু। গ্রামের মেয়েরা একত্রিত হলেই বলাবলি করতে লাগল: মিসেস তসাউ একটা নীল রঙের সিল্কের স্কার্ট কিনেছে আহ কিউ-র কাছ থেকে। পুরনো হলেও মোটে নব্বুই সেণ্ট দাম। আর চাও পাই-ইয়েনের মা (আরও একটু খতিয়ে দেখতে হবে, কেননা অনেকেই বলছে চাও সজু-চেন এর মা) একটা বাচ্চাদের জামা কিনেছে টুকটুকে লাল রঙের। বিদেশী কেলিকো কাপড়। প্রায় নতুন। মাত্র

তিন শত সেন্ট, শূন্তকরা আট সেন্ট ছাড়।

এরপর যাদের সিল্কের স্কার্টের দরকার, অথবা বিদেশী কেলিকো কাপড় চাই তারা আহ কিউএর কাছে যেতে লাগল। তাকে এড়িয়ে না গিয়ে পথে দেখা হলে তার পেছন পেছন ধাওয়া করত, ডেকে কথা বলত।—আহ কিউ সিল্কের স্কার্ট আছে তোমার কাছে? নেই? কিছু বিদেশী কেলিকো কাপড়ও চাই। দিতে পার?

ধীরে ধীরে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল গরীবের ঘর থেকে বড়লোকের ঘরে। মিসেস তসাউ সিল্কের স্কার্ট পেয়ে এত খুশী হয়েছিলেন যে তিনি দেখিয়েছিলেন মিসেস চাওকে। আর মিসেস চাও বললেন মিঃ চাওকে প্রশংসা করে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা ডিনারের সময় মিঃ চাও ছেলের কাছে (তাঁর ছেলে জেলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একমাত্র ছাত্র) তুললেন কথাটা। নিশ্চয় একটা কিছু আজব ব্যাপার আছে এই আহ কিউ মানুষটার। বাড়ির দরজা জানলাগুলির দিকে নজর রাখা দরকার। অহ কিউএর কাছে আরও কিছু জিনিসপত্র ছিল কিনা তারা জানত না তবু ভাবল কিছু ভালো জিনিস হয়তো থাকতে পারে তখনো। একটা দেখতে ভালো এবং সস্তা ফার জ্যাকেট দরকার মিসেস চাওএর। আহ কিউকে আসতে খবর দিতে হবে, মিসেস তসাউকে অনুরোধ করা হবে ঠিক হলো। বাড়ির চলতি নিয়মের তিন নম্বর ব্যতিক্রম পর্যন্ত মেনে নেওয়া হলো, সেদিন সন্ধ্যার পর আলো জ্বালবার বিশেষ অনুমতি দেওয়া হলো।

অনেক তেল পুড়ল, কিন্তু আহ কিউ এল না তখনও। অধৈর্য হয়ে হাইম উঠতে লাগল চাও বাড়ির সবার, কেউ কেউ বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল আহ কিউএর এমনি বিশৃঙ্খল খেয়ালীপনার জন্য। কেউ বা ক্রোধের বশে দোষারোপ করল মিসেস তসাউকে। আহ কিউকে হাজির করবার বিশেষ ব্যবস্থা নিশ্চয় করেন নি তিনি।

মিসেস চাওএর আশঙ্কা ছিল গত বসন্তকালের চুক্তির ভয়ে হয়তো আসবে না আহ কিউ কিন্তু এ যুক্তিকে তেমন আমল দিলেন না মিঃ চাও। কারণ, তিনি বললেনঃ এবার আমি নিজে তাকে ডেকে পাঠিয়েছি না!

খুবই সত্যি। মিঃ চাওএর অন্তর্দৃষ্টি আছে প্রমাণিত হলো। মিসেস তসাউকে সঙ্গে নিয়ে শেষপর্যন্ত আহ কিউ এসে হাজির হল।

—ও তো বলছে ওর কাছে আর কিছু নেই। বলতে বলতে মিসেস তসাউ ঘরে ঢুকলেন। যখন নিজে এসে আপনাদের বলতে বললাম তখন থেকেই গাওনা শুরু করেছে। তাকে বললাম…

—হুজুর! একটু মুচকি হাসবার চেষ্টা করে ঘরের ছইয়ের তলায় এসে দাঁড়াল আহ কিউ।

—শুনলাম তুমি নাকি খুব পয়সা করেছ! কী বলো আহ কিউ? তার

কাছাকাছি গিয়ে ভালো করে দেখে নিয়ে বললেন মিঃ চাও। খুব ভালো কথা! তারপর—লোকে বলছে কিছু পুরনো জিনিষ নাকি আছে তোমার কাছে? যা আছে. সবগুলো নিয়ে এস গিয়ে, আমরা দেখব। আমার কিছু জিনিষের দরকার—

—মিসেস তসাউকে তো বলেছি। আর কিছু নেই।

—কিছু নেই! হতাশা মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন মিঃ চাও। এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল সব!

—আমার এক বন্ধুর জিনিষ। খুব বেশী ছিল না গোড়ায়। মানুষেরা অনেক নিয়ে গেছে।

—নিশ্চয় কিছু আছে এখনও?

—আছে, কেবল একটা দরজার পর্দা।

—ওটাই নিয়ে এস আমরা দেখব। মিসেস চাও বললেন। বেশ, তাহলে ওটা কাল সকালবেলা আনলেও চলবে। খুব আগ্রহ না দেখিয়ে বললেন মিঃ চাও। ভবিষ্যতে যখনই কিছু আনবে আগে আমাদের দেখিয়ে নেবে—বুঝলে আহ কিউ?

—আমরা তোমাকে অন্যের তুলনায় কম দাম দেব না নিশ্চয়। বলল, জেলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র, মিঃ চাওএর পুত্র।

মিঃ চাও এক নজর তাকিয়ে দেখলেন আহ কিউএর দিকে।

—আমার একটা ফার জ্যাকেট দরকার। মিসেস চাও বললেন।

মিঃ চাওএর প্রস্তাবে আহ কিউ রাজী হলো কিন্তু এমন জবুথবু ভাব দেখিয়ে এবং বেপরোয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেল যে তাদের নির্দেশ মেনে নিল কিনা বোঝা গেল না। মিঃ চাও হতাশ হলেন, তাঁর রাগও হলো। তিনি চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন, তাঁর হাইম তোলা বন্ধ হয়ে গেল। জেলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রও আহ কিউএর ব্যবহারে সন্তুষ্ট হলো না। সে বলল: এই রাম ঘুঘু থেকে সাবধান হওয়া উচিত আমাদের। শেরিফকে বলুন না একে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিতে।

মিঃ চাও সম্মত হলেন না। এসব ক্ষেত্রে ঈগল পাখি নিজের বাসায় শিকার করে না এই প্রবাদ বাক্য মনে নেওয়া উচিত, তিনি বললেন। নিজের গাঁয়ে ভাবনার কিছু নেই, একটু বেশী সাবধান হলেই চলবে রাত্তির বেলায়। পিতামাতার নির্দেশ মেনে নিয়ে আহ কিউ:ক গ্রাম থেকে বিতাড়নের প্রস্তাব তুলে নিল তাঁর পুত্র। মিসেস তস ্কে সাবধান করে দিল, তার প্রস্তাবের কথা বাইরে যেন প্রকাশ না হয়।

কিন্তু পরদিনই, নীল রঙের স্কার্ট কালো রঙ করতে গিয়ে মিসেস তসাউএর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল আহ কিউ সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্যের কথা। আহ কিউকে বিতাড়নের প্রস্তাব প্রসঙ্গে কিছুই উল্লেখ করলেন না যদিও। তবু খুবই ক্ষতির

কারণ হলো আহ কিউর পক্ষে। প্রথমতঃ বেলিফ এসে দরজার পর্দাটা নিয়ে গেল তার বাড়ি থেকে। আহ কিউ আপত্তি জানাল, এটা মিসেস চাও নেবেন। তবু বেলিফ পর্দাটা ফিরিয়ে দিল না, উপরন্তু মুখ বন্ধ রাখবার মাসোহারা ঘুষ দিতে হলো আহ কিউকে। দ্বিতীয়তঃ গ্রামের মানুষের শ্রদ্ধা সে হারিয়ে ফেলল হঠাৎ। অত্যাধিক স্বাধীনতার সুযোগ না নিলেও গ্রামের মানুষেরা যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলতে লাগল তাকে। ঠিক আগের মতো ভয়ভীতি না হলেও প্রেতযোনীর প্রতি প্রাচীন মানুষের ব্যবহারের মতোই একটা সশ্রদ্ধ দূরত্ব রেখে চলতে লাগল সবাই।

আহ কিউএর ব্যাপারে রহস্য উদ্‌ঘাটনে কৌতূহলী গ্রামের গুটিকয়েক বাউণ্ডুলে যুবক অনুসন্ধান করতে গেল আহ কিউ এর কাছে! কিছুই গোপন না করে তার সমস্ত অভিজ্ঞতার বিবরণ গর্বের সঙ্গে দিল সে। তারা জানতে পারল, আহ কিউএর ব্যবসা ছিল ছিচকে চুরি। সে দেওয়াল টপকাতে পারত না। সিঁদ কেটে ঢুকতে পারত না। সিঁদের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত চুরির মাল সংগ্রহ করবার জন্য।

একদিন রাত্রে, সিঁদের বাইরে আহ কিউ তখন সবে একটা প্যাকেট হাতে পেয়েছে। তার সর্দার আবার ভেতরে ঢুকেছে। তক্ষুনি আহ কিউ শুনতে পেল ভেতরে একটা অস্বাভাবিক গণ্ডগোল। সঙ্গে সঙ্গে বমাল দ্রুত ছুটে পালাল সেখান থেকে। সে রাত্রেই আহ কিউ শহর থেকে পালিয়ে চলে এল এখানে, ওয়েই চুয়াঙএ। এরপর আহ কিউ আর সাহস পায় নি এ ব্যবসায় ফিরে যেতে।

এ গল্পে আরও ক্ষতি হলো আহ কিউ এর। গ্রামের মানুষেরা এতকাল শত্রুতার ভয়ে সশ্রদ্ধ দূরত্ব রেখেই এড়িয়ে চলত তাকে। কারণ কে অনুমান করতে পারত সে একজন চোর, অথচ চুরি করতে ভয় পায়? কিন্তু এই গল্প ছড়িয়ে পড়বার পর সবাই জানল অতি নিম্নস্তরের মানুষ এই আহ কিউ, কিসের ভয় তাকে?

মন্দির চাতালের কুঁড়ে ঘরে অঘোরে ঘুমোয় আহ কিউ।

৭

বিপ্লব

সম্রাট সুয়ান তুঙএর রাজত্বের তৃতীয় বৎসরের নবম চান্দ্রমাসের চৌদ্দ তারিখে (১৯১১ বিপ্লবের সময় যেদিন শাওসিং মুক্ত হয়েছিল) যেদিন আহ কিউ তার টাকার থলিটা চাও পাই-ইয়েনএর নিকট বিক্রয় করেছিল, মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হবার পর কালো রঙের চাঁদোয়া ঝুলানো একটা বড়ো নৌকো এসে ভিড়ল চাও-দের বাড়ির নদীর ঘাটে। নৌকোটা অন্ধকারে ভাসছিল। তখন গ্রামের মানুষেরা গভীর ঘুমে নিমগ্ন। কিছুই তারা টের পেল না। আবার

ভোর না হতেই চলে গেল নৌকোটা, কিছু লোক দেখল তখন। অনুসন্ধানের পর সবাই জানল নৌকোটার মালিক প্রাদেশিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র। এই ঘটনার পর কেমন একটা অস্বস্তির ভাব ছড়িয়ে পড়ল সারা ওয়েইচুয়াঙ জুড়ে। সেদিন দুপুর না হতেই বুকের স্পন্দন যেন বেড়ে গেল গ্রামের মানুষদের। তবে এই নৌকোর অভিযান ব্যাপারে অচঞ্চল রইল কেবল চাও পরিবার; কিন্তু গ্রামের চায়ের দোকান আর শুঁড়িখানায় গুজব ছড়ালো বিপ্লবীরা শহরে ঢুকেছে। প্রাদেশিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র নৌকো করে আশ্রয় নিতে এসেছেন এই গ্রামে। মিসেস তসাউ ভাবলেন অন্য কথা, তাঁর মতে প্রাদেশিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রটি কয়েকটা ভাঙাচুড়া বাক্স রাখতে এসেছিলেন এই ওয়েইচুয়াঙে। কিন্তু মিঃ চাও রাখতে সম্মত হন নি। আসলে চাও পুত্র এবং প্রাদেশিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রটির মধ্যে কোনো সংভাব ছিল না বলেই এই বিপদের সময় মিঃ চাওএর কাছে বন্ধুত্বের ব্যবহার প্রত্যাশা দুরূহ ছিল। মিসেস তসাউ চাও পরিবারের প্রতিবেশী, আর কী ঘটেছিল তা একমাত্র তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তাই আসল ব্যাপার জানা সম্ভব শুধু তারই পক্ষে।

তারপর আরও একটা গুজব রটল। নিজে না এসে চাও পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তার সুদূর সম্পর্কের সূত্র টেনে নাকি একটা দীর্ঘ চিঠি দিয়েছিলেন ঐ পণ্ডিত ব্যক্তি, অনেক বিবেচনা এবং চিন্তার পর কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই বুঝতে পেরে বাক্সগুলি রাখবার সিদ্ধান্ত করলেন মিঃ চাও। সেগুলি এখন গাদা করা আছে স্ত্রীর খাটের তলায়। আর বিপ্লবীদের সম্বন্ধে কেউ কেউ বলল, সাদা শিরস্ত্রাণ আর সাদা বর্ম গায় এঁটে তারা নাকি সেই রাত্রেই প্রবেশ করেছে শহরে—সাদা পোশাক সম্রাট চুঙ চেন (মিঙ রাজবংশের শেষ নৃপতি চুঙ চেন ১৬২৮ খৃঃঅঃ থেকে ১৬৪৪ খৃঃঅঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। লি তজু চেঙএর অধিনায়কত্বে বিদ্রোহী কিষাণ বাহিনীর বেজিং প্রবেশের পূর্বে ফাঁসির দড়িতে ঝুলে তিনি আত্মহত্যা করেন) এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশের চিহ্ন!

অনেকদিন থেকে বিপ্লবীদের কথা জানত আহ কিউ, আর এবছর বিপ্লবীদের শিরোচ্ছেদ করতে স্বচক্ষে দেখে এসেছে। কিন্তু যেদিন সে বুঝতে পারল যে বিপ্লবীরা বিদ্রোহী এবং বিদ্রোহ এলে তার নিজের অবস্থাও খুব কাহিল হয়ে পড়বে, সেদিন থেকে সবসময় এদের ঘৃণা করে আসছে সে। এদের থেকে দূরে রেখেছে নিজেকে। কে জানত সুবিস্তীর্ণ ত্রিশ মাইল ঘিরে যার প্রতিপত্তি এবং সুখ্যাতি ছড়িয়ে আছে সেই প্রাদেশিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রটিকেও পর্যন্ত এরা সন্ত্রস্ত করে তুলবে? আহ কিউ যেন কেমন অভিভূত মনে করল নিজেকে, গ্রামের মানুষদের সন্ত্রস্ততা যেন ইন্ধন জোগাল তার আনন্দে।
—বিপ্লব খারাপ কিছু নয়। আহ কিউ ভাবল। সবাইকে একসঙ্গে খতম করে দাও, জাহান্নামে পাঠাও, আমিও বিপ্লবীদের দলে যোগ দেব।

ইদানিং খুবই কষ্টে চলছিল আহ কিউর—বোধহয় কেমন একটা অসন্তুষ্টি কুঁড়ে খাচ্ছিল তাকে। তার উপরে, খালি পেটে দুই পাত্র মদ গিলেছে আজকে দুপুরে। তাই মাতাল হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। আপন মনে ভাবতে ভাবতে পথ চলতে কেবলি মনে হতে লাগল আবার বুঝি সে হাওয়ায় উড়ছে। হঠাৎ তার মনে চমক দিয়ে গেল যেন সে নিজেই বিপ্লবীদের একজন, আর ওয়েই-চুয়াঙের মানুষেরা সব তার হাতে বন্দী। আনন্দের জোয়ারে নিজেকে আর সংযত রাখতে না পেরে সে সজোরে চিৎকার করে উঠল ঃ বিপ্লব! বিপ্লব! আতঙ্কিত, বিভ্রান্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল গ্রামের মানুষেরা।

এরূপ সকরুণ দৃষ্টি কোনোদিন দেখেনি আহ কিউ। গ্রীষ্মের ভরা দুপুরে এক গ্লাস বরফ জলের মতো শ্রান্তিহর মনে হলো তাদেরকে। তাই আরও উৎফুল্ল চিত্তে চলতে লাগল সে চিৎকার করতে করতে ঃ ঠিক আছে। আমার যা ইচ্ছে তাই নেব! যা ভালো লাগে তাই করব। ট্রা লা, ট্রা লা!

দুঃখ আমি রাখি কোথায় মেরেছি ভুল করে

শপথি-ভাই চেঙকে আমার রুপোর পেয়ালায়।

দুঃখ আমি রাখি কোথায়, মেরেছি ভুল করেছি—ইয়াহ! ইয়াহ। ইয়াহ। ট্রা লা, ট্রা লা, টুম টি টুম টুম!

মারব আমি লৌহ-গদায় এই যে আছে ঐ!"

মিঃ চাও ও তাঁর পুত্র গেটের ধারে দাঁড়িয়ে দুজন আত্মীয়ের সঙ্গে বিপ্লবের কথা আলোচনা করছিলেন। তাদের লক্ষ্য করেনি আহ কিউ। মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে সে চলছিল ঐ পথ দিয়ে গাইতে গাইতে—ট্রা লা লা, টুম টি টুম!

—তারপর কিউ, কী খবর বুড়ো কত্তা!

—দুঃখ আমি রাখি কোথায়, মেরেছি ভুল করে—

—বলি, আহ কিউ শুনছ! জেলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ডাকল তাকে নাম ধরে, শুধু তখন দাঁড়াল আহ কিউ।

—কী, বলুন! সে বলল, একদিকে মাথা কাত করে।

—বুড়ো কত্তা কি—তাহলে—কি বলবেন মিঃ চাও মুখে কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না—তাহলে বেশ দুপয়সা করছ আজকাল?

—দু পয়সা করছি? তা বটে! যা চাই তাই আমি নেই···

—আহ কিউ, ভাইটি আমাদের, আমাদের মতো গরীব বন্ধুর কথা আর মনেই পড়ে না তোমার, কী বলো? বলল চাও পাই ইয়েন।

—গরীব বন্ধু? তোমরা তো আমার চেয়ে নিশ্চিত ধনী মানুষ। জবাব দিয়ে পথ চলতে লাগল আহ কিউ।

মনমরা আর বুদ্ধবাক হয়ে তারা দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

একটু পরে বাড়ির ভেতর চলে গেল মিঃ চাও আর তাঁর পুত্র।

সেদিন বিকেলে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালবার আগ পর্যন্ত এই বিষয়ে আলোচনা

করল পরিবারের সবাই মিলে। চাও পাই-ইয়েন বাড়ি ফিরে টাকার থলিটা ট্যাক থেকে বের করে দিল তার স্ত্রীর হাতে। বাক্সের তলায় কোথাও লুকিয়ে রাখবার জন্য।

যেন সে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে নেশার ঘোরে। কিছুক্ষণ এমনি মনে হলো আহ কিউকে। মন্দির চাতালে ফিরে আসতে আসতে আবার সে অপ্রমত্ত হলো, শান্ত হলো। সেদিন সন্ধ্যার পর হৃদয় বুঝি খুলে গেল। মন্দির চাতালে বৃদ্ধ মোহান্ত আহ কিউকে চা খেতে ডাকল। দু টুকরো রুটি চাইল আহ কিউ। রুটিটা খেয়ে একটা মোমবাতিও চেয়ে নিল মোহান্তের কাছ থেকে। মোমবাতিটা জ্বালিয়ে নিঃসঙ্গ আহ কিউ শুয়ে পড়ল তার ছোট কুঁড়েঘরখানির ভূমিশয্যায়। সে আজ প্রশান্ত সে আজ আনন্দিত। দীপাবলী উৎসবের প্রদীপের মতোই দুলতে লাগল নাচতে লাগল মোমবাতির স্নিগ্ধ শিখা। কল্পনার রঙিন ফানুষও সে উড়িয়ে দিল সেই সঙ্গে।

—বিদ্রোহ? খুব মজা হবে। সাদা শিরস্ত্রাণ আর সাদা বর্ম এঁটে আসবে একদল বিপ্লবী। তাদের হাতে থাকবে তরবারি, লোহার গদা, বোমা, বিদেশী বন্দুক দু-ধার ধারালো মুখ ছুঁচলো ছুরি, আর আকশি আঁটা বর্ম। তারা আসবে এই গাঁয়ের মন্দির চাতালে, ডাকবে আহ কিউ। এসো আমাদের সঙ্গে, আমাদের সঙ্গে এসো। আমি তখন যাব চলে তাদের সাথে।

—গ্রামের মানুষদের অবস্থা তখন হবে সে কি হাস্যকর, পায়ের উপর লুটিয়ে পড়বে মানুষগুলি, কাকুতি মিনতি করবে, আহ কিউ আমাদের বাঁচাও। কিন্তু কে শুনবে তাদের কথা! প্রথম মরবে যুবক ডি আর মিঃ চাও, তারপর জেলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র আর নকল বিদেশী শয়তান, কিন্তু আমি হয়তো রেহাই দেবো জনাকয়েককে। একবার হয়তো গুঁপো ওয়াঙকেও রেহাই দিতাম কিন্তু এখন আমি চাই না সেও—

—আর জিনিষপত্রগুলো?…সটান ভেতরে ঢুকে যাব। বাক্সগুলি খুলে ফেলব ঃ কত ভাল ভাল রূপোর বিদেশী মুদ্রা, বিদেশী কেলিকো কাপড়ের জ্যাকেট—জেলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের পত্নীর নিংপো খাটটা প্রথমেই নিয়ে আসব মন্দির চাতালে আর নিয়ে আসব চিয়েন পরিবারের চেয়ার এবং টেবিলগুলিও চাওদেরগুলিও ব্যবহার করতে পারি। না, নিজে আনব না, এক তিল কিছু না—যুবক ডিকে হুকুম করব, আমার হয়ে নিয়ে আসবে। সে চটপট কাজ সারবে, নয়তো খতম করব তাকেও—

—চাও সজু-চেনএর ছোট বোনটা খুবই বিশ্রী দেখতে। মিসেস তসাউএর মেয়ের কথাও ভাবতে পারি কয়েক বছর বাদে। নকল বিদেশী শয়তানের বউ বেনী ছাড়া মানুষের সঙ্গে রাতে ঘুমোয়—কী বিশ্রী! দেখতে কালো নয় মেয়েমানুষটা। জেলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের বউএর চোখের পাতার উপর কিসের একটা দাগ—আমাহ বুকে অনেকদিন দেখি না। কোথায় যে আছে তাও

জানি না। ওর পা দুটো কেমন কুৎসিৎ দেখতে একেবারে গোব্দা গাব্দা—আহ কিউএর কল্পনা জাল ছড়ানো শেষ হয়নি তখনও, হঠাৎ কানে এল নাক ডাকার আওয়াজ। মোমবাতিটা আধা ইঞ্চি মতো পুড়েছে ততক্ষণে, মোমবাতির কম্পমান লাল আলোর শিখায় জলজল করে উঠল তার হাঁ করা মুখের ভেতরটা।

—ওহো! ওহো! মাথাটা তুলে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল আহ কিউ। দেখল কেবল মোমবাতিটাই জলছে ঘরে, সে আবার শুয়ে পড়ল, ঘুমিয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

পরদিন সকালে খুব বিলম্বে তার ঘুম ভাঙলো। খোলা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সবই ঠিক তেমনি আছে। তখনও সে খুব ক্ষুধার্ত, মস্তিষ্কটাকে তোলপাড় করেও যেন সে কিছুই ভাবতে পারল না। হঠাৎ একটা আইডিয়া তার মাথায় এল। আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। সুপরিকল্পিতই হোক আর আকস্মিকতার জন্যই হোক, দেখল সে দাঁড়িয়ে আছে কনভেণ্টের সামনে।

গত বসন্তকালে যেমন দেখেছিল সাদা রঙের দেওয়াল আর কালো রঙের ফটক বিশিষ্ট মঠ, তখনও তেমন শান্ত পরিবেশ! ক্ষণিক চিন্তার পর সে টোকা দিল ফটকের দরজায়, সঙ্গে সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে উঠল একটা কুকুর মঠের ভেতরে। কয়েক টুকরো পাটকেল কুড়িয়ে নিল আহ কিউ। আরো জোরে ঘা দিল ফটকের দরজার গায়ে। দরজা খুলতে কি যেন আসছে সে টের পেল।

হাতে ইঁটের টুকরোগুলি নিয়ে দুপা ফাঁক করে আহ কিউ দাঁড়িয়ে পড়ল। কালো কুকুরটাকে মোকাবিলা করতে সে প্রস্তুত। একটু ফাঁক করে মঠের ফটক খুলল, সবটা খুলল না। আহ কিউ দেখল, কালো কুকুরটা বেরিয়ে আসেনি। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল, ভেতরে দাঁড়িয়ে কেবল মঠের সেই বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী।

—এখানে আবার এসেছ কেন? একটু চমকিত ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

—বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে—জানেন না আপনারা? একটু অস্পষ্টতার মধ্যে আহ কিউ জবাব দিল।

—বিপ্লব! বিপ্লব—বিপ্লব তো এর মধ্যে হয়েই গেছে। বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী বললেন কেঁদে কেঁদে। তার চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল। তোমাদের এইসব বিপ্লব নিয়ে আমাদের কী হবে বলতে পার?

—কী বলছেন? অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করল আহ কিউ।

—তুমি জানো না? এর মধ্যেই বিপ্লবীরা এসেছিল এখানে!

—কারা? আরও বেশী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল আহ কিউ। জেলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র আর নকল বিদেশী শয়তান এই দুই জনই তো এসেছিল!

একটা বিরাট বিস্ময় ঠেকল আহ্ কিউএর কাছে। সে হকচকিয়ে গেল। বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী যখন লক্ষ্য করলেন আহ্ কিউএর আক্রমণাত্মক ভাব কেটে গেছে, তিনি দ্রুত গতিতে ফটক বন্ধ করে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে সজোরে ধাক্কা দিয়েও নাড়াতে পারল না আহ্ কিউ। দরজায় বার বার আঘাত করেও আর কোনো সাড়া পেল না ভেতর থেকে।

ব্যাপারটা ঘটেছিল সেদিন সকাল বেলা। চাও পরিবারের ছেলে জেলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রটি তাড়াতাড়ি পেল খবরটা। যখনই শুনল বিপ্লবীরা রাতের অন্ধকারে শহরে প্রবেশ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে চুলের বেনী কুণ্ডলি পাকিয়ে ফেলল। যে মানুষটির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না এতকাল সেই নকল বিদেশী শয়তানের সাথে দেখা করতে প্রথমেই সে ছুটে গেল চিয়েন পরিবারের বাড়িতে। দেশ সংস্কারের কাজে একযোগে নেমে আসার এই প্রকৃষ্ট সময় বুঝতে পেরে আন্তরিক আলোচনা হলো দুজনের মধ্যে। সহমত হয়ে কমরেড বলে মেনে নিল পরস্পরকে। বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়তে শপথ নিল দুজনেই। তারপর মস্তিষ্ক অনেক তোলপাড় করে তাদের মনে পড়ল কনভেন্টের দেওয়ালে একটা প্রস্তর ফলকে লেখা আছে সম্রাট দীর্ঘজীবি হউন—তারা সিদ্ধান্ত নিল অবিলম্বে তুলে ফেলতে হবে ঐ ফলকটা। এমনি বিপ্লবী পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে আর ক্ষণিক সময় নষ্ট না করে ছুটে গেল মঠের দিকে। বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী বাধা দিয়েছিলেন! কিছু বলেও ছিলেন। তারা তাঁকে ধরে নিল চিঙ সরকারের অনুগামী বলে! লাঠির ঘা আর গোটা কতক ঘুষি পড়ল তাঁর মাথায়। এরা চলে যাবার পর নিজেকে সামলে নিয়ে বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী সবকিছু দেখলেন চারদিক ঘুরে ঘুরে। রাজকীয় ফলক টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। ক্ষমার দেবী কুয়ানিনি মন্দিরে রক্ষিত সুয়ান তে যুগের বহুমূল্যবান ধুনুচিটিও উধাও। (বহু মূল্যবান কারুকার্যখচিত ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি ধুনুচি—মিঙ রাজবংশের রাজা সুয়ান তের রাজত্বকালে (১৪২৬-১৪৩৫) এই ধুনুচিটি নির্মিত হয়েছিল।)

আহ্ কিউ এ খবর জানল অনেক পরে। সে তখন ঘুমে অচৈতন্য ছিল বলে ধিক্কার দিল নিজেকে। তাকে ডাকতে আসেনি বলে সে ক্ষুব্ধ হলো। সে বলল নিজের মনেঃ হয়তো তারা জানত না বিপ্লবী দলে আমিও যোগ দিয়েছি।

৮

বিপ্লবে অংশ নিতে বঞ্চিত

ওয়েইচুয়াঙ-এর মানুষেরা দিন দিন আরও আশ্বস্ত হতে লাগল। আহৃত সংবাদ থেকে তারা জানতে পারল বিপ্লবীরা শহরে অনুপ্রবেশ করলেও বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি এদের প্রবেশের পরে। ম্যাজিস্ট্রেট তখনও সর্বোচ্চপদে

অধিষ্ঠিত, শুধু তার খেতাবের বদল হলো। প্রাদেশিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রটিও কোনো একটি চাকরি পেল—কোনো এক পর্যায়ের সরকারী চাকরি আর সামরিক বাহিনীর পুরোধায় তখনও সেই পুরনো ক্যাপটেন। ক্ষুদকুড়ো আরও কিছু যারা পেল তাদের নামগুলি মনে নেই ওয়েইচুয়াঙ-এর মানুষদের। বিপ্লবীদের শহর অনুপ্রবেশের পরদিন কয়েকজন দুষ্ট বিপ্লবী শহরবাসীদের কারও কারও বেনী কেটে দিয়ে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল সেটাই তখন একমাত্র ভয়ভাবনার কারণ। পাশের গাঁয়ের একজন নৌকোর মাঝি হলো তাদের প্রথম শিকার। মুখ দেখাতে পারেনি সে কিছুদিন। তবু কী আর তেমন ভয়। ওয়েইচুয়াঙের মানুষেরা খুব কচিৎ শহরে যায়। যারা শিগগির যাবে বলে ঠিক করেছিল এই ঝুঁকি এড়াতে তারাও পিছিয়ে গেল। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার উদ্দেশ্যে শহরে যাবে বলে ঠিক করেছিল আহ কিউ। সেও মিইয়ে গেল। শহরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিল।

কিন্তু বিপ্লবের পর ওয়েইচুয়াঙ-এ কোনো পরিবর্তন আসেনি বললে ভুল হবে। যারা চুলের বেনী মাথার উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে রেখেছিল তাদের সংখ্যা বেড়ে গেল কয়েকদিনের মধ্যেই। আর স্বভাবতই এই কাজে আগুয়ান হলো জেলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র, তারপর এক এক করে এল চাও সজু-চেন আর চাও পাই-ইয়েন এবং সবশেষে তাদের পর আহ কিউ। গ্রীষ্মকালে অদ্ভুত লাগত না যদি গ্রামের সব মানুষের চুলের বেনী মাথার উপরে কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখত বা গাঁট পরিয়ে রাখত। কিন্তু তখন হেমন্তের প্রায় শেষ। সুতরাং কে বলবে বেনী পাকিয়ে রাখবার গ্রীষ্মের অভ্যাসকে এই হেমন্তে প্রচলন প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে একটা বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্য কিছু। আর কে বলবে ওয়েইচুয়াঙের সংস্কার পরিকল্পনায় এটাও একটা অংশ নয়!

চাও সজু চেনকে ঘাড় কামানো অবস্থায় দেখে গাঁয়ের মানুষেরা তাই এক গলায় চেঁচিয়ে উঠল : ঐ যে বিপ্লবী যায়! খবরটা শুনে খুবই ভালো লাগল আহ কিউএর। জেলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রটিকে চুলের বেনী মাথার উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখবার খবর যদিও শুনেছিল অনেকদিন আগেই তবু নিজেকে সাবধান করবার কথা ভাবেনি কখনও। চাও সজু-চেনকেও করতে দেখে তার খেয়াল হলো। তাদের নকল করতে মনস্থ করল সে। মাথার উপর চুলের কুণ্ডলী করতে একটা বাঁশের চপস্টিক্‌ও নিল, তারপর ক্ষণিক ইতস্তত করবার পর বুকে সাহস সঞ্চয় করে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

পথে চলতে গেলে অনেক মানুষ তাকিয়ে থাকে তার দিকে, কিন্তু কোনো কথা বলে না কেউ। খুব অখুশী হয় আহ কিউ। কেমন বিরক্তি আসে। ইদানিং সহজেই সে মেজাজ হারিয়ে ফেলে। আসলে বিপ্লবের আগের চেয়ে অবস্থা খারাপ নয় তার। মার্জিত ব্যবহার সে পাচ্ছে গ্রামের মানুষদের কাছে,

দোকানীরা নগদ চাইছে না, তবু কেমন একটা অসন্তুষ্টির ভাব জড়িয়ে আছে তার মনকে। বিপ্লবের পর আরও অনেক কিছু প্রত্যাশা মানুষের, কেবলি সে ভাবে। যখন সে যুবক ডি-কে দেখল রাগে তার ভেতরটা টগবগ করে ফুটে উঠল।

যুবক ডিও বেনী কুণ্ডলী পাকিয়েছে, সেও আহ কিউএর মতো চপস্টিক লাগিয়েছে। আহ কিউ কল্পনা করেনি এমন সাহস হবে যুবক ডি-র ; এটা বরদাস্ত করতে পারল না সে। যাহোক, কে এই যুবক ডি? তক্ষুণি একে হাতের মুঠোয় পেতে বাঁশের স্টিকটা ভেঙ্গে ফেলে চুলের বেনী টেনে নামাতে ইচ্ছে জাগল আহ কিউর। নিজের মূল্য না বুঝে বিপ্লবী বলে পরিচয় দেবার স্পর্ধা অসহ্য ঠেকল তার কাছে। কিন্তু রেহাই দিল তাকে, কেবল থুকথুক করে থুতু ফেলল যুবক ডি-কে লক্ষ্য করে।

গত কয়েকদিনের মধ্যে শহরে গিয়েছিল কেবল একমাত্র নকল বিদেশী শয়তান। চাও পরিবারে ছেলে জেলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র, তাদের কাছে গচ্ছিত বাক্সগুলির ব্যাপারে আলোচনার অজুহাত নিয়ে প্রাদেশিক পরিক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে শহরে যাবে মনস্থ করল। কিন্তু মাথার বেনী কাটা যাবার ভয়ে সে পরিকল্পনা স্থগিত রাখল। বিশেষ ভদ্রতাসূচক একখানা চিঠি সহ নকল বিদেশী শয়তানকে শহরে পাঠিয়ে দিল ; লিবার্টি পার্টির সঙ্গে তাকে পরিচিত করে দেবার কথাও বলে দিল। নকল বিদেশী শয়তান শহর থেকে ফিরে এলে চার ডলার দিতে হলো তাকে। পরীক্ষায় জেলার উত্তীর্ণ ছাত্রটি রূপোর পিচ ফল ধারণ করতে লাগল এরপর থেকে। এ দেখে অভিভূত হয়ে গেল ওয়েইচুয়াঙ গাঁয়ের মানুষেরা। তারা ভেবে নিল নিশ্চয় এটা পারসিমন অয়েল পার্টির ব্যাজ (Parsimion Oil Party) হান লিন Han lin (চিঙ রাজবংশের রাজত্ব কালীন ১৬৪৪-১৯১১) সাহিত্যে সবচেয়ে সেরা ডিগ্রী।) এর সম মর্যাদা সম্পন্ন। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ চাও-এর মর্যাদা হঠাৎ বেড়ে গেল, তাঁর ছেলে যেদিন সরকারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল সেদিনও ততটা হয়নি বোধহয়। সবাইকে ঘৃণার চোখে দেখতে লাগলেন, আহ কিউকে যখন দেখলেন তাকেও যেন একটু এড়িয়ে গেলেন। এমনি তাচ্ছিল্যে আহ কিউ অসন্তুষ্টিতে ভরপুর হয়ে গেল। কিন্তু যখন সে রূপোর পিচ ফলের কথা শুনল সে অনুধাবন করতে পারল গভীর অরণ্যে যেন সে পরিত্যক্ত হলো। শুধু যোগ দিলাম বললেই বিপ্লবী হওয়া যায় না ; কেবল চুলের বেনী মাথার উপর গুটিয়ে নিলেও নয় ; সবচেয়ে প্রয়োজন বৈপ্লবিক দলের সংস্পর্শে আসা। সারা জীবনে মাত্র দুজন বিপ্লবীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তার—একজন দিশেহারা হয়ে গেছে শহরে গিয়ে, বাকী রয়েছে কেবল নকল বিদেশী শয়তান। নকল বিদেশী শয়তানের সঙ্গে অবিলম্বে আলোচনা না করলে কোনো পথ আর খোলা থাকবে না তার জন্যে।

চিয়েন বাড়ির সদর দরজাটা সেদিন সে খোলা পেল। আহ কিউ ভীরু ভীরু পদক্ষেপে ঢুকে গেল। ভেতরে ঢুকেই সে চমকে গেল। দেখল মিশ কালো পোশাক পরে নকল বিদেশী শয়তান বাড়ির আঙিনায় দাঁড়িয়ে। অবশ্যি বিদেশী পোশাক, আর তার গায়েও দেখল একটা রুপোর পিচ ফল। তার হাতে দেখল একটা ছড়ি। যেটার সঙ্গে খুবই পরিচিত ছিল আহ কিউ। সন্ত লিউএর চুলের (চীন দেশীয় পল্লী রূপকথার একজন অমর নায়ক, বিলম্বিত কেশগুচ্ছ তার বৈশিষ্ঠ।) মতো অগোছাল চুলের গোছা ঝুলছিল তার ঘাড়ের উপর। তার সামনে ঋজু দাঁড়িয়ে চাও পাই-ইয়েন এবং আরও তিনজন—নকল বিদেশী শয়তানের বক্তৃতা তারা শুনছিল গাঢ় মনোযোগ এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে।
আহ কিউ পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল। ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল চাও পাই-ইয়েনের পেছনে। মনে ইচ্ছে থাকলেও শুভেচ্ছা জানাবার ভাষা সে খুঁজে পেল না। স্পষ্টতই নকল বিদেশী শয়তান বলে ডাকতে পারত না, বিদেশী ও নয়, বিপ্লবী শব্দটাও অনুপযুক্ত মনে হলো। বোধহয় সবচেয়ে ভালো সম্ভাষণ হবে মিঃ বিদেশী।

কিন্তু মিঃ বিদেশী তাকে দেখতে পায়নি। তখন সে চোখের পুটলি ঊর্দ্ধমুখী করে বলছিল দারুণ উদ্দীপনায় ঃ
—আমি এতই আবেগ প্রবণ যে, যখনই আমাদের দেখা হয় আমি বলতে থাকি ভাই হুঙ, এমনি করেই আমরা চলব। কিন্তু সব সময় সে জবাব দিত, না আর না, একটা বিদেশী শব্দ, তোমরা বুঝবে না। নইলে আমরা সফল হতাম অনেক আগেই। এই থেকেই প্রমাণ সে কত সতর্ক মানুষ। সে আমাকে বার বার বলেছে হুপেই যেতে কিন্তু রাজী হইনি আমি। কে চায় একটা ছোট্ট শহরে গিয়ে কাজ করতে— ?
—তা—আ—
কথার বিরামের অপেক্ষায় রইল আহ কিউ, তারপর নিজের বক্তব্য বলবার জন্য সব সাহস সঞ্চয় করল বুকের ভেতর। কিন্তু যে কারণেই হোক তখনও মিঃ বিদেশী বলে তাকে ডাকতে পারল না।
শ্রোতাদের চারজনই হঠাৎ চমকে উঠল তাকে দেখে ঃ ভ্রূকুটি নেত্রে তাকাল আহ কিউর দিকে। মিঃ বিদেশীও এই প্রথম লক্ষ্য করল তাকে।
—কী চাই তোমার ?
—আমি—
—কোনো প্রয়োজন নেই, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।
—আমিও যোগ দিতে চাই
—কোনো কথা শুনব না, বেরোও বলছি। মিঃ বিদেশী বলল শ্মশানযাত্রীর হাতের লাঠিটা উঁচিয়ে।
তখন চাও পাই-ইয়েন আর অন্যরাও উঠল চেঁচিয়ে ঃ

—মিঃ চেন তোমাকে চলে যেতে বলছেন, শুনছ না ?

মাথা বাঁচাতে আহ কিউ হাতটা মাথার উপর তুলে নিল, কী করছে চিন্তা না করেই ছুটে পালাল সদর দরজা পেরিয়ে ; কিন্তু মিঃ বিদেশী এবার আর তেড়ে গেল না তাকে। ষাট পদক্ষেপে ছুটে গিয়ে দাঁড়াল আহ কিউ, কেমন বিগড়ে গেল মেজাজটা। কারণ মিঃ বিদেশী যদি বিপ্লবীর দলে যোগ দিতে না দেয়, তবে আর কোনো পথ খোলা নেই তার কাছে। ভবিষ্যতে কোনো দিন আর সাদা শিরস্ত্রাণ আর সাদা বর্ম পরে কেউ আসবে না তাকে ডাকতে। তার সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য, আশা এবং ভবিষ্যত কিছুই আর থাকবেনা। এক আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল সব কিছু। এই খবর গাঁয়ের মানুষেরা ছড়িয়ে দেবে চারদিকে। সে বিদ্রূপের পাত্র হবে যুবক ডি আর গুঁপো ওয়াঙের কাছে। তবু এসব চিন্তা এখন গৌণ তার কাছে।

নিজেকে এতটা হতাশ আর মনে হয়নি কোনোদিন। এমন কি মাথার বেণীর কুণ্ডলী আজ অর্থহীন বিশদৃশ লাগছিল তার কাছে। প্রতিশোধ স্পৃহায় চুলের বেনী ঝুলিয়ে দিতে সে প্রলুব্ধ হলো ; কিন্তু করল না। আসন্ধ্যা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল। ধারে দুপাত্র মদ গিলবার পর নিজেকে যেন অনেকটা চাঙা লাগল। মনশ্চক্ষুর সম্মুখে শ্বেত শিরস্ত্রাণ আর শ্বেত বর্মের টুকরো টুকরো ছবি আবার বেশ ভেসে বেড়াতে লাগল।

একদিন গভীর রাত্রি পর্যন্ত উদ্দেশ্যেহীন ভাবে সে ঘুরে বেড়াল।

শুঁড়িখানার ঝাপ উঠছে তখন, ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে গেল মন্দির চাতালে।

—দুম···দুম··· ।

হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক আওয়াজ সে শুনতে পেল। আতস পটকা নয় বুঝতে পারল। যে মানুষ সবসময় উত্তেজনা পছন্দ করত, পরের ব্যাপারে নাক গলানো যার স্বভাব, সেই আহ কিউ তক্ষুনি ছুটল অন্ধকারে সেই আওয়াজের খোঁজে। মনে হলো তার সামনে কার পায়ের শব্দ, কান পেতে শুনতে লাগল, আচমকা একটা মানুষ ছুটে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল তার সামনে। আহ কিউএর নজরে পড়া মাত্রই ঘুরে গিয়ে দ্রুতবেগে ছুটতে লাগল লোকটা লোকটা ঘুরে দাঁড়াতেই আহ কিউও দাঁড়িয়ে পড়ল। আহ কিউ দেখল আর কেউ নেই তার পেছনে, লক্ষ্য করে দেখল তার সামনের মানুষটি যুবক ডি।

—ব্যাপারটা কী ? হয়েছে কী ? বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল আহ কিউ।

—চাও—চাওদের বাড়িতে ডাকাত প ়েছে। খেঁকিয়ে উঠেছিল যুবক ডি।

আহ কিউএর হৃদপিণ্ডে ধুক ধুক শুরু হলো। কথাটা বলেই চলে গেল যুবক ডি। আহ কিউও ছুটতে লাগল। থামল দুই তিন বার। নিজেও একদিন এই ব্যবসায় ছিল বলেই অদ্ভুত রকম সাহসী মনে হলো নিজেকে। রাস্তার বাঁক থেকে বেড়িয়ে এসে শুনল কান পেতে, ঐ বুঝি বহু লোকের চিৎকারের

আওয়াজ ভেসে আসছে। সতর্কতার সঙ্গে দেখল চারদিকে, মনে হলো সে যেন দেখছে এক বিরাট দল মানুষ মাথায় শ্বেত শিরস্ত্রাণ আর গায় শ্বেত বর্ম, কারো মাথায় বাক্স-প্যাটরা, কারও মাথায় ফারনিচার, কেউ বা নিয়েছে জেলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের স্ত্রীর সেই নিংলোখাট ; সবই যেন কেমন আবছা আবছা। সে আরও কাছে যেতে চাইল, কিন্তু পারল না। তার পা দুটি বুঝি শিকড় গেড়েছে মাটিতে।

আকাশে চাঁদ ছিলনা সেই রাত্রিতে। ওয়েইচুয়াঙ তখন গভীর অন্ধকারের নিস্তব্ধতায় ডুব দিয়েছে। প্রাচীন কালের সম্রাট ফু সির (চীনদেশের সবচেয়ে প্রাচীন উপকথার এক নৃপতি।) আমলের দিনগুলির মতোই শান্ত নিথর নিস্তব্ধ। তার সকল আগ্রহ ঝিমিয়ে না পড়া পর্যন্ত আহ কিউ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। তবু সব যেন মনে হলো আগের মতোই ; দূরে দেখা যায় এদিক ওদিক ঘুরছে বহু মানুষ, কী যেন বইছে সঙ্গে করে। বাক্স-প্যাটরা আসবাবপত্র, জেলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের স্ত্রীর নিংলোখাট-টাও বুঝি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তবু নিজের চোখকেই বুঝি সে বিশ্বাস করতে পারছে না। কিন্তু সে আর কাছে যাবে না ঠিক করল। ফিরে গেল তার মন্দির চাতালে। মন্দির চাতালে তখন যেন আরো গাঢ় অন্ধকার। বাইরে সদর ফটক খুলে হাঁতড়ে হাঁতড়ে সে গিয়ে ঢুকল নিজের কুঁড়েঘরে। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবার পর চতুর্দিকের ক্রিয়াকাণ্ডের কী প্রতিক্রিয়া তার উপর তা ভাববার মতো শান্ত মনে হলো নিজেকে। শ্বেত শিরস্ত্রাণ আর শ্বেতবর্ম পরিহিত মানুষগুলো এসেছিল এটা স্পষ্ট কিন্তু তারা তো ডাকতে আসেনি তাকে ; তারা নিয়ে গেছে অনেক কিছু কিন্তু সে তো পায়নি তার কাণাকড়ির ভাগ—কেন ? নকল বিদেশী শয়তান দায়ী এর জন্যে। সে বিপ্লবে অংশ নিতে বঞ্চিত করেছে আহ কিউকে। নইলে কেন সে ভাগ পেতে বঞ্চিত হলো এবার। আহ কিউ যতই ভাবতে লাগল ততই তার ক্রোধ বাড়তে লাগল সে প্রচণ্ড রোষে অভিভূত হয়ে পড়ল।

—তাহলে বিপ্লব আমার জন্য নয়, না ? কেবল তোমার, এঁ্যা ! চিৎকার করে উঠল সে দুর্বার রোষে। নকল বিদেশী শয়তান, তুমি নিপাত যাও মর গিয়ে তুমি বিপ্লব কর গিয়ে—জাননা বিদ্রোহীর সাজা তার মুণ্ডচ্ছেদ। আমি গুপ্তচরের খাতায় নাম লেখাব। আমি দেখব তোমাকে শহরে নিয়ে যাবে, ধর থেকে মাথা কেটে নামাবে—খালি তুমি নয়—তুমি, তোমার পরিবারের সবাই ! মারো মারো !

৯

অপূর্ব পরিশেষ

চাওদের বাড়িতে লুটতরাজের পর ওয়েইচুয়াঙে মানুষেরা অনেকেই খুশী হলো আবার শঙ্কিতও হলো। আহ কিউএর বাইরে নয় কিন্তু দিন চারেক

পর হঠাৎ এক গভীর রাত্তিরে কিছু লোক এসে টেনে হিঁচড়ে শহরে নিয়ে গেল আহ কিউকে। ভীষণ অন্ধকার ছিল সেই রাত্তিরটায়। সৈন্য-বাহিনীর একটা ক্ষুদ্র দল, স্থানিয় সৈন্য-বাহিনীর একটা ছোট্ট অংশ, একদল পুলিশ এবং পাঁচজন গুপ্তচরের একটা বাহিনী সেই রাত্তিরে চুপিসারে প্রবেশ করল ওয়েই চুয়াঙ গ্রামে সদর কটকের সামনে একটা মেসিন গান বসিয়ে গাঢ় অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ঘিরে ফেলল গ্রামের মন্দির আর মন্দির চাতাল। আহ কিউ বেরিয়ে এল না। কিছুক্ষণ ধরে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না মন্দির আঙিনার ভেতর থেকে। হানাদার বাহিনীর অধিনায়ক অধৈর্য হয়ে উঠল, কুড়ি হাজার ছোট্ট মুদ্রা (সেণ্ট) পুরস্কার ঘোষণা করল আহ কিউকে ধরে আনবার জন্য। এরপরই স্থানিয় বাহিনীর দুইজন সৈনিক সাহস সঞ্চয় করে পাঁচিল টপকে প্রবেশ করল আঙিনার ভেতরে। তাদের সহ যোগিতায় আরও কিছু সৈনিক এগিয়ে হিঁচড়ে বার করল আহ কিউকে। কিন্তু মন্দিরের বাইরে মেসিন-গানটির কাছে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত শান্ত হলো না সে।
দ্বিপ্রহর হয়ে গেছে যখন তারা শহরে পেঁছিল। একটা পুরনো জেল বাড়ির ধ্বংসাবশেষের কাছে নিয়ে গেল আহ কিউকে। এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে তাকে ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দিল একটা ছোট্ট ঘরের ভেতর। ঘরের ভেতর হুমড়ি খেয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে গরাদ দেওয়া দরজাটা দুম করে বন্ধ হয়ে গেল তার পেছনে। ঘরটার তিনদিকে তিনটা জানলাহীন ফাঁকা দেওয়াল। ভালো করে চারদিক তাকিয়ে দেখল আরও দুটি মানুষ গুঁড়িসুড়ি মেরে বসে আছে ঘরের এক কোণে।
যদিও কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল, তবু বিষণ্ণ বোধ করল না আহ কিউ, কারণ মন্দির চাতালে যে কুঁড়ে ঘরটায় সে ঘুমতো, এই ঘরটার তুলনায়, কোনো মতেই তেমন ভালো ছিল না সেই ঘরটা। মনে হলো ঐ লোক দুটিও গাঁয়ের মানুষ। ধীরে ধীরে তারা বাক্যালাপ শুরু করল আহ কিউ-এর সঙ্গে। একজন বললে ঠাকুরদার আমলের বকেয়া পাওনা খাজনা আদায় করতে প্রাদেশিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ভদ্রলোক ধরে এনে আটকে রেখেছে তাকে। অপর মানুষটি জানতই না কেন তাকে নিয়ে এসেছে এখানে। তাদের প্রশ্নের সোজা সরল উত্তর দিল আহ কিউ—আমি বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলাম তাই।
সেদিন সন্ধ্যায় গরাদ আঁটা দরজা খুলে একটা প্রকাণ্ড হল ঘরের ভেতর টেনে নিয়ে গেল আহ কিউকে। হল ঘরের একপ্রান্তে বসেছিলেন মুণ্ডিত মস্তক একজন বৃদ্ধ লোক। বৃদ্ধটিকে প্রথমে শ্রমণ বলে ধরে নিয়েছিল আহ কিউ। কিন্তু সে দেখল কয়েকটি সৈনিক প্রহরায় দণ্ডায়মান, দুই পাশে লম্বা কোটপরা প্রায় এক ডজন লোক বৃদ্ধকে ঘিরে উপবিষ্ট—তাদের কারও মকস্তক মুণ্ডিত আবার কারও বা ফুট পরিমান দীর্ঘ ঘাড়ের উপর দিয়ে বিলম্বিত কেশগুচ্ছ

ঠিক নকল বিদেশী শয়তানের মতোই। ভীষণ গম্ভীরভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে সবাই তাকিয়ে ছিল তার দিকে। এমনি দেখেই সে বুঝতে পারল বৃদ্ধ একজন বিশিষ্ট লোক। সঙ্গে সঙ্গে তার দুই হাঁটুর গাঁট শিথিল হয়ে গেল সে নির্জীবের মতো বসে পড়ল।

—দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে কথা বলো। বসো না। লম্বা কোট পরা সবগুলো মানুষ চেঁচিয়ে উঠল এক সুরে।

আহ কিউ তাদের কথা বুঝতে পারল, কিন্তু শক্তি পেল না উঠে দাঁড়াবার, অজান্তেই সবটা শরীরকে হাঁটু ভেঙ্গে বসিয়ে দিল, অবশেষে বসে পড়ল নতজানু হয়ে।

—গোলাম !···নচ্ছার···

লম্বা কোটওয়ালা মানুষগুলি আবার চেঁচিয়ে উঠল। তবে উঠে দাঁড়াতে আর জোর করলো না আহ কিউকে।

—সত্যিকথা বলো, কম সাজা পাবে তাহলে।

মুণ্ডিত মস্তক বৃদ্ধ উচ্চারণ করলেন নিচু অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে, দৃষ্টি আহ কিউএর উপর স্থির নিবদ্ধ রেখে।—সব কথা আমি জানতে পেরেছি। যদি অপরাধ স্বীকার করো, তোমাকে রেহাই দেব।

—দোষ স্বীকার করো। লম্বাকোট পড়া মানুষগুলি এক সুরে হাঁক দিয়ে উঠল।

—সত্যি বলছি···আমি চাইছিলাম—আসতে—কিছুক্ষণ এলোমেলো চিন্তার পর খাপছাড়া ভাবে বিড় বিড় করতে করতে বলল আহ কিউ।

—তাহলে, আসনি কেন ? নরম সুরে শুধোলেন বৃদ্ধ লোকটি।—নির্বোধ কোথাকার। কোথায় তোমার আর সব সাকরেদরা ?—কী বলছেন ? কারা—

—সেদিন রাত্রে চাওদের বাড়িতে লুটপাট করেছিল যারা ?—জানিনা। তারা আসেনি আমার কাছে। নিজেরাই সবকিছু নিয়ে সরে পড়েছে। কেমন এক বিতৃষ্ণার ভাব প্রকাশ করে বলল আহ কিউ।

—তারা গেল কোথায় ? বলো। ছেড়ে দেব তোমাকে। আরও সুর নরম করে বললেন বৃদ্ধ মানুষটি।

—জানি না তো ! তারা তো আমায় ডাকতে আসেনি—? তারপর বৃদ্ধের এক ইশারায় আহ কিউকে টেনে নিয়ে এল বাইরে হল ঘরে।

বড় হলঘরটায় তখনও সব তেমনি আছে। মুণ্ডিত মস্তক সেই বৃদ্ধ মানুষটি স্বস্থানে তেমনি আসীন। আহ কিউও হাঁটু গেড়ে বসা আগের মতোই।

—আরও কিছু বলবার আছে তোমার ? বৃদ্ধ আবার প্রশ্ন করলেন সরল ভাবে। আহ কিউ একটু ভাবল, সে ঠিক করল আর কিছু বলবার নেই তার। সে জবাব দিল : কিছু না।

একজন লম্বাকোট পরা মানুষ এক টুকরো সাদা কাগজ আর লিখবার তুলি-কলম নিয়ে এল আহ কিউ এর কাছে, হাতে এক রকম গুঁজেই দিল তুলি কলমটা।

ভয়ে প্রায় দিশেহারা হয়ে গেল আহ্ কিউ। জীবনে এই প্রথম লিখবার তুলি কলম উঠেছে তার হাতে। কেমন করে ধরবে এটা এই তার তখন ভাবনা। কাগজের উপর দস্তখত করবার একটা জায়গা দেখিয়ে দিল মানুষটি।

—আমি—আমি তো—লিখতে জানিনা। কলম ধরে হাত থর থর করে কাঁপছে, বিনয়নম্র কণ্ঠে বলল আহ্ কিউ। তাহলে যেটা তোমার কাছে সহজ লাগবে, একটা গোল চাকার মতো চিহ্ন এঁকে দাও এখানে।

বৃত্তটি অঙ্কণ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করল আহ্ কিউ, যে হাতে তুলি-কলম, থর থর করে কাঁপতে লাগল সেই হাতটা, মাটির উপর কাগজটা ছড়িয়ে দিল লোকটা, আহ্ কিউ পারছে না দেখে। উবু হয়ে বসে, যেন এর উপরই নির্ভর তার জীবন মরণ আপ্রাণ চেষ্টার পর আহ্ কিউ আঁকল একটা কিছু। কিন্তু বিদ্রুপের ভয়ে বৃত্তটি ঠিকমতো আঁকতে সচেষ্ট হলেও তুলি-কলমটা এমনি ভারি যে যেন নাড়তেই পারছিল না ওটাকে। তুলিটা কেবলি নড়ছিল এদিক ওদিক। রেখাটা গোল করে মিলাবার মুখে এসেই আবার নড়ে গেল তুলিটা, একটা তরমুজের বীচির মতো আকার নিল অঙ্কনটা।

একটা পূর্ণাঙ্গ বৃত্ত আঁকতে না পারবার লজ্জায় যখন আহ্ কিউ মুষড়ে পড়ছিল সেই ফাঁকে বিনামন্তব্যে কাগজ আর তুলি নিয়ে চলে গেল লম্বাকোট পরা একটা মানুষ। টেনে হিঁচড়ে তৃতীয়বারের মতো নিয়ে গেল আহ্ কিউকেও আবার সেই গরাদ আঁটা দরজা খুলে।

তখনও সাবলিল রইল আহ্ কিউএর মেজাজটা।

সে ধরে নিল এমনি একটা সময় আসে পৃথিবীর সকল মানুষের যখন তাদেরকে জেলখানায় ঢুকতে হয়, আবার বেরুতে হয় আর কাগজের উপ বৃত্ত আঁকতে হয়; সে উপলব্ধি করতে পারল বৃত্তটি গোল করে আঁকতে পারেনি বলেই আজ তার সুনাম ক্ষুন্ন হলো, কলঙ্ক আরোপিত হলো। যাহোক তার মনের স্থৈর্য ফিরে পেল এই ভেবে "নিখুঁত বৃত্ত আঁকতে পারে কেবল নির্বোধ মানুষেরাই।" এমনি ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল আহ্ কিউ। প্রাদেশিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মানুষটিও ঘুমুতে পারেনি সেই রাত্তিরে, সেনা বাহিনীর অধিনায়কের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছে। লুণ্ঠিত সামগ্রী পুনরুদ্ধার করা প্রধান কাজ এই তার দৃঢ় মত কিন্তু অধিনায়কের মতে প্রধান উদ্দেশ্য জনগনের কাছে একটা দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা। ইদানিং অধিনায়কটি তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যবহার করে আসছিল তার সঙ্গে সে এটা লক্ষ্য করছিল। সেদিন সজোরে টেবিল চাপড়ে বলল অধিনায়কটি ঃ একজনকে মেরে দশজনকে শেখানো তবেই হবে কাজ। জানেন কুড়িদিন হয়ে গেল আমি বিপ্লবীদলের সদস্য হয়েছি। এর মধ্যেই দশবারোটা লুটতরাজ হয়েছে দেখলাম কোনোটারই হিল্লে হলো না। বুঝতে পারছেন না এ আমার পক্ষে কতখানি অপমানজনক। এই একটিমাত্র ব্যাপারএকটা কিনারা হয়েছে, আর এটা নিয়েই আপনি এসেছেন পণ্ডিতীপনা

করতে। এ হতে পারে না। এ আমার নিজস্ব ব্যাপার।
প্রাদেশিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ভদ্রলোকটির মেজাজ বিগড়ে গেল। কিন্তু তবু সে নাছোড়বান্দা। লুণ্ঠিত জিনিষগুলির পুনরুদ্ধার না হলে সহকারী অসামরিক প্রশাসকের পদে ইস্তফা দিতেও সে পিছপাও নয়। সে বলল সেনাবাহিনীর অধিনায়ককে। আপনার যা ইচ্ছে। অধিনায়ক বলল।
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ভদ্রলোকটির সেই রাত্রে তাই ঘুম হয়নি কিন্তু মুখের কথা পরদিন ভোর হলে পদত্যাগপত্রও সে আর দাখিল করেনি।
যে রাত্তিরে প্রাদেশিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রটির নিদ্রা হয়নি তারই পরদিন সকাল বেলা তৃতীয়বারের মতো গরাদ দেওয়া দরজার বাইরে নিয়ে গেল আহ কিউকে। বড় হল ঘরে ঢুকে সে দেখল মাথা ন্যাড়া বৃদ্ধ ঠিক নিজের আসনে বসে অন্যদিনের মতোই, আহ কিউও তেমনি হাঁটুগেড়ে বসল সেদিন অন্যদিনের মতোই। খুব ধীরে ধীরে বৃদ্ধ প্রশ্ন করলেন :আরও কিছু বলবার আছে তোমার ?
আহ কিউ ভাবল কিছুক্ষণ। ঠিক করল কিছুই নাই বলবার, সে জবাব দিল :
—কিছু না।
লম্বাকোট আর খাটো জ্যাকেট পরা কয়জন মানুষ একটা সাদা রঙের বিদেশী কাপড়ে তৈরি ভেস্ট পরিয়ে দিল আহ কিউকে। কয়েকটা কালো অক্ষর ছাপা ছিল ওতে। দুর্ভাগ্য সূচক শোকের পোশাকের মতো ভেস্ট গায় পরে বেশ কিছুটা অপ্রতিভ বোধ করল সে। তার হাতদুটিকে পিঠমোড়া করে বেঁধে হিঁচড়ে বের করে আনল হলের ভেতর থেকে।
একটা আঢাকা ঠেলা গাড়িতে উঠানো হলো আহ কিউকে। খাটো জ্যাকেট পরা কয়টি মানুষ ঘিরে বসল তাকে। তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে গেল ঠেলা গাড়িটা। কাঁধে বিদেশী রাইফেল নিয়ে সামনে চলছে কিছু সংখ্যক সৈনিক আর স্থানিয় বাহিনীর কয়েকটি মানুষ, দুই পাশে হতভম্ব কৌতুহলী দর্শক জনতার মেলা ; কিন্তু পেছনে কী ছিল দেখতে পেল না আহ কিউ। হঠাৎ তার মনে চমক দিয়ে গেল—তবে কী মুণ্ডচ্ছেদ করবে বলে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে ? একটা দুর্নিবার ভয় আঁকড়ে ধরল তাকে, সবকিছু যেন অন্ধকার হয়ে এল তার চোখের সামনে, দুই কানে যেন কিসের ভোঁ ভোঁ ধ্বনি বাজতে লাগল, সে কি তবে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল ! কিন্তু না সংজ্ঞা হারায় নি সে। কখনও কোনো মুহূর্তে ভয় তাকে পেয়ে বসেছে কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে তার আবার প্রশান্তি নেমে এসেছে। তার মনে হচ্ছে হয়তো বা এমনি কোনো একবার মুণ্ডচ্ছেদ এই পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের অলঙ্ঘনীয় নিয়তি।
সে তখনও রাস্তাটা চিনতে পারল না, কেমন অবাক হয়ে গেল, কিন্তু তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে না কেন ? সে জানত না যে জনগনের সমুখে একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরবার জন্য পথে পথে ঘুরিয়ে নিয়ে যাবে তাকে। কিন্তু জানলেও

ব্যতিক্রম হতো না কিছু ; সে শুধু ভাবল হয়তো বা কোনো একবার জনগনের সমুখে দৃষ্টান্ত স্থাপন এই পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের ভাগ্যের বিধান। তারপর সে বুঝতে পারল পথ ঘুরিয়ে তাকে নিয়ে যাবে বধ্যভূমিতে। তার মুণ্ডচ্ছেদ হবে সেখানে। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল আহ কিউ। অসংখ্য পিঁপড়ের মতো মানুষগুলো ঘিরে আছে তাকে। অপ্রত্যাশিত ভাবে পথের ধারে জনতার ভীড়ের মাঝে সে দেখল দাঁড়িয়ে আছে আমাহ বু। এই জন্যেই বুঝি তাকে দেখেনি এতকাল। শহরে এসে কাজ নিয়েছিল আমাহ বু।

এমনি মিইয়ে গিয়ে পরক্ষণেই আবার বড়ো লজ্জিত বোধ করল আহ কিউ। কেন ? কোনো একটা পরিচিত অপেরার হাজার বার শোনা এক লাইন গানও তো এখন তার মনে আসছে না। ঘুর্নী বাতাসের মতো ঘুরতে লাগল তার চিন্তাগুলি। স্বামীর সমাধি পাশে ঐ তরুনী স্বামীহীনা খুব বেশি জোরালো লাগে না শুনতে। ড্রাগন আর বাঘের লড়াই অপেরার দুঃখ আমি রাখি কোথায় মেরেছি—এই লাইনটাও বড়ো মিনমিনে। মারব আমি লৌহ গদায় এইটাই বুঝি সবার সেরা মনে হচ্ছে তার কাছে। কিন্তু হাত উপরের দিকে তুলতে গিয়ে খেয়াল হলো তার দুটি হাতই পেছন দিকে বাঁধা। তাই মারব আমি লৌহ গদায়-এ গানও আর গাওয়া হলো না তার।

বিংশতি বর্ষ পরে আবার আসিব প্রবচন বাক্যটি উচ্চারণ করতে গিয়ে (বিংশতি বর্ষ পরে আবার আসিব ফিরে দুর্ণিবার তরুণের বেশে। মৃত্যুর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করতে গিয়ে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে এই প্রবচল বাক্যটি অনেক অপরাধীরা উচ্চারণ করত।) দারুণ উত্তেজনায় অর্দ্ধপথে থেমে গেল আহ কিউ। এর আগে এই বাক্যটি সে উচ্চারণ করেনি কখনও। সম্মিলিত জনতা গর্জন করে উঠল 'শাবাস' মনে হলো যেন ক্রুদ্ধ নেকড়ে বাঘের গর্জন। মন্থর গতিতে এগিয়ে চলল ঠেলা গাড়ি। জনতার চিৎকারের ফাঁকে ফাঁকে আহ কিউএর চোখ খুঁজে বেড়াল আমাহ বুকে। আমাহ বু কিন্তু দেখছেনা আহ কিউকে, তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সৈনিকের হাতের বিদেশী রাইফেলটির দিকে। আহ কিউ আর একবার তাকাল চিৎকাররত জনতার দিকে।

সেই মুহুর্তে তার চিন্তাগুলি যেন আবার ঘুরতে লাগল ঘুর্ণী হাওয়ার মতো। চার বছর আগের কথা, পাহাড়ের তলায় সে মুখোমুখি হয়েছিল একটা ক্ষুধার্ত নেকড়ের সঙ্গে ; কিছুদূর পর্যন্ত তেড়ে এসেছিল নেকড়েটা তাকে আক্রমণ করবার জন্য। সে তখন ভয়েই অর্দ্ধমৃত। কিন্তু সুখের কথা, তখন তার হাতে ছিল একটা কুড়োল, তারই উপর নির্ভর করে মনে সাহস নিয়ে, সে ফিরে এসেছিল ওয়েইচুয়াঙএ। নেকড়ের ছোট চোখের সেই দৃস্টি সে ভুলতে পারেনি কোনোদিন, সে দৃষ্টি যেমন হিংস্র তেমনি ভীরুভীরু—জ্বলছিল দুটি আলেয়ার আলো, দূর থেকে তীর বেগে এসে বিঁধছিল তার গায়ে। আর

আজ নেকড়ের চোখের চেয়েও যেন আরও ভীষণ মনে হলো চারদিক থেকে নিক্ষিপ্ত মানুষের চোখের দৃষ্টিগুলি—নিস্তেজ অথচ মর্মভেদী সে দৃষ্টি, তার মুখ থেকে উচ্চারিত কথাগুলি গিলে খেয়েও বুঝি রক্ত মাংসের সীমা ছাড়িয়ে আরও কিছু গিলতে চাইছিল ওগুলো। সে দৃষ্টি যেন চলল তার পিছু পিছু। কিছু দূর পর্যন্ত।
সবগুলো চোখের দৃষ্টি নিঃশেষে মিলিয়ে যেন হয়ে গেল কেবল একটিমাত্র দৃষ্টি, বিদ্ধ করে তার আত্মাকেও।
—বাঁচাও ! বাঁচাও।
মাত্র দুটি শব্দ। এ শব্দ আর কখনও উচ্চারণ করতে হলো না আহ কিউকে। সব অন্ধকার হয়ে এল তার চোখের সামনে, দুই কানে কোন এক গুণ গুণ আওয়াজ। মনে হলো হালকা ধূলিকনার মতো তার সারাটা দেহ যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।
সেদিনকার লুটতরাজের প্রতিক্রিয়া বেশি করে ভোগ করতে হলো প্রাদেশিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ভদ্রলোকটিকে। কারণ অপহৃত জিনিষপত্রের পুনরুদ্ধার হয়নি কোনোদিন। হা হুতাশ করেই তার পরিবারের সবার দিন কাটল। তারপর এল চাও পরিবারের পালা। ডাকাতির খবর দিতে যেদিন জেলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রটি শহরে গেল সেদিন তাকে ধরে নিয়ে শুধু তার মাথার বেনী কেটেই রেহাই দিল না অসৎ বিপ্লবীরা কুড়িহাজার সেন্ট খেসারতও দিতে হলো তাকে। তারপর চাও পরিবারও দিন কাটাল হা হুতাশ করেই সেদিন থেকে দিনের পর দিনে তাদের জন্য থাকল শুধু ধ্বংসপ্রাপ্ত সাম্রাজ্যের টিকে থাকা উত্তরাধিকারের ছলনা মাত্র।
এই ঘটনার ব্যাপারে আর কোনো আলোচন হলো না, কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করল না ওয়েইচুয়াঙের মানুষেরা। সবাই মেনে নিল আহ কিউ একটি অসৎ লোক। তার প্রমাণ তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। অসৎ মানুষ না হলে প্রাণদণ্ড হবে কেন ? কিন্তু শহরের মানুষের ঐক্যমত প্রতিকূলে গেল। অধিকাংশ মানুষ অখুশী হলো, তাদের বিশ্বাস শিরচ্ছেদ করা শোভন কিন্তু গুলিবিদ্ধ করে প্রাণদণ্ড দেওয়া অসুন্দর। সবাই অবাক হয়ে গেল, পথের পর পথ অতিক্রম করে গেল অথচ এই আহ কিউ মানুষটা এমনি অদ্ভুত যে যে কোন অপেরার একটি ছত্র গানের কলি বেড়িয়ে এল না তার মুখ দিয়ে। বৃথাই অগনিত জনতা তার পিছু নিয়েছিল।

The True Story of Ah Q.
December—1921

—শেষ—

আই-ছিং

ভাষান্তর ঃ অরুণকান্তি সাহা

॥ সূচীপত্র ॥

কবিতা

বিবিধ

আই-ছিং সম্পর্কে

আই-ছিং চীনের একজন বিখ্যাত আধুনিক কবি। জন্ম ১৯১০ সালের ২৭ শে মার্চ, জেজিয়াং প্রদেশের জিনহুয়া-তে। ১৯২৮ সালে তিনি চিত্রাঙ্কণ বিদ্যা শিখতে 'হ্যানজু'-তে আসেন এবং সেখানে National West Lake fine Arts Institute-এ ভর্তি হন। ১৯২৯ সালে প্যারিসে যাবার জন্যে সাংহাই-এ আসেন এবং সেখান থেকে প্যারিসে যাত্রা করেন। সেখানে তিনি একটি স্টুডিওতে শিক্ষানবিশের কাজ করেন। এখানে এসেই তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন।

১৯৩২ সালে তিনি দেশে ফিরে এসে সাংহাই-এ Association of Chinese Left-wing Artist-এ যোগদান করেন। সেই বছরের জুলাই মাসে তাঁকে বন্দী করে কারাগারে পাঠানো হয়। সেখানেই তিনি তাঁর বিখ্যাত কবিতা: 'ডায়ানহি: আমার নার্স' রচনা করেন এবং ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি এই কবিতা লিখেছিলেন 'আই-ছিং' এই ছদ্মনামে। ১৯৩৫ সালের অক্টোবরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। কারাগারের জীবন থেকে তাঁর যেমন কবি জীবন শুরু, তেমন আবার চিত্রাঙ্কণ বিদ্যা শেষ। কবিতার জন্যেই তিনি চিত্রাঙ্কণ জীবন ত্যাগ করেন। তাঁর লিখিত কবিতা অনেক। এবং সেগুলো পরপর সাজালে বোঝা যায় যে তার লেখায় পরিণতি এসেছে ধীরে ধীরে। তিনি ধীরে তাঁর কাব্য চেতনাকে শিল্পমণ্ডিত করেছেন। ভাষায় কারিকুরি এনেছেন এবং জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

১৯৪২ সালে Yanan-এ এসে তিনি Luxun Institute of Literature and Art এ শিক্ষা গ্রহণ করেন। এবং ১৯৪৫ সালে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

১৯৪৯ সালে People's Republic of China পত্তনের পর তিনি প্রথম সারির নেতা রূপে স্বীকৃতি পান এবং জাতীয় ব্যবস্থাপক পদে নিযুক্ত হন।

১৯৫৮ সালে তাঁকে Northeast China-তে পাঠান হয়। তারপর ১৬ বছরের জন্যে পাঠানো হয় Xinjing Uygar Autonomous Region. ১৯৭৫ সালে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে Beijing-এ ফিরে আসেন। 'Red flag' কবিতাটি তাঁর প্রথম লেখা কবিতা। ৩০শে এপ্রিলে সাংহাই থেকে প্রকাশিত 'wenbin daily' পত্রিকাতে তাঁর পুনর্বাসনের পর ছাপা হয়। তারপর থেকে তাঁর অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি West Germany, Austria, Italy এবং United States পরিদর্শন করেন।

কবির ধর্ম সত্য উদ্ঘাটন।

তোমরা সাধারণতঃ শুনতে পাও যে সাধারণ লোক বলছে, "অমুক অমুক কবির লেখা কবিতাগুলো বেশ ভাল। জনসাধারণ বেশ নিচ্ছে। তার কারণ ঐ কবিতাগুলোর মধ্যে জনসাধারণের মনের কথা আছে। অন্তরের কথা আছে। কিন্তু আমি মনে করি, এই কথাগুলোই যথেষ্ঠ নয় অথবা পূর্ণাঙ্গ নয়। আমি বলতে চাই, "অমুক অমুক কবির কবিতাগুলো জনগণ পছন্দ করেছে বা নিয়েছে তার কারণ, তাঁরা সত্য কথাগুলো সরাসরি বলেছেন। এবং সে কথাগুলো কবিদের মনে স্বাভাবিক ভাবেই উৎসারিত।"

প্রতিটি মানুষই সত্য কথা শুনতে ভালবাসে। সত্যকথা জানতে চায়। একমাত্র কবিই পারে কবিতার মাধ্যমে মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে। যদি তার কবিতা হয় অন্তর উৎসারিত এবং নিষ্ঠা নির্মিত। প্রকৃত কবির ধর্মই হচ্ছে সে জনগণের পাশে এসে দাঁড়াবে। ভালবাসা, ঘৃণা, আনন্দ এবং দুঃখের অংশ নেবে। অর্থাৎ সবকিছুই সমান ভাগে ভাগ করে নেবে। জনগণ যখন কোন কবির পাণ্ডিত্য ও সাহসিকতাকে স্বীকার করে নেয়, তখনই বুঝতে হবে যে সে সাধারণ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে পেরেছে। সাধারণ মানুষের বিশ্বাসী কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে।

জনগণ মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে নারাজ। তারা মিথ্যার বেসাতি করতে প্রস্তুত নয়। কবিতার মধ্যে তুমি যতই কারীকুরী কর না কেন, যতই শব্দের অলঙ্কার ব্যবহার কর না কেন তা মানুষের অন্তর স্পর্শ করবে না। প্রত্যেক মানুষের মনেই তার নিজস্ব একটা মাপ আছে। সেই মাপে সে প্রতিটি কবিতা ওজন করে নেবে। ব্যবহৃত শব্দকে মেপে দেখবে।

কিছু সংখ্যক মানুষ আছেন, যাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার বড়াই করেন। তাঁরা সব সময়ই ক্ষমতাবান মানুষদের প্রশংসা করেন এবং ক্ষমতাহীন মানুষদের প্রতি আঘাত করেন।

এই ধরণের মানুষেরা যদি কবিতা লেখেন, তবে সে কবিতা হয়ে দাঁড়ায় অনেকটা এক চক্ষু হরিণের মত। অর্থাৎ তাঁরা তাপমাত্রার দিকে চোখ রেখে কবিতা লেখেন।

কিন্তু বর্তমানে আমরা এমন একটা জগতে বাস করছি যা দ্রুত পরিবর্তনশীল। এই ধরণের কবিদের যদি এই দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে হয়, তাহলে তাদের পা ভাঙ্গবেই ভাঙ্গবে। কারণ এঁরা স্বভাব-ধর্মে চলতি হাওয়ার পন্থী। একজন সেয়ার মার্কেটের দালালকে যেমন প্রতিনিয়ত বাজারের হিসাব রাখতে হয়। এই সমস্ত কবিদের অবস্থাও ঐ একই প্রকার হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্ত কবিরা স্বভাবে ধূর্ত। কিন্তু সুশিক্ষাবিহীন। সেইজন্যে মাঝে মাঝে এদের বাজি ধরাও ভুল প্রমাণিত হয়।

রাজনৈতিক দূরদর্শিতা অবশ্যই প্রয়োজন। এ ব্যাপারে যে যত দূরদর্শিতা দেখাতে পারে ততই ভাল। কিন্তু সে দূরদর্শিতা জনগণের ইচ্ছা এবং জনমানসের সঙ্গে সমতা রেখে প্রয়োগ করতে হবে। যদি কোন কবি স্বার্থপরতা দ্বারা পরিচালিত হয়, নিজস্ব নীতির ধারক এবং বাহক হয়, তাহলে সে কখনোই প্রকৃত রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারে না।

অর্থাৎ আমি বলতে চাই যে কবির দূরদর্শিতার সঙ্গে জনগণের দূরদর্শিতার সমতা থাকবে। প্রকৃত কবি সমতা রক্ষা করে চলবে। জনগণের রাজনৈতিক বিশ্বাসের সঙ্গে তার রাজনৈতিক বিশ্বাসের মিল থাকবে।

যে ব্যক্তি প্রতিনিয়তই ডিগবাজি খায় এবং দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে তাকে সব সময়ই সঠিক অবস্থানের জন্যে ভাবতে হয়। সুতরাং তাকে একটি খেলনা বলা যায়। সে কখনোই মানুষের স্বভাব-ধর্মের প্রতিভূ হতে পারে না।

একটা পতঙ্গ জানে কখন উৎসাহিত হতে হবে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ মানুষ তা' জানে না।

কিছু সংখ্যক মানুষ মনে করে কবিতা লেখার জন্যে কোন উৎসাহের প্রয়োজন নেই। ভাব অথবা ভাবনার প্রয়োজন নেই। আমার মনে হয় যে সমস্ত মানুষ 'টেস্ট টিউব বেবী'-র প্রচার এবং প্রসারের কথা বলে, এই সমস্ত কবিরা সেই দলের মানুষ। সেই পন্থীতে বিশ্বাসী। কিন্তু আমি এদের নিশ্চয়ই কবি বলতে পারি না।

অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা যে জিনিষ বোঝেন না অথবা তার সঠিক ব্যাখ্যা

দিতে পারেন না, তাঁরা ভাবেন, সে জিনিষের কোন অস্তিত্ব নেই বা অবৈজ্ঞানিক। তাঁরা অনেকটা শামুকের আবরণে বাস করছেন।

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে বাস্তব জগৎ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। এখানে কখনও অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরছে। আবার কখনও ঘূর্ণিঝড় বইছে। সেই রকম মানুষও কখনও অতি আনন্দে উৎসারিত হচ্ছে। আবার প্রচণ্ড দুঃখে ভেঙ্গে পড়েছে।

অনুপ্রেরণার কথা যদি বলতে হয়, তাহলে বলা যায় যে সেটা একজন কবির স্বাভাবিক সত্তার ওপরে কিছুটা আরোপিত উত্তেজনা। অথবা আকস্মিক স্নায়ুক্রিয়া। কিম্বা বলা যায় মনের ওপর ক্ষণিকের জন্যে হঠাৎ আলোর ঝলকানি। একজন কবির ব্যবহারিক জগতের বিপরীতমুখী সম্ভাব্য সুখই হচ্ছে অনুপ্রেরণা। এই অনুপ্রেরণাই হচ্ছে একজন কবির প্রকৃত বন্ধু। তবে কবির এই অনুপ্রেরণা কেন বাস্তব সত্তার মরুভূমিতে হারিয়ে যায়?

এ প্রশ্নের জবাব নানা মুনির নানা মনের মত ব্যতিক্রমে ভরা।

প্রতি ব্যাপারেই উত্তেজিত হবার অর্থ, কোন ব্যাপারই উত্তেজিত না হওয়া।

একজন কবি তার অনুভবের দিক থেকে অবশ্যই সত্য থাকবে। কারণ তার অনুভবই হচ্ছে বাস্তব জগতের বিপরীতমুখী ক্রিয়া।

কবির প্রতিটি কবিতাতেই নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু প্রতিটি কবিতাই তার নিজের লেখা। তাহলেই বুঝতে হবে যে সে কবিতা তার অন্তর থেকে উৎসারিত।

যেখানে উত্তেজনার কোন অর্থ নেই অথচ আপনি সেখানে অকারণ উত্তেজনা প্রকাশ করছেন, অথবা উত্তেজনার ভান করছেন, তাহলেই বুঝতে হবে যে আপনি মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। যে লেখা, কবির নিজের হৃদয়কে স্পর্শ করে না, সে লেখা, কোন দিনও জনগণের মন জয় করতে পারে না।

অবশ্য সব সময় সত্য কথা বলতে অসুবিধা আছে। এবং বিপদও আছে। কিন্তু একজন কবি কবিতা লেখার সময়ে তার বিবেককে বিক্ষত করে মিথ্যা প্রচারে নামবে না। অর্থাৎ নামা উচিত হবে না।

একজন কবি নিশ্চয়ই কতকগুলো শব্দ পরপর বসিয়ে কবিতা লিখবে না। সে নিশ্চয়ই শব্দের ব্যবহার জানবে। এমনকি কথা বলবার সময়েও একজন প্রতারকের ভাষা ও একজন সত্যধর্মী মানুষের ভাষা এক হয় না।

কল্পনা ও ভাবনার প্রতিচ্ছবি জন্ম নেয় চিন্তা থেকে। এবং এরা ধীরে ধীরে জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিত হয়। একজন কবির রচনাকালে তুলনা মূলক অবস্থার জন্ম নেয় তখনই, যখন সে তার পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমান অভিজ্ঞতাকে পাশাপাশি রেখে বিচার করে।

কবির শিল্প চিন্তা সবসময় পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। এত পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে পাঠকেরা যাতে ছাপার অক্ষরের মত পড়তে পারে এবং বুঝতে পারে।

শিল্প চিন্তা কোন কঠিন ও সংক্ষিপ্ত বিষয় বস্তুকে সহজবোধ্য করে এবং একটা সহজবোধ্য রূপ নিয়ে মানুষের কাছাকাছি আসে।

কবিদের শিল্প-চিন্তা কোন কঠিন, ভারী বা দুর্বোধ্য বিষয়বস্তুকে পাখা বিস্তারে সাহায্য করে। অপর দিকে কোন তরল অথবা পরিবর্তনশীল বস্তুকে আকারে নিয়ে আসে।

শিল্প-চিন্তা মানুষকে হাজার মাইল দূরে নিয়ে যেতে পারে, আবার দূরের মানুষকে কাছেও টানতে পারে।

শিল্প-চিন্তা একটা পন্থা, যে পন্থা দ্বারা কোন অস্পষ্ট এবং না-বোঝা বস্তুকে আকারে নিয়ে আসে। মানুষকে বুঝতে সাহায্য করে।

শিল্প-চিন্তা অনেকটা কাব্যের মত। এ বস্তু কোন কিছু লেখার মূল ছুঁয়ে আছে। এমনকি তত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধেও, যেখানে যুক্তি-তর্কের অবতাড়না করা হয়, সেখানেও শিল্প-চিন্তা আরোপিত হয়ে থাকে।

কাব্যে একটা চিরস্থায়ী কৌশল আছে। কারণ সেখানে কোন ভাব বা ভাবনা শিল্প-সম্ভারে পরিবেশিত হয়ে থাকে।

একজন কবি তার ভাবনাকে পরিবেশন করবার আগে নিজের মানস-চিত্র ভাল ভাবে অনুসন্ধান করে। উদাহরণ স্বরূপ আমি আমার নিজের 'মুক্তো' কবিতার কথা বলতে পারি

পান্না জড়ানো সাগরের গভীরে
সূর্যের নির্যাস জমা হচ্ছে,
তুমি হচ্ছ রামধনুর একটি অংশ
মেঘে ঢাকা ভোরের সূর্যের
উঁকি দেবার মতই উজ্জ্বল।

তুমি উজ্জ্বলতায় সিক্ত, অনুপ্রাণিত,
স্ফটিকের নির্যাসের উপাসনায় নিয়োজিত,
আমার চেতনার ঝিনুকের গভীরে লুকানো কল্পনা
ধীরে ধীরে বিন্দু বিন্দু জমা হয়ে
উজ্জ্বল মুক্তায় পরিণত হচ্ছে।

কবির ভাবনার কোন আকার নেই। কিন্তু যখনই তাকে 'একটি উজ্জ্বল মুক্তা বিন্দুতে' পরিণত করা হচ্ছে, তখনই তা সুন্দর আকারে পরিণত হচ্ছে। মানুষের আয়ত্তে আসছে।

ডায়ানহি: আমার নার্স

ডায়ানহি, আমার নার্স
সে যে গ্রামে জন্মেছিল,
সেই গ্রামের নামেই তার নাম।
ডায়ানহি, আমার নার্স
অল্প বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল।

আমি একজন ভূ-স্বামীর ছেলে,
কিন্তু আমাকে ডায়ানহির ছেলেও বলা যায়,
আমি তার বুকের দুধ খেয়ে বড় হয়েছি।
ডায়ানহি আমাকে পালন ক'রে তার পরিবার চালাত।
ডায়ানহি, তুমি আমার নার্স হলেও
আমি তোমার বুকের দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছি।

ডায়ানহি, আজকে তুষার পাতের দিনে
তোমাকে বার বার মনে পড়ছে;

আজকে তোমার ঘাসে ঢাকা কবর-ভূমি
তুষারেও ঢাকা পড়েছে,
তোমার বন্ধ-কুটিরের পাশের গুহাটি,
এখন আগাছায় পূর্ণ। শুকনো।
তোমার কুটিরের সামনে ছোট্ট সুন্দর বাগানটি
আজ তুষারে ঢাকা পড়েছে।
তোমার গেটের সামনে সবুজ পাথরে মোড়া
বসবার আসনটিও আজ ওরা কেড়ে নিয়েছে।
তুষারে ঢেকে দিয়েছে।
জানিনা, আজকে তুষার পাতের দিনে
তোমাকে বার বার মনে পড়ছে।

তোমার সবল বাহু দুটি দিয়ে
একদিন তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরতে,
মাতৃত্বের আস্বাদন পেতে।
তোমার স্টোভ্ জ্বালা শেষ করে,
তোমার পোষাকের ছাইগুলো ঝেরে ফেলে,
রাতের রান্না শেষ করে,
সেগুলো টেবিলে সাজিয়ে,
তোমার ছেলেদের পোষাকগুলো সেলাই করে,
তোমার ছোট ছেলের কেটে যাওয়া আঙুলটি
কাপড়ে জড়িয়ে দিয়ে,
তোমার ছেলেদের জামার উকুন বেছে দিয়ে,
এবং
সারাদিনের ডিমগুলো গুছিয়ে রেখে,
তুমি আমাকে কোলে নিতে,
তোমার সবল দুটি বাহু দিয়ে
আমাকে জড়িয়ে ধরে মাতৃত্বের আস্বাদ নিতে

আমি একজন ভূ-স্বামীর ছেলে,

কিন্তু,
তোমার বুকের শেষ বিন্দু দুধ আমি পান করেছি।
আমার বাবা-মা যখন আমাকে
তোমার কাছ থেকে বাড়ীতে নিয়ে এলো
তখন তুমি কেন কেঁদেছিলে ডায়ানহি ?
আমার বাবা-মার বাড়ীতে যখন আমি
প্রথম এলাম, তখন আমি নতুন আগন্তুক,
আমি এসেই প্রথমে আমাদের আসবাবপত্রগুলোতে
হাত বুলোলাম।
বাবা-মায়ের সুন্দর কারুকার্য বিছানা
আমাকে মুগ্ধ করলো,
আমি তাতে হাত বুলোলাম।
দরজার মাথার ওপরে একটি আলো জ্বলছিল,
তার নীচে লেখা ছিল 'সুখী পরিবার'।
আমি সেই লেখাটির দিকে অবাক চোখে
তাকিয়েছিলাম,
যদিও আমি তখন কিছুই পড়তে পারি না,
অক্ষর জ্ঞানহীন।
মুক্তোর বোতাম বসান আমার সোনালী
পোষাকগুলোকে আমি স্পর্শ করলাম,
মায়ের বুকে ঘুমিয়ে থাকা আমার ছোট বোনের দিকে
আমি বিস্ময়ে তাকালাম।
ওর সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই।
এখানে আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত।
সেদিন, সুন্দর কারুকার্য মণ্ডিত একটি টুলে বসে
আমি আমার আহার শেষ করলাম,
সুন্দর শাদা ভাত, সঙ্গে আরও কিছু,
কিন্তু এত আদর-যত্ন সত্ত্বেও
আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম,
আমি নতুন তো,

বাবা-মার বাড়ীতে আমি একজন
নতুন অতিথি। আগন্তুক।

ডায়ানহি, তুমি জানো
আমার মায়ের বুকের দুধ—
শুকিয়ে যাবার পরেও তিনি আমাকে
কত আদর করেছেন, বুকে জড়িয়ে ধরেছেন।
কিন্তু সে আদর আমার কাছে
যন্ত্রণা বলে মনে হয়েছে।
তিনি হাসি মুখে আমার পোষাক পরিষ্কার করেছেন।
তিনি হাসি মুখে আমাদের গ্রামের সেতুর
নীচে বসে ঠাণ্ডাজলে তরকারী ধুয়ে এনেছেন।
তিনি হাসি মুখে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া
শালগম, ওলকপিগুলো সুন্দর ভাবে কেটেছেন।
তিনি হাসি মুখে আমাদের শুকর ছানাদের
খাবার তৈরী করেছেন।
তিনি হাসি মুখে পাখার হাওয়ায়
আগুন জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে পাত্রের মাংস
সিদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন।
তিনি হাসি মুখে ঠাণ্ডা গমের ঝুড়ি
রোদে দিয়ে গরম করবার চেষ্টা করেছেন।
ডায়ানহি, তুমি জানো
আমার মায়ের বুকের দুধ
শুকিয়ে যাবার পরে তিনি আমাকে
বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কত চেষ্টা করেছেন।
আমার দুঃখ ভুলিয়ে দেবার জন্যে
আমাকে বুকে নিয়ে বার বার আদর করেছেন।
সে আদর আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে একথা ঠিক,
কিন্তু তবুও আমার কাছে
যন্ত্রণা বলে মনে হয়েছে।

ডায়ানহি, তুমি তোমার এই পালিত শিশুকে
অত্যন্ত ভালবেসেছিলে।
তুমি তোমার বুকের দুধ দিয়ে তাকে মানুষ করছিলে
নতুন বছরের উৎসব দিনে তুমি সুন্দর চালের
ভাত রেঁধে তাকে খেতে দিয়েছিলে।
মাঝে মাঝে নিজেকে গোপন করবার জন্যে
তুমি তোমার গ্রামের ছোট্ট কুটিরে
নিজেকে লুকিয়ে রাখতে।
ফলে তোমার পালিত এই ছোট্ট শিশুটি
তোমাকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে
মা, মা বলে ডাকতে ডাকতে তোমার ঘরে
ঢুকে পড়ে তোমাকে জড়িয়ে ধরতো।
তুমি তখন আদর করে চুমো খেতে।
এই পালিত শিশুটি একটি ছবি এঁকেছিল,
ছবিটি এমন কিছু নয়।
তবুও তুমি সেই ছবিটাকে তোমার স্টোভের
পাশের দেওয়ালে সেঁটে রেখেছিলে,
এবং প্রশংসা করেছিলে।
গ্রামের প্রতিবেশীদের তুমি এই
পালিত শিশু সম্পর্কে অনেক লোভনীয়
গল্প শোনাতে। তারা অবাক হয়ে শুনতো।
তোমার কি মনে পড়ে ডায়ানহি,
তুমি একবার একটি সুন্দর স্বপ্ন দেখেছিলে,
সেই স্বপ্নের কথা তুমি কাউকে জানাওনি,
শুধু আমাকে জানিয়েছিলে।
তোমার স্বপ্ন ছিল:
তোমার এই পালিত শিশুটির বিবাহ-উৎসবে
তুমি সুন্দর সিল্কের পোষাক পরে,
উজ্জল আলো জ্বলা একটি হল ঘরে বসেছিলে।

এই পালিত-শিশুটি ও নববধূ তোমাকে,
মা, মা, বলে ডাকছিল।
ডায়ানহি, তুমি এই শিশুটিকে কত ভালবাসতে
তোমার বুকের দুধ দিয়ে তাকে মানুষ করেছিলে!

স্বপ্নের আচ্ছন্নতা কেটে যাবার আগেই তার মৃত্যু ঘটে।
সেই সময় তার পালিত-পুত্র তার পাশে ছিল না;
তার স্বামী তার প্রতি অত্যাচার করেছিল,
তাকে মেরেছিল;
কিন্তু যখন সে মারা যায়,
তখন তার স্বামী অঝোর কান্নায় কেঁদেছিল।
তার অন্যান্য ছেলেদের চোখেও জল ছিল,
তাদের চোখের জল সেদিন কোন
বাঁধ মানেনি।
মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে, তুমি তোমার
পালিত-পুত্রের নাম ধরে ডেকেছিলে,
স্বপ্নভঙ্গের আগেই তোমার মৃত্যু হল।
তোমার মৃত্যুর সময়ে তোমার পালিত-পুত্র
তোমার পাশে ছিল না।

চোখের জলে স্বপ্ন ভিজিয়ে ডায়ানহি চলে গেল।
গত চল্লিশ বছর অবিরাম অত্যাচারের বোঝা
মাথায় নিয়ে ডায়ানহি মানব-সমাজ থেকে
বিদায় নিল। ডায়ানহি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল
ক্রীতদাসের সীমাহীন দুঃখ বুকে নিয়ে,
কফিনের এক টুকরো কাপড় আর
এক বাণ্ডিল খড় সঙ্গে নিয়ে,
নিজের অনন্ত-ঘুমের অধিকার স্বরূপ
এই পৃথিবীর, এক টুকরো মাটি দখল নিয়ে,
(হয়তো এখানেই সে তার খাবার ধান

বুনে নেবে),
পুড়ে যাওয়া কাগজের নোটের এক মুঠো ছাই
সঙ্গে নিয়ে,
ডায়ানহি, তার দু'চোখের জলে
এই পৃথিবীটাকে গরম করে চলে গেল।

কিন্তু এর পরের ঘটনাগুলো ডায়ানহি জানলো না,
জেনে যেতে পারলো না
ডায়ানহি জানলো না যে তার মৃত্যুর পরেই
তার মাতাল-স্বামীর মৃত্যু হয়েছে।
তার বড় ছেলে দস্যুতে পরিণত হয়েছে,
তার দ্বিতীয় পুত্র যুদ্ধের আগুনে পুড়ে মারা গেছে,
তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম পুত্র বেঁচে আছে,
তবে ভূ-স্বামীর অত্যাচারে তারাও জর্জ্জরিত।
এবং সব শেষে আমি—
আমি এই পৃথিবীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে,
অবিচারের বিরুদ্ধে কলম ধরেছি।
দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার পর
আমি যখন গ্রামে ফিরব,
তখন, আমার গ্রামের পাহাড়-পর্বত,
শস্য ভরা ধান ক্ষেত
আমাকে আবাহন জানাবে, আলিঙ্গন করবে।
আমার ভাইদের সঙ্গে দেখা হবে,
আমরা সন্ধ্যায় মুখোমুখি বসে
পুরোনো দিনের গল্প করবো।
পুরোনো স্মৃতি স্মরণ করবো,
যেমন আগে করতাম।
এবং এই কথাগুলো ডায়ানহি,
তুমি জানো না, জানবে না,
জানতে পারবে না।

তুমি নিঃশ্চুপ আকাশের নীচে
ঝরা-কান্না বুকে নিয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে থাকবে,
কেউ জানবে না। বুঝবে না।

ডায়ানহি, তুমি জানো না যে
তোমার বুকের দুধ-খাওয়া পালিত পুত্রটি
আজ কারাগারে।
সে আজ এখানে বসে একটি কবিতা
তোমাকে উৎসর্গ করছে,
সেই সঙ্গে সে স্মরণ করছে
তার গ্রামের স্নেহছায়া জড়ানো পল্লবিত বনালী,
তোমার পেলব বাহুদ্বয়,
যে বাহুদুটি সারাক্ষণ তাকে জড়িয়ে থাকতো
সে স্মরণ করছে তোমার দুটি অধরকে
যে অধর দুটি তাকে চুম্বনে ভরিয়ে রাখতো,
তোমার বিনম্র চক্ষু দুটিকে,
তোমার মুখমণ্ডলকে,
তোমার স্তন দুটিকে,
যে স্তনের দুগ্ধে সে পালিত,
যে স্তনের নীড়ে তার রাতের ঘুম,
তার শৈশবের পরিচর্যা,
সে আরও স্মরণ করছে তোমার পুত্রদের
অর্থাৎ তার বৈমাত্রেয় ভাইদের,
এবং এই পৃথিবীর সকল পালিত পুত্রদের,
ও তাদের মাতৃ-স্বরূপা সেবিকাদের
যাঁরা আমার ডায়ানহির মত
স্নেহশীলা, সেবাপরায়ণা ও
করুণার প্রতিমূর্তি।
ডায়ানহি, তুমি যেমন আমাকে
তোমার নিজের পুত্রের মত ভালবাসতে।

জানিনা, তুমি বিশ্বাস করো
আমি তোমারই পুত্র,
তোমার স্তনের দুধে আমি পালিত,
আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি,
তোমাকে প্রণাম করি,
আমি তোমাকে ভালবাসি
তাই আজ এই কবিতার মাধ্যমে
আমার বুকের নিবিড় নির্যাস
তোমাকে দান করি।

তুষারাবৃত সকালে।
জানুয়ারী ১৪, ১৯৩৩

সূর্য

হাজার বছরের কবর ভূমি ভেদ করে,
হাজার বছরের অন্ধকার ভেদ করে,
হাজার বছরের মানবতার মৃত্যু ভেদ করে,
ঐ দেখ, পর্বত মালার ঘুম ভাঙ্গছে।
এখন ওখানে সূর্য একটি ঘূর্ণিত অগ্নিবলয়
পাহাড় চূড়ার পিঙ্গলবর্ণ ভেদ করে
ঘূড়ন্ত চাকীর মত
আমার দিকে ছুটে আসছে।

তার জ্যোতির্ময় তীরের ফলাকা,
মানুষকে জীবন দান করছে,
তার আগমনে গাছের পত্রসমূহ আনন্দে হিল্লোল,
ক্ষীনবহ নদীরাও গান গেয়ে ঊর্মি তোলে,
যেন এক আনন্দিত ধারা।

সূর্যের ঘূর্ণিত অগ্নিবলয় যত এগিয়ে আসছে,
আমি শুনতে পাচ্ছি,
দেখতে পাচ্ছি,
আগ্রাসি মানবতার পোকাগুলো
গভীর গহ্বরে চলে যাচ্ছে।
ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ক্ষয় রোগের পোকাগুলো,
জ্যোতির্ময় তীরের ফলাকায় বিদ্ধ হচ্ছে।
ভরপুর প্রাণের পেয়ালা হাতে নিয়ে
ঘুমন্ত মানুষেরা পার্কে দাঁড়িয়ে
নিজেদের বক্তব্য রাখছে,
অতীতের বহমান বিশাল ব্যক্তিত্বের কথা শোনাচ্ছে,
শহর এবং শহরবাসী,
দূরে দাঁড়িয়ে,
ঘূর্ণিত সূর্যের চূর্ণিত ফলাকাকে
ইংগীতে আহ্বান জানাচ্ছে,
আগন্তুকের সম্মোহন শক্তিতে,
এরা সমাহিত।

ঐ জ্বলন্ত সূর্য-বলয় আমার কাছে এসে,
আমার বুকের জানালাটা খুলে,
ঘুণ-ধরা ছিঁড়ে খাওয়া আত্মাটাকে
আবার সেলাই করে দিল।
আমি আবার নতুন করে,
বাঁচবার আশ্বাস পেলাম।
ঐ সূর্যটা আমাকে
বাঁচবার প্রতিশ্রুতি দিল।

[বসন্ত, ১৯৩৭]

সে উঠে দাঁড়িয়েছে

বার বছরের দাসত্বের দড়ি কেটে
সে আজ উঠে দাঁড়িয়েছে।
বার বছরের নির্মম মানবতাহীন
পেষণযন্ত্রের মুখ থেকে ছিট্‌কে
সে আজ বেরিয়ে পড়েছে।
সে আজ উঠে দাঁড়িয়েছে।
শত্রুর সম্মুখ অস্ত্রকে ফাঁকী দিয়ে
তার মানবতাবোধ আজ তাকে
সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

তার মুখমণ্ডল রক্তাক্ত,
তার বুক আজ ক্ষতবিক্ষত
আত্মা অঝোরে রক্ত ঝরিয়ে চলেছে,
কিন্তু তবুও সে আজ হাসছে,
অফুরন্ত প্রাণের নির্যাস ঝরিয়ে
সে অবিরাম হেসে যাচ্ছে,
এত হাসি সে আগে কখনও
হাসতে পারে নি।

সে হাসছে,
তার চোখ দুটো উজ্জ্বল আলোয় চক্‌চক্‌ করছে,
মনে হচ্ছে,
সে তার শত্রুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে,
যে তাকে পদানত করেছিল,
তার মানবতাকে ধর্ষিত করে,
অমর আত্মাকে খণ্ডিত করে
রাম্না চাপিয়েছিল।

সে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে,
যখন সে একবার উঠে দাঁড়াবার
সুযোগ পেয়েছে,
তখন সে এবারে হবে
সমস্ত বন্য জন্তুর চেয়েও হিংস্র,
এবং
সমস্ত মানুষের চেয়ে বুদ্ধিমান।

তাকে এমনই হতে হবে,
সমস্ত মানুষকে এমনই হতে হবে,
কারণ,
সে তার জীবনকে শত্রুর হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে,
ছিনিয়ে নিয়েছে।
মৃত্যুর মুখ থেকে সে তার জীবনকে
ফিরিয়ে এনেছে।

[অক্টোবর ১২, ১৯৩৭]

চীনা ভূমিতে তুষারপাত

চীনা ভূমিতে তুষারপাত চলছে :
এদেশ আজ জমাটি ঠাণ্ডায় আক্রান্ত...

এখানে বাতাস যেন কোন্ সেকেলে বুড়ী,
সারা জীবনের অভিযোগ নিয়ে
এই তুষারপাতকে অনুসরণ করে
ছুটে আসছে,
তুষারে জর্জরিত হেঁটে যাওয়া মানুষের
পোষাকে তার ধারালো নখের থাবা বসাচ্ছে,
তার কথার শব্দ ঠাণ্ডা মাটির চেয়েও শীতল,

স দূর-দূরান্ত থেকে বিরামহীন প্রশ্ন নিয়ে
ছুটে আসছে,
যে সমস্ত কৃষকেরা এই তুষারপাতের দিনেও
বুকে সাহস নিয়ে,
ঘন বনের গভীরে গিয়ে
কাঠ কেটে আনছে,
আজ তাদের পশমের টুপীগুলো
ঝোড়ো বাতাসে বারবার উড়ে যাচ্ছে।
বাতাস তাদের গায়ে পড়ে প্রশ্ন করছে :
তোমরা কোথায় যাচ্ছ ?

আমি মহাকাল জবাব দেব,
আমিও একজন কৃষকের বংশধর,
আমি আগন্তুকদের মুখের রেখা ও
মানবিক বেদনার কথা জানি,
এত বেশী জানি যে আর কেউ জানে না।
অতীতের কঠিন দিনগুলোর কথা আমি ভুলিনি,
সেই সময় আমিও সুখে ছিলাম না
অন্যান্য কৃষকের মত আমার দিনলিপিও
ছিল দুঃখের,
সমতলভূমিতে ছায়া সুশীতল নদীর কিনারে
আমার বাস ছিল,
সে বাসা ঝড় কেড়ে নিয়ে গেছে,
নদী ভাসিয়ে নিয়ে গেছে,
আমাকে পথে বসিয়ে দিয়েছে,
তারপর থেকে আমি পথে পথে
ঘুরে বেড়াচ্ছি,
কখনও বাইরে কখনও জেলে,
এইভাবে আমার যাদুকরী যৌবন কেটেছে,
আমার জীবনের ফুল-ফোটা বসন্তের দিনগুলো;

অভিশপ্ত অভিমানে কেটেছে।
আজ আমি তোমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।
আমার জীবনও আজ তোমাদেরই মত
শুকনো, বিবর্ণ।

চীনা ভূমিতে তুষারপাত চলছে,
এ দেশ আজ জমাটি ঠাণ্ডায় আক্রান্ত···

আমি মহাকাল,
আমি আজ গলিত, মথিত, বিদীর্ণ বুকে
বাতাসের হাহাকার শরীরে জড়িয়ে ঘুরে বেড়াই।
তুষারপাতের গভীর রজনীতে,
নদীর কিনারে,
নিভু নিভু পলতে জ্বলা আলোর গভীরে,
একটি জরাজীর্ণ বোটের ওপরে,
কালো ঢাকনা গায়ে,
আলোর মুখোমুখি,
ক্লান্তিতে নুয়ে পড়া মুখে,
কে বসে?

ও তুমি
এলোমেলো চুলে আলুথালু বেশে,
নোংরা পোষাকে মলিন মুখে
তুমি যুবতী নারী,
এইটাই তোমার
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির-নীড়
আক্রমণকারীরা,
আততায়ীরা,
তোমার এই শান্তির নীড়
পুড়িয়ে দিয়েছে?

সে'ও বুঝি আজকের মত
এমনি এক রাত্রি ছিল ?
সেই রাত, সেই ভয়াবহ রাত
তোমার জীবনের সুখের শেষ রাত
যে রাতে তুমি তোমার স্বামীর
আশ্রয় হারালে।
মৃত্যুর বিভীষিকা তোমার জীবনে
নেমে এলো।
শত্রুর বেয়নেটের মুখে
তুমি তোমার নারীত্ব, সতীত্ব হারালে,
নির্যাতনে, নিপীড়নে নিঃশেষ হলে।

এমনই এক তুষার-ঝরা রাতে,
এ দেশের হাজার মাতৃত্ব
লুণ্ঠিত হয়েছিল,
মায়েরা শিশু-বুকে পথে বেরিয়ে পড়েছিল,
ভিক্ষাপাত্র হাতে অপরের গৃহে
পশুর মত আশ্রয় নিয়েছিল,
নিতান্তই অবহেলিত আগন্তুক,
জানে না আগামীকাল
ভাগ্যের চাকা তাদের কোথায় নিয়ে যাবে,
চীনের রাস্তা বড়ই অমসৃণ,
বড়ই অসমান,
বড়ই কর্দমাক্ত,
বড়ই পিচ্ছল।

চীনা ভূমিতে তুষার পাত চলছে,
এদেশ আ-- জমাটি ঠাণ্ডায় আক্রান্ত·

সেদিন সেই জমাটি তুষারপাতের রাতে
যুদ্ধের সংকেত ভেসে এলো

পর মুহূর্তেই যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো
মাতৃভূমি শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হল।
হিসাব-বিহীন ভূমি-চাষী জমি হারালো
উর্বর ভূমি,
সোনালী ধানের শিষে ন্যুয়ে পড়া
গর্ভবতী ভূমি,
শত্রুরা লুণ্ঠন করলো।
চাষীরা উর্বর ভূমি হারালো,
গৃহপালিত পশু হারালো,
হাজার হাজার মানুষ দিশেহারা হয়ে
প্রচণ্ড শূন্যতা সঙ্গে নিয়ে
যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়ালো।
কালো আঁধার রাতে
গভীর নৈরাজ্যে নৈরাশ্য বুকে নিয়ে
হাজার হাজার বজ্র-মুঠি শূন্যে হাত তুলে
ক্ষুধার্ত কুকুরের মত
জমির দাবীতে এক-যোগে প্রতিবাদ জানালো,
দাবী পেশ করলো।

আজকের এই ব্যাপক এবং দীর্ঘ
তুষারপাতের মত,
নেমে আসা গভীর রাতের মত
চীনের উৎকণ্ঠা ও সমস্যার শেষ নেই।
চীনা ভূমিতে তুষারপাত চলছে
এ দেশ আজ জমাটি ঠাণ্ডায় আক্রান্ত……

আমার মাতৃভূমি তোমায় প্রণমি,
আজকের এই গভীর নিকষ কালো রাতে
আমার এই অপটু কবিতা,
আমার এই কাব্য-কথা
তোমাকে কি একমুহূর্তের জন্যেও উষ্ণতা দেবে ?

[রাতে, ডিসেম্বর ১৮, ১৯৩৭]

সেলাই রত মহিলা

রাস্তার পাশে বসে একজন মহিলা
পোষাক সেলাই করছে।
পান্থজনেরা ধূলো উড়িয়ে চলে যাচ্ছে,
সেই ধূলো তার পরনের পোষাক
ডুবিয়ে দিচ্ছে,
পোষাকের রং পাল্‌টে দিচ্ছে,
ধূলো-ওড়া মুহূর্তে তার কোলের শিশুটা
কেঁদে উঠছে,
তার চোখের জল সূর্যের রোদ
ক্ষুধার্তের মত চেটে খাচ্ছে ;
মহিলাটি তার নিজের কাজে নিয়োজিত,
এ সব দেখেও দেখছে না।
সে তার ঘরের কথা ভাবছে,
ভালবাসার মশলা দিয়ে
গেঁথে তোলা ছোট্ট একটি ঘর,
যে ঘর শত্রুর বারুদের আগুনে পুড়েছে।
মেয়েটি এক মনে কাজ করে যাচ্ছে,
ক্ষুধার্ত শিশুটি সূর্যের রোদে লাল হয়ে যাওয়া
চোখ দুটি নিয়ে খাবারের আশায়
পাশের ঝুড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে।

মেয়েটি রাস্তার পাশে বসে
একমনে পোষাক সেলাই করছে।
তার সামনে দীর্ঘ অসমতল রাস্তা পড়ে আছে,

মেয়েটি কোন একজনের মোজা সেলাই-এ
ব্যস্ত আছে,
সেই লোক এই মাত্র পাশ দিয়ে
চলে গেল।

[রেলওয়েস্টেশনে, ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮]

প্রণমি জন্মভূমি

আমি যদি সংগীত শিল্পী হতাম
তাহলে আমি আমার মাতৃভূমিকে
বন্দনা করতাম।
আমার কণ্ঠ যদি কর্কশও হত,
তা'হলেও আমার মাতৃভূমি বন্দনা থেকে
বিরত থাকতাম না।
দুর্যোগ আর দুর্বিপাকে আচ্ছন্ন
আমার মাতৃভূমিকে,
আমার সংগীতে সান্ত্বনা জানাতাম,
আমাদের চোখের জলে
যে নদী উদ্বেলিত.
যে নদী আন্দোলিত.
আমি আমার সংগীতের মাধ্যমে
তাকে স্তুতি জানাতাম,
যে বাতাস রাগান্বিত,
যে বাতাস ঝড় হয়ে
আমার মাতৃভূমিকে পোষাকে ঢাকতে চাইছে
আমি তাকে আমার গানের মাধ্যমে
শান্ত হতে বলতাম।
যে উষা পাইনের বনে
রোদের জামা গায়ে দিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে
আমি তাকে আমন্ত্রণ জানাতাম।
তাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতাম,
তারপর যদি আমার মৃত্যু হত
আমি দুঃখ পেতাম না।
বরং

কবরভূমিতে কফিনে আচ্ছাদিত হয়েও
আমি শান্তি পেতাম

কিন্তু, আজ আমার দু'চোখ জলে
কানায় কানায় পূর্ণ কেন ?
কারণ, আমি আমার মাতৃভূমিকে ভালবাসি
এবং আমি বন্দনায় অক্ষম।

[নভেম্বর ১৭, ১৯৩৮

হিটলার

শতবর্ষ আগে নেপোলিয়নের
উন্নততর পরিকল্পনা
আজ অলীক স্বপ্নে সমাহিত।
পুরোনো পৃথিবী আজ বন্ধ দরজায়
মাথা কুটছে—
মধ্যবিত্ত নামক নতুন মানুষ,
যদিও অনিমন্ত্রিত,
তবুও পায়ে পায়ে আজ
ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এসে হাজির।

ইতিহাস একযুগ ধরে ভোজসভা শেষ করে
আজকে মধ্যবিত্তদের মাঝে এসে দাঁড়ালো
ফলে এর আর কোন উজ্জ্বলতা নেই।
আমলাতান্ত্রিক ভোজ সভার বিশৃঙ্খলা
পরিষ্কার করবার জন্যে
ইতিহাস হিটলারকে নিয়ে এলো
প্রহসনের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে।

চরিত্রের দিক থেকে তিনি ছিলেন
উন্মত্ত, পাগল,
অসংযত উচ্চাকাঙ্খিত মানুষ।
অসংযত অসম্ভব অহমিকা
তাঁকে সীমাহীন সাহস
এনে দিয়েছিল।
তাঁর চরিত্রে দৃঢ়তা তৈরী করেছিল।

নিজের চোখে তিনি নিজে ছিলেন
একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক,
বীর বোনাপার্টির একটি অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি,
তিনি ছিলেন জার্মান সংসদের অগ্নিদাতা,
ভাঙ্গণের মূল শিকড়,
জার্মান বিপ্লবের ভালকুত্তা,
পুতুল নাচের দক্ষ খেলোয়াড়,
ষড়যন্ত্র ও প্রবঞ্চণার অপ্রতিদ্বন্দ্বী জুয়াড়ী।

মানুষের সৃষ্টিমূলক প্রতিভার বিরুদ্ধে,
শান্তিকামী মানুষের শান্ত-নীড়ের বিরুদ্ধে,
পরিপূর্ণ মানবতার বিরুদ্ধে,
পরিপূর্ণ সৎ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে,
ইতিহাসের নিয়মের বিরুদ্ধে,
তিনি সবকিছু ভেঙ্গেচুড়ে দিতে চেয়েছিলেন
তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কলার
পরিবর্তে বন্দুক ও বোমারু প্লেনকে
আহ্বান জানানো হোক,
বিচার এবং আইনকে
অত্যাচার করে এবং চাবুক মেরে
তাড়ানো হোক,

শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবকে গলা টিপে মেরে,
প্রতিভাশালী মানুষদের দেশ ছাড়া করে,
ভাল মানুষদের জেলে পুরে,
তিনি সমস্ত জার্মান জাতটাকে
একটি রাজনৈতিক বন্দী শিবিরে পরিণত করেছিলেন।

ফলে, মানুষেরা রুজি-রোজগার হারিয়েছিল,
সুখ-শান্তি হারিয়েছিল,
তাঁর রাজ্যে তিনি বুঝতেন.
অলসতার অর্থই হল চাবুক পেটা,
চারিদিকে হাহাকার,
রক্তের গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত,
অবিরাম রক্তপাতে দেশটাই
গভীর অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল,
শস্য নেই খড়ের গাদা সর্বত্র ছড়িয়ে।

তাঁকে বলা যায় একজন গুপ্তঘাতক,
একজন নীচতম অপরাধী,
তিনি মনে করেন তাঁর এইসব
নীচতম কাজই হচ্ছে
তাঁর বদান্যতা, তাঁর মানবতা,
সমস্ত কিছু সৎ উদ্যোগের প্রতিবাদে
তিনি সোচ্চার।
প্রচণ্ডতম বাধা দানে অগ্রণী।
আমাদের সময়ে তিনি ছিলেন একজন
নামকরা বিশ্বাসঘাতক এবং সন্ত্রাসবাদী।
তিনি ছিলেন সকলের ভয়ের পাত্র।
তাঁর নিজের দেশের সমস্ত মানুষের দুর্ভাগ্য
তিনি নিজে ডেকে এনেছিলেন।
তাঁকে দেখলেই লোকে ভাবতো

তিনি একই সঙ্গে চারিটি ঘোড়ায় চড়ে
উল্কার মত ছুটে আসছেন,
এবং সঙ্গে নিয়ে আসছেন,
যুদ্ধ, মহামারী, অনসন এবং মৃত্যু।

তিনি যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে দিতে
ভালবাসতেন,
এক হাতে চাবুক ও অন্য হাতে পিস্তল নিয়ে
তিনি সমস্ত জার্মান জাতটাকে
নিজের বুটের নীচে রেখেছিলেন,
এবং এই ভাবে তিনি সমস্ত পৃথিবীটাকে
জয় করতে চেয়েছিলেন।

তিনি সমস্ত গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে
নগর ধ্বংস করে,
সমস্ত মানুষকে ক্রীতদাস করে,
পৃথিবীর অর্দ্ধেকটাকে
গভীর অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়ে,
শিশুর মত উজ্জ্বল হাসিতে
নিজের মুখমণ্ডল পূর্ণ করে
বসেছিলেন।
নিজের দেশটা প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসে
নিমজ্জিত দেখে
তিনি হাসিতে ফেটে পড়েছিলেন।
জয়ের স্বপ্নে নিজেকে আকণ্ঠ ডুবিয়ে,
তিনি এখন শেষ অভিযানে যেতেছেন,
তিনি তাঁর দুর্ধর্ষ সৈন্যদলকে পাঠিয়েছেন
একটি স্বাধীন, শান্তি কামী দেশকে
আক্রমণ করবার জন্যে,
আমাদের শ্রমিক সৈনিকেরা

তাদের অবিরাম বাধা দিচ্ছে,
প্রতিহত করে রেখেছে;
আমাদের বন্দুকের গর্জন,
তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার জবাব দিচ্ছে

আমাদের শপথ হচ্ছে :
তাকে আক্রমণ করো,
তার ওপর এমন আঘাত হানো
যা' তার মৃত্যুকে কাছে ডেকে আনবে,
তাঁর আজব স্বপ্নকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দাও,
তাঁর দু'চোখে জল নেমে আসুক
তাঁকে পুড়িয়ে ফেলার দিন এসেছে.
তিনি তাঁর নিজের কবর নিজেই খুঁড়েছেন।

তাঁর অধিকৃত সমস্ত দেশের মানুষ একহও,
সমস্ত ক্রীতদাস একটি শপথের পতাকার
নীচে এসে দাঁড়াও।
ফ্রেঞ্চ, ডাচ, বেলজিয়ান কিম্বা
গ্রীক বলে কোন কথা নেই,
তোমরা আজ একটি মিলন-মাল্যে
গ্রথিত হয়ে
একটি শপথের পতাকাতলে এসে দাঁড়াও,
বুকে সাহস রাখো,
জানবে, তোমাদের সাহস জোগাতে
তোমাদের পেছনেই আছে লাল ফৌজ,
স্বাধীনচেতা, সাহসী সৈনিকের দল
এসো, আজ আমরা সকলে একত্রিত হয়ে
একটি লৌহশৃঙ্খল রচনা করি,
একটি শপথের বাণী উচ্চারণ করি,
মানবতাকে বাঁচাবার জন্যে,

স্বাধীনতা, শান্তি এবং সুখকে
বাঁচাবার জন্যে,
এসো, আজ আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে
লড়াই করি।
আজ এই দস্যুকে তাড়িয়ে দেবার দিন এসেছে।

[জুলাই, ২, ১৯৪১]

ভোরের ঘোষণা

কবি, এখনও ঘুমিয়ে কেন ?
ওঠো, জাগো,
জাগরণের গান গাও।

আমার আগমনের ঘোষণা
তুমি প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে
পৌঁছে দাও।
আজ তারা আসতে দেরী করছে কেন ?

তুমি তাদের বলো আমি রাতের আঁধার
অতিক্রম করে এসেছি,
শেষ রাতের শুকতারার আলোকে
পথ করে করে আমি এসেছি

তুমি তাদের গিয়ে বলো,
আমি পূবের আকাশে উদিত হয়ে
এই বার্তা ঘোষণা করছি।
আমি সমুদ্রের সমস্ত জলোচ্ছ্বাসকে ডিঙিয়ে
এখানে এসেছি।

আমি জ্যোতির্ময়,
সময় পৃথিবীকে আলোকিত করা
আমার কাজ।
সমস্ত মনুষ্যজগৎকে তেজদীপ্ত করা
আমার কাজ ।

কবি, সৎ মানুষের মুখ দিয়ে
সৎ মানুষের বাণী রূপে
আমার বার্তা প্রতিটি মানুষের কাছে
পৌঁছে দাও।

তাদের বলো, যারা আলোর পিয়াসী,
যে সমস্ত মানুষ, অথবা গ্রাম, গঞ্জ
অথবা শহর দুঃখে নিমজ্জিত,
দুঃখে ভারাক্রান্ত,
তারা যেন আমাকে স্বাগতঃ জানায়।
আমি হচ্ছি সমস্ত দিনমানের অগ্রদূত,
আলোকের দিশারী।

তাদের বলো,
তারা যেন সমস্ত বাতায়ন খুলে
আমাকে স্বাগতঃ জানায়,
সমস্ত তোরণ উন্মুক্ত কোরে
আমাকে আবাহন করে।

স্বাগতঃ সময়ে তারা যেন বাঁশী বাজায়,
বাদ্য বাজায়।

আমার চলার পথ যেন পরিষ্কার থাকে
ময়লা যেন সরিয়ে ফেলা হয়।

কাজে যাবার সময়ে শ্রমিকেরা যেন
দীর্ঘ পদক্ষেপে হেঁটে যায়।
চৌমাথা পার হবার সময়
ট্রাম গাড়ী যেন মিছিল করে যায়।

গ্রাম-গঞ্জগুলো যেন
গভীর কুয়াসা ভেদ করে জেগে ওঠে,
তারা যেন আমাকে স্বাগতঃ জানাবার জন্যে
তোরণগুলো খুলে রাখে।

গ্রামের মেয়েরা যেন মুরগী ছানাদের
খাঁচা থেকে বার করে দেয়,
কৃষকরা যেন তাদের গৃহপালিত পশুদের
খোঁয়াড় থেকে বার করে নিয়ে আসে।

কবি, তুমি তোমার বাণীর মাধ্যমে
এই ঘোষণা কর যে,
আমি পর্বতের চূড়া অতিক্রম করে,
গভীর অরণ্য ভেদ করে,
তাদের জন্যে আলোর বার্তা নিয়ে আসছি।

গৃহবধুরা যেন তাদের অঙ্গন পরিষ্কার রাখে,
ফুলে শোভিত রাখে,
শহরের অপরিষ্কার চলাপথ যেন
সুসজ্জিত থাকে,

শহরবাসীরা যেন তাদের রঙ্গীন কাগজে মোড়া
জানালাগুলো খুলে রাখে,
যে সমস্ত দরজার মাথার ওপর নবীন বসন্তের

বাণী খোদিত আছে,
সেই সব দরজাগুলো যেন খুলে রাখে।

শ্রমিক মহিলারা, যাঁরা কল-কারখানায়
কাজ করেন, তাঁরা যেন দয়া করে
উঠে পড়েন,
গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন নাক ডাকানো
পুরুষেরা যেন আর না ঘুমোন।

যুবক প্রেমিকদেরও উঠতে হবে,
যুবতী মেয়েরা যারা ঘুমোতে ভালবাসে
তাদের জাগিয়ে দাও।

ক্লান্ত মায়েরা যারা শিশু-বুকে নিয়ে
ঘুমিয়ে রয়েছে, তারা ওঠো, জাগো।

প্রতিটি মানুষের জন্যে আমি আজ
অমৃত এনেছি।
প্রতিটি মানুষ আজ ওঠো, জাগো,
পঙ্গু তুমি উঠে দাঁড়াও,
অন্তঃস্বত্তা মহিলা, তুমি জাগো।

এমনকি অতি বৃদ্ধ,
যারা বিছানা ছেড়ে নড়তে পারে না
আজ তাদের দাঁড়াবার দিন এসেছে।

যারা যুদ্ধে আহত,
যারা গ্রাম ছাড়া, ঘর ছাড়া,
যাদের ঘর শত্রু আগুন ধরিয়ে দিয়েছে,
আজ তাদের জাগবার দিন।

আমি তাদের জন্যে আজ
আশ্বাসের বাণী নিয়ে এসেছি।

দুঃখে ভারাক্রান্ত মানুষ
আজ জেগে ওঠো।
আমি তাদের জন্যে অমৃত এনেছি,
সুখ স্বাচ্ছন্দ এনেছি।

শ্রমিক, স্থপতি, শিল্পী,
তোমরা তো জীবনকে ভালবাস
সুতরাং ওঠো, জাগো।

গায়কগণ আমার বন্দনা গান করুক
তারা শিশির ভেজানো ঘাসের গন্ধ
জড়ানো কণ্ঠে আমাকে স্বাগতঃ সম্ভাষণ
জানাক।

ভোরের কুয়াশা ভেদ করে
নর্তকীরা নৃত্যের মাধ্যমে আমাকে
স্বাগতম জানাক

স্বাস্থ্যবান পুরুষ এবং সৌন্দর্যময় নারীকে
জানিয়ে দাও—
আমি তাদের জানালায় এসে হাজির হয়েছি

হে কবি!
তুমি সময়ের মূল্য বোঝ
তুমি ঋষি,
তুমি সমস্ত মনুষ্য সমাজের
সুখের সন্ধান নিয়ে এসো।

তুমি সমস্ত মনুষ্য সমাজকে
জানিয়ে দাও
সামনে সুদিন আসছে।

ভোরের আলো গ্রহণ করবার জন্যে
সমস্ত মনুষ্য সমাজকে তৈরী হতে বলো।
ভোরের শেষ মোরগ-ডাকের সঙ্গে সঙ্গে—
আমার আগমন বার্ত্তা ঘোষিত হবে।

সমস্ত মানুষ যেন বিনম্র চোখে
দিক্‌চক্রবালের দিকে উৎসুকে তাকিয়ে থাকে
যারা আগমন প্রতীক্ষায় থাকবে
আমি তাদের মস্তকে আশীর্বাণী হয়ে
ঝরে পড়বো।

কবি,
রাত শেষ হয়ে আসছে,
তুমি সকলকে জানিয়ে দাও,
সমস্ত মানুষ যার প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান,
সে আসছে।

[১৯৪২]

জৈবশিলা

আজ তোমার গতিতে ক্ষিপ্রতা আছে,
আজ তোমার ভেসে বেড়াবার ক্ষমতা আছে,
তুমি মহাসমুদ্রে পুঞ্জরাশি হয়ে
ফেনা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ।

তোমার ভাগ্য যদি মন্দ হয়,
তবে একটা আগ্নেয়গিরির অগ্নিশিখা
অথবা কোন ভূমিকম্প
তোমাকে হঠাৎ থামিয়ে দিতে পারে,

অথবা স্থবির করে দিতে পারে,
এবং স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারে,
শেষ কথা :
পুড়িয়ে দিতে পারে

হাজার বছর পরে
সেই জায়গা জরিপ করতে এসে
কোন ভূবিদ্যা বিশারদের সভ্যগণ
তোমাকে প্রবাহমান শিলাস্তরের মধ্যে
পেয়ে যেতে পারে,
এবং দেখে মনে হতে পারে
তুমি তখনও জীবিত।

কিন্তু তখন তুমি নিরব,
তোমার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
সবই ঠিক আছে।
চোখও আছে,
কিন্তু তুমি দেখতে পাও না,
নড়তেও পার না।
সুতরাং সম্পূর্ণ স্থবির,
পরিপূর্ণ জৈবশিলা,
প্রস্তরে পরিণত,
তখন তুমি এই পৃথিবীর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায়
জড়িত নও,
তোমার চোখ থাকা সত্ত্বেও
তুমি আকাশ, নদী কিছুই
দেখতে পাও না,
সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন
তোমার কানে যায় না
তোমার সেই জৈবশিলা দেখে
সেই ফসিল অবস্থা অবলোকন করে

একজন মূর্খও অনেক জ্ঞান
লাভ করতে পারে,
তারা জানতে পারে,
স্থবিরতা জীবন নয়,
জীবন চলায়মান
জীবনের ধর্ম চলা

সুতরাং বেঁচে থাকতে গেলে
পথ চলতে হবে,
এবং পথ চলতে গেলে
সংগ্রাম করতে হবে।
এবং এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই
মানুষ তার সীমানা বাড়াবে,
অগ্রগতির পথ করে নেবে।
যদিও মানুষ মরণশীল
মৃত্যু অবশ্যম্ভাবি
তবুও আমরা বাঁচবার জন্যে
সংগ্রাম করে যাব.
এবং সেই সংগ্রামে
আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি
নিয়োগ করব।

ছাতা

সকালে আমি ছাতাকে প্রশ্ন করলাম
তুমি কি রোদে পুড়তে পছন্দ কর ?
না বৃষ্টিতে ভিজতে পছন্দ কর ?

ছাতা মিষ্টি হেসে বললো :
এ ব্যাপারে আমার মাথা ব্যথা নেই

আমি আমার প্রশ্নকে অনুসরণ করে
আবার বললাম :
তা'হলে কিসে তোমার মাথা ব্যথা ?

ছাতা বললো :
আমার কাজ হচ্চে
বৃষ্টিতে যাতে মানুষের পোষাক না ভেজে
সেটা দেখা, আর
রোদের সময় মানুষের মাথার ওপরে
মেঘের মত বিছিয়ে থাকা।

এ ব্যাপারেই আমার মাথা ব্যথা,
আমি এটা নিয়েই চিন্তিত।

আয়না

আয়নার আয়তন সব সময়ই
সমতল এবং মসৃণ,

এ যাকে ভালবাসে
গভীর ভাবেই ভালবাসে
কোন কিছু গোপন করে না
কোন ভুল-ত্রুটি অগোচরে রাখে না।
সৎ মানুষের কাছে
এ জিনিষ সব সময়ই সৎ
কারণ, সৎ মানুষ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
নিজেকে চিনতে পারে।
নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
মদ্যপায়ী অনায়াসেই নিজেকে চিনতে পারে
বরফের মত সাদা হয়ে যাওয়া

চুলের মালিক যদি
পরচুলা ব্যবহার করে তাহলেও ধরা পড়বে।

সেই কারণে,
দেখতে সুন্দর—সুন্দরীরা
অথবা, সৎ মানব—মানবীরা
একে পছন্দ করবে,
যেহেতু তারা সুন্দর এবং সৎ

কিছু মানুষ আবার একে অপছন্দ করে
কারণ, এ জিনিষ বড় বেশী
নগ্নতা প্রকাশ করে,
কিছু রেখে-ঢেকে প্রকাশ করে না।

আবার এমন কিছু লোক আছেন
যাঁরা এই আয়নাকে প্রচণ্ড ভাবে
অপছন্দ করেন
এবং সুযোগ পেলে তাঁরা হয়তো
এটাকে গুঁড়িয়ে দিতেও পারেন।

কারণ, এ জিনিষ সত্য প্রকাশ করে

আলোকের গুণগানে

জীবনে প্রতিটি মানুষই,
সে চালাক হোক অথবা বোকা হোক,
ভাগ্যবান হোক অথবা অভাগা হোক
মাতৃগর্ভ থেকে ভুমিষ্ঠ হয়েই
দু'চোখ দিয়ে
আলোকের অনুসরণ করতে থাকে।

পৃথিবীতে আলো নেই

এ কথা ভাবার অর্থ
মানুষের চোখ নেই,
এ যেন অনেকটা
দূরবীণহীন জাহাজ
অথবা, দৃশ্যপট হীন বন্দুকের মত।
আলো যদি না থাকে
তা'হলে সামনের সাপটি
কি করে বুঝবে যে তার সামনে
ফাঁদ পাতা আছে ?
অথবা,
ফাঁদই বা কি করে বুঝবে যে
সামনে সাপ আছে ?

পৃথিবীতে যদি আলো না থাকে
তা'হলে বসন্তের গান ব্যর্থ,
গ্রীষ্মে ফোটা-ফুলের মেলা ব্যর্থ,
শরতে সোনালী ফলের সমারোহ ব্যর্থ,
শীতে উড়ন্ত বরফ কণার ফুলঝুড়ি ব্যর্থ।

পৃথিবীতে যদি আলো না থাকে
তবে আমরা নদীর দুর্বার স্রোত
দেখতে পাব না,
ঘন নিবিড় বন, সমুদ্রের গর্জন,
তুষারে ঢাকা মৌনী পর্বত,
এসব কিছুই আমাদের
নজরে আসবে না,
এসব যদি আমরা কিছুই দেখতে
না পারি,
তাহলে, এই পৃথিবীর প্রতি
আমাদের আকর্ষণ কমতে বাধ্য।

(২)

আলো আছে বলেই
পৃথিবীর অগণিত জিনিষ
আমাদের কাছে অত্যন্ত বর্ণময় ও

অত্যুৎকৃষ্ট বলে মনে হয়,
মনে হয় সমাজ এত দীপ্তিমান।

আলো আমাদের জ্ঞান দেয়
আলো আমাদের কল্পনা শক্তি বাড়ায়
আলো আমাদের কাজে উৎসাহ যোগায়
যার ফলে আমরা কিছু শাশ্বত ভাবনা
গড়ে তুলতে পারি।
আলো আছে বলেই
আমরা আমাদের ভাবনার রাজ্যে
স্থাপত্য বিদ্যায় পারদর্শী হতে পেরেছি
এবং আরও গভীরে যাবার উৎসাহ পাচ্ছি,
আলো আছে বলেই
কবিতায় প্রাণ আছে
যে প্রাণ কবিতা পাঠে
মানুষের চোখের জল নিয়ে আসে!

আলো আছে বলেই
একজন ভাস্কর মৃত পাথরেও
প্রাণ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী,
একজন চিত্রশিল্পী
একটি লাবণ্যময়ী কুমারীর চোখ দুটি
এমন পল্লবিত ভাবে আঁকবে যে
দেখে মনে হবে ঐ কুমারী মেয়েটি
তোমার সঙ্গে কথা বলছে।

বাতাসের হিল্লোলের চেয়ে

নৃত্যের হিল্লোল আরও সুন্দর
মুক্তোর চেয়ে সংগীতের কণ্ঠ মাধুর্য
আরও সুন্দর
অগ্নিময় উৎসাহ, বিনয়, এ সমস্তই
উৎকৃষ্ট কাচের মত
কিন্তু আলোর স্পর্শে এরা প্রাণবন্ত।

গভীর রাতে সমতল ভূমিতে কোন তাঁবুতে
আগুন লাগলে সুন্দর দেখায়,
বন্দরের আলোক-সংকেত সত্যিই সুন্দর,
গ্রীষ্মের রাত্রে আকাশে নক্ষত্রের আলো
নিঃসন্দেহে বর্ণময়,
উৎসবের রাত্রে বাজির আলো
মনকে আলোকিত করে
এ সমস্ত কিছুই আলোর ওপরে নির্ভরশীল।

(৩)

আলো বস্তুটা কত সুন্দর
এ জিনিষের কোন ওজন নেই
কিন্তু সোনার মতই উজ্জ্বল,
দেখা যায়, কিন্তু ধরা যায় না
পৃথিবীর সর্বত্র এর গতি,
কিন্তু কোন আকার নেই
জ্ঞানী এবং বিনয়ীরা এর পূজারী
এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ।

পরস্পর সংঘাতেই এর সৃষ্টি
জ্বলা এবং নির্বাপণের মধ্যে দিয়েই
এর জন্ম ;
আগুনের পথ ধরে সে আসে
তড়িতের পথে এর আগমন,
চির শাশ্বত জ্বলন্ত সূর্য থেকে এর স্ফুরণ।

হে সূর্য, তুমিই আমাদের আলোর উৎস!
হাজার হাজার মাইল দূর থেকে
তুমি আমাদের আলো বিকীরণ করছো,
আমাদের বাসস্থান এই পৃথিবীকে
তুমি গরম রেখেছ,
যার ফলে পৃথিবীর সমস্ত জিনিষের বিকাশ ঘটছে।
পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী তোমাকে পূজা করে
কারণ, তুমিই আলো, যা' কোন দিনও নিভে যাবে না।

আলো অতলস্পর্শ, অগাধ,
এ জিনিষ শক্ত নয়, পাতলা নয়, গ্যাসও নয়,
আসে যায় কোন চিহ্ন রাখে না,
এর সীমানা অসীম, অনন্ত।
কোন আওয়াজ নেই, শব্দ নেই
অথচ সর্বত্র এর গতি
প্রচণ্ড শক্তিমান, কিন্তু শক্তির কোন প্রকাশ নেই
নিরব গাম্ভীর্যে ভরা।

সৃষ্টি হিসাবে মহৎ
ঐশ্বর্যে ভরপুর, মানুষের হিতৈষী,
উদার মনের অধিকারী এবং সরল,
এর করুণা কোন প্রকার
পুরস্কারের আশা করে না,
আত্মকেন্দ্রিক নয়,
সর্বদিক থেকে সব সময় মানুষকে
উদ্ভাষিত রাখে।

(৪)

কিন্তু, কিছু সংখ্যক মানুষ আছেন
যাঁরা আলোকে ভয় পান,
তাঁরা আলোকে ঘৃণা করবার শিক্ষা
সমাজকে দিয়ে থাকেন।

কারণ, সূর্যের আলো বা সূর্যশিখা
তাঁদের স্বার্থপরতার চোখে আঘাত করে
স্বার্থপরতায় আলো ফেলে।
ইতিহাসের সমস্ত স্বেচ্ছাচারী শাশক,
উৎপীড়ক জমিদার,
অতীতের সমস্ত রাজবংশীয় অসৎ মন্ত্রীপরিষদ
পৃথিবীর সমস্ত অসৎ, লোভী ও অর্থলিপ্সু মানুষ
আলোকে কজা করবার চেষ্টা করেছে,

বন্দী করবার চেষ্টা করেছে
কারণ আলো মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলে
মানুষকে মানুষ করে
মানুষকে জানিয়ে দেয় যে এরা চোর,
পরধন লোভী,
পরের সম্পদ হাতাতে ওস্তাদ।

এরা অপরকে শোষণ এবং শাসন করে
মানুষকে বীর্যহীন করে রাখতে চায়
মানুষের কথার স্বাধীনতা, ভাষার স্বাধীনতা,
কেড়ে নিতে চায়,
এরা চায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মত
রাজত্ব চালাবে, শাসন চালাবে।

যারা অপরকে নিজের কাজে লাগায়
অপরকে শোষণ করে,
তারা সাধারণ মানুষকে
অজ্ঞতার আড়ালে রাখতে চায়
জ্ঞানের আলো থেকে দূরে রাখতে চায়,
এত দূরে রাখতে চায়
যাতে মানুষ সংখ্যা গণনা না জানে
নিজের জীবনের যোগ-বিয়োগ না বোঝে
হিসাব করতে না পারে।

এই ধরনের মানুষেরা ক্রীতদাস চায়,
সেবক চায়,
এরা যান্ত্রিক সভ্যতাকে আবাহন জানায়
যান্ত্রিক মানুষকে নিজের কাজে লাগায়
নিজের মনের মত করে কথা বলতে শেখায়।
এরা ভীত, নিরীহ জন্তুকে ভয়ানক পছন্দ করে,
এরা মানুষ চায় না, মানুষকে পছন্দ করে না,
বিশেষতঃ যে সব মানুষের আদর্শ বলে কিছু আছে।
যারা ন্যায় সত্য মেনে চলে।
সুতরাং এরা আগুনকে ভয় পায়
আগুনের সংকেতকে ভয় পায়
আগুন জ্বলার আগেই
আগুন নেভাতে ছোটে।
এরা সীমাহীন আঁধারের অন্তর্বাসে
নিজেরাই নিজেদের পাথরের
রাজপ্রাসাদ খাড়া করে,
লৌহ প্রাচীরে ঘিরে রাখে,
নিজেদের রাজ্যে চিরদিনের জন্যে
স্বেচ্ছাচারীতা বজায় রাখবার চেষ্টা করে

এরা বিচারকের আসনে বসে
এক হাতে স্বর্ণপদক,
অন্য হাতে চাবুক নিয়ে,
এক পাশে অর্থ আর
অন্য পাশে শৃঙ্খল রেখে
সাধারণ সমাজ এবং মানুষকে
দাঁড় করিয়ে দর কষাকষি চালায়,
রাতে রাজসভায় কুৎসিৎ নৃত্য করে
এবং মানুষের রক্ত মাংসের
ভোজ উৎসব পালন করে।

ইতিহাস জানে এই ভাবে কত মানুষ
কত বংশ গভীর শোকে শেষ হয়েছে,
গ্রাণহিট্-এর মত শক্ত অন্ধকারে ডুবে গেছে।
কিন্তু তবুও কিছু সাহসী মানুষ
এই পৃথিবীতে এসেছেন,
এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন
এবং নরকের এই লৌহ শৃঙ্খল
ভেঙ্গে পুড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন।

বিজয় তাঁদেরই জন্যে যাঁরা এর প্রতিবাদ করেছেন,
এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন,
বিজয় তাঁদেরই জন্যে যাঁরা নিজেদের
সংগ্রামে নিয়োজিত রেখেছেন।
প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিতে আকস্মিক বজ্রপাত
সমস্ত চেতনাকে নাড়া দিয়ে যায়
অবস্থার কথা জানিয়ে দিয়ে যায়,
গাঢ় অন্ধকারে হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি
সমস্ত কিছুকে মুহূর্তের জন্যে
আলোকিত করে যায়
জানিয়ে যায় যে দীর্ঘ দুঃখের রাত্রি শেষ হবে,
সুখের আলোর উৎসব সুরু হবে।

(৭)

আমরা প্রত্যেকেই এক একটি জীবনের অধিকারী
যে জীবন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত নীহারিকার
এক একটি মহাজাগতিক চিহ্ন,
এক একটি জীবন অথবা মহাজাগতিক চিহ্ন
তার নিজস্ব শক্তির অধিকারী,
এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহাজাগতিক শক্তির
সম্মেলনেই আলোর উৎপত্তি
এদের প্রত্যেকেরই স্বাধীন সত্ত্বা আছে

এরা স্ব নির্ভর,
এবং অপরকে আলোকিত করে,
প্রভাবিত করে,
আলোতে এ জীবন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে
সমতা রেখে অবিরাম ঘুরে যাচ্ছে

আমরা আলোকিত হই অথবা পুড়ে যাই
যেহেতু আমরা ঘুরি বা ঘুরপাক খাই
আমাদের জীবন আলোকিত হতে হতে
অথবা পুড়তে পুড়তে এগিয়ে চলেছে।
আমাদের যুগে আমরা হচ্ছি
উৎসবের বাজির মত,
আনন্দের উৎস নিয়ে উল্কার মত
আকাশে ছুটে যাই
তারপর আলো হয়ে ঝরে পড়ি

যদি আমরা একটি ছোট্ট বাতিও হই
তবুও আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জ্বলবো,
আমরা যদি একটি দেশলাইয়ের কাঠিও হই
তাহলেও আমরা সময় মত জ্বলে উঠবো
প্রয়োজনে আগুন জ্বালবো
এমনকি আমাদের মৃত্যুর পর
আমরা সেই ছাই-এর নীচে
আগুন হয়ে ধিকি ধিকি জ্বলবো।

(৮)

যদি আমাদের জীবন শিশির বিন্দুতেও
পরিণত হয়,
যদি আমাদের জীবন গঙ্গার চেনাভূমির
বালুকা কণাতেও পরিণত হয়,
যদি মানুষ হিসাবে আমরা
অনাবশ্যক হয়ে পড়ি,

যদি জ্যোতিঃশাস্ত্রের গণনায়
আমরা যদি ধূলার চিহ্ন
স্বরূপে পরিণত হই,
তাহলেও আমি বিশ্বাস করি
আমরা আমাদের শরীরের আয়তন অপেক্ষা
অনেক বড় এবং জ্যোতিষ্মান আলো
এনে দিতে পারি।
কারণ, আমি এবং আমরা
বজ্রকণ্ঠে স্বাধীনতার গান গেয়েছি
যখন আমাদের স্বাধীনতা বলতে
কিছুই ছিল না।
আমরা মুক্তির গান গেয়েছি
নির্যাতিত, অবহেলিত এবং পদদলিত।

এই বিরাট বিশ্বে
আমি এবং আমরা তাদেরই জন্যে গান করেছি
যাদের মানবতা লাঞ্ছিত,
তাদের জন্যে গান করেছি যারা নির্যাতিত,
আমি এবং আমরা প্রতিরোধের গান করেছি
বিপ্লবের গান শুনিয়েছি,
যাদের দুঃখের রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে
আমরা তাদের আশার বাণী শুনিয়েছি
ভোরের আলোয় সংবাদ পৌঁছে দিয়েছি
এই জ্যোতিষ্মান আলোর জগতে
আমি শুধুমাত্র এক ঝলক আলো
তবুও সেই আমি,
আমাদের বিজয় উৎসবের দিনে
সুখের গান গেয়েছি।
আলোর সংবাদ মানুষকে জানিয়েছি।

যখন আমার এই জীবনের আলো

আর জ্বলবে না,
যখন আমি এই মহাবিশ্বের
আগুন এবং আলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়,
বিশ্বশক্তির সঙ্গে একত্রিত হয়ে
এক এবং একাকার হয়ে যাব
তখনও আমি বলবো,
আমি সত্যের জন্যে লড়াই করেছি,
যারা এখনও সংগ্রামে লিপ্ত
তাদের সাথে আমিও আছি।
আমি অদৃশ্য বস্তু হয়েও
আলোর গান গাহিবো
যে-আলোর অধিকার সমস্ত মানুষের
যে-সমপদের অধিকার সমস্ত মানুষের
আগামী দিনের পৃথিবী সমস্ত মানুষের
ভবিষ্যত সমস্ত মানুষের।

আমরা আলোকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি
আলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে জয় লাভ করছি,
এবং সেই জয়, মানুষেরই জয়।
যখন আমরা মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাস করি
আমরা অপরাজেয়।
আমরা অপরাজিত শক্তি।

(৯)

আমাদের অসীম ধৈর্যই
আমাদের জয়কে ত্বরান্বিত করেছে।
তারা আমাদের চলতি পথে।
আগুন লাগিয়ে দিয়েছে
সুতরাং তাদের প্রতি আঘাত হানতে হানতে
আমাদের চলার পথ করে নিতে হয়
আমাদের দৃঢ় পায়ে পথ চলতে হয়েছে

এইবার আমরা লং মার্চ সুরু করবো
এক নতুন ধরণের লং মার্চ
সে লং মার্চের দূরত্ব মাত্র
আট হাজার মাইলের নয়,
শুধু মাত্র সামনের ঐ দক্ষিণ পশ্চিমের
পর্বতটা ডিঙিয়ে যাবনা,
অথবা উত্তর পশ্চিমের বরফ আচ্ছাদিত
পর্বতের চূড়াটাই পার হব না,
কিম্বা আমরা দাতু নদী অতিক্রম করবো না
বা তার অপরাজেয় বালুকারাশি
পায়ে পায়ে পার হব না,
এবারে আমরা অত্যন্ত কঠিন এবং
দুর্গম পথ অতিক্রম করবো।
এ পথ ঘূর্ণিবার্তা, ঝড়, হিমবাহ
এবং তুষার নদীতে নিমজ্জিত।

কিন্তু সামনের ঐ আলো আমাদের
নীরব সংকেতে ডাকছে,
আমাদের সঞ্জীবিত করছে
প্রাণান্ত করছে উৎসাহিত করছে
এই আলো আমাদের নতুন যুগের
সূর্য এনে দিয়েছে,
ভোরের সংবাদ দিয়েছে,
এখন আমাদের সৈনিকরা
আমাদের নির্বাতিত মানুষরা
সাহসের সঙ্গে সমস্ত দুর্গ জয় করে
এগিয়ে যাচ্ছে।
সমস্ত ফ্রণ্টের মুখোমুখি তারা
লড়াই করছে।

আমাদের চলতি পথে সহায় সম্বল
কিছুই নেই।
আছে শুধু বিশ্বাস এবং সাহস।
বিশ্বাস এবং সাহসই আমাদের শক্তি।
অস্ত্র বলতে আমাদের হাতে রয়েছে
শুধুমাত্র আদর্শ।
আদর্শই আমাদের অস্ত্র।
আর আমাদের সঙ্গে রয়েছে
শিক্ষিত মানব সমাজ।
আমরা আজ উত্তেজিত
আশার আগুনে আমাদের অন্তর জ্বলছে।
আমাদের সামনের পথ
সূর্যের আলোকের ঝর্ণায় উৎসারিত।

আমাদের এই দিনগুলো
দ্রুতগতি একটা চক্রের চেয়েও
আরও দ্রুতগতিতে ঘুরে যাক,
আমাদের জীবন এইবার
পরিপূর্ণ জীবনী শক্তি যোগাক,
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শক্তি বলয় থেকে
ছুটে আসা নীহারিকার মত
এবারে আমাদের শক্তি সঞ্চয় হোক
যাতে আমরা দূর দিগন্ত পর্যন্ত
আলোর পাখা বিস্তার করতে পারি
অসীমকে অনুভব করে
তার শূন্যতা ভরিয়ে দিতে পারি,
তার শূন্যতায় এসে জমা হতে পারি।

এসো, এবারে আমরা তীব্র গতিতে ছুটে যাই
এসো, এবারে আমরা অদম্য উৎসাহে ছুঠে যাই
এসো, আমরা আগামী দিনের জন্যে

আজ থেকে যাত্রা শুরু করি,
প্রতিটি দিন যেন আমাদের কাছে
নতুন বলে মনে হয়।

সম্ভবতঃ কোন একদিন এমন সময় আসবে
যখন আমরা, এই ঐতিহ্যপূর্ণ বনেদী জাত,
আজকের এই সাহসী মানুষদল
আলোর আমন্ত্রণকে স্বীকার করে নেব
সূর্য তোরণের লৌহ প্রাচীর
যা আজকে সুদৃঢ় ভাবে বন্ধ
একদিন আমরা সেখানে ধাক্কা দিতে পারবো,
আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করতে পারবো
আত্মীয়তা পাতাতে পারবো।

এসো, আমরা এই পৃথিবী থেকে
যাত্রা স্রুরু করে
সূর্যের দিকে এগিয়ে যাই।

কয়লার জবাব

তোমার বাসস্থান কোথায়?

আমি কঠিন পাহাড়ের নীচে
দশ হাজার বছর ধরে বাস করছি
আমি খাড়া এবড়ো-খেবড়ো শিলা প্রস্তরের নীচে
দশ হাজার বছর ধরে বাস করছি।

তাহলে তোমার বয়স কত?

আমার বয়স কঠিন পাহাড়ের চেয়েও অনেক বেশী
আমার বয়স খাড়া এবড়ো-খেবড়ো শিলা প্রস্তরের
চেয়েও অনেক বেশী।

কত বছর তুমি এভাবে চুপ করে আছ?

প্রাগৈতিহাসিক যুগের বৃহদাকার সরীসৃপ
যখন এই পৃথিবীতে রাজত্ব করতো,
তখন থেকে।
পৃথিবী যখন প্রথম কম্পন বা শিহরণ
অনুভব করলো, তখন থেকে।

তুমিকি তীব্র ঘৃণা, বিদ্বেষ অথবা হিংসা
কিম্বা তীব্র তিক্ততা নিয়ে ধীরে ধীরে
ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছ ?

মৃত্যু ? না, না, আমি এখনও বেঁচে আছি
তবে দয়া করে আমাকে আলোকে নিয়ে এসো,
আমাকে একটু আলো দাও। [বসন্তকাল ১৯৩৭]

হাত গাড়ীর চাকা

এক সময় যে রাজ্যে হলুদ নদী বয়ে যেত
সেই রাজ্যের শুকনো উপত্যকায়
একটি হাত গাড়ীর চাকা
তার একটি চাকা নিয়ে
আকাশের দিকে মুখ তুলে
চিঁ চিঁ শব্দ করে বিষাদময় আকাশকে
বার বার নাড়া দিচ্ছিলো।
মাঝে মাঝে মর্মভেদী শব্দ করে
শীতের কঠিন নিরবতা ও নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল।
এই শব্দ পর্বতের পাদদেশ থেকে সুরু করে
পর্বত অতিক্রম করে ডান দিকে প্রবাহিত হয়ে
উত্তর সীমানায় এসে এখানকার অধিবাসীদের
দুঃখের কারণ হচ্ছিলো।

কঠিন শীতের নিরবতার মধ্যে
ঐ ছোট্ট গ্রামের অসহায় মানুষগুলো

গাড়ীর চাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলো।
চাকাটি গভীর রাতে একা একা নিঃসঙ্গ জীবনে
বিশাল পৃথিবীর মাটি কাটার যন্ত্রণায় ভুগছিল।
তার কান্না দিকে-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছিল
এবং গ্রামবাসীদের মন বিষাদঘন করে তুলছিল

[প্রথম দিকে ১৯৩৮]

ভিক্ষুক

উত্তরে
হলুদ নদীর তটসীমায়
ভিক্ষুকেরা চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে,
সামনেই রেল স্টেশান
সেই রেল স্টেশানেও তাদের দেখা যাচ্ছে।

উত্তরে
ভিক্ষুকেরা বিশ্রীরকমের চেঁচাচ্ছে
তাদের দুঃখের কথা জানাচ্ছে,
অভিযোগের কথা জানাচ্ছে,
দেখে মনে হচ্ছে তারা কোন সাহারা মরুভূমি
থেকে আসছে। অথবা
কোন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে।

ক্ষুধা এবং অনশন খুবই ভয়াবহ জিনিষ
দয়া মায়া তারা ভুলে গেছে,
এটা এখন তাদের কাছে একটা পুরোনো জিনিষ,
তারা এখন যুবকদের ঘৃণা করতে শেখাচ্ছে।

উত্তরে
ভিক্ষুকেরা নিঃসম্বল অসহায় অবস্থায় এসে জমা হয়েছে
তাদের দৃষ্টি এখন দূর নক্ষত্রের দিকে
তাদের চোখ দুটো এমন ক্ষুধায় জ্বলছে যে

যেকোন মানুষের দিকে তাকালে
সে মানুষটা থমকে দাঁড়িয়ে যাবে,
হয়তো কঠিন পাথরেও পরিণত হয়ে যেতে পারে
কোন মানুষ যদি ওখানে দাঁড়িয়ে কোন খাদ্য খায়
অথবা আঙুল দিয়ে কিছু তুলে গ্রহণ করবার চেষ্টা করে
তবে হাজার মানুষ সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

উত্তরে
ভিক্ষুকেরা তাদের নগ্ন হাত বাড়িয়েই আছে
তারা কালো হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভিক্ষা করছে।
পয়সা চাইছে।
যেকোন মানুষের কাছে,
কোন বাধ-বিচার নেই
এমন কি সৈনিকদের কাছেও
যাদের কাছে কোন টাকা নেই
ব্যাঙ্কে কোন অর্থ নেই।

রাস্তা

এক সময় আমি এই রাস্তার বাসিন্দা ছিলাম
যুদ্ধের দামামা বেজে উঠতেই
এই রাস্তার সমস্ত বাসিন্দাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
যাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে
তাঁদের মধ্যে ছিলেন : অন্তঃসত্তা নারী, অসুস্থ মানুষ,
হাঁপানী রোগী, বৃদ্ধা মহিলা এবং উঠতি বয়সের ছেলেরা
এঁদের সবাইকে ট্রাকে করে একটি ছোট শহরে
এনে জমা করা হল,
দেখলে মনে হবে এটা একটা পাগলা গারদ,
এরা সব পাগল
আশ পাশের রাস্তা দেখতে দেখতে
উদ্বাস্তু, আহত সৈনিক এবং স্কুলের ছেলের দলে
রাস্তা ভরে গেল।

চারিদিকে চিৎকার, আর্তনাদ আর গোলমালে
কানপাতা দায়।

যে রাস্তা থেকে এদের তুলে আনা হয়েছে
সে রাস্তা এখন ঝক্‌ঝকে,
পরিবর্তনের পোষাক পরে দাঁড়িয়ে,
যুদ্ধ একে রঙ্গীন পোষাক পরিয়েছে :
রাস্তার হু'পাশে নানা রকমের দোকান জাঁকিয়ে বসেছে,
ফলের দোকান রেস্তোরাঁয় পরিণত হয়েছে,
মশলাপাতির দোকান হয়েছে হোটেল,
আমার বাড়ীর বিপরীত দিকের বাড়ীটা এখন
অস্থায়ী হাসপাতাল ॥

কিন্তু একদিন এই রাস্তায় এবং
পাশের শহরের আকাশেও মেঘ জমা হল।
শত্রুপক্ষ প্রচণ্ড বোমা ফেলে এ শহর ধ্বংস করে দিল ;
শহরের প্রায় অর্দ্ধেকটা শেষই হয়ে গেল।

বাড়ীর ছাদ ভেঙ্গে পড়েছে
দেওয়াল ধ্বসে গেছে
পাতকুয়োগুলো আবর্জনায় ভরে গেছে
চারিদিকে ফসিল এবং অঙ্গারের স্তূপ।

এই ধ্বংসের মধ্যে মানুষ আর নেই
তারা সব পালিয়েছে।
(আবার নতুন ঠিকানা ঠিক করে নিয়েছে)
কিন্তু একজনের সঙ্গে আমার
ঐ রাস্তায় দেখা হল।
যে আগে আমারই মত এই রাস্তার বাসিন্দা ছিল।

সে হেঁটে আমার পাশে এসে দাঁড়াল
মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে
আমাকে অভিবাদন জানালো।

তার চুল ছোট করে ছাঁটা

পায়ে মোজা এবং বুট

সে এখন সবুজ সৈনিকের পোষাক পরে

আমার পাশে দাঁড়িয়ে।

আমাকে অভিবাদনে রত [বসন্তকাল ১৯৩৯]

শীতের ডোবা

শীতের ডোবা

একাকী পড়ে আছে,

যেন একটি নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ মানুষের হৃদয়—

যে হৃদয় এই পৃথিবীর সমস্ত তিক্ততার কথা জানে,

শীতের ডোবা

শুকিয়ে পড়ে আছে

যেন বৃদ্ধ কোন মানুষের শুকনো চোখের মত—

যে চোখের ঔজ্জ্বল্য দীর্ঘদিনের দৃষ্টিদানের

ফলে আজ ম্রিয়মান।

দীর্ঘব্যবহারে জ্যোতিহীন।

শীতের ডোবা

বৃদ্ধ মানুষের চুলের মত অবহেলিত

যে চুলের রং ছাই,

শীতকালীন ঘাসের মত।

শীতের ডোবা

অভিযুক্ত বৃদ্ধ মানুষের মতই বিষণ্ণ।

যে বৃদ্ধ মানুষটা আজ মেঘ জমা

আকাশের নীচে ন্যুব্জ অবস্থায় দাঁড়িয়ে।

[জানুয়ারী ১১, ১৯৪০]

গাছ

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে,
দু'জনেই একা, এবং খাড়া
বাতাস এবং ঝড়
ওদের কানে কানে ওদের দূরত্বের কথা জানাচ্ছে।

কিন্তু
মাটির নীচে ওদের যে শিকড় আছে।
তা' অদৃশ্যমান। দৃষ্টির বাইরে।
ওদের শিকড় পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে। [বসন্তকাল ১৯৪০

ওদের ভেতরে আনতে দিন

দয়া করে পথ করে দিন
পাশে সরে দাঁড়ান
ওদের ভেতরে আনতে দিন
দয়া করে ধাক্কাধাক্কি করবেন না
রাস্তার একপাশে গিয়ে দাঁড়ান
ওদের ভেতরে আনতে দিন
দয়া করে চিৎকার করবেন না
দয়া করে চুপ করে দাঁড়িয়ে
ওদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন
ওদের ভেতরে আনতে দিন

ইনি একজন মহিলা
এ'নার মাথার খুলি গোলা থেকে বেরিয়ে আসা
গুলিতে উড়ে গেছে,
এ'নার চোখ দুটি শান্তিতে বুজতে দিন
গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হতে দিন।
তাতে হয়তো ইনি কোন দিনও সুস্থ হয়ে

উঠে দাঁড়াতে পারেন
আসুন আমরা এঁকে বাড়ীতে পৌঁছে দি
যাতে এঁনার পরিবারবর্গ
তিক্ততায় এবং চোখের জলে
এই মহিলার দায়িত্ব নিতে পারেন।
ইনি একজন কর্মরত ব্যক্তি
এঁনার পরনে খাঁকি পোষাক
হাতে সৈনিকের চিহ্ন
আপনারা কি জানেন, ইনি কে?
এঁনার মুখমণ্ডল ধূলায় ঢাকা
গোলা থেকে বেরিয়ে আসা গুলী
এঁনার হাত ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে
দয়া করে পথ করে দিন, দয়া করে কিছু
সম্মান প্রদর্শন করুন,
আপনাদের বাঁচাতে গিয়ে,
আপনাদের ক্ষতি বাঁচাতে গিয়ে
ইনি আহত হয়েছেন।

দয়া করে গোলমাল বা ধাক্কাধাক্কি করবেন না
পেছনে আরও অনেকে আছেন, তাদের আনা হচ্ছে
হসপিটালে আহত সৈনিকদের সেবা করতে করতে
এঁরা আহত হয়েছেন
যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের হসপিটালে রাখা হয়েছিল
তাদের সেবা যত্ন করা হচ্ছিল
যাতে তারা আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যেতে পারে
কিন্তু নিষ্ঠুর শত্রুরা হসপিটালেও বোমা ফেলেছে
সুতরাং সেবারত সৈনিক এবং আহত ব্যক্তিরা
আজ সবাই আহত। একত্রিত।

দয়া করে পথ করে দিন
ওদের ভেতরে আনতে দিন

দয়া করে একপাশে সরে দাঁড়ান
আমাদের স্ট্রেচার নিয়ে ভেতরে আসতে দিন
দয়া করে মনে রাখবেন
এ সমস্ত ঋণ রক্ত দিয়ে কেনা··· [জুন ১১, ১৯৪০]

ছেলেটি শস্য কাটছে

সন্ধ্যায় ডুবন্ত সূর্য সামনের জমিটায়
লাল রং ছড়িয়ে দিয়েছে।
শস্য কাটা বালকটি নিরবে মুখ বুজে বসে
ঘাস কাটছে।
মাথা ঝুঁকে পড়েছে, শরীরটা নুয়ে গেছে
তবুও সমানে হাত চালিয়ে যাচ্ছে।
এক পাশ শেষ করে অপর পাশে সরে যাচ্ছে।

ঘাস সম্পূর্ণভাবে ছেলেটিকে ঢেকে দিয়েছে
আমরা শুধু স্তূপাকার ঘাসই দেখতে পাচ্ছি
আর দেখতে পাচ্ছি একটি বাঁশের ঝুড়ি
এবং ঘাসের উঁচু উঁচু ঢিপি
পড়ন্ত সূর্যের সোনালী আলোয়
কাস্তেটা চক্‌চক্‌ করছে। [১৯৪০]

বৃদ্ধ মানুষটি

দীর্ঘ পরীখার দু'পাশে লাউগাছের জাফরী
একটি কুব্জ লোক মাটি কেটে কেটে পরিখা বাড়িয়ে চলেছে
তার ইচ্ছা ওখানে নতুন বীজ বপন করে

এই ভাবে সে সারাদিন ক্লান্ত পায়ে কাজ করে যাচ্ছে
তার কুব্জ দেহ ধীরে ধীরে আরও কুব্জ হয়ে
মাথাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে।
সে মাটি তুলে পরিখা তৈরী করছে
পরে মাটি সরিয়ে জমি পরিষ্কার করছে

আগাছা এবং পাথরগুলো দু'পাশে ফেলে দিচ্ছে

বর্তমানে তার পোষাকের রং কাল মাটির মত
গায়ের চামড়া পিঙ্গল বর্ণ মাটির মত
অথবা বলা যায় ফ্যাকাশে গিরিমাটির মত
সূর্য মধ্য গগণে, সরাসরি তার মুখে এসে পড়ে
গাছের বল্কলের মত তার মুখে নানা প্রকার
খাঁজ তৈরী করছে। মুখটা অমসৃণ করে তুলছে।

সারাদিন সে জোর কদমে কোদাল চালিয়ে যাচ্ছে
চোখের ভ্রূ গড়িয়ে ঘামের স্রোত
চোয়ালে নেমে আসছে,
ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া লোকটার গায়ে লাগতে
লোকটা বার কয়েক কেশে উঠলো
ঠিক সেই মুহূর্তে এক ফালি উজ্জ্বল রোদ
তার বিষণ্ণ মুখে এসে পড়লো। [আগস্ট ১৭, ১৯৪০]

সূর্য বলছে

জানালাগুলো খুলে দাও
দরজাগুলো খুলে দাও
আমাকে আসতে দাও
আমাকে আসতে দাও
তোমার ছোট্ট ঘরে ঢুকতে দাও

আমি তোমার জন্যে নানা রঙের ফুল এনেছি
বনের গন্ধ আমি তোমাকে উপহার দেব
আমি তোমার জন্যে উষ্ণতা এবং উজ্জ্বলতা এনেছি
তোমার সারা শরীরে মাখবার জন্যে আমি শিশির এনেছি
তাড়াতাড়ি কর, ওঠো, ওঠো,
বালিশ থেকে মাথা তোলো
চোখের পাতা তুলে চোখ মেলে তাকাও

তোমার চোখ দুটো আমার আগমনের সাক্ষী হোক

কাঠের বাক্সের মত তুমি তোমার হৃদয় খুলে দাও
হৃদয়ের জানালাগুলো এবারে খুলে দাও
ওগুলো অনেকদিন বন্ধ আছে
তোমার হৃদয়ে কতখানি জায়গা আছে আমি দেখি
কারণ আমার সঙ্গে ফুল আছে, ফুলের গন্ধ আছে
আলো আছে, উষ্ণতা আছে এবং শিশির আছে।

[জানুয়ারী ১৪, ১৯৪২]

প্রবাল প্রাচীর

ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে
প্রবাল-প্রাচীরে নির্দয় ভাবে আঘাত করছে।
প্রতিটি ঢেউ তার পায়ে এসে আঘাত করে
পুঞ্জপুঞ্জ ফেনার সৃষ্টি করে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ঢেউয়ের আঘাতে প্রবাল প্রাচীরের
দেহ এবং মুখমণ্ডল যেন
বার বার ছুরি দিয়ে কাটছে।
কিন্তু প্রবাল-প্রাচীরটি ঐ একই ভাবে
দাঁড়িয়ে আছে।
মুখে তার মৃদু হাসি
আর চোখ দুটি সমুদ্রের দিকে। [জুলাই ২৫, ১৯৫৪]

পৃথিবীর এ পাশে

পৃথিবীর এ পাশে মানুষেরা
আমাদের নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে আছে।

এমন নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে আছে
যে আমরা নিঃশ্বাস নিতে পারি না
আমাদের মুখমণ্ডল ব্যাগ্র ভাবে
চুম্বনে ভরিয়ে দিচ্ছে।

তার অর্থ এই নয় যে আমরা এখনও যুবক আছি
অথবা দেখতে সুন্দর

কারণ একটাই, সেটা হচ্ছে
আমরা একই দেশ থেকে আসছি
একই দেশের মানুষ
যে দেশের জন্ম রক্তাক্ত বিপ্লবে

আমরা নতুন জায়গায় এসে পুরোনো বন্ধুকে পাইনি
কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেরই আগে
অনেকের সঙ্গে দেখা হয়নি।
কিন্তু আমাদের দেশপ্রেম
আমাদের পরস্পর পরস্পরকে কাছে টেনেছে
প্রেমের বাঁধনে বেঁধেছে,
যেন আমরা দীর্ঘ দিন আলাদা ছিলাম।

চীনারা প্রতিটি দেশেই অভিনন্দিত
কারণ তাদের সাহস এবং অধ্যবসায়
সকলেরই জানা,
আমরা একই পতাকাতলে ছয় শত কোটি মানুষ
পায়ে পা ফেলে মার্চ করেছি,
এবং সেই পতাকায় একটি নতুন শব্দ খোদিত হয়েছে,
সেই শব্দটি : শান্তি ! [জুলাই ১৯৫৪]

শুকতারা ভোরের তারা

এখন তোমার সময়
এই মুহূর্তটি তোমার
সময় এখন আঁধার পেরিয়ে আলোর মুখে
কাল রাত্রিটা মুখ লুকিয়ে পালাচ্ছে
উজ্জ্বল দিনের আলোয় পৃথিবীটা জাগছে

আকাশের তারার দল অনেক আগেই অবসর নিয়েছে

কিন্তু তুমি এখনও দাঁড়িয়ে
সূর্য ওঠার অপেক্ষায়

ভোরের প্রথম আলোর রেখা জ্বালো
সঞ্চিত আলোর আধার থেকে একটি রেখা তুলে নাও
অত্যন্ত গোপনে
কেউ যাতে তোমাকে দেখতে না পায়। [আগস্ট, ১৯৫৬

বসন্ত ঋতু

১

তোমার গান পর্বত শিখরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে
সেই প্রতিধ্বনি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে
কাছে, দূরে-অদূরে
কান পেতে শোনো
ঋতুরাজ বসন্তের গানের চেয়েও
পর্বত শিখরের প্রতিধ্বনি আরও পরিষ্কার।

২

এখানে পর্বত অনেক উঁচু
এখানে জলের গভীরতা অনেক
তুমি এখানে জল পান করে
অনায়াসেই গানের গলা ভিজিয়ে নিতে পার

সাধারণ মানুষ এখানে আসে না
সামনের এই পর্বত শিখরে ওঠবার ধৈর্য
মানুষের নেই

এই পর্বত শিখরে কেবলমাত্র
দু'ধরণের পাখী খেলা করে
রুদ্রদিন মঙ্গোলিয়ান ভরত পাখী
এবং
নরম সন্ধ্যা—মাতোয়ারা বুলবুল। [আগস্ট ১৯৫৬

মালভূমি

এখানে দিন এত গরম কেন ?

কারণ সূর্যের কাছাকাছি

এখানে সন্ধ্যা এত ঠাণ্ডা কেন ?

কারণ, চাঁদের কাছাকাছি

সূর্যের কাছাকাছি বলে গরম কেন ?
চাঁদের কাছাকাছি বলে ঠাণ্ডা কেন ?
কারণ সূর্য আগুন
চন্দ্র বরফ। [১৯১৬]

উলানোভা স্মরণে

[স্যারে নাড়ে'-ব্যালে দেখার পর]

মেঘের মত নরম এবং ধীর
বাতাসের মত হালকা
চন্দ্রের চেয়েও উজ্জ্বল
গভীর রাতের চেয়েও প্রশান্ত
একটা আকৃতি, একটা অবয়ব
বাতাসে ভেসে চলে গেল ;
মেয়েটি স্বর্গের পরী নয়
এই পৃথিবীর দেবী
স্বপ্নের চেয়েও সুন্দর
একটি পলক মাত্র
দৃশ্যমান বস্তুর মুহূর্তকাল অপেক্ষা
দৃষ্টির মুহূর্তের একটি উজ্জ্বল স্ফটিক।

আসা

স্বপ্নের বন্ধু
মায়া বিভ্রমের ভগ্নী

বাস্তবে তোমার ছায়া . .
সব সময়েই তোমার সামনে দাঁড়িয়ে

আলোর মত আকার বিহীন
ঝড়ের মত অস্থির

তুমি এবং সেই মেয়েটি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
মেয়েটি সব সময়ই তার দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে

তোমার জানালার বাইরে উড়ন্ত পাখী
আকাশে উড়ন্ত মেঘ

নদীর পাশে রামধনু রং মাখা প্রজাপতি
মেয়েটি চতুর এবং সুন্দরী

তুমি উঠে দাঁড়ালে, সে পালালো
তুমি উপেক্ষা করলে
সে তোমার মনযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করবে

মেয়েটি সব সময়ই তোমার সঙ্গে আছে
তোমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত।

প্রাচীর

এই প্রাচীর অনেকটা ছুরির মত
একটা শহরকে দ্বিখণ্ডিত করেছে
একদিক পূর্বে
অন্যদিক পশ্চমে

এই প্রাচীরটা কত লম্বা ?
কত চওড়া ?
কত উচ্চতা ?
এটা যদি আরও লম্বা, আরও চওড়া
এবং আরও উচ্চ হয়

তাহলেও এটা চীনের প্রাচীরের সমান
হতে পারবে না।
এটা একটা ইতিহাসের নিদর্শন
জাতির আঘাতের স্মরণিকা
এই প্রাচীর কেউ পছন্দ করে না।

তিন মিটার উঁচু কিছুই নয়
পঞ্চাশ সেন্টিমিটার চওড়া কিছুই নয়
পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার লম্বা কিছুই নয়।
এটা যদি হাজার গুণ উঁচু হয়
হাজার গুণ চওড়া হয়
হাজার গুণ লম্বা হয়
তাহলেও সে
মেঘ, বাতাস, বৃষ্টি এবং স্বর্গের আলো
আটকাতে পারে না।

সে কি করে জলের গতি এবং বাতাসকে আটকাবে?

বা কি করে শত দোষী মানুষকে আটকাবে?
যাদের ভাবনা চেতনা বাতাসের চেয়েও মুক্ত?
যাদের শুভ ইচ্ছা এবং শপথ অনেক গভীরে
এবং সময় সীমার বাইরে?

নীরবতা পেরিয়ে □ রবার্ট. সি. ফ্রেণ্ড

[সমকালীন চীন কবি আই ছিং সম্পর্কে আলোচনা]

চীনাশহর 'হুহান'। ১৯৩৭ সালের কোন একটি শীতকালীন ঘটনা। নিজের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে কবি 'আই-ছিং।' নিজের মাতৃভূমির প্রতি জ্বলন্ত তাঁর ভালবাসা। আত্মত্যাগে প্রবুদ্ধ। রাগে জ্বলচে তাঁর দু'চোখ। জ্বলন্ত দেশপ্রেম বুকে নিয়ে তিনি জানালায় দাঁড়িয়ে। মাতৃভূমির দূর দিকচক্রবালে দৃষ্টি নিবদ্ধ। সেখানে পাহাড়ের গায়ে বরফের গভীর আস্তরণ। আদিগন্ত বিস্তৃত বনভূমি বরফে মোড়া। কিছুক্ষণ আগে জাপানী সৈন্যেরা

আই-ছিং

চীনাভূমি আক্রমণ করে লুট করে নিয়ে গেছে। তছনছ করে দিয়েছে। অতর্কিত আক্রমণে চীনা সৈন্যেরা বিপর্যস্ত। মাতৃভূমির এ অংশ বোধহয় হাত ছাড়া হয়ে গেল। কবি আই-ছিং তাঁর জলন্ত চোখ দুটি দূর দিক্‌চক্রবাল থেকে সরিয়ে এনে নিজের লেখার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

তিনি লিখলেন: 'প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর বরফে চীনাভূমি আদিগন্ত আচ্ছাদিত। হীমশীতল ঠাণ্ডা এলোমেলো বাতাস অনেকটা উন্মত্তা বৃদ্ধা মহিলার মত অট্টহাস্যে এগিয়ে আসছে। চীনাবাসীদের আচ্ছাদিত করে ফেলছে। সৈন্যেরা জমে যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে একজন বিরাট আকারের প্রবীনা মহিলা তার নিজের শরীরটা একটা লম্বা সাদা কাপড়ে ঢেকে চীনা ভূমিতে ছুটে আসছে। দু'হাতে তার বড়বড়ে নখদন্ত। সেই নখদন্ত দিয়ে চীনাভূমির গলা টিপে ধরতে চাইছে। সমস্ত মানুষের পোষাক আঁকড়ে ধরেছে। টেনে ছিঁড়ে খুলে দেবার চেষ্টা করছে। মুখর বাতাস প্রতিনিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এ প্রচেষ্টার যেন কোন বিরাম নেই।' (বরফে আচ্ছাদিত চীনাভূমি)

কবি আই-ছিং দীর্ঘ কুড়িবছর দক্ষিণ পন্থী হিসাবে কাজ করবার পর চীনা প্রজাতন্ত্রে স্বীকৃতি পেলেন। তাঁর লেখা কবিতা 'বরফ আচ্ছাদিত চীনাভূমি' পাঠ করে দেশীয় কিছু কিছু সমালোচক মন্তব্য করলেন: 'এ কবি দুঃখবাদী কবি। বিষণ্ণতার কবি। জগতে অন্ধকার দিকটাই তাঁর নজরে পড়েছে।' এই সব সমালোচকেরা এ কবির কবিতার ইচ্ছাকৃত ভাবেই বিকৃত অর্থ দাঁড় করালেন। কবিতার যে অংশে কবি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন, এই সব সমালোচকেরা ইচ্ছাকৃত ভাবেই তা উপেক্ষা করে গেলেন। আই-ছিং-এর আসল বক্তব্য ছিল:

'চীনা ভূমিতে অপর্যাপ্ত তুষার পড়ছে,
তুষারে আচ্ছদিত এ শহর,
নিশ্চুপ আঁধারে ডুবে আছে এ চীনাভূমি,
নিস্তব্ধ নিথর যেন পাথর।
হে আমার মাতৃভূমি
আমার কবিতার এই পঙ্‌ক্তি কটি
এই বরফ জমা ঠাণ্ডার রাজ্যে কি

একটুও উষ্ণতা এনে দিতে পারে না ?
চীনা সৈন্যদের একটু মানসিক উত্তেজনা
একটু উদ্দীপনা ? একটু সাহস ? আর দেশপ্রেম ?"

এই সমালোচনার পর মরমী কবি মনে মনে দুঃখ পেলেন। ব্যথা পেলেন। এ আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে তিনি সমাজ-জীবন থেকে সরে দাঁড়ালেন। কেউ আর তাঁর খোঁজ পেলেন না। তিনি নিখোঁজ হলেন। সেই সঙ্গে তাঁর কবিতাও অদৃশ্য হল। তিনি লেখা বন্ধ রাখলেন। তাঁর এই নিস্তব্ধতা তাঁকে দীর্ঘ দিন ঘিরে রইলো। তিনি আর আত্মপ্রকাশ করলেন না। করতে চাইলেন না। ফলে বিদেশী লেখকরা যাঁরা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন তাঁরা ভাবলেন এ কবি আজ মৃত। জগৎ থেকে অপসৃত। লেখনী স্তব্ধ। অন্য অর্থে চীনের ভাগ্যাকাশে আবার নতুন করে বরফ জমা হতে শুরু করেছিল। নতুন একটা শক্তি আর চিন্তা-ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটছিল। এই শক্তি গোপনে যুবসম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ধীরে ধীরে গণতন্ত্রের শ্বাসরোধ করবার চেষ্টা করছিল। এরা এদের চিন্তা-ভাবনা সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মীদের মধ্যেও ছড়াবার চেষ্টা চালাচ্ছিল। এবং ব্যাপক গণআন্দোলনের ও ধ্বংসের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার চেষ্টা করছিল যে জনসাধারণকে আই-ছিং দীর্ঘজীবন সেবা করে এসেছে। এইভাবে এই আন্দোলন নানা উত্থান-পতন এবং ঝড়-ঝঞ্ঝার মাধ্যমে ১৯৭৬ সালের দরজায় এসে দাঁড়ালো। এবং সর্বশেষে এঁদের নেতৃস্থানীয় 'Gang of four'-কে বন্দী করবার ফলে এই দূষিত ও গলিত আবহাওয়া কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হল। আই-ছিং এইসব গোলমালে জড়িয়ে পড়ে আগেই বন্দী-জীবন যাপন করছিলেন। সালের শেষের দিকে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় আইনত দোষমুক্ত হয়ে ছাড়া পেলেন।

দীর্ঘ দুই দশক কাল নীরবতার পর আই-ছিং ছাড়া পেয়ে শুধু একটি কথাই বললেন : 'হেলংজিয়াং প্রদেশে আমাকে দেড় বছর কাটাতে হয়েছিল। সেখানে ১৯৫৮ সালের বসন্তের শুরু থেকে আমি দৃঢ় বিশ্বাসে আমার নিজের কাজ শুরু করি। তারপর ১৯৫৯ সালের শীতের শুরুতেই আমাকে 'এক্সজিয়াং'-এ বদলি করা হয়। সেখানে আমি দীর্ঘ ১৬ বছর কাটিয়েছি। এই ১৬ বছরই আমি নীরবে এবং দৃঢ় বিশ্বাসে আমার নিজের কাজ করে গেছি।"

এই দীর্ঘ জীবনে তিনি যা লিখেছেন তা প্রকাশিত হয়নি। তবুও তিনি

নিরাশ না হয়ে ক্রমান্বয়ে কবিতা লিখে গেলেন। পূর্বে যে প্রদেশে তিনি ছিলেন, সেখানে দুটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছিলেন যার সারমর্ম ছিল মাতৃভূমির রূপান্তর। তিনি রূপান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এবং নিজের মাতৃভূমির রূপান্তর তিনি চেয়েছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, এই দুটি দীর্ঘ কবিতা কোন ভাবে হারিয়ে যায়। আর পাওয়া যায় নি। পরবর্তী কালের বন্দী জীবনে তিনি একটি বৃহৎ উপন্যাস শেষ করেন। নামঃ "The Desert in Retreat."

আই-ছিং তাঁর সারা জীবন কবিতা সাধানায় একটি বক্তব্যই ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। একটি কথাই বার বার বলতে চেয়েছেন যে তাঁর মাতৃভূমির এবং তথাকথিত সমস্ত পৃথিবীর নিপীড়িত, শোষিত ও বঞ্চিত মানবসন্তানদের একটু মানবতা দেখানো হোক। তাদের বুকে একটু বল ভরসা জাগিয়ে তোলা হোক। তাদের ইচ্ছা এই মাতৃভূমিতে রূপান্তরিত হোক। তারাও মনে মনে অনুভব করুক যে এটা তাদেরও মাতৃভূমি। তাদের সংঘত দাবীও এই দেশ গড়ে তোলার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, একদিন এই সব নিপীড়িত ও শোষিত মানব সমাজই একটা নতুন ও উজ্জল মাতৃভূমি গড়ে তোলার জন্যে গণ-বিপ্লব শুরু করেছিল। একটা নতুন পৃথিবী তৈরী করবার ব্যাপারে জনগণের বিক্ষিপ্ত আন্দোলনকে সংহত করেছিল। তারা চেয়েছিল একটা নতুন পৃথিবীর নীল আকাশের নীচে বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে তারা বেঁচে থাকবে। নতুন ফসলের গানে স্বদেশে সোনা ফলবে। আই ছিং-এর সমালোচকেরা তাঁকে যতই দুঃখবাদের কবি বলুক না কেন, আসলে তিনি কোন দিনও দুঃখবাদের কবি ছিলেন না। তিনি তাঁর কোন কবিতাতেই দুঃখবাদ, অসংলগ্ন অথবা বিকৃত চিন্তা-ভাবনা রূপায়িত করেন নি। তিনি আজীবন আশাবাদী ও গণ আন্দোলনের কবি। তাঁর বিপুল কর্মজীবনে তিনি কখনও দুঃখ বা হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন নি অথবা ঐ ধরনের কোন চিন্তাকে মনে ঠাই দেন নি। এমনকি তিনি তাঁর 'রণভেরী—১৯৩৭'-কবিতায় তার বিপরীত বক্তব্যই পেশ করেছেন। 'রণভেরী ১৯৩৭'-কবিতার নায়ক একটি কিশোর মাত্র। তার বয়স খুবই কম। যুদ্ধক্ষেত্রে চারিদিকে কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া আর আগুনের ঝলকানির ব্যুহতে সে আটকা পড়েছে। সেখানে কবি লিখছেন ঃ

'যুদ্ধের দামামা আর আগুনের ঝলকানির মধ্যেও
ঐ কিশোরটিকে কেউ পড়ে যেতে দেখেনি।

সে তার মাতৃভূমি থেকে শুরু করে
প্রতিটি ধূলিকণাকে ভালবেসেছিল।
শত বিপদের মধ্যেও তার হাত দুটো
যুদ্ধের বিজয় ঘোষণা করে চলেছে।
রণভেরী বাজিয়ে চলেছে।

* * * * * *

শোনো! শোনো!
ঐ কিশোরের হাতে রণভেরী এখনও বাজছে।
এখনও সে বিজয় ঘোষণা করে চলেছে।'

এরপর নদীতে অনেক জল বয়ে গেছে। চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সময় তার পা ফেলে ফেলে ১৯৭৮ সালের দরজায় এসে পা দিয়েছে। এই সময় চীনের নবা শিক্ষিত জনগণ আধুনিকতার সমস্যা সম্পর্কে আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে। এ সমস্যার প্রতি তারা আবার নতুন করে গভীর ভাবে মনোনিবেশ করবার প্রয়োজন অনুভব করেছে। অথচ কবি আই-ছি তাঁর কবিতায় এই আধুনিকতার সমস্যার প্রতি অনেক আগেই জনগনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তাঁর 'লাল নিশান' কবিতায় রণভেরীর বিজয় ঘোষণা যে রক্তের পথেই আসে সে কথা স্মরণ করে লিখেছিলেন :

'আগুনের রং লাল,
রক্তের রং লাল,
'সাবান ডেনডান' ফুলের রংও লাল,
'এ্যাজেনিয়া' ফুলের রংও লাল,
ফুটন্ত ডালিম ফুলের রংও লাল,
প্রভাতের সূর্যের রংও লাল,
আর সব শেষে রণভেরী বাজিয়ে
যুদ্ধের বিজয় ঘোষণা করে যে পতাকা,
যে পতাকা বিজয় গর্বে দূর আকাশে
বাতাসে আন্দোলিত হয়
তার রংও লাল।'

আই-ছিং ১৯১০ সালে 'জীনহুয়া' শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জমিদার পরিবার ভূক্ত একজন পুরুষ। তাঁর পিতা-মাতা 'জেজিয়াং' প্রদেশের

অন্তর্গত 'জীনহুয়া' শহরে বাস করতেন। তাঁর জন্মলগ্নে একজন জ্যোতিষী ভবিষ্যত-বাণী করেছিলেন যে এই শিশু তাঁর পরিবারবর্গের ক্ষতি করবে। বিশেষ ভাবে তাঁর মাতাপিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এর ফলে আই-ছিং-এর জন্মলগ্নেই তাঁর ভাগ্যের বিপর্যয় ঘটলো। তাঁকে পাঠানো হল এক কিষাণ পরিবারে।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে তিনি সেখানেই বাস করবেন এবং লালিত-পালিত হবেন। এই কিষাণ পরিবারটি অত্যন্ত দরিদ্র এবং দুঃখী ছিল। পরিবারটির গৃহকর্ত্রীকে প্রতিবেশীরা সেই গ্রামের নামেই ডাকতো। সেই গ্রামের নাম ছিল 'ডেয়াহি।' অতএব সেই মহিলার নামও হয়ে গিয়েছিল 'ডেয়াহি'। গোটা গ্রামের লোকেরাই তাঁকে 'ডেয়াহি' বলে ডাকতো। এই পরিবারে পাঁচ বছর অতিক্রান্ত আই-ছিংকে আবার বাড়ীতে ফিরিয়ে আনা হল। কিন্তু তাঁর পিতা-মাতা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষতি এড়াবার জন্যে আই-ছিং-কে 'বাবা-মা' বলে ডাকবার অনুমতি দিলেন না। ফলে আই-ছিং তাঁর পিতা-মাতাকে 'কাকা ও কাকীমা' বলে সম্বোধন করতেন। একজন জ্যোতিষীর ভবিষ্যত-বাণী তাঁর জীবনে এই ভাবে এক অভিশাপের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল। সেই কারণে তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জ্যোতিষী, ভবিষ্যতবক্তা ও সামন্ততন্ত্রের কুসংস্কারকে এড়িয়ে চলেছেন এবং ঘৃণা করেছেন। পরবর্তী জীবনে তিনি তাঁর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন: আমি অত্যন্ত ঘৃণা অবজ্ঞার মধ্যে মানুষ হয়েছি। আমার প্রতি নজর দেবার কেউ ছিল না।'

তার বাছাই করা কবিতার যে সঙ্কলনটি শীঘ্রই প্রকাশিত হল (People's literature publishing house, Beijing; 1979) তার ভূমিকায় তিনি তাঁর শৈশব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন: আমার শৈশবকাল ও আমার পারিবারিক সম্পর্কের কথা আমি আমার লেখা 'ডেয়াহি' কবিতায় অঙ্কিত করেছি। 'আমার ধাত্রী'ও 'আমার পিতা' এই পর্যায়ে দুটি কবিতা তিনি লিখেছেন। একটি ১৯৩৩ সালে ও দ্বিতীয়টি ১৯৪১ সালে। এই দুটি কবিতায় তিনি তাঁর ধাত্রী ও পিতাকে স্মরণ করেছেন এবং কবিতায় তাঁদের বিশদভাবে রূপায়িত করেছেন। ধাত্রীর প্রতি তাঁর ভালবাসার নির্যাস অকুণ্ঠ ভাবে ঝরে পড়েছে। ধাত্রীকে তিনি তাঁর স্নেহশীলা মাতারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং পিতাকে তিনি অপর্যাপ্ত ঘৃণা ও অবজ্ঞায় ভরিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেছেন:

'আমার পিতা আমার মনের প্রশান্তি নষ্ট করেছেন এবং আমার জীবনে এক যুগ-ব্যাপী নানা সমস্যার সৃষ্টি করেছেন।' এই বিপরীত ধর্মী দুটি মানুষ তাঁর জীবনে কতখানি গুরুত্ব লাভ করেছিলেন, সেটা তাঁর কবিতা রচনা ও জীবনব্যাপী কর্তব্যের প্রতি আনুগত্য ও স্থির করণের প্রতি নজর দিলেই দেখতে পাওয়া যায়। সেই গভীর কর্তব্যপরায়ণতা ও কবিতার রচনাশৈলীই তাঁকে একদিন কবি 'আই-ছিং'-তে পরিণত করেছিল। যাঁকে আজ আমরা চিনি ও পৃথিবীর সমস্ত লোক চেনে ও জানে। 'ডেয়াহি' কবিতায় যে কল্যাণময়ী মাতার রূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, তিনি তার ধাত্রী ছিলেন। তিনি আই-ছিংকে লালন-পালন ও পরিপুষ্ট করে তুলেছিলেন। তিনি লিখেছেন : আমি একজন জমিদারের পুত্র…' এই পঙতিটি যেখানে এক নিঃশ্বাসে শেষ হচ্ছে, সেখানে তিনি লিখেছেন : 'তবুও আমি তোমার স্তনের দুধ, তোমার স্তনের সুধা শেষ বিন্দু পান করেছি।'

পিতা-মাতার অবজ্ঞা ও ঘৃণাই তাকে বাড়ী থেকে চলে যাবার স্থির সিদ্ধান্তে নিয়ে এসেছিল। তিনি বাড়ী থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে দক্ষিণপন্থী দলে যোগ-দান করে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। যে সংগ্রাম এই আন্দোলন অতিক্রম করে নীরব, নিপীড়িত ও বঞ্চিত চীন-ভূমিকে শেষ বারের মত মুক্তির স্বাদ এনে দিয়েছিল। মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসার এই প্রেরণা তিনি তাঁর পারবারবর্গ থেকে পাননি। তিনি পেয়েছিলেন তাঁর অবহেলিতা, অনাদ্রিতা পালিতা মাতার কাছ থেকে। যিনি তাঁর বুকের শেষ বিন্দু দুধ খাইয়ে আই-ছিং-কে মানুষ করেছিলেন।

পিতার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আই-ছিং বলেছেন 'আমার পিতা শিশুদের মানুষ করবার জন্যে অত্যাচারের পক্ষপাতী ছিলেন। পরিবারের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন উৎপীড়ক ও স্বেচ্ছাচারী শাসক।' এর ফলে আই-ছিং-কে পিতার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিরোধীতায় নামতে হয়েছিল। এবং তাঁর পিতার ধারনা ছিল যে শিশুদের স্কুলে যাওয়া ও পুস্তক পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ এই স্কুল বা কলেজীয় শিক্ষা একটি ছাত্রের মন ও জীবনকে পরিচ্ছন্ন করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। পারিবারিক সম্পত্তি রক্ষায় মনকে নিয়োজিত করে। যে যুবকের মন মাতৃভূমির স্বাধীনতায় উৎসর্গীকৃত, যে যুবকের মন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে প্রস্তুত, তার মনে এই প্রকার উপদেশ রেখাপাত না করাই স্বাভাবিক। (তিনি তাঁর পিতার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন :

আমার পিতা বিপ্লবে অবিশ্বাসী। অনড়। স্থির।
সভ্যতার আলোকে বা আধুনিকরণে অনীহা।
তিনি মনে করতেন এই সমস্ত জিনিষ একটা সাময়িক উত্তেজনা।
অতএব এই বেগবান প্রবাহকে তিনি কঠোর হস্তে দমনে আগ্রহী।
তিনি এই প্রবাহ থেকে নিজেকে অত্যন্ত সযত্নে দূরে রাখতেন।
কিন্তু এই প্রবাহকে লক্ষ্য রাখতে ভুলতেন না।
মানুষ হিসাবে তিনি নিতান্ত সাধারণ,
নিজের মনের নীচতা ও কাপুরুষতার গুণে
তিনি তাঁর প্রাত্যহিক কর্তব্যকর্ম কঠোর ভাবে পালন করে যেতেন।
তিনি একজন শিষ্টাচারী, অতি লোভী ও রক্ষণশীল মানুষ,
পরিবর্তনের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক বিরোধিতা
তাঁকে মধ্যপন্থীরূপে প্রতিভাত করেছিল।

চীনে এক যুগ ধরে যে জাতীয় আন্দোলন চলেছিল,
তাতে তিনি ছিলেন পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি লাভে সচেষ্ট।
যে ভূমিকায় তৎকালীন আরও বহু ভূস্বামীকে দেখা গিয়েছিল।
তিনি তাঁর গ্রাম্যজীবন, পরিবেশ ও ব্যবস্থাকেই
নিজের অপরিবর্তনীয় স্বর্গরাজ্য বলে মনে করতেন।
তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু সম্পত্তির মালিক ছিলেন,
এবং তাঁর ইচ্ছা ছিল উত্তর পুরুকে সে সম্পত্তি সঞ্চারিত করা।
তাঁর জীবনব্যাপী কর্মে বৃহৎ কোন ভূমিকা নেই,
নেই কোন প্রস্তুতি।
এবং সেই কারণেই আমি তাঁকে করুণা করতাম।
তিনি আমার কাছে ছিলেন একজন নিবীর্য, নির্জীব ব্যক্তি।'।

'গণতন্ত্র' এবং 'বিজ্ঞান' এই দুটি পদ এবং তার প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে যখন তাঁর প্রথম বোধোদয় হল, তখন তিনি প্রথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। দিনটা ছিল ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে। এই দিনটা বিপ্লবের একটি বিশেষ দিন বলে চিহ্নিত। পরবর্তী কালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসে তিনি **'Lu-Xun'**-এর লেখা কিছু রচনা পাঠ করেন এবং একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। নাম : **Each age should have its own literature.'** তিনি যখন গ্রামে বাস করতেন তখনই তিনি

শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে অবিহিত হন। এই সময় টাইপ করা একটি ছোট্ট পুস্তিকা তাঁর হাতে আসে। যার নাম: Iutroduction of Historical Materialism,. এই ছোট্ট পুস্তিকাটিই তাঁকে শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভে সাহায্য করে।

১৯২৮ সালে তিনি Hangzhou-এ 'National West School of Art'-এ ভর্তি হন। সেখানে প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন Lin Fengmian. লীন 'আই-ছিং-এর প্রতিভার স্বীকৃতি জানিয়ে বলেছিলেন: 'তুমি এখানে কিছুই শিখতে পারবে না। তুমি বিদেশে যাও।'

কথা শুনে 'আই-ছিং চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পরে ১৯২৯ সালের কোন এক সন্ধ্যায় তিনি তাঁর পুরোনো পল্লীতে ফিরে গিয়ে পিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করলেন। পিতা অনেক চিন্তার পর ঘরের কোনো একটি জায়গায় মাটি খুঁড়ে হাজার খানেক রৌপ্যমুদ্রা কম্পিত হস্তে তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন: কয়েক বছরের মধ্যেই ফিরে আসবার চেষ্টা কোরো। বিদেশে বিলাসিতার জোয়ারে গা ভাসিয়ে স্বদেশে ফিরে আসবার কথা ভুলে যেও না।'

যথারীতি স্বীকৃতি জানিয়ে আই-ছিং পড়াশোনার পাট শেষ করবার জন্যে ফ্রান্সে গেলেন। সেখানে একটি ছোট কারখানায় কাজ জুটিয়ে নিয়ে নিজের জীবন ও জীবিকার খরচা চালাতে লাগলেন। এখানে তিনি Rimband, Yesemin, Blok এবং Maya kovsky-র কবিতার সঙ্গে গভীর ভাবে পরিচিত হলেন। বিশেষ করে বেলজিয়াম কবি Verhaeren-এর কবিতায় তিনি মুগ্ধ হলেন। তিনি বললেন: কবিতা যেন আমায় পেয়ে বসলো। আমি কবিতাকে পূর্ণাঙ্গভাবে ভালবাসতে শিখলাম।'

১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে আই-ছিং সাংহাই-তে ফিরে এসে বামপন্থী শিল্পী সমন্বয়ে যোগদান করে একটি শিল্পী চক্র গড়ে তোলেন। ঐ একই বছরের জুলাই মাসে Jiang Jie shi (chiang kai-shek)-কে সমালোচনা করবার জন্যে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। Nazim hikmet ও অন্যান্যদের মত তাঁরও তিন বছরের কারাজীবন কবিতায় ভরে ওঠে। এই তিন বছরে তিনি অনেক কবিতা রচনা করেন। এই বন্দী জীবনেই তিনি 'ডেয়াহি — আমার ধাত্রী' এবং আরও অনেক বিখ্যাত কবিতা রচনা করেন। এবং এই সমস্ত কবিতা প্রকাশের জন্যে তিনি ছদ্মনাম 'আই-ছিং' ব্যবহার করবেন বলে মনস্থ করেন। এই সমস্ত কবিতা ১৯৩৬ সালে একটি বিশেষ সঙ্কলন রূপে

আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'আই-ছিং'-এর শিল্পীমন ও জীবন কবিতায় পরিবর্তিত হয়। তিনি কবি Verhaeren-এর কিছু কবিতার অনুবাদ করেন। পরে সেসব অনুবাদ একটি সঙ্কলন রূপে প্রকাশিত হয়। তিনি সে সঙ্কলনের নাম দেন 'The prairie and the city' কারা প্রাচীরের অন্তরালে বাস করবার সময়ে তিনি গরীব ও নির্যাতিত মানুষের কথা চিন্তা করবার বেশী করে সময় পান। এবং সেই সময় থেকেই তাঁর কবিতা জনমুখী হয়ে ওঠে।
১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। আই-ছিং এর এই সময়ের অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে একজন লেখক বলেছেন : 'আহ-ছিং-এর জীবন এক অত্যাশ্চর্য যোদ্ধার জীবন। এই কবি-সৈনিক লক্ষ লক্ষ চীনা দেশ-প্রেমিকের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছেন। কাঁধে কাঁধ রেখে যুদ্ধে মরণপণ করে এগিয়ে এসেছেন।' ১৯৩৭ সালে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হলে তিনি Shangshi-এ চলে যান। সেখান থেকে যান 'Wuhan'. তারপর সেখান থেকে উত্তর 'Shaxi'. সেখান থেকে Shaanxi ও পরে দক্ষিণে। সেখানে তিনি কিছুদিন Guilin -এ 'The South'-এর সম্পাদক রূপে কাটান। 'The South' ছিল তৎকালে 'Guangni Dily'-এর ক্রোড়পত্র। সেখানে 'Hunan'-এ তিনি শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষাকতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। তারপর শিক্ষা শেষ করে ১৯৪০ সালে Chougging-এ ফিরে আসেন এবং তাঁর আপৎকালীন যাত্রা শেষ করে ১৯৪১ সালে Zhon Eulai-এর সহযোগীতায় Yanan'-এ বসবাসের ইচ্ছায় ফিরে আসেন। পরে তিনি 'Yanan' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লিখেছেন : Yanan-এ এসেই আমি প্রথম সূর্যের মুখ দেখতে পেলাম। আমার চোখে আলো পড়লো।' ঐ একই বছরে তিনি 'Shaanxi' Gansu-Ningxia Bordr Anea Congress' সদস্য-ভুক্ত হবার অধিকার পান। ১৯৪২ সালে সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ে 'Yanan'-এ যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয় তিনি সে সভায় যোগদান করেন। ১৯৪৪ সালে ভাস্কর্য চর্চার কর্মীরূপে নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৫ সালে 'Yanan Luxun Academy of Art and Literature-এ শিক্ষাকতার সুযোগ পান। ১৯৪৬-৪৯ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন 'North China Associate College of Literature and Art'-এর সহ-সভাপতি। ১৮৪৯ সালের গোড়ার দিকে তিনি Beijing-এর 'People's Libberation Army'-তে যোগদান করেন। এই সময়ে তিনি 'Congress of Literary and Art works-এও অংশ নেন।

স্বাধীনতার পরে তাঁকে Central Art Academy-কে আবার নতুন করে গড়ে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং ঐ একই সময়ে তিনি 'People's Litarature'-এর সংযুক্ত-সম্পাদক রূপে নির্বাচিত হন।
১৯৫০ সালে তিনি 'পাবলো নেরুদা' ও 'নাজিক হিকমৎ'-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এঁরা এই সময়ে মাদাম সানিয়াৎ সেন-কে শান্তি পুরস্কার দিতে চীনে গিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে তিনি বলেছেন: 'পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটি আমাকে এইসব বিখ্যাত পুরুষদের দেখা শোনার দায়িত্ব দিয়েছিল। এই সময়ে আমরা পরস্পরকে জানবার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছি। আমরা পরস্পর ভালই ছিলাম। হিকমৎ সেই সময়ে 'টারফিস্' কারাগার থেকে ১২ বছর পর সম্ভ মুক্তি লাভ করেছেন। তাঁর অপরাধ ছিল তিনি নির্যাতিত মানুষের কথা জনসমক্ষে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। নিপীড়িত মানুষের বেদনার গান গেয়েছিলেন। পরিশেষে সে আন্দোলন সমস্ত পৃথিবীব্যাপী প্রচারিত হবার সম্ভাবনার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। আই-ছিং-ও এই আন্দোলনে স্বীয় অংশ নিয়েছিলেন। এই তিন কবি শুধু সহকর্মীই ছিলেন না। সহমর্মীও ছিলেন। তাঁদের মানসিক ভাবনার আকাশ ছিল একটি সূত্রে গাঁথা। সে ভাবনা আর কিছুই নয়— 'মানবতা বোধ।' লক্ষ লক্ষ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তাঁরা বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছিলেন, মানবতা বোধে সোচ্চার হয়েছিলেন। সেই কারণে স্বেচ্ছাচারী শাসকেরা এইসব ঈগলের গানকে অত্যন্ত ভয় করতেন। এঁদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর মানবদরদী মনকে শাসকবর্গ অবিরাম প্রতিহত করবার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকতেন। কিন্তু কারাগারের অন্তরালে নিক্ষেপ করেও শাসকবর্গ এঁদের কণ্ঠস্বরকে প্রতিহত করতে পারেননি। ১৯৫৮ সালে 'পাবলো নেরুদা' পুনর্বার চীন পরিদর্শনে আসেন। এই সময়ে তার সঙ্গে ছিলেন ব্রেজিলের বিখ্যাত লেখক 'আমাডো।' আই-ছিং এবারেও এঁদের আদর আপ্যায়ন ও যথাযথ সম্বর্ধনার দায়িত্ব নেন। নেরুদা যখন চীন পরিদর্শনে ব্যস্ত তখন তাঁকে পরোয়ানা পাঠানো হয়। তিনি দক্ষিণপন্থী রূপে অভিযুক্ত হন। চিলির কবি নেরুদাকে এই সময় বিদায় সম্বর্ধনা জানাবারও অবকাশ পাননি আই-ছিং। দীর্ঘ জীবন 'নেরুদা' সম্পর্কে চীনের জনগণের কণ্ঠে একটি বাণীই অবিরাম ধ্বনিত হয়েছে। সে বাণী: জনগনের কবি 'পাবলো নেরুদা' একজন দয়ালু, সৎ ও বৃহৎ জগতের মানুষ। তাঁর হৃদয় সমুদ্রের মত মহান। তিনি মানবতা বোধের পথিকৃৎ। এ যুগের যাঁরা স্মরণীয় কবি, তাঁরা তাঁদের বিশেষত্ব ও মহত্ব প্রকাশ করে-

ছিলেন তাঁদের কবিতায়। সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্যে সংগ্রামের আহ্বান, শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের আশার বাণী তাঁদের কবিতায় ধ্বনিত হয়েছিল। এই ধরনের মানুষ ছিলেন নেরুদা, হিকমৎ ইত্যাদি স্মরণীয় কবিগণ। এঁদের চরিত্রের বৈশিষ্ট হল, এঁরা একই ভাবনায় পুষ্ট এবং একই বক্তব্যে সোচ্চার। এঁদের কবিতা জনগণ কর্তৃক এত আদ্রিত হবার প্রথম কারণ হল, এঁরা কবিতায় সমাজের নিপীড়িত জনগণের কথা তুলে ধরেছিলেন। যাঁরা মুক্তি-যুদ্ধে সত্যজয়ী, তাঁদের দুঃসাহসের কথা, তাঁদের মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভালবাসার কথা মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করেছিলেন। ফলে এইসব কবিদের কবিতা শুধু মাত্র চীন দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এঁদের কবিতা চীনাভূমি ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদেরও অনুপ্রাণিত করেছিল। যদিও ভাষা একটাবাধা স্বরূপ, তবুও বিভিন্ন দেশের অনুবাদের মাধ্যমে ভাষার বাধা এড়িয়ে সেই সমস্ত দেশের সাধারণ মানুষেরও মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। এঁরা যে দরদী ও মরমী কবি, মানবিকতার ক্ষেত্রে এঁদের কবিতা যেকোন দেশ বা ভাষার বাঁধনে বাঁধা নয় এ কথা আজ সর্বজন স্বীকৃত। এঁরা এঁদের কবিতায় যে ভাব-মূর্তি বা মানসিক চিত্র গড়ে তুলেছিলেন, যে রূপক উপমা এবং অলঙ্কার ব্যবহার করেছিলেন তা সার্বজনীন। এবং সেই কারণেই এঁরা বিশ্ববাসীর মনে স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। এঁরা সকল মানুষের উৎসাহ ও মনের উষ্ণতা গ্রহণে সমর্থ হয়েছিলেন। দ্বিতীয় কারণ, এইসব মহৎ কবিদের কবিতায় লেশ-মাত্র শব্দাড়ম্বর ছিল না। এঁরা কবিতায় কখনও দাম্ভিকতা বা ধৃষ্টতা প্রকাশ করেননি। চিড়-খাওয়া ঘণ্টা যেমন বাজে, এঁদের কবিতার একটি পঙক্তিও তেমন বেসুরে বাজেনি বা বিপরীত সুরে ধ্বনিত হয় নি। এঁদের কবিতার মাধুর্য সারল্যে ও সততায়। মানুষের মনের কথা, মানুষের আবেদন সোজা-সুজি পরিবেশন করা। তৃতীয় কারণ, এমন কোন মানুষ দাবী করতে পারবেন না যে দুঃখবাদ বা বিষণ্ণতাবাদের মধ্যে কোন মহৎ কবি জন্ম লাভ করেছে। অর্থাৎ দুঃখবাদ বা বিষণ্ণতাবাদের মধ্যে কোন মহৎ কবির জন্ম হতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাসে সেইসব কবিতা ও কবিরাই বেঁচে আছেন, যাঁরা মানুষের কথা বলেছেন, মর্ত্যের বাণী নির্ভয়ে উচ্চারণ করেছেন, দেশের জনসাধারণকে শত্রু মিত্র চিনিয়ে দিয়েছেন এবং ক্রমান্বয়ে আশার বাণী শুনিয়েছেন। অগ্রণীর ভূমিকা নিতে সাহায্য করেছেন। চতুর্থ কারণ, মহৎ কবিরা হচ্ছেন দেশের ভবিষ্যৎ বক্তা। দেশের জনগণের রায় তাঁদের বাণীর মধ্যে সেই সর্বজন সমক্ষে

পরিবেশিত হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবন, পারিপার্শিক অবস্থা, এ সমস্তই তাঁদের কবিতায় বিস্তারিত বিধৃত। সংগ্রামের আইনগত অধিকার, উন্নতি ও ফল, এইসব মহৎ কবিরাই সর্বাগ্রে জনসাধারণকে অবহিত করতে সক্ষম। এঁদের সোচ্চার বক্তব্যে ভীত মানুষেরা হয়তো নীরব থাকবেন। কিন্তু এঁরা সব সময়ই আশার আলো হাতে নিয়ে জনগণকে সূর্য ওঠার গান শোনাবেন। সুন্দর, সুস্থ এক মানব সমাজের কথা বলবেন। এই সব কবিরা মানুষ হিসাবে অত্যন্ত সাধারণ, রসিক, জীবন্ত এবং প্রাণধর্মী। এরা আজীবন সাধারণ মানুষের ওপর ভরসা রাখেন এবং আশা-ভরসার দীপবর্তিকা হয়ে থাকেন।

আই-ছিং-এর চরিত্র এবং কবিতা ঐ একই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে মহান কবি নাজিম হিকমৎ-এর কবিতা তাঁর দেশীয় ভাষার বাধা ডিঙিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁচেছে। সেই প্রকার আই-ছিং-এর কবিতাও চীনাভূমি অতিক্রম করেছে। ১৯৩৭ সালে এই দুই দেশের দুই ভিন্ন ভাষার কবি শত্রুদের সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে জনগণের সংগ্রামের সামিল হয়েছেন। দেশের সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেছেন। হিকমৎ 'ম্যাড্রিড্'-এর নাগরিক হয়ে 'ফ্রাঙ্কো' সেনাবাহিনীর প্রতি সতর্ক করেছেন। অপর দিকে আই-ছিং চীনা ভূমিতে কৃষক-মজদুরদের হয়ে কথা বলেছেন সংগ্রামের বহ্নি জ্বালিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে হিকমৎ লিখেছেন :

'গভীর রাত তুষারে আচ্ছাদিত,
　　তুমি 'ম্যাড্রিড্ শহরের দরজায় দাঁড়িয়ে .....
আজ সন্ধ্যা থেকেই তুমি শীতে কষ্ট পাচ্ছ,
　　তোমার পদযুগল ঠাণ্ডা তুষারে সিক্ত,
আমি যখনই তোমার কথা চিন্তা করি
　　এবং সম্ভবতঃ ঠিক এই মুহূর্তে, যখন
আমি তোমার কথা চিন্তা করছি,
　　সেই মুহূর্তে একটি গুলি তোমার,
শরীর ভেদ করে চলে গেল।
এখন তোমার কাছে তুষারপাত, হীম-শীতল বাতাস, শীত
দিন বা রাত্রি সবই সমান।

[গভীর রাতে তুষার পাত, ১৯৩৭

ঐ একই প্রসঙ্গে, আই-ছিং' লিখেছেন :—

'আজকের মত সেদিন রাতেও ঠাণ্ডা ছিল ভয়ানক,
অসংখ্য প্রবীনা মায়েরা
অপরের ঘরে পশুর মত অপেক্ষায় রত,
এরা অনামী, অখ্যাত পথিক,
জানেনা আগামীকাল তাদের ভাগ্য
আবার নতুন করে কোথায় তাদের টেনে নিয়ে যাবে।
আজকেও চীনের লক্ষ্য পথ
বড়ই অনমনীয়, অসমান, অসমাপ্ত—
এবং কর্দমাক্ত।

[চীনা ভূমিতে অবিরাম তুষারপাত, ১৯৩৭]

দুটি কবিতারই চিত্র, কলা ও মেজাজ এক। এক এই অর্থে নয় যে, এই দুটি কবিতাতেই ঠাণ্ডা ও তুষারপাতের ছবি আঁকা হয়েছে। এক এই অর্থে যে, এই দুটি কবিতাতে নিপীড়িত, শোষিত মানুষের কথা বলা হয়েছে। যদিও এই দুই কবির পরস্পর অবস্থানের দূরত্ব ছিল ১০ হাজার মাইল, এবং এদের আন্দোলন ফ্যাসীবাদীর বিরুদ্ধে। তখন ফ্যাসীবাদীর কালো হাত এই দুই দেশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

আই-ছিং-এর কবিতার বিশেষত্ব ঋজুতা, বলিষ্ঠতা ও নির্মল সারল্য। তিনি তাঁর কবিতায় পরিষ্কার ভাবে বক্তব্য পেশে আগ্রহী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, তাঁর 'আয়না' কবিতাটি। এই কবিতাটি তিনি ১৯৭৮ সালে রচনা করেছিলেন। এবং অনেক কবিতার মধ্যে এটি একটি বিশেষ কবিতা: 'ভালোবাসার মধ্যেই সত্য ঘুমিয়ে আছে। ভালবাসা কিছুই গোপন করে না। ভালবাসা মহৎ, যদি কোন মানুষ মহত্বের মাধ্যমে একে চায়। ভালবাসা এত নির্মম সত্য যে, কিছু কিছু মানুষ একে এড়িয়ে যেতে চায়। আমাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছেন। যাঁরা ভালবাসাকে ঘৃণা করেন। এমনকি একে দু'পায়ে দলিত করতেও ইচ্ছুক।"

মহৎ কবিদের আর একটি বড় শক্তি হচ্ছে, তাঁরা আগামী দিনের ঘোষক। নতুন জগৎ সৃষ্টির অগ্রগামী দূত। এই কবিরা মানুষের মনে বিবাদ সৃষ্টি করেন না। মানুষের জীবনের অন্ধকারের বা রাতের গান করেন না। এঁরা সূর্যের আলোর কথা বলেন। সব সময়ই সংগ্রামের কথা বলেন। কোন

বিষয়েই অনীহা প্রকাশ করেন না। এঁরা পুরাতন পথের পথিক নন। এঁরা জটিল পথের সন্ধানী। দুর্গম গিরির গহন পথ এঁদের অভিনন্দিত করে। অবশ্য বিপ্লবীদের এটা একটা আন্তর্জাতিক চরিত্র যে, এঁরা সবসময়ই সাধারণ মানুষের পাশে পাশে থেকে তাদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। এমনকি হাজার বছরের পুরাতন ফসিল থেকেও আই-ছিং একটি চমৎকার কবিতা লিখেছেন। তিনি বলেছেন: একজন মহৎ কবি এই ফসিল দেখেও অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। এই ফসিল একজন কবির কাছে ভবিষ্যৎ পথের দিগ-দর্শক হতে পারে। ফসিল বিষয়ে 'একজন নির্বোধ মানুষও এই ফসিল থেকে শিক্ষা দিতে পারে' কবিতায় তিনি বলেছেন: 'স্থাবরের কোন প্রাণ নেই। বেঁচে থাকার অর্থই সংগ্রাম। এবং ক্রমাগত সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাওয়া। এমনকি মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও, আমরা আমাদের শেষ শক্তি নিয়োজিত করে থাকি।' কিছুদিন আগে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে এই ফসিল কবিতা লেখার নেপথ্যে তাঁর কোন প্রকার কৌতুক প্রবণতা ছিল কিনা। এ কথা শুনে তাঁর উজ্জ্বল চোখ দুটিতে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি উত্তরে বলেছিলেন: 'হ্যাঁ'! তারপর শেষ কটি কথা যোগ করেছিলেন: 'আজকের দুনিয়ায় বড় বেশী সংখ্যক মানুষ ফসিলে রূপান্তরিত হচ্ছে। [ফসিল-১৯৭৮]

কারণ বিপ্লবী প্রতিটি কবিই প্রতিটি জিনিষের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে সত্যের সন্ধান করেন। তারা ক্রমাগত জনসাধারণের সঙ্গে যোগসূত্র রেখে চলেন। কারণ তাঁরা সর্ব সময়ের জন্যেই মনে করেন যে তাঁরা জনগণের কবি। তারা পরিষ্কার ভাবে দেশের শত্রুকে চিনিয়ে দেন। কিছুদিন আগে বেইজিং শহরে যে কবি সম্মেলন হয়ে গেল, তাতে আই-ছিং বলেছেন: জনগণের স্বার্থে একজন কবি সত্য কথা বলতে বাধ্য।' তিনি আরো বলেছেন: 'একজন মহৎ কবির কাজ হবে জনসাধারণের সমস্যা বিবেচনা করা। জনসাধারণকে ধ্যান করা। বর্তমান কালের সমস্যা ও তার সমাধানের পথ খোঁজা এবং তুলে ধরা।' তিনি (আলোর স্তুতি—১৯৭৮) কবিতায় বলেছেন: 'আলোহীন পৃথিবী যেন চোখহীন মানুষ। এরা শত্রু-মিত্র চিনতে অক্ষম। শতাব্দীব্যাপী মানুষের জ্ঞানের আলো মানুষকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। মানুষকে সজাগ করেছে। আমাদের চোখ খুলে রাখতে সাহায্য করেছে। যাতে লক্ষ লক্ষ শত্রু, যারা আমাদের অবিরাম ঘিরে আছে, তাদের কৌশল, চালাকি প্রবণতা ও বঞ্চনা যেন আবার নতুন করে আমাদের ঘিরে না ফেলে। জ্ঞানের আলো

আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, একতার অর্থ প্রতিবাদ। যেখানেই কিছু মানুষ একত্রিত হয়েছে, সেখানেই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার অনিবার্য ফল, বিপরিতধর্মী ভাবনার মুখোমুখি হওয়া। অর্থাৎ আগামীদিনের বিপদ সংকেত শুনতে পাওয়া। সংগ্রামকে সব সময়ই বিপরীত সংগ্রামকে সামলাতে হয়। প্রতিহত করতে হয়। ফলে বিপ্লবকে সব সময়ই প্রবঞ্চনার দায়িত্ব নিতে হয়। অর্থাৎ বিপ্লবের কোরকে প্রবঞ্চনা লুকিয়ে থাকে।'

আই-ছিং দেশের জনসাধারণকে এই নির্মম সত্য ও সমাধান বাণী উচ্চারণ করতে গিয়ে বলেছেন:

'আমাদের জীবনটা একটা জ্বলন্ত অগ্নিক্রিয়া।
আমরা, আমাদের সময়ে
কোন উৎসবে আতস বাজীর কাজ করবো।
আমরা, আনন্দের প্লাবনে অসীম আকাশে ছুটে যাব,
তারপর অতর্কিতে অগ্নিশিখা হয়ে ছড়িয়ে পড়বো।

আমরা যদি কখনও ক্ষুদ্র আলোক-বর্তিকা-ও হই,
আমরা শেষ বিন্দু পর্যন্ত জ্বলবো;
আমরা যদি কখনও দেশলাই হই
আমরা বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দুতে আগুন লাগাবো,
চূড়ান্ত সময়ে জ্বলে উঠবো;
মৃত্যুর পর যদি কখনও আমাদের
হাড়গুলোতে পচন ধরে, গলিত হয়ে যায়
তবুও নিশ্চিত জেনো তৃণের আঁটির মত
নিভু নিভু হয়েও আমরা আমাদের জ্বলন্ত
ইচ্ছা নিয়ে জ্বলবো।'

আশ্চর্যের কথা এই যে আই-ছিং শুধুমাত্র একজন বিপ্লবী কবি বা জীবন-শিল্পীই নন। তিনি একজন চিত্রশিল্পীও বটে। শৈশবে তিনি অনেক ছবি এঁকেছেন। এবং আরও আঁকবার ইচ্ছা পোষণ করতেন। বাল্যকালে তিনি নিজেকে চিত্রশিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে 'National West Lake School of Art'-এ ভর্তি হন। কিন্তু নানা কারণে এ জীবন তাঁর স্থায়ী হয়নি। তারপর তিনি ছবি আঁকা শিখতে প্যারিসে যান। আজ তিনি

'বেইজিং'-এ তাঁর বাসস্থানের জন্যে যে কুঞ্জ-কুটিরটি তৈরী করেছেন, সেখানে নানা দেশের বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষভাবে তিনি বেছে নিয়েছেন Qi Baishi (Chi-Pai-Shih)-এর অঙ্কিত ছবি। তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু Lin Fengmian এবং অন্যান্য প্রতিভাধর ব্যক্তিবর্গের ছবি। চীন দেশে দীর্ঘকাল ধরেই চিত্রশিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে একটী যোগসূত্র গড়ে উঠেছে। এ আত্মীয়তা দীর্ঘ দিনের। উদাহরণ স্বরূপ Su-Donspo (১০৩৭-১১০১) ট্যাংকবি, চিত্রশিল্পী, হস্তশিল্পী ও সংগীত বিশারদ Wang Wei (moji, 699-751) সম্পর্কে বলেছিলেন, Mojie-র কবিতা পাঠের অর্থ তাঁর ছবি দেখা, তাঁর ছবি দেখার অর্থ তাঁর কবিতা পাঠ করা।' যদিও আই-ছিং-এর কবিতা পাঠের অর্থ তাঁর ছবি দেখা। সত্যিকথা বলতে কি একজন কবি তাঁর নির্বাচিত শব্দের সাহায্যে কবিতায় তাঁর শ্রেষ্ঠ কল্পনার রূপ নির্মাণ করেন। আই-ছিং-এর শ্রেষ্ঠ কবিতায় আমরা এই সর্তের প্রতিধ্বনিই শুনতে পাই। যেমন: চীনাভূমিতে তুষারপাত, রণতূর্যবাদক, আলোকের স্তুতি, ইত্যাদি কবিতার গঠনপদ্ধতি, রূপকল্পনা, শব্দ চয়ন মানুষের মনকে অনায়াসেই স্পর্শ করে। আই-ছিং কলমকে বা লেখনীকে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু অনেকে বলেন যে তিনি যদি চিত্রশিল্পকে বা ব্রাশকে বেছে নিতেন তাহলে তিনি যথাযথ পুরস্কৃত হতেন।

আই-ছিং আজীবন মানুষকে আশার বাণী শুনিয়েছেন। জীবনের দাবী মিটিয়েছেন। পূর্বসূরীদের মতই সূর্যের নির্মল আলোর বাণী শুনিয়েছেন। মুক্তদিনের মুক্ত বাতাসের কথা বলেছেন। উত্তুঙ্গ পাহাড়ের মত মানুষের মনে অসীম আশার জোগান দিয়েছেন। শ্যামল বন-বীথিকার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। সামনে চলার পথের নির্দেশ দিয়েছেন। দূর আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবার কথা বলেছেন এবং বিশেষভাবে সংগ্রাম ও বিপ্লবের কথা বারবার উচ্চারণ করেছেন। সোচ্চার রণতূর্যের মত সমস্ত মানব সমাজকে একটা নতুন পৃথিবী, নতুন মানব সমাজ গড়ে তোলার জন্যে আজীবন আহ্বান করেছেন। যে সমাজে মানব-জীবনের পূর্ণতা আছে; বাঁচার আনন্দ আছে, বীর্য আছে, ভালবাসা আছে এবং সর্বোপরি সমস্ত মানুষের একটি জাতীয় ইচ্ছা আছে। সে ইচ্ছা উজ্জ্বল এক নতুন পৃথিবীর স্বাদ। সমুদ্রের মত মানবতাবোধের স্বাদ। এই সমস্ত স্বপ্নের দিশারী ও আলোকবাহী হচ্ছেন বিপ্লবী কবি—'আই ছিং'।

এক রকম পাখী শিকারী

কোন একজন মানুষের হঠাৎ পাখী শিকার-বিদ্যা শেখবার ইচ্ছা হল। তিনি একজন শিকারীর কাছে গিয়ে তাঁকে শিক্ষক হতে বললেন। তিনি শিকারীকে বললেন: একজন মানুষ অনেক কষ্টে এবং পরিশ্রমে কোন একটি বিদ্যা আয়ত্ব করতে পারে। এবং এ ব্যাপারে তাঁকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। আমি ঠিক করেছি যে, আমি নিজেকে শিকারী রূপে প্রতিষ্ঠিত করবো। আমি বনে গিয়ে পাখী শিকার করতে চাই। কারণ আমি শিকার পছন্দ করি।

শিকারী ঐ ভদ্রলোকের বন্দুকটা ভাল করে পরীক্ষা করলেন। তিনি দেখলেন যে বন্দুকটা সত্যিই ভাল। এবং ভদ্রলোকও এ ব্যাপারে বেশ তৎপর এবং উৎসুক। সুতরাং তিনি তাঁকে বিচিত্র পাখীদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের কথা জানালেন। বিভিন্ন ধরনের পাখী শিকার করতে গেলে কি ধরণের শিক্ষা থাকা প্রয়োজন সেকথাও জানালেন। কিন্তু কি করে নজর ঠিক করতে হয় এবং বন্দুক ব্যবহার করতে হয় তা' বিশেষ কিছুই জানালেন না।

ঐ ভদ্রলোক শিকারীর কথা শুনে সে মনে মনে ভাবলেন যে তিনি শিকারের ব্যাপারে সব কিছু শিখে এবং জেনে ফেলেছেন। এবং এই বিশ্বাসে তিনি তাঁর বন্দুক নিয়ে বনে চলে গেলেন। বনে গিয়ে এক জায়গায় তিনি দেখলেন যে অনেক পাখী বসে আছে। কিন্তু তিনি বন্দুক তুলতে না তুলতেই সমস্ত পাখী উড়ে চলে গেল।

ভদ্রলোক শিকারীর কাছে ফিরে এসে বললেন: পাখীরা অত্যন্ত চালাক। আমি তাদের ভাল করে দেখার আগেই তারা আমাকে দেখে ফেলেছে। এবং বন্দুক তোলার আগেই তারা উড়ে পালালো।

তখন শিকারী বললেন: আপনি কি এমন পাখী শিকার করতে চাইছেন যে উড়তে পারে না?

ভদ্রলোক জবাব দিলেন: সত্যিকথা বলতে কি, আমি যখন শিকার করবো তখন যদি পাখীরা উড়তে না পারে তাহলে খুবই ভাল হয়।

শিকারী বললেন: তাহলে আপনি বাড়ী গিয়ে একটা কার্ডবোর্ডে একটি পাখী এঁকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে গুলি করুন। দেখবেন আপনার লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।

ভদ্রলোক বাড়ী গিয়ে শিকারী যা' বলেছিলেন তাই করলেন। তিনি বেশ কয়েকটা গুলি করলেন। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছালো না। তিনি আবার শিকারীর কাছে ফিরে এসে বললেন: আমি আপনার কথা মত কাজ করলাম, কিন্তু তবুও কোন ফল হল না। আমার গুলি ঐ পাখীটার গায়ে বিঁধলো না। শিকারী তখন জানতে চাইলেন যে কেন লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলেন। ভদ্রলোক তখন বললেন: সম্ভবতঃ আমার মনে হয় আমি পাখীটা খুবই ছোট করে এঁকেছিলাম। অথবা আমি আমার লক্ষ্য বস্তু থেকে বড় বেশী দূরে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন শিকারী বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন: আমি আপনার ধৈর্যও মননশীলতা দেখে মুগ্ধ। এবারে আপনি বাড়ী গিয়ে গাছে একটা বড় কার্ডবোর্ড ঝুলিয়ে তাতে গুলি করুন। দেখবেন এবারে আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হবেন না।

ভদ্রলোক এবারে অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন: দূরত্ব কি আগের মতই থাকবে?

শিকারী বললেন: সেটা আপনার খুশি।

ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করলেন: আমি কি কার্ডবোর্ডে আবার একটা পাখী এঁকে নেব?

শিকারী জবাব দিলেন: না।

ভদ্রলোক তখন মৃদু হেসে বললেন: এবারে কি আমি শুধু কার্ডবোর্ডেই গুলি চালাব?

শিকারী তখন উপদেশ দিয়ে বললেন: আমি যা ভেবেছি সেটা বলি। প্রথমে আপনি কার্ডবোর্ডেই গুলি করা অভ্যাস করুন। যখন এ কাজটা আপনার আয়ত্বে এসে যাবে তখন আপনি কার্ডবোর্ডের প্রতিটি গর্তে একটি করে পাখী এঁকে নেবেন। যতগুলো পাখী আঁকা সম্ভব আঁকবেন। এবং গুলি করবেন। শিকারের শিক্ষা এই ভাবেই এগুতে থাকবে।